ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক
Ebong Prantik

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৯, মে ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
Vol. 12th Issue 29th, May, 2025
DOI : 10.5281/zenodo.16036760

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)]
DOI : 10.5281/zenodo.16036760
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 29th, 12th May, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১২ তম বর্ষ ও ২৯ তম সংখ্যা
১২ মে, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. রুপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি. এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।

২. বাংলা হরফে লিখলে অভ্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।

৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com

৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।

৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 8250595647
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

বাংলা দলিত আত্মকথার ধারা ও তার গতিমুখ
দেবাশিস বিশ্বাস ১১
যোগদর্শনের আলোকে রাজযোগ
কাকলী সাঁতরা ১৮
দামোদর নদ ও বর্ধমান : একটি ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা
জয়দীপ ঘোষ ২৪
ঝাড়খণ্ডে বাংলা ও কুড়মালি সাহিত্যের চর্চা অনুশীলন
রাজশ্রী মাহাত ৩২
ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব- পর্যালোচনা
নীলকান্ত বিশ্বাস ৩৯
অথর্ববেদে প্রতিভাত মাতৃত্ব : একটি সমীক্ষামূলক অধ্যয়ন
বন্দনা দাস
দীপঙ্কর সালুই
অভিজিৎ মণ্ডল ৪৫
আধুনিক শিক্ষা চিন্তায় বিদ্যাসাগর : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ
নোটন সিং ৫৫
ভাসনাটকচক্রে প্রতিফলিত যোগতত্ত্ব
সুকন্যা সরকার ৬১
সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতায় চিত্রিত দেশ : একটি সমীক্ষা
সুরেন্দ্র নাথ দে
দেবাশিস ভট্টাচার্য ৬৫
রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও ‘মানুষের ধর্ম’
পিউ মুখার্জী ৭৯
সিপাহি বিদ্রোহকালের উপন্যাস বৈষ্ণবচরণ বসাকের ‘দেবযানী’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অনুধ্যান
বাসব দাস
বিনীতা রানি দাস ৮৭
হিজল বিল ও কোপাই নদীর বাঁক : দুই অনন্য উপকথা
সন্ধ্যা মন্ডল ৯৫
রবীন্দ্রগল্পে নারীর জীবনে অনাচার ও প্রথার প্রতিচিত্র : একটি নির্বাচিত পাঠ
সন্দীপ ঘোষ ১০০
খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা : বোধির একান্ত অভিশাপ
সৌরভ মজুমদার ১০৮
সেলিনা হোসেনের তিনটি উপন্যাস : শিল্পী জীবনের ছবি
সায়ন মণ্ডল ১১৬

‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পের বহুমাত্রিক অনুসন্ধান
সাথী নন্দী ১২২
কাহিনি নির্মাণে চেতনাপ্রবাহ রীতি : প্রেক্ষিত জয় গোস্বামীর সংশোধন বা কাটাকুটি
সঙ্গীতা দাস ১২৮
তপন বাগচীর আলোকায়ন : রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ আখ্যান
শর্মিষ্ঠা ঘোষ (সিন্‌হা) ১৩৪
শৈলীর নবনির্মাণ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প (নির্বাচিত)
রিঙ্কু ঘোষ ১৪৫
বোকা তাঁতি : একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ
রঘুনাথ রায় ১৫৫
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : জেলেদের বাস্তব জীবন সংগ্রামের চিত্র
মনোয়ার আলী ১৬০
উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জ জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা
মো: শরিফুল ইসলাম ১৬৮
বাক্য সংযুক্তির স্বাতন্ত্র্য সন্ধান : রাজবংশী ভাষা
মিনাল আলি মিয়া ১৭৫
প্রেমের এক আকুণ্ঠ জিজ্ঞাসায় ‘গঙ্গা’ উপন্যাস
মিঠুন পাল ১৮৪
সাম্প্রতিক লেখিকা পারমিতা ঘোষ মজুমদারের উপন্যাসে আধুনিক পৃথিবীর দাম্পত্য
সহেলি চৌধুরী ১৯৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘আমি রাইকিশোরী’ : বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা
প্রলয় মণ্ডল ২০০
মুনতাসীর মামুনের গল্প : দ্বন্দ্ব সংকটের সময়কাল ও মানসিক টানাপোড়েন
পুনম মুখার্জী ২০৬
বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্পে হাস্যরস
পার্থ সারথি চক্রবর্তী ২১৩
‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ : জাদু বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা
দেবদীপ দাস ২২০
বিশ শতকের নির্বাচিত মুসলিম বাঙালি নারীর কলমে অবরোধ বিষয়ক বোঝাপড়া
দিশা দত্ত ২২৭
মধুসূদন - দীনবন্ধু
তপন কুমার বালা ২৩৪
ইতিহাসের আলোকে ছোট আস্তানা এবং শাহ ইসমাইল গাজীর সমাধি প্রসঙ্গ
ডালিয়া খাতুন ২৪৬
জীবনানন্দ দাশের কাব্যচেতনা : হাইডেগার থেকে দ্যলুজ
দীপঙ্কর দেবনাথ ২৫১
মধুসূদন দত্তের নাটকে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ : প্রসঙ্গ কৃষ্ণকুমারী নাটক
চন্দন বাউরী ২৫৯

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী
চন্দন চৌধুরী ২৬৫
ইমতিয়াজ মাহমুদ ও আনিফ রুবেদের নির্বাচিত কবিতায় দৃশ্যরূপ : একটি শৈল্পিক অন্বেষণ
চৈতালি ঘোষ ২৭১
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধীর বাড়ি ফেরা' : ভাবনার অন্য ভুবন
চিরঞ্জিত মাণ্ডি ২৭৭
ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে ধর্ম
জাগৃতি চ্যাটার্জী ২৮২
প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত
প্রলয় শঙ্কর অধিকারী ২৮৯
শম্ভু মিত্রের "ঘূর্ণি" নাটক সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল
অর্জুন কুমার কর ৩০৪
রাগের ভিন্নতা ও শ্রোতার অভিজ্ঞতা : হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ
ঋতু মণ্ডল ৩১০
রাজনৈতিক চেতনা প্রশ্নে আল মাহমুদের কবিতা
ফজলুল হক তুহিন ৩১৬
শীতলামঙ্গলে বর্ণিত বিভিন্ন রোগ, লক্ষণ ও তার লোকায়ত চিকিৎসা
নীতীশ ঘোষ ৩২৫
আবুল কাসেমের 'অতীশ' : বৌদ্ধধর্মে বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুরণ
কনক মণ্ডল ৩৩৪
'পুঁইমাচা' : বিষয়বস্তু নিতান্ত নগন্য হয়েও গল্পে অসাধারণত্ব
অরূপ পলমল ৩৪১
রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদের এবং যোগাভ্যাসের মূল্যায়ণ
গৌর বেরা ৩৫০
উনিশ শতকে (১৮৭০-১৯০০) বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের নামকরণে 'আর্য্য' শব্দের ব্যবহার
পারঙ্গমা সেন সাহা ৩৫৫
রবীন্দ্রনাথের 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসদ্বয়ে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা
মৌসুমী মণ্ডল ৩৬১
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের শৈলী বিচার
জয়ন্ত বিশ্বাস ৩৬৮
Indo - Bangladesh Relations : Since 1971
Manoj Basak ৩৭৯
Demographic Trends and Patterns of Nadia District
Chaina Debnath ৩৮৭

Planning and Welfare Schemes for Scheduled Tribes in Northern Odisha : Opportunities and Barriers to Inclusive Development
Bhagyashree Mishra ৩৯৯
Sankaracharya's Advaita Vedanta Philosophy and Brahmanism : A Critical Analysis
Chaitali Saha ৪১১
The China as - a Factor in Indo-Bhutan Relations
Chandan Chatterjee ৪১৯
The Rise and Growth of Goyendah in Colonial Bengal
Faijun Aktar ৪২৭
Study of Modern Sanskrit Literature
Haripada Mahapatra ৪৩৪
A Comprehensive Study of the Sericulture Industry in Murshidabad : Historical Evolution, Present Trends and Future Prospects
Md. Bulbul Saikh ৪৩৭
Abul Kashem Fazlul Haq : AVersatile Genius in Pre-Independence India
Neksad Khan ৪৪৫
Good Governance and Indian Democracy : Problems and Prospectus
Nepal Chandra Sarkar ৪৫২
Ethical Recognition of Motherhood : Revisiting Feminist Ethics in the light of Buddhist Philosophy
Ria Mondal ৪৬১
Holi a Dalit Festival : An Untold Story of Protest
Shatrughan Kahar ৪৬৮
Swami Vivekananda and his Educational Thoughts Include Social Values and the Present-Day Society
Sk. Mohammad Hasan ৪৭৬
The Surveillance Scheme : British Intelligence and the Suppression of Revolutionary Movements in India (1900-1920s)
Shampa Khatun ৪৮৬
Gender Stereotypes and Its Impact on Indian Society
Tanima Chatterjee ৪৯৫
A Heritage Police and His Struggle for Protecting Tangible Heritages of Temple Village of India
Samima Nasrin ৫০১

সম্পাদকীয়

সময়টা ক্ষয় হয়ে গেলেও চিহ্নটা থেকে যায়। চিহ্নকে সঠিকভাবে চিনতে গেলেই সঠিক চেতনার প্রয়োজন। গভীর চেতনা থেকেই চিন্তনের রসদ তৈরি হয়। রসদ সব সময় অনুসন্ধানের আগ্রহ তৈরি করে। আগ্রহই কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে। ত্বরান্বিত কাজই আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তবে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েই থেমে থাকা উচিত নয়। থামার আগে আপনার বিচার করা প্রয়োজন। আপনার চেতনার গভীরতা অন্যদেরকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। আপনার উপলব্ধি অন্যদের কতটা বুঝতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি আপনার অনুসন্ধান যেন অন্যদেরকে আপনার কাজের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এবারের ‘এবং প্রান্তিক’ সেই অনুসন্ধানের দিকেই দৃষ্টি রেখেছে।

বাংলা দলিত আত্মকথার ধারা ও তার গতিমুখ

দেবাশিস বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: আত্মজীবনী বা আত্মকথা দলিত সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ধারা। বিশিষ্ট মারাঠি লেখক দয়া পাওয়ারের 'বলুতা', লক্ষ্মণ মানের 'উপর', শরণকুমার লিম্বালের 'অক্করমাসি', লক্ষ্মণ গায়কোয়াড়ের 'উচল্যা', তামিল লেখিকা বামার 'কারুক্কু', হিন্দিতে লেখা ওমপ্রকাশ বাল্মীকীর 'ঝুটান' প্রভৃতি এই ধারার উল্লেখযোগ্য রচনা। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন', কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলির উপকথা', যতীন বালার 'শিকড়ছেঁড়া জীবন', কল্যাণী ঠাকুরের 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি', লিলি হালদারের 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালি' প্রভৃতি বাংলা উল্লেখযোগ্য দলিত আত্মকথা। এই সকল আত্মকথায় দলিত লেখকগণ তাঁদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা পাঠকের সঙ্গে শেয়ার করেছেন যেমন, তেমনি ধর্ম-সামাজিক কাঠামোয় তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রায় সকলে। বর্ণবাদীদের প্রতি অনাস্থার পাশাপাশি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যান-ধারণার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন প্রায় অধিকাংশ দলিত লেখক। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি নিজেদের লালিত সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের আত্মজীবনীতে তাই অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে শ্রেণিচেতনা। দলিত আত্মকথা শেষপর্যন্ত আর ব্যক্তির জীবন-ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে প্রান্তিক দলিত শ্রেণির জাতিগত অবস্থানজনিত লাঞ্ছনার ইতিহাস, লড়াইয়ের কাহিনি।
সূচক শব্দ: আত্মকথা, দলিত চেতনা, যাপিত জীবন, সমানুভূতি, সাহিত্য আন্দোলন, দেশ-কাল-সমাজ।

মূল আলোচনা:

ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি Autobiography বাংলায় তাই আত্মকথা বা আত্মজীবনী। ১৭৯৭ সালে The Monthly Review-তে উইলিয়াম টেইলর প্রথম Autobiography শব্দটি ব্যবহার করলেও সাহিত্যরীতি হিসাবে এটি অনেক পুরানো। মনে করা হয় সেন্ট অগাস্টিনের (৩৫৪-৪৩০) Confessions রচনার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যে আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যের সূচনা হয়। কেউ কেউ প্লেটোর লেখা Seventh Epistle-কে এই ধারার সাহিত্যের প্রথম প্রয়াস বলে দাবি করেন। ষোড়শ শতকে ইতালিয়ান ভাস্কর বেন ভেনুতো চিলিনির (১৫০০-১৫৭১) 'Vita' রেঁনেসা যুগের প্রথম আত্মজীবনী। ১৯৪৭ -এ প্রকাশিত অ্যানা ফ্রাঙ্ক-এর 'The Diary of a Young Girl' ইউরোপে অতি সাধারণ মানুষের বিখ্যাত হওয়া আত্মজীবনীগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় প্রকৃত পক্ষে আত্মজীবনী লেখার ব্যাপক চল শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। যদিও ১৬৪১-এ লেখা জৈন কবি বানারসি দাসের 'অর্ধ-কথানক'কে ভারতীয়দের লেখা প্রথম আত্মজীবনী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কালানুক্রমে আত্মজীবনী ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহারাষ্ট্রে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মূল ধারার সাহিত্যের সমান্তরাল একটি

সাহিত্যধারা যা দলিত সাহিত্য নামে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেই দলিত সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা আত্মকথা বা আত্মজীবনী।

১৯৫১ তে প্রকাশিত 'Untouchable: The Autobiography of an Indian Out Caste' গ্রন্থটিকে মনে করা হয় ভারতীয়দের লেখা প্রথম দলিত আত্মজীবনী। এই আত্মকথার লেখক নিজেকে হাজারি নামে পরিচয় দিয়েছেন। গবেষকদের ধারণা এটি লেখকের প্রকৃত নাম নয়। বিশিষ্ট মারাঠি লেখক দয়া পাওয়ারের 'বলুতা', লক্ষ্মণ মানের 'উপর', শরণকুমার লিম্বালের 'অক্করমাসি', লক্ষ্মণ গায়কয়াড়ের 'উচল্যা'; তামিল লেখিকা বামার 'কারুক্কু'; হিন্দিতে লেখা ওমপ্রকাশ বাল্মীকীর 'ঝুটান' প্রভৃতি এই ধারার উল্লেখযোগ্য রচনা। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন', কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলির উপকথা', যতীন বালার 'শিকড়ছেঁড়া জীবন', কল্যাণী ঠাকুরের 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি', লিলি হালদারের 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালি' প্রভৃতি বাংলা প্রথম সারির দলিত আত্মকথা।

দলিত সাহিত্যিকরা তাঁদের আত্মকথা লিখতে গিয়ে পাশ্চাত্য আদর্শে গড়ে ওঠা বাংলা আত্মজীবনী বা আত্মকথার যে বহুচর্চিত ধারা তাকে হুবহু অনুসরণ করেননি। 'আমি'কে বলয় করে আত্মকথার যে ধারা পৃথিবীর সকল ভাষার সাহিত্যে চর্চিত হয়ে এসেছে দলিত আত্মকথা তার থেকে খানিকটা ভিন্ন গোত্রের। এখানে 'আমি'র অবস্থান কেন্দ্রে থাকলেও এই 'আমি' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবচন বিশেষ্য পদ হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। 'আমি' আর 'আমরা এক হয়ে গেছে। 'আমি'কে উপস্থাপন করতে গিয়ে দলিত লেখকগণ দলিত সত্ত্বাকে চেনার চেষ্টা করেছেন; দলিতের আত্ম-আবিস্কারে রত থেকেছেন সর্বদা। দলিত লেখকের তথা দলিত মানুষের আত্মানুসন্ধান আর আত্ম আবিস্কারের প্রয়াস এই ধারার সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট লেখিকা ড. দেবী চ্যাটার্জী এ প্রসঙ্গে বলেছেন— "অধিকাংশ দলিত আত্মজীবনী বা আত্মকথা সেই অর্থে ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস নয়; সমষ্টির ইতিহাস। সেখানে তুলে ধরা হয় তাঁদের জাতিগত অবস্থান জনিত লাঞ্ছনার ইতিহাস, লড়াইয়ের কাহিনি আর প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি।"[১]

বাংলা দলিত সাহিত্যে যে সকল আত্মজীবনী আমরা পেয়েছি তার সবগুলি খুব উচ্চমানের তা নয়। তবে প্রত্যেকটি আত্মকথারই একটা নিজস্বতা রয়েছে। প্রত্যেকটিরই আলাদা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দলিত লেখকদের অনেকেই আত্মজীবনী লিখেই শুরু করেছেন তাদের সাহিত্য জীবন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকা ছিন্নমূল দলিত বাঙালি মানুষজনের অনেকেই কলম হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁদের নিজেদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার জন্য; তাদের দীর্ঘ বঞ্চনা, লড়াই-সংগ্রাম এবং বর্ণবাদীদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে। এঁদের সবগুলি রচনা হয়তো এখনও জনসমক্ষে আসেনি। অনেক লেখা হয়তো পাণ্ডুলিপি হিসেবে থেকে গেছে প্রকাশকের অভাবে। যে সকল বাংলা দলিত আত্মজীবনী এখনও পর্যন্ত জনসমক্ষে এসেছে তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত কিছু আত্মকথা সম্পর্কে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব।

বাংলা দলিত আত্মকথার আলোচনায় প্রথমেই উঠে আসে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' (২০১২) বইটির কথা। মনোরঞ্জন ব্যাপারী শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমি লেখক। তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একজন লেখক যিনি তাঁর আত্মজীবনীর জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী অনূদিত হয়েছে একাধিক দেশি বিদেশি ভাষায়। 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' বইটির জন্য মনোরঞ্জন ব্যাপারী ২০১৮ সালে 'দ্য হিন্দু প্রাইজ' পান। দু-খণ্ডে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে লেখক নিজের লড়াই-সংগ্রামের

কথা, নিজের চোখে দেখা রিফিউজি ক্যাম্প জীবন, কলকাতার ফুটপাথের জীবন, জেলখানার জীবন, কুলি-মুটে-রিক্সাচালকের জীবন, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাঁর লেখক হয়ে ওঠার আখ্যান বিবৃত করেছেন নিজের মতো করে। তাঁর নিজের যাপিত জীবন যে রেখায় প্রবাহিত সেই একই মাটির নির্মাণ হল 'ইতিবৃত্তে চন্ডাল জীবন'। এখানে লেখকের ব্যক্তিজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অদম্য লড়াইয়ের আখ্যানের পাশাপাশি উঠে এসেছে নকশাল আন্দোলনের উত্তাপ। উঠে এসেছে বামপন্থী রাজনীতির নানা দিক। আবার দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল হয়ে আসা পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজের দুর্দশার কথা, তাদের ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যেভাবে এই আত্মকথায় উঠে এসেছে তা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' পড়ে কবি শঙ্খ ঘোষ আপ্লুত হয়ে জানিয়েছেন–

> "...বইটির প্রথম খন্ড পড়ে মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক তৈরি হয়েছিল। আঘাতে আর দীপ্তিতে পূর্ণ এ রকম একখানা বই লিখলেন সমাজের একজন অবহেলিত মানুষ, লিখলেন তাঁর নিজের কটু– কিন্তু অপরাজেয়– অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ রূপটি। শুধু সেই অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যেই নয়, রচনার কুশলতাতেও সে-বই ছিল মুগ্ধ করার মতো। জনে জনে পড়াতে ইচ্ছে হয়েছে বইটি।"[২]

বাংলা দলিত সাহিত্য আন্দোলনের প্রতিনিধি স্থানীয় আর একজন সাহিত্যিক যতীন বালা। তিনি পূর্ববঙ্গে যশোর জেলার এক কৃষিজীবী নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত ছোট বেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছেন তিনি। তাঁর শৈশব কেটেছে দারিদ্র আর অনটনের মধ্য দিয়ে। দেশ ভাগের ফলে তিনিও উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসেন এদেশে। শুরু হয় আর এক নতুন লড়াই। অস্তিত্ব রক্ষার, বেঁচে থাকার সংগ্রাম। যা গাঁথা আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'শিকলছেঁড়া জীবন' (২০১০)। শৈশবে দাঙ্গার আগুনে নিজের বাড়িঘর, দেশ জ্বলতে দেখেছেন লেখক। এ গ্রন্থে সবিস্তারে তার বর্ণনা আছে। দশ বছরের উদ্বাস্তু ক্যাম্প জীবনের ছবি বিশ্বস্ততার সাথে এঁকেছেন লেখক। তাঁর নিজের ভাষায় "এ কাহিনি আমার সময়ের, আমার জন্মভূমি মায়ের অঙ্গচ্ছেদের আর আমার জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনচিত্র..."[৩]

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও দলিত চিন্তাবিদ মনোহরমৌলি বিশ্বাসের জন্ম তথাকথিত পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার এক নমঃশূদ্র কৃষক পরিবারে। তিনি বাংলা দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম মুখ। তাঁর আত্মকথার নাম 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি' (২০১৩)। সাধারণ গ্রাম্য কৃষক পরিবারের ছেলে হয়েও লেখক হাজার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সেই ইতিবৃত্ত এ গ্রন্থে যেমন পাই পাশাপাশি নিজের স্বগোষ্ঠীর মানুষজনের দীর্ঘদিনের সামাজিক বঞ্চনার মধ্য দিয়ে টিকে থাকার চালচিত্র সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যে সমাজ পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন সেখানে জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল বড় দাগে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষজন তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে 'ছোট জাত' হিসাবে গণ্য হত। লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন– "ছোটলোকের বাড়িতে এসে বাবুরা কেউ পাত পেতে খেতও না। ঠাকুর মশাই বাড়িতে শ্রাদ্ধ শান্তি করতে এলে তার জন্য স্বপাকের জোগান দিতে হত।"[৪] সব ব্রাহ্মণ অবশ্য তাদের বাড়িতে পুজো করতে আসত না। যারা আসতো তারা ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে নিচু জাতের। তাদেরকে বলা হত 'চাঁড়ালের বাওন'[৫]। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি বিষয় ছিল উল্লেখ করার মতো। বিধবা বিবাহের মত সমাজসংস্কার অনেক আগেই হয়েছে তাদের সমাজে। লেখক জানাচ্ছেন– "আমার জাতিগোষ্ঠীর বিধবারা মাছ মাংস আহারে অভ্যস্ত ছিল। এখনও তাদের মধ্যে সে-অভ্যাস বিদ্যমান। একাদশী

করা, ব্রত পালন করা তাদের ধাতে নেই। বিধবা বিবাহের কঠোর বিধিনিষেধ তাদের মধ্যে ছিল না। তাদের নিজস্ব সমাজ-সংস্কারকেরা এই বিধবা বিবাহের প্রচলন অনেক আগের থেকেই চালু করেছিল।"[৬] এইভাবে দলিত জীবনের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আলোচ্য আত্মজীবনীতে। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

দলিত নাট্যকার রাজু দাসের আত্মজীবনী 'এক রিকশাওয়ালার আত্মকথা' (২০১৫)। রাজু দাস এক উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন। জীবনে টিকে থাকার জন্য খবরের কাগজ বিক্রি করেছেন, রিক্সা চালিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি সরকারি চাকরি করেছেন কিন্তু রিক্সা চালানো ছাড়েননি। রিক্সা চালানোর পাশাপাশি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন দীর্ঘদিন। দলিত আন্দোলনে নিবেদিত এই মানুষটি একাধারে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন একটি নাটকের দল। তৈরি করেছেন 'শান্তিকুঞ্জ ব্লাইন্ড নাট্য একাডেমি'। লেখকের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তাঁর নানা কর্মযজ্ঞের ইতিবৃত্ত ধরা আছে এই আত্মজীবনীতে।

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলির উপকথা' (২০০০) আর একটি উল্লেখযোগ্য দলিত আত্মকথা। একাধারে এটি লেখকের আত্মজীবনীমুলক উপন্যাস। নকুল মল্লিকের 'মানিকরতন'ও (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) সমগোত্রীয় রচনা। জীবন আলেখ্য রচনার পাশাপাশি দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন, বর্ণবাদী সমাজে দলিত মানুষের টিকে থাকার লড়াই, দলিত আন্দোলন, মতুয়া আদর্শ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে এই দুটি আত্মজীবনীতে। এছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত শ্যামলকুমার প্রামাণিকের 'প্রান্তজনের আত্মকথা' (২০২২) আরেকটি উল্লেখযোগ্য দলিত আত্মজীবনী। অনিল রঞ্জন বিশ্বাসের 'রঙ বেরঙের দিনগুলি' (১৯৯১), মনোরঞ্জন সরকারের 'একজন দলিতের আত্মকথা' (২০০০), বনমালী গোস্বামীর 'অবর বেলায় পাড়ি' (২০১০), মনোরঞ্জন বড়ালের 'মনেপড়ে' (২০১২), ধূর্জটী নস্করের 'দলিতনামা' (২০১৪), বিভুতিভূষণ বিশ্বাসের 'গেঁয়ো ভূতের আত্মকথা' (১৯১৬) এই তালিকায় উল্লেখের দাবি রাখে। সবগুলি আত্মকথা নিয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

বাংলায় মেয়েদের লেখা আত্মকথার সংখ্যা সীমিত। কল্যাণী ঠাকুরের 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি' (২০১৬), লিলি হালদারের 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালি' (২০১৯) ও 'অথ লীলাবতী কথা' (২০২০) সাম্প্রতিককালে আলোচনার শিরোনামে উঠে এসেছে। 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি' বাংলা দলিত মহিলাদের লেখা প্রথম আত্মকথা। কল্যাণী ঠাকুর তাঁর আত্মকথা শুরু করেছেন শৈশব কালের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৫ সালে নদীয়া জেলার বগুলায় এক নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু পরিবারে কল্যাণী ঠাকুরের জন্ম। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্য দিয়ে লেখিকার শৈশব কেটেছে। যে গ্রামে তাদের বাস সেখানকার সকলেই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নিম্নবর্ণের হিন্দু। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এই সব প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মানুষদের প্রতিটি দিনই কাটত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য লড়াই করে। কিন্তু হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে বিশ্বাসী পিতা অভাবের সংসারেও বরাবর ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তিনি বলতেন— "ঠাউর কইছে- খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই। ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই"[৭]। আবার কখনও গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাণী উদ্ধৃত করে বলতেন— "ছেলে মেয়ে দিতে শিক্ষা প্রয়োজনে করবে ভিক্ষা"[৮]। লেখিকা নিজেও পরবর্তীকালে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মতুয়া আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। লেখিকা তার

গ্রাম্যজীবনের স্মৃতি উচ্চারণে কেবল নিজের জীবনকথা পাঠকের কাছে হাজির করেছেন এমনটা নয়, সেখানকার খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষ, তাদের জীবন-জীবিকা, তাদের লড়াই সংগ্রাম সবকিছু উঠে এসেছে সত্যতার সঙ্গে। আত্মজিবনীতে তিনি বলছেন—

> "এ আত্মকথন আমার নয় ঐ গ্রামে আমার সময়ের চুন্টু, ছোট, কুটি, অনিমা, করুণা, ছবি, রীনা, যমুনা এদের সকলের। কারণ আমরা সবাই তো ওখানে আধপেটা খেয়ে মাঠে ঘাটে গরু বাছুরের সাথে ঘুরে মানুষ হয়েছি। তাদের থেকে কোনো এক দৈব বলে আমি ছিটকে এসে দু'কলম লিখছি"।[৯]

ছোটবেলা থেকেই কল্যাণী ঠাকুর লড়াকু। স্কুল জীবনে লেখিকাকে তথাকথিত উচ্চবর্ণের সহপাঠিনীর পরিবারের কাছ থেকে অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়েছে নিজের জাতিগত অবস্থানের কারণে। এমনকি পিতার সমান স্কুলের প্রিয় শিক্ষকের কাছ থেকেও গঞ্জনা পেয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে রেলে চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর সেখানেও তাকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে নিজে এস.সি. বলে। কোটায় চাকরি পাওয়াটা যেন অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিরাট বড় অপরাধ। গায়ের রঙ নিয়েও তিনি চাকরিক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। নারীজনিত অবস্থানের কারণেও তাকে অবমাননার শিকার হতে হয়েছে। তবে লড়াকু মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি মাথা উঁচু করে বেঁচেছেন চিরকাল। আলোচ্য আত্মজিবনীতে তাঁর এই লড়াকু জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাঠক পাবেন।

লিলি হালদারও একজন উচ্চশিক্ষিতা এবং সরকারি চাকরিজীবী। রেলে চাকরি সূত্রে দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় তিনি ঘুরেছেন। ঘুরে বেড়ানো তাঁর নেশা। কবিতা লেখা তাঁর প্যাশান। 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালি' (২০১৯) প্রান্তিক সমাজ থেকে উঠে আসা লিলি হালদারের এক বর্ণময় জীবনের আখ্যান। বাঙালি দলিত নারীর লেখা যে-ক'টি আত্মজীবনী এখনও প্রকাশ্যে এসেছে তার মধ্যে 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালি' অনেক অর্থেই বিশিষ্ট। লিলি অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন- "যে জায়গা থেকে আমি বড়ো হয়েছি, যে পরিবার থেকে আমি বেড়ে উঠেছি সেখানে কবিতা লেখা বা গল্প লেখা একটা অকাজ ছিল"।[১০] গতানুগতিক প্রথা মেনে শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে লেখিকা তাঁর আত্মকথা শুরু করেছেন। লিলি হালদারের জন্ম কলকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। কিন্তু আত্মকথায় লেখিকা জানিয়েছেন আজীবন তাঁর নাড়ির টান রয়ে গেছে পূর্ববঙ্গের বড়িশালে পিতৃগ্রাম কাঠালিয়ার সঙ্গে। শৈশবে কাটানো দুবরাজপুরের স্মৃতি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এখানে। শৈশব কালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে পাঠককে দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদের চেয়ে নির্মম জাতপাতের ভেদাভেদ। কল্যাণী ঠাকুরের মত লিলি হালদারকেও জাতপাতের শিকার হতে হয়েছে কর্মক্ষেত্রে। দেশভাগের ফলে এপারে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা মানুষজনের উত্তর প্রজন্ম হিসাবে লিলি উপলব্ধি করেছেন ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা। ৭১-এর উদ্বাস্তু স্রোত লেখিকা স্বচক্ষে দেখেছেন, দেখেছেন নকশাল আন্দোলন। মনোরঞ্জন বড়ালের সংস্পর্শে এসে তিনি যেমন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সংস্পর্শে এসে লোকসংস্কৃতি চর্চাও করেছেন। যুক্ত হয়েছেন মতুয়া আন্দোলনে। 'ভাঙা বেড়ার পাঁচালি' ও 'অথ লীলাবতী কথা'য় এ সবের সবিস্তার বর্ণনা আছে লেখিকার নিজস্ব জবানিতে।

বাঙালি মেয়েদের লেখা যে সকল আত্মজীবনী আমরা এখনো পর্যন্ত পেয়েছি বেবী হালদারের 'আলো-আঁধারি' (২০০৪) এর মধ্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। লোকের বাড়ির পরিচারিকা

থেকে আজ সে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। তাঁরএই জার্নি লিপিবদ্ধ আছে ‘আলো-আঁধারি’ গ্রন্থে। ‘আলো-আঁধারি’ আরও ব্যতিক্রমী এইকারণে যে, বাংলায় গ্রন্থটি প্রকাশের আগেই এটি হিন্দিতে অনূদিত হয় এবং হিন্দি বলয়ের পাঠকের কাছে বিরাটভাবে সমাদৃত হয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ২০০৩ সালের ১৮ জানুয়ারি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভারতের শ্রেণি বিভাগের তাৎপর্য’ প্রবন্ধে দলিতদের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন— “নিম্ন শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে শ্রেণিবঞ্চনা ও লিঙ্গবঞ্চনা এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে তাদের জীবন দুঃসহ করে তোলে। একদিকে নিম্নশ্রেণির অভিশাপ এবং তারই সঙ্গে মেয়ে হয়ে জন্মানোর বঞ্চনা এই দুই দিক একত্রিত হওয়ার ফলে নিম্নশ্রেণির মেয়েরা নিদারুণ দৈন্য ও রিক্ততার মধ্যে পড়েন”[১১]। বেবী হালদারের যাপিত জীবন যা তিনি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন ‘আলো আঁধারি’ নামক আত্মজীবনীতে। একের পর এক তাঁর জীবনের যে ঘটনাবলি আমরা জানতে পারি তাতে ড. সেনের উপরোক্ত বক্তব্য মিলে যায় হুবহু। এটাই নিম্নবর্গের মেয়েদের বিশেষ করে ভারতবর্ষে প্রকৃত অবস্থা। নিজের ইচ্ছে এবং জেদি মনোভাবের মধ্যে দিয়ে বেবি হালদার প্রমাণ করে দিলেন ভেঙে না পড়ে পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করলে ঘুরে দাঁড়ানো যায়। তিনি নিজেই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আজ বেবী হালদার স্বনামে পরিচিত। এই পরিচিতি তৈরির পেছনে তাঁর যে লড়াই তার সঙ্গে তুলনা করার মতো উদাহরণ স্মরণে আসে না সচরাচর। তাঁর আত্মকথা ‘আলো-আঁধারি’ শিল্পমূল্যের দিক থেকে প্রথম শ্রেণিতে পড়বে না হয়তো কিন্তু পাঠক চিত্তকে বিরাটভাবে নাড়িয়ে দেয়।

আরো অনেগুলি আত্মকথা আলোচনায় আসতে পারত কিন্তু কল্যানী ঠাকুর, লিলি হালদার, বেবী হালদারের মতো দলিত লেখক তাঁদের আত্মকথায় নিজেদের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার কথা যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে দলিত নারীর অবস্থানবিন্দুটিকে চিনে নিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। পুরুষের লেখা যে সকল আত্মকথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে তাতেও দলিত নারীর কথা এসেছে। সবগুলি আত্মকথাতে যে বিষয় দুটি বড় মাত্রায় দাগ কেটেছে তা হল দেশভাগ ও বর্ণবাদী সমাজের প্রতি দলিত শ্রেণির অনাস্থা। একজন দলিত লেখকের যেহেতু জন্ম থেকেই বর্ণবাদী সমাজ কাঠামোর প্রতি অস্বীকৃতি থাকে সেহেতু সমাজ ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনাই আর পাঁচজন মানুষের মতো করে তাকে আলোড়িত করে না। আবার কোনো কোনো ঘটনা হয়তো একটু বেশি মাত্রায়ই তাকে আলোড়িত করে। বিষয় বা ঘটনাকে দেখার দৃষ্টিকোণও পৃথক হয়ে যায় অনেক সময়। সমকালকে দেখা এবং বোঝার ফারাক দলিত আত্মকথায় আছে।

ভারতবর্ষে দলিত সাহিত্য গড়েই উঠেছে পিছিয়ে পড়া দলিত মানুষের যাপিত জীবনের লড়াই সংগ্রামকে স্বীকৃতি দেবার মধ্য দিয়ে। দলিত আত্মকথার লেখক সেই বর্গের মানুষ যে নিজে দলিত জীবন ভোগ করেছে। দলিত জীবনের যন্ত্রণা, লড়াই-সংগ্রাম সে নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছে। স্বগোষ্ঠীর সমাজশৃঙ্খলাকে নিজে লালন করেছে। সে নিজে তাঁর সমাজের ভালোমন্দের শরিক। একজন নিম্নবর্ণের দলিত মানুষ তাঁর নিজের চোখ দিয়ে তার সমাজকে কীভাবে দেখছেন, সেই সমাজের গড়নটাই বা কেমনতর, দেশকালের ঘাত-প্রতিঘাতে তা কেমন বদলে যাচ্ছে, এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা পাব বাঙালি দলিত লেখকের আত্মকথায়।

তথ্যসূত্র:

১। চ্যাটার্জী, দেবী, দলিত মানুষের আত্মকথা, ‘পথসংকেত’ পত্রিকা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ২০২১, পৃ. ১১

২। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন, একা (Eka), চেন্নাই, ২০১৯, পৃ. ৯।

৩। বালা, যতীন, দলিত রচনা সংগ্রহ- ১ম খণ্ড, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৪৪।
৪। বিশ্বাস, মনোহর মৌলি, আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১৩, পৃ. ২৪।
৫। তদেব, পৃ. ৭৫।
৬। তদেব, পৃ. ৫৯
৭। ঠাকুর, কল্যাণী, আমি কেন চাঁড়াল লিখি', চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৯।
৮। তদেব, পৃ. ১৯।
৯। তদেব, পৃ. ১৪।
১০। হালদার, লিলি, ভাঙা বেড়ার পাঁচালি, পরম্পরা প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৪২।
১১। বিশ্বাস, অধীর (সম্পাদিত), গাঙচিল- দলিত সংখ্যা, এপ্রিল-২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২৮।

যোগদর্শনের আলোকে রাজযোগ

কাকলী সাঁতরা
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ: আমরা সাধারণ মানুষ থেকে যোগী পুরুষ বা প্রাজ্ঞজনে পরিণত হতে পারি সাধনা ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা। কিন্তু এই সাধনা ও অধ্যাবসায় সহজসাধ্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। তার জন্য মনের স্থিরতা ও কার্যসাধন করার নিরন্তর প্রয়াস প্রয়োজন। কারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তিই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে যে কোনো কার্যসাধনে সক্ষম হয়। আমরা তার প্রমাণ প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ্য করছি। সেখানে দেখেছি অনেক মুনি-ঋষি পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বিবিধ মোক্ষমার্গের পথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই জটিল পথনির্দেশিকা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। সেইরকম সফল একটি মার্গের নির্দেশ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলির মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত যোগদর্শনে মোক্ষলাভের যে নির্দেশিকা উল্লেখ করা আছে তারই উপর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। মোক্ষলাভের স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত 'রাজযোগ' যোগদর্শনের উপর আধারিত বিশ্বপ্রসিদ্ধ মার্গ। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনের উপর আধারিত কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ‘রাজযোগ’ এক স্বতন্ত্রধারা। কারণ যোগদর্শনের প্রাচীন পদ্ধতিকে স্বামীজি আধুনিক মননের দ্বারা বিশ্বজনীন করে তোলার প্রয়াস করেছেন। এই বিশেষত্ব নিয়েই রাজযোগ মোক্ষলাভের পথনির্দেশিকা দান করেছে এক ও অনন্য ধারায়। যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগের বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে স্বামীজি 'রাজযোগে' স্বয়ং চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
সূচক শব্দ: রাজযোগ, যোগদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন, অষ্টাঙ্গযোগ, মোক্ষশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, নির্বীজ সমাধি।

মূল আলোচনা:

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অনন্তজ্ঞান ও শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। কিন্তু মানব মন এত চঞ্চল যে একমুহূর্তও কোন এক নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে স্থির থাকতে পারে না। এই চঞ্চল মনের ক্রিয়া বিনষ্ট করে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস নিরন্তর সাধন করেছেন অনেক বিদ্বান ব্যক্তিরা। কিন্তু কিছু অল্প সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তি একাগ্রতার সঠিক মার্গে পৌঁছাতে পেরেছেন। কারণ মানব মনের শক্তির কোন সীমা নেই। কিন্তু মানব মনের শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতে আমরা অসমর্থ হই। ভারতবর্ষের বড় বড় দর্শনশাস্ত্রীদের একটাই লক্ষ্য ছিল, যেকোনো প্রকারে আত্মার পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করা যায়। সেজন্য তারা মনকে একাগ্র করতে বেশ কিছু উপায় বের করেছিলেন। তার মধ্যে একটি বিশ্ব প্রসিদ্ধ মার্গ হল স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'রাজযোগ'। এখানে যোগের কথা বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রের অনেক প্রকার যোগের সাথে আমাদের পরিচিতি হয়েছে, যেমন - কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, নাথযোগ, হঠযোগ, স্বরযোগ প্রভৃতি। আমাদের জানতে হবে যোগ কি? যুজ্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন যোগ শব্দের অর্থ হল কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। অর্থাৎ এখানে যোগ এর অর্থ হল যুক্ত হওয়া। যখন আমরা কর্মযোগ এর কথা বলি তখন কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে কর্মযোগ বলে। আবার যখন ভক্তিযোগ এর কথা

বলা হয় তখন ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানযোগে জ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বরের বা আত্মার সাথে যুক্ত হওয়ার উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা পথ বা উপায়ে ঈশ্বর বা আত্মার সাথে যুক্ত হওয়াকে যোগ বলে। সুতরাং যে উপায়ে যুক্ত হওয়া যায় সেই উপায়ের সঙ্গে যোগ শব্দটি যুক্ত করে একটি শব্দ গঠন করা যায়।

আমাদের আলোচনার বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ উপদিষ্ট 'রাজযোগ'। এটি হলো যোগের একটি বিশেষ পরিশুদ্ধ উপায়। এই যোগে একজন যোগীকে সকল কিছু অবলম্বন ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই যোগে যোগীকে কর্মও ছেড়ে দিতে হবে; ভক্তিও ছেড়ে দিতে হবে; জ্ঞানও ছেড়ে দিতে হবে। কোন প্রকার অবলম্বনের আশ্রয়ে থাকলে চলবে না। কিন্তু এর কতকগুলি পদ্ধতি বা উপায় আছে। সেই উপায়ের দ্বারাই যোগমার্গে উন্নীত হতে হবে। এখানে অবলম্বন ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে, মানে এই নয় যে প্রথম দিনেই সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। এই যোগমার্গের পথ অনুসরণ করে যখন এগিয়ে যাওয়া হয় তখন যোগের অন্তিম বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগী উন্নীত হয়ে সর্বপ্রকার অবলম্বন পরিত্যাগ করবেন।

স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত 'যোগসূত্র' এই গ্রন্থের উপর আধারিত বা প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' যোগের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে চিত্ত বা মনের সমস্ত বৃত্তি বা কর্মের নিরোধ বা অবসানই হল 'যোগ'[১]। অর্থাৎ যত প্রকার অবলম্বন আছে বা যত প্রকার বিষয় আছে সেই তত প্রকার বিষয়ের প্রতি যদি মনের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় আর মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দেশিত অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করে নেওয়া যায় তাহলেই যোগের স্থিতি হয়। যোগ কোন ব্যায়াম বা আসন নয় আর যোগ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা আমাদের মনে কখনোই ব্যায়াম বা আসনের উপলব্ধি হবে না।

কিন্তু কখনও আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে 'যোগ' কাকে বলে? অষ্টাঙ্গযোগ কি? ক্রিয়াযোগ কি?—এই বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের এই যোগদর্শনের উপর আধারিত একটি নতুন যোগ এর প্রতিপাদন করার কি প্রয়োজন ছিল? তার উত্তর স্বরূপ বলা যায় প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ্, দর্শনসমূহ ও পুরাণাদিতে যে প্রাচীন জ্ঞান উপলব্ধ হয় সেই জ্ঞানকে আধুনিক মননের দ্বারা আধুনিক প্রজন্মের কাছে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস স্বামীজি করেছিলেন। সেই কারণেই স্বামীজি 'রাজযোগ' নামক পৃথক এক যোগের প্রণয়ন করেছিলেন। অষ্টাঙ্গযোগ হলো যোগ দর্শনের একটা অংশ। আর এই অংশকে আরো সর্বজনগ্রাহ্য ও বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য স্বামীজি রাজযোগের উপস্থাপন করেছেন।

যোগ দর্শনে কয়েক প্রকার যোগের উল্লেখ আছে। যেমন ক্রিয়াযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি। ক্রিয়াযোগ হল যে, যোগী যোগের পথে বা মার্গে পূর্ব থেকেই অভিজ্ঞ অর্থাৎ যে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট উপায়ে যোগমার্গে এগিয়ে চলেছে। আমরা, যারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম যোগমার্গের উপদিষ্ট পথ অনুসরণ করে আত্মোপলব্ধির জন্য অগ্রসর হচ্ছি মহর্ষি পতঞ্জলী তাদের অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর মহর্ষি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগকে আরও সর্বজনবিদিত করার জন্য স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত 'রাজযোগ' এক অনন্য উপায়। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা যুক্তিগত চিন্তা ভাবনা এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। সেহেতু রাজযোগে তিনি যুক্তিগত তাত্ত্বিক আলোচনায় সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, আমরা যদি সমস্ত ধর্মকে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে, কোথাও না কোথাও

হাজার বা দু-হাজার বছর পূর্বে কোনো না কোনো ব্যক্তি অবশ্যই ছিলেন যিনি আত্মাকে বা ঈশ্বরকে অনুভব বা উপলব্ধি করেছিলেন। সেটা যে কোন ধর্মই হোক না কেন। যেমন আমরা খ্রিস্টান ধর্মে যীশুখ্রীষ্টকে দেখতে পাই যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলি তাহলে সেখানে গৌতম বুদ্ধের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যিনি জ্ঞানের দ্বারা সত্যকে অনুভব করেছিলেন। আর আমরা যখন সনাতন ধর্মের কথা বলি তখন দেখতে পাই অনেক মুনিঋষিদের, যারা ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি করেছেন। আর এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন তোলেন যে, আজ থেকে হাজার দু-হাজার বছর আগে এইরকম ব্যক্তি ছিলেন যারা ঈশ্বর তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তাহলে এখন কেন হয় না? এখন কেন ঈশ্বরতত্ত্বের অনুভব করতে কেউ সক্ষম হয় না? এখন কেন কেউ আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না? স্বামীজি এই কারণেই প্রশ্ন করেছেন ধার্মিক লোকেদের প্রতি। স্বামীজি বলতে চেয়েছেন যখন আত্মার উপলব্ধি হয়নি তাহলে কেন ঈশ্বর ও আত্মাকে বিশ্বাস করে মান্যতা দিচ্ছেন? কারণ স্বামীজীর বক্তব্য হল প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে গঠিত। আর প্রকৃতিতে কোন কর্ম যদি একবার হয়ে থাকে তাহলে সেই কাজ দ্বিতীয়বার আবারও হতে পারে। তাঁর মতে এমন হয়নি যে আজ থেকে হাজার দু-হাজার বছর পূর্বে কোন কাজ হয়েছে এখন আর হবে না। তখন লোকেদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে আর ঐ অনুভূতি বর্তমানে লোকেদের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কারণে স্বামীজি বর্তমান সমাজের মানুষদের দুটি বিভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো যারা আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে সরাসরি মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে, তাদেরকে নাস্তিক বলে পরিগণিত করা হয়েছে। আর অন্য বিভাগটি হলো যারা ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করে কিন্তু তারা নিজেরা কেউই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করেনি। তারা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে মনে করেন নিজেদের বিশ্বাসের দ্বারা। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধার্মিক লোকেদের প্রতি প্রশ্ন করেছেন যে তাঁরা যেহেতু ঈশ্বর অনুভূতির স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেননি তাহলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও বন্ধ করে দিন। কারণ আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন কেবলমাত্র অনুভূতি সাপেক্ষ। আর সেই অনুভবের সর্বজনবিদিত মার্গের নির্দেশ করেছেন 'রাজযোগ' এ। স্বামীজি রাজযোগে বলেছেন এটি শিক্ষনীয় বিষয়, সেটি হল—যেটা আমরা স্বয়ং উপলব্ধি করিনি, যেটার সত্যতা স্বয়ং প্রমাণ করতে সক্ষম হইনা সেই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়। স্বামীজি একটি নিষেধবার্তাও দিয়েছেন, সেটি হল—কোন ব্যক্তি যদি স্বয়ং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর তার সত্যকে মেনে চলতে ও বিশ্বাস করতে বলছেন আর আমরা যদি সেই বিশ্বাস করি তাহলে সেটা অত্যন্ত ভয়ংকর ফলস্বরূপ হয়। সে কারণে স্বামীজি নিজেকে স্বয়ং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ মহর্ষি পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগ এর উপর আধারিত এবং এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাঙ্গ যোগে মার্গের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং রাজযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ একসাথে আমাদের জ্ঞাতব্য হবে। অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি অঙ্গ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি[২]। এই আট ভাগের প্রথম তিনটি অর্থাৎ যম নিয়ম ও আসন হল যোগানুশীলনের প্রথম পর্যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমরা যখন শরীর চর্চা কেন্দ্রে যাই তখন প্রথমে সহজসাধ্য ব্যায়াম অনুশীলনের দ্বারা শরীরকে সক্রিয় বা সচল করার পর কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করি। এখানেও ঠিক তেমনই। মানে যোগী হতে বা যোগানুশীলনের মার্গ অনুসরণ করলে প্রথম দিনেই যে সবকিছু ত্যাগ করতে হবে তা কিন্তু নয়। এখানে যম, নিয়ম ও আসন এই তিনটি যোগমার্গানুসারী ব্যক্তিকে যোগোপযুক্ত করে তৈরি করে প্রাথমিক পর্যায়ে। আর প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার হল ক্রান্তিকালীন অবস্থা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে জীবন আর

যোগের যে জীবন, এই দুটোর মধ্যে যে ক্রান্তিকালীন অবস্থা সেটাই হলো প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি হলো যোগের সর্বোচ্চ অবস্থান। ধারণা নামক যোগাঙ্গে যোগী যোগারূঢ় অবস্থায় স্থিত হয়। ধ্যান নামক যোগাঙ্গ যোগীকে যোগের মার্গে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আর সমাধিতে যোগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো যায়।

অষ্টাঙ্গ যোগের যম ও নিয়ম এই দুটি অঙ্গ যে সমস্ত মানুষজন সাধারণ মনুষ্য জীবনে যারা এখনও দুঃখ অনুভব করেন কিন্তু তারা যোগের স্থিতি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন তাদের জন্য। যম ও নিয়ম যোগীর চিত্তশুদ্ধি করে এবং চরিত্র নির্মাণ করে। যম ও নিয়মকে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাবো যে যম হলো নিষ্ক্রিয় প্রচেষ্টা ও নিয়ম হল সক্রিয় প্রচেষ্টা। কারণ যমকে অনুশীলন করতে হলে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন কাজ করতে হয় না। কেবলমাত্র সাধারণ মনুষ্য জীবনের অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করতে হয়। যমের পাঁচটি বিভাগ আছে, যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ[৩]। অহিংসা মানে হিংসা না করা। হিংসা প্রধানত কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কায়িক অর্থাৎ শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করে কোন প্রাণী বধ বা অপরকে আঘাত করা। বাচিক হিংসা অর্থাৎ অকথ্য ভাষণের দ্বারা অপরকে দুঃখিত করা। মানসিক হল অপরের ক্ষতি চিন্তা করা। অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা সর্ববিধ হিংসা জনক কার্য থেকে বিরত থাকাই হলো অহিংসা। সত্য আমাদের কখন উপলব্ধি হয়? যখন আমরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করি। যোগীর ক্ষেত্রে সত্য উপলব্ধি একটু ভিন্ন রকম। সরল হয়ে, ছল পরিত্যাগ করে, দুরভিসন্ধি বর্জন করে, চিত্তসংযম করে, তদ্গত চিত্ত হয়ে, আপদ্, বিপদ্ ও সম্পদ সকল সময়ই বাক্য ও মনে সত্য উপলব্ধি করা। অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য। অস্তেয় আমাদের কখন অনুভূত হয়? যখন আমরা চুরি না করি। পরদ্রব্যগ্রহণ ও পরদ্রব্যহরণ যদি পরিত্যাগ করা যায় তাহলে চিত্ত শীঘ্রই বশীভূত হয়। ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ শুক্রধারণ। সর্বপ্রকার কামচিন্তা বর্জন করা। এরূপ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন আত্মায় একপ্রকার আশ্চর্য শক্তি জাত হয়। যার অন্য নাম ব্রহ্মতেজ। অপরিগ্রহ হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপরের দান গ্রহণ না করে কেবলমাত্র প্রাণধারনের নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণই গ্রহণ করা। যখন আমরা কিছুই করি না অর্থাৎ কেবল আপনা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা সক্রিয়ভাবে কিছু না করা হয় অথবা অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে ত্যাগ করতে হয় এটাই হল যম। সেই কারণেই যমকে নিষ্ক্রিয় প্রচেষ্টা বলা হয়। আর নিয়মও পাঁচটি শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান[৪]। নিয়মকে সক্রিয় প্রচেষ্টা বলা হয়। কারণ নিয়মকে অভ্যাস করতে হলে যোগীকে সক্রিয়ভাবে অনুশীলন করতে হবে। শৌচ দুই প্রকার একটি বাহ্য অপরটি অভ্যন্তর। বাহ্য হল স্নানাদির দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ রাখা। অভ্যন্তর হল মন ও বিচারকে শুদ্ধ রাখা। সন্তোষ অর্থাৎ পরিতৃপ্তি, বিনা চেষ্টায় যা লাভ করা যায় সেটাতেই পরিতৃপ্ত থাকতে হবে। সন্তোষ অনুশীলনের দ্বারা চিত্ত দৃঢ় নিবদ্ধ হয়। তপঃ হলো তপস্যা। যেমন, আমরা কিছু কার্যসিদ্ধ করার সংকল্প নিয়েছি, সেই কার্যসিদ্ধিতে প্রচুর বাধা ও বিপত্তি আসতে পারে। কিন্তু ঐ বাধা - বিপত্তিকে পার করে সংকল্পের সঙ্গে স্থির থাকা এটাই হলো তপঃ। স্বাধ্যায় হল মোক্ষশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা বিষয় চিন্তা ক্ষীণ হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভের বাসনা জাত হয়। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিজেকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে চিন্তনই হল ঈশ্বর প্রণিধান।

যম ও নিয়ম আবশ্যিকভাবে অনুশীলনের দ্বারা যোগ মার্গে প্রবেশ করেন যোগী। পাঁচ যম ও পাঁচ নিয়ম পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারা মনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে এবং যোগীর

চরিত্র গঠন হয়। যোগী যে মার্গে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন সেই মার্গে কিছুটা উত্তরণ হয়। যম ও নিয়মের অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত হলে যোগীকে আসনের অভ্যাস করতে হয়[৫]। আমাদের মনে হতে পারে আসন অভ্যাসের কি প্রয়োজন? রাজযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগের যে অন্তিম স্থিতি সেখানে আমাদের সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়। এমনকি শরীরও ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু প্রারম্ভে তো শরীর অনুভব হয়ই। সেইজন্য শরীরকে এমন এক অবস্থায় রাখতে হবে যাতে যোগমার্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু শরীরের কারণে আমাদের যোগের স্থিতি বা সমাধির কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্য আসনের প্রয়োজন। আসন অভ্যাসের দ্বারা শরীর নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান রাখাও অত্যন্ত প্রয়োজন যোগীর ক্ষেত্রে। আসনে উপবেশন করতে কোন নির্দিষ্ট আসনের কথা সেইরকম ভাবে স্থির করা হয়নি। শুধু বলা আছে এমন একটি আসনে উপবেশন করতে হবে যাতে শরীরের কোন ক্লেশ না হয়। এরপর প্রাণায়াম। আমরা আসনের অভ্যাস তো করি কিন্তু কখনও কখনও মন বিচলিত হয়ে পড়ে এই কারণে প্রাণায়ামের কথা বলা হয়েছে। প্রাণায়াম শব্দটি প্রাণ + আয়াম এইরূপে সন্ধিবদ্ধ। এর মানে প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করাই হলো প্রাণায়াম[৬]।। যোগ দর্শনে প্রাণ,শ্বাস এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এরকম বলা যায় যে—যখন আমরা নতুন শ্বাস নিই তখন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় শরীরে। প্রাণায়াম মানে শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাণায়াম ত্রিবিধ যথা বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি প্রাণায়াম[৭]। এই তিনটি প্রাণায়ামকে রেচক, পূরক, কুম্ভক নামেও উল্লেখ করা হয়। রেচকে শ্বাসকে বাইরে নির্গত করা হয়। পূরকে শ্বাসকে অন্তরে গ্রহণ করা হয়। এবং কুম্ভকে শ্বাসকে ধরে রাখা হয়। রাজযোগে স্বামীজি আরো তিন প্রকার প্রাণায়ামের কথা বলেছেন - অধম, মধ্যম ও উত্তম। যখন কোন যোগী এক শ্বাস ১২ সেকেন্ড সময় গ্রহণ করে ও সেই শ্বাসকে ধারণ করে তখন সেটা অধম প্রাণায়াম। যখন ২৪ সেকেন্ড সময় ধরে গ্রহণ করে এবং ধারণ করে তখন সেটা মধ্যম প্রাণায়াম। আর ৩৬ সেকেন্ড সময় ধরে শ্বাস গ্রহণ ও ধারণ করাকে উত্তম প্রাণায়াম বলে[৮]।

প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার হলো এখানে মানুষকে সাধারণ জীবন থেকে যোগের সাথে সুন্দর ভাবে যুক্ত করে। এখানে প্রত্যাহার কি? আমরা সাধারণ মানুষ বহু দুষ্কর্ম বারবার করে থাকি আর দুঃখ ভোগ করে থাকি। কারণ আমাদের মনের প্রতি কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রত্যাহার—প্রতি + আহার অর্থাৎ যেখানে আহারের প্রতিষেধ করা হয়। এখানে আহার বলতে কী বোঝায়? আহার মানে ইন্দ্রিয়ের আহার। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ইন্দ্রিয়ের আহার কি? ইন্দ্রিয়ের আহার হলো ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় অবস্থা। যেমন দর্শনীয় বিষয়ে চক্ষু ইন্দ্রিয় সক্রিয়। শব্দ শ্রবণে কর্ণ ইন্দ্রিয় সক্রিয়। এর থেকে আমাদের দূরে যেতে হবে। এই জন্য আমাদের মনীষিরা বেশিরভাগ গুহা মধ্যে বা অরণ্যে অথবা একান্ত জায়গায় যোগাভ্যাস করেন কারণ তাঁরা এই ইন্দ্রিয়ের আহার থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। আর এটাকে প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার-এর আর এক মানে আহরণ। আহরণ মানে আকর্ষণ করা। মানে আমাদের ইন্দ্রিয়কে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করা আর বাহ্য বিষয় থেকে দূরে রাখা[৯]। মন যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারে। মানুষের উচিত এই মনকে বশে রেখে নিজের প্রতি আকর্ষিত করা। অর্থাৎ এখানে প্রত্যাহার মানে অর্ন্তমুখী হয়ে যাওয়া। যম থেকে প্রত্যাহার পর্যন্ত বাইরের প্রতি আকর্ষিত অবস্থা। আর প্রত্যাহার হয়ে গেলেই শুরু হবে মনের অন্তর্মুখী ভাব।

এরপর ধারণা ধ্যান ও সমাধি। ধারণা কি? ধ্যান কি? সমাধি কি? যখন যোগী অন্তর্মুখী হন তখন কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনকে আকর্ষিত করেন এবং সেই বিষয়ের প্রতি মন স্থির করেন। মনের সেই স্থিরকৃত অবস্থাকে বলে ধারণা[১০]। আর ঐ বিষয়ের প্রতি মনকে

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বারংবার একাগ্র করাকে ধ্যান[১১] বলে। আর এইসব বারংবার অভ্যাস করতে করতে যোগী ওই একটি বিষয়ের প্রতি এতটাই গুরুত্ব দেন এবং সবকিছু ভুলে যান তখন বলা হয় সমাধি[১২]। কোন এক অবলম্বনে তিন প্রকার মানসক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করার নাম সংযম। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকার পূর্ণ হয়। সমাধি মার্গে উন্নীত হওয়ার পর যোগীর কোন বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের সাহায্যের বিশেষ কোনো প্রয়োজন হয় না। সবথেকে উচ্চপর্যায়ের সমাধি হলো নির্বীজ সমাধি। প্রথমে সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তারপর নিবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তারপর সর্বিচার ও তারপর নির্বিচার ও সবশেষে নির্বীজ সমাধি প্রাপ্ত হয়। নির্বীজ সমাধিতে যোগী আত্মাতে লীন হয়ে যায় এবং পরমাত্মার জ্ঞান হয়।

তথ্যসূত্র:

১. যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।।স.২।।
২. যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি।।সা.২৯।।
৩. অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।।সা.৩০।।
৪. শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা।। সা.৩২।।
৫. স্থিরসুখমাসনম্।।সা.৪৬।।
৬. তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।।সা.৪৯।।
৭. বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।।সা.৫০।।
৮. স্বা. বা. র
৯. স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।।সা.৫৪।।
১০. দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।।বি.১।।
১১. তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।।বি.২।।
১২. তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।।বি. ৩।।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. চক্রবর্তী, নীরদবরণ। (২০০৪). *ভারতীয় দর্শন,* কলকাতা: দত্ত।
২. চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি। (১৪১৫ বঙ্গাব্দ). *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ১,* কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।
৩. চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি। (১৪১৬ বঙ্গাব্দ), *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ২,* কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।
৪. বিবেকানন্দ, স্বামী। (১৯৯৮), *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।
৫. বেদান্তবাগীশ, কালীবর। (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), *পাতঞ্জলদর্শন।* কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী।
৬. ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। (১৯৯৪), *শ্রীমদ্ভগবত।* কলকাতা: ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।
৭. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। (২০০২), *ভারতীয় দর্শন।* কলকাতা: বুক সিণ্ডিকেট।
৮. সরস্বতী, মধুসূদন। (১৯৮৬), *শ্রীমদ্ভগবদগীতা।* কলকাতা।
৯. সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দূর্গাচরণ। (২০২১), *পাতঞ্জলদর্শনম্।* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।
১০. সেন, দেবব্রত। (২০১০), *ভারতীয় দর্শন।* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

দামোদর নদ ও বর্ধমান : একটি ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা

জয়দীপ ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

সারসংক্ষেপ: দামোদর নদ বর্ধমান জেলার অন্যতম প্রধান নদী। বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনে দামোদর নদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কখনো কখনো এই নদ বর্ধমানবাসীর কাছে দুঃখের নদ হিসাবে পরিচয় বহন করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই নদ বর্ধমানকে করে তুলতো শস্য-শ্যামলা। তাই সুদূর অতীতকাল থেকেই দামোদর নদ জনমানসে স্থান পেয়েছিলো। সমকালীন সাহিত্য ও ছড়ায় এই নদকে নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখি চোখে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পলিত হতো এই নদকে কেন্দ্র করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই নদ কে পুজো করতো। নদী তীরবর্তী আদিবাসীদের প্রধান সম্পদ ছিলো জল, জমিন ও জঙ্গল। তারা জলসম্পদ বলতে দামোদর নদ কেই বোঝাতো। ঔপনিবেশিক পর্বেও দামোদর নদকে কেন্দ্র করে সরকারি তরফে নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। ১৮৬৬ সালে দামোদর নদকে কেন্দ্র করে প্রথম খাল খননের চিন্তা ভাবনা করা করা হয়। সরকারি আমলাদের মধ্যে খাল খননকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বাদানুবাদ। ঔপনিবেশিক সরকারের মনে চিন্তা ছিলো, খাল খননের খরচ আদৌ জনগণের জল কর মারফত উঠে আসবে কিনা? তাই দীর্ঘ কয়েক দশক কেটে যায় সরকারি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হতে। ১৯৩৩ সালে দামোদর কানাল এর উদ্বোধন হয়। এরপর সরকার জল কর বসালে শুরু হয় কানাল কর বিরোধী আন্দোলন। অবশেষে সরকার তীব্র আন্দোলনের জন্য জল কর প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দামোদর নদকে নিয়ে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। প্রতিষ্ঠা হয় ডি.ভি.সি'র। ডি.ভি.সি.-কে কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলার আর্থ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে দামোদর নদকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে বর্ধমান জেলার আর্থ সামাজিক পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: দামোদর, ডিভিসি, ক্যানাল-খনন, সেচ, কৃষি।

মূল আলোচনা:

বর্ধমান জেলায় জল সম্পদের প্রধান উৎস হল নদ নদী। দামোদর বরাকর অজয় প্রভৃতি নদ-নদীর জলই হল জেলার অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। দামোদর নদ হল বর্ধমান জেলার প্রধান নদী। এটি ছোটনাগপুর মালভূমির প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে হুগলি নদীতে মিশেছে।[১] দামোদর বহু প্রাচীন নদ। এই নদ ছিল বর্ধমানের 'দুঃখের নদ', মঙ্গলকাব্যের দেবনদ। এটি হাজারীবাগের অধিবাসীদের কাছে পরিচিত ছিলো 'দামুদা' নামে। দামোদর নদ ছিল নদী অববাহিকার সাঁওতালদের কাছে 'পবিত্র নদ' কারণ এই নদকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন জীবিকার অনেকটা নির্বাহ হতো। এই নদের জলকে তারা 'পবিত্র' হিসাবে গ্রহণ করত এই নদের তীরেই তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো।[২] বর্ধমান জেলায় দামোদরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্মরণাতীত কাল থেকে। কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যেহেতু জলের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তাই সেচের প্রয়োজনে দামোদর নদের জলকে অতীতকাল

থেকেই মানুষ ব্যবহার করে এসেছে। বর্ধমানের রাজারা যেমন একাধিক জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি তারা নদীর জলকে ধরে রেখে প্রয়োজনের সময় সেচের কাজে ব্যবহার করতেন। ঔপনিবেশিক পর্বে দামোদর নদীর জলকে ব্যবহার করা হয়েছিল একাধিক উদ্দেশ্যে। দামোদর গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে ঔপনিবেশিক সরকার খাল খননের প্রকল্প গ্রহণ করে।

বর্ধমান জেলায় নদীর জলকে এখানকার মানুষ অতীতকাল থেকেই ব্যবহার করে আসছে। নদ-নদী বিশেষত দামোদর ও বরাকরকে কেন্দ্র করে এখানে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে দামোদরের উল্লেখ রয়েছে। বর্ধমানের সমৃদ্ধি ও বিনাশ উভয় ক্ষেত্রেই দামোদরের অবদান ছিল। তাই প্রচলিত ছিল বিভিন্ন লোক- কথা। এজন্য লোক মুখে প্রবাদ গড়ে উঠেছিল :

"রাজা বড় ভাগ্য ধর, পাশে আছে দামোদর"।

আবার অন্যদিকে দামোদরের বন্যা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের দুঃখের কারণ হত। তাই প্রবাদ গড়ে উঠেছিল:

"ওরে নদ দামোদর, তোকে নিয়ে আতান্তর", বা "নদীর তীরে বাস, ভাবনা বারো মাস" ইত্যাদি।[৩] এই প্রবাদগুলো তখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ জনমানুষে দামোদরের দুটি রুপই প্রকাশ পেতো-- দামোদরের সমৃদ্ধি এবং দামোদরের ধ্বংস।

দামোদর অববাহিকায় গড়ে ওঠা জনবসততী'র আদিমতম নিদর্শন পাওয়া যায় দুর্গাপুরের কাছে বীরহানপুরে। এই জন-বসতীর বয়স ছিল মোটামুটি ৪০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ। পশ্চিম বর্ধমানের দামোদর কুন্ডে আবিষ্কৃত হয়েছে গুপ্ত যুগের একাধিক দেবী মূর্তি।[৪] এগুলো দামোদর অববাহিকায় পাওয়া উন্নত সংস্কৃতির ইঙ্গিত বহন করে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন মানচিত্রেও দামোদরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দামোদর অববাহিকার বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। দামোদর উপত্যকায় বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর যেমন ডোমন, বীর প্রভৃতি বসবাসের প্রমাণ মিলেছে। সুতরাং বলা যায় দামোদর নদকে কেন্দ্র করে বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দামোদরের প্রবাহ পথে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জনবসতি। সমৃদ্ধ কৃষি, বাণিজ্য, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই নদের অববাহিকায়। এই নদের অববাহিকায় এক সময়ে ধর্ম পূজার প্রচলন ছিল। ধর্ম ঠাকুরের পুজো প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মনসা-মঙ্গলের যুগে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য নগরী ছিল গোলসির 'কসবা চম্পক নগরী' যা দামোদর নদের একটি শাখা নদীর অববাহিকা বিশেষ।[৫] বর্ধমানের সমৃদ্ধির মূলে ছিল দামোদর নদ, কারণ নদী তীরবর্তী অঞ্চল গুলোই ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। এখানকার উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ছিল শিল্প ও বাণিজ্যেরও সহায়ক। দামোদর নদ অববাহিকা অঞ্চলে বিশেষত সপ্তগ্রামের কাছে যেখানে ভাগীরথী নদী সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছিল। অন্তর-বাণিজ্যে অন্যতম ছিলো দামোদরের প্রধান দুটি ঘাট - সদরঘাট ও কাঠগোলা ঘাট। একসময় এই স্থান দুটি বর্ধমান নগরের অন্যতম দুই বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায়, এক সময় দামোদর নদে বাণিজ্য তড়ি চলতো।[৬] কয়লা খনি আবিষ্কার ও উত্তোলনের পর রানীগঞ্জের কয়লা নৌকা পথে দামোদর হয়েই কলকাতা আসতো সুতরাং দামোদর নদ নদী -তীরবর্তী সভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশকে যে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দামোদরের অববাহিকায় অবস্থিত 'তেলকুপি' নামক এক সমৃদ্ধ জনপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখান থেকে এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতো। দশম থেকে

পঞ্চদশ শতকের মধ্যে এখানে বেশ কিছু বৈষ্ণব ও শৈব মন্দির গড়ে উঠেছিল। পঞ্চদশ শতকে এখানেও একাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছিল অর্থাৎ এখানে যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তাদের একটা নিজস্ব স্বকীয় ধর্মীয় সত্তা ছিল। দামোদরের এক শাখা নদী বাঁকা কাঞ্চননগর জনপদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কাঞ্চননগর ছিল সেই সময়ের একটি ব্যবসায়ী কেন্দ্র।[৭] দামোদর ও বাঁকার মধ্যবর্তী অববাহিকায় বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে জনপদ বিকশিত হয়েছিল।

দামোদরের প্রধান দুই শাখা নদী হল বাঁকা ও খড়ি। বাঁকা ও খড়ি অজয় নদের মধ্য দিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। একসময়ে বর্ধমান শহরে ও গ্রামীণ জনপদগুলোতে পানীয় জলের অন্যতম উৎস ছিল বাঁকা নদীর জল। বর্ধমান জেলাতেই বাঁকা নদীর উৎস এবং এই জেলাতেই এর মোহনা। বর্ধমান জেলার ৫-৬ টি ব্লকের মধ্য দিয়ে এই নদী প্রবাহিত। বাঁকার তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বাঁকা নদীর জল দ্বারা সেচকার্যের ফলে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। দামোদর অববাহিকায় অতীতকালে বিভিন্ন উপজাতি শ্রেণীর লোকেদের বসবাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। নদী ও অরণ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এখানকার উপজাতি শ্রেণীর মানুষের জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতি। সে সময়ে দামোদর নদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে দামোদর নদ কে তারা 'দেবতা' জ্ঞানে পূজা করত। পিটারসন লিখেছেন, দামোদর ছিল সাঁওতালদের কাছে 'পবিত্র নদ', ছোটনাগপুরের অধিবাসীরা দামোদরকে বলতো 'দামোদা' বা 'দামুদা'।[৮] এটি ছিল তাদের কাছে দেবতার ন্যায়। যারা ধর্ম ঠাকুরের উপাসনা করত তাদের কাছে দামোদরের জল ছিল পবিত্র। তাদের কাছে দামোদর ছিল 'সত্যের গঙ্গা দামোদর, আদ্যের গঙ্গা দামোদর'।

তবে দামোদর নদ অঞ্চলটিতে শুধু যে সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিল তা নয়, অনেক সময় দামোদর হয়ে উঠতো 'দুঃখের নদ'। দামোদরের বন্যা অনেক সময় মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। পিটারসনের লেখা থেকে বর্ধমান জেলায় একাধিকবার বন্যার কথা জানা যায়। বেশিরভাগ বন্যার ফল স্বরূপ নদী তীরবর্তী অঞ্চল প্লাবিত হতো, পশু ও শস্য হানি হত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো। অতিরিক্ত বন্যার জল জমা থেকে নিম্ন দামোদর উপত্যকায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ দেখা দিত। বন্যা হলে মশা মাছির উপদ্রবে লোকজন সেসময় শহর ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করত। ম্যালেরিয়া সঙ্গে টাইফয়েড ও কলেরা রোগ মিলিত হয়ে মহামারী আকারে দেখা দিত। তাই সে সময় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল 'রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে বর্ধমানে আছি'।[৯] তবে জনগণের কাছে দামোদরের কল্যাণকর রূপ অপেক্ষা বিধ্বংসী রূপটি বেশি স্থান পেয়েছে। তাই তৎকালীন সাহিত্যে এবং লোকমুখে জনগণের কাছে দামোদরের বিধ্বংসী রূপটি বেশি প্রকাশিত হয়েছে।

দামোদর নদকে কেন্দ্র করে সেসময় চলতো মৎস্য উৎপাদন। দামোদর, অজয়, খড়ি, কুনুর প্রভৃতি নদ -নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আগে দামোদর ও ভাগীরথীতে প্রচুর ইলিশ উঠতো। রনডিয়া, জামালপুর, বড়শুল প্রভৃতি স্থান থেকে দামোদরে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যেত।[১০] দামোদর নদ তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হতো। হিন্দু রাজাদের আমলে এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জাগরন সূচিত হয়েছিল। লৌকিক বিভিন্ন ধর্ম পালন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের জন্য সে সময়ের মানুষ দামোদর নদ কে বেছে নিত। দামোদরের তীরে স্নান, তর্পণ, পূজো-পার্বণ ইত্যাদির জন্য মানুষ প্রায়ই জমায়েত হত। দামোদর নদীর তীরে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে সে সময়ে মানুষ পূর্ণ অজন করত।[১১] বর্ধমানের

রাজারাও সে সময়ে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে উৎসাহ প্রদান করতেন।

বর্ধমান জেলার কৃষির উন্নতিতে নদীর জল সম্পদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বহু পূর্বে বর্ধমান জেলায় কৃষিকার্যের জন্য নদনদী ও জলাধার এর মাধ্যমে জল সম্পদকে ব্যবহার করা হত। বৃষ্টি ও বন্যার জলকে জলাধারে সঞ্চিত করে প্রয়োজনের সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হতো। অষ্টাদশ শতকে দামোদর ও তার বিভিন্ন শাখা নদী চিরাচরিত সেক ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছিল। এছাড়া প্রায় প্রতি বছর দামোদর নদ বন্যায় প্লাবিত হতো। এই পলিবাহিত জল জলাধারে সঞ্চিত হতো এবং উপত্যকা অঞ্চলকে উর্বর করে তুলতো। জমিদাররা নদী বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ করতেন এবং সেচের অন্যান্য চ্যানেলের দিকে নিয়মিত নজর রাখতেন এবং এক ধরনের কর যা তৎকালীন সময়ে 'পুলবন্দী' নামে পরিচিত ছিল, তা জনগণের থেকে আদায় করা হতো।[১২] এই কর ও জলসম্পদকে রক্ষা করার জন্য এবং ট্যাংক ও জলাধার মেরামতির জন্য কৃষকদের থেকে আদায় করা হতো। 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র শাসনকালে জমিদাররা সেচের উন্নতি বিষয়ে কাজকর্ম সেভাবে করতে পারতেন না। কারণ তাদের উপর ছিল রাজস্বের মাত্রাতিরিক্ত চাপ। স্বভাবতই জল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক কাজগুলি অবহেলিত হতে থাকে। অর্থাৎ সে সময়ে জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার না হওয়ায় সেচ ব্যবস্থার যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল। চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হলে বর্ধমান জেলার জল সম্পদ সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। কারণ জল সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়নি। বর্ধমানের মহারাজা দায়িত্বভার থেকে মুক্তি নিলে স্বভাবতই জল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ে সরকারের উপর। কিন্তু সরকার দামোদরের মৃত 'চ্যানেল'গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে কোন উদ্যোগই নেয়নি, এমনকি 'কোম্পানি' বন্যার জল প্রতিরোধের জন্য বাঁধের ফাটল মেরামত করার ব্যাপারে সেভাবে উদ্যোগ নেয়নি। বর্ধমান জেলা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও উপনিবেশিক পর্বে জল সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়নি। তাই প্রণালীবদ্ধ সেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

বর্ধমান জেলায় বিশেষত নিম্ন দামোদর অঞ্চলে দামোদর নদের জল সম্পদকে নিয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের চিন্তাভাবনা শুরু করে ১৯ শতকের মধ্যভাগে। এসময় দামোদর নদের গুরত্ব উপলব্ধি করে জল সম্পদকে নৌপরিবহনের এবং সেচের কাজে ব্যবহারের চিন্তাভাবনা ব্রিটিশ সরকারের মাথায় আসে। দামোদর নদে খাল খননের প্রথম পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পেয়েছিল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে।[১৩] এতে বলা হয়েছিল রানীগঞ্জ থেকে শ্রীরামপুর হয়ে হুগলি নদী পর্যন্ত এই খাল খনন করা হবে। তৎকালীন সময়ে ক্যাপ্টেন গার্নাল্ড (Garnault) এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই পরিকল্পনার খরচ ধার্য হয়েছিল ৪৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৮১৬ টাকা। এই পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কলোনেল রানডাল (Colonel Rundall)।[১৪] তবে মনে রাখা প্রয়োজন ব্রিটিশ সরকার প্রথমে সেচকর্যের জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি, সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রানীগঞ্জের কয়লা জল দ্বারা বহন করে কলকাতায় নিয়ে আসা। সরকার মনে করেছিল জলপথে বহনের ফলে সরকারের খরচ অনেকে কম হবে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে সরকার কর্তৃক ইডেন খাল খনন করা হয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির কথা ভেবে এই খাল খনন করা হয়েছিল, কেননা এর পূর্ববর্তী সময়ে দামোদরের নিম্ন উপত্যকায় জল নিকাশি ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে বর্ধমান জেলায় সংক্রমক রোগের উৎপত্তি হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ 'ইরিগেশন কমিশন' উপলব্ধি করে দামোদরের মূল উৎস থেকে বৃহৎ আকৃতির কোন খাল খনন

না করলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।[১৫] তবে ক্যানালের জল ব্যবহারের জন্য জলকর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জনগণ ও জমিদাররা না দিলে 'ইরিগেশন কমিশন' কোন প্রস্তাব অনুমোদন করতে রাজি ছিল না। বোঝা যায় উপনিবেশিক সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল খাল খননের খরচ কর বাবদ জনগণের কাছ থেকে তুলে নেওয়া। আসলে ঔপনিবেশিক সরকারের লক্ষ্য জনগনের হিত সাধন করা ছিল না, সরকারের লক্ষ্য ছিল বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদাই করা।

এই তথ্যের প্রমাণ মিলে দামোদর খাল খনন নিয়ে সরকারি আমলা দের মধ্যে বিতর্কে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে দামোদর খাল খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়, অথচ ক্যানাল উন্মুক্ত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। এই দীর্ঘ সময় ধরে সরকারি আমলাদের মধ্যে বিতর্ক চলেছিল। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল খাল খননের খরচ রাজস্ব বাবদ উঠে আসবে কিনা। ভারত সরকারের উপদেষ্টা ভারত সরকারের সচিব ইন্সপেক্টর জেনারেল ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলে। পরিকল্পনা একাধিকবার সংশোধিত হয় এবং খরচের হিসাবও বারবার পরিবর্তিত হয়। এইভাবে দেখা যায়, জল সংক্রান্ত পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়া তো দূরের কথা-- ব্রিটিশ আমলাদের মধ্যে বাদানোবাদ হতে হতেই কয়েক বছর কেটে যায়। আসলে ব্রিটিশ সরকার জনগণের কল্যাণের দিক টিকে উপেক্ষা করে তাদের লাভজনক ব্যবসার দিক টিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে শুরু করে। অবশেষে দামোদর ক্যানালের আনুষ্ঠানিক উন্মুক্তিকরণ ঘটে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে।[১৬] বর্ধমান জেলার দামোদর সন্নিহিত অঞ্চলে কৃষকরা ক্যানাল কর সংক্রান্ত লিজ সই না করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের যুক্তি ছিল সুদূর অতীত থেকেই তারা দামোদরের জলে চাষ করে এসেছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার আসার পর কার্যে অবহেলার জন্য তারা দীর্ঘদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই তারা জলকর দিতে বিরোধিতা করে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি বর্ধমান এর টাউনহলে অত্যধিক কর হারের বিরুদ্ধে প্রায় হাজার কৃষকদের নিয়ে একটি সভা হয়। এখানে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় ক্যানাল কর অতিরিক্ত হারে হচ্ছে এবং কর আদায়ের জন্য অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সরকারি তরফে যে সিদ্ধান্ত হয় তা হল জলকর সাড়ে পাঁচ টাকা থেকে কমিয়ে চার টাকা দু আনা করা হোক এবং এই বছর ২৫ শতাংশ ছাড় দিয়ে জলকার ৩ টাকা করা হয়। কিন্তু এতে কৃষকরা সন্তুষ্ট হয়নি। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলাফল অবশ্য কৃষকদের পক্ষে শুভ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সরকার ক্যানালের জল কর দু টাকা নয় আনা ধার্য করতে বাধ্য হয় এবং বকেয়া কর কার্যত বাতিল হয়।[১৭] বলা যেতে পারে দামোদর ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল কৃষকদের পক্ষে শুভ হয়েছিল।

দামোদর ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন শুধু উপনিবেশিক সরকার আরোপিত করের বিরুদ্ধেই ছিল না, এটি পরিণত হয়েছিল উপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনে। বর্ধমান জেলা তথা ভারতবর্ষের বৃহত্তর রাজনীতিতে জল সম্পদের ব্যবহারের জন্য ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলন গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্ধমানের কৃষকরাও উপনিবেশিক সরকারের করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং সফলতা পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপনিবেশিক শাসন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ই আগস্ট শেষ হয় এবং স্বাধীন ভারত সরকার দামোদর নদীর জল সম্পদ কে নিয়ে বৃহত্তর চিন্তাভাবনা শুরু করে। এরই পরিণতিতে গড়ে ওঠে 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' বা ডি.ভি.সি.।[১৮] উনিশ শতক থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নদী বিশেষজ্ঞগণ দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার কথা ব্রিটিশ সরকারকে বারংবার বললেও ব্রিটিশ শাসকেরা সে বিষয়ে কর্ণপাত করার প্রয়োজন

মনে করেনি। দামোদর নদের বারংবার বন্যা জনজীবনের ক্রমশ ক্ষতি করে চলেছিল। বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব ছোটখাটো ব্যবস্থা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে নেয়া হয়েছিল সেগুলি প্রায় সবই নিষ্ফল হয়েছিল। সরকারি তথ্য থেকে জানা যায় ১৮২৩, ১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৬৩, ১৮৯০, ১৮৯৪, ১৯০১, ১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১৩, ১৯১৬, ১৯২৩, ১৯৩৫ এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দামোদর নদে ভয়ংকর বন্যা হয়েছিল। ১৮৬২ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দামোদর নাদে, বিশেষত নিম্ন দামোদর উপত্যকায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ ঘটে। দামোদর নদের দক্ষিণ তীরের অববাহিকা অঞ্চলগুলির প্রায় এক- তৃতীয়াংশ জনগণ মারা যায়। এই ঘটনা 'বর্ধমান ফিভার' নামে পরিচিত।[১৯] বন্যার প্রকোপে আবদ্ধ পচা জলাশয় আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন করে। মশা মাছির উৎপাতে বহু মানুষ সে সময়ে শহর ছেড়ে পালাতে থাকে। সেই সময়ে লোকের মুখে মুখে প্রবাদ প্রচলিত হয় -

"রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে বর্ধমানে আছি"।[২০]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বন্যার পর থেকে সরকারের টনক নড়ে এবং মহামাড়ির হাত থেকে বর্ধমানকে রক্ষা করতে একটা 'মাস্টার প্ল্যান' রচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বর্ধমান শহর ও দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানো। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। বর্ধমানের মহারাজা উদয় চাঁদ মহাতাব ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান। এই কমিটি সমস্যা সমাধানের জন্য আমেরিকার 'টেনেসি ভ্যালী অথরিটি'র মডেলটি দামোদর উপত্যকায় প্রয়োগের কথা বলে সরকার। এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানায় কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিহার ও বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কনফারেন্স হয় ৩রা জানুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। এতে স্থির হয় দামোদর উপত্যকার উন্নতির জন্য একটি 'মেমোরান্ডাম' তৈরি হবে। অবশেষে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন' বা সংক্ষেপে ডি.ভি.সি.।[২১] স্বাধীন ভারতে এটিই ছিল প্রথম জাতীয় ভিত্তিতে প্রস্তুত বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ডি.ভি.সি. গঠনের পর সরকারি তরফে দাবি করা হয় যে এটি হবে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রগতির প্রথম আলো। ডি.ভি.সি. প্রকল্পের নকশাটি প্রস্তুত করেন টি.ভি.এ বিশেষজ্ঞ ডাবলু. এল. উডউইন।

ডি.ভি.সি পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেত এ একটি করে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হয়। সেখানে একটি করে 'হাইড্রো ইলেকট্রিক স্টেশন' স্থাপন করা হয় বিদ্যুৎ তৈরির জন্য। পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বে সেচের জন্য দুর্গাপুর বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া দামোদর উপত্যকায় বনভূমি স্থাপন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের কথা পরিকল্পনার সময় মাথায় রাখা হয়। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে আরো কিছু পরিকল্পনা হয়েছিল। ডি.ভি.সি.-র পরিকল্পনা অনুসারে দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরি হলে বর্ধমানের আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঘটে। দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শুরু হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এবং এটির আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। দুর্গাপুর ব্যারেজের সাথে ক্যানাল খননের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। এছাড়া গৃহীত হয় দীর্ঘ জল নিকাশি ও নৌ পরিবহন ব্যবস্থা।[২২]

দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মাণ নিঃসন্দেহে মানবকল্যাণে সহায়ক হয়েছে। সেচকার্যে সহায়তা করেছে দুর্গাপুর ব্যারেজ - সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যারেজর ডান এবং বাম দিক থেকে দুটি সেচ ক্যানাল খনন করা হয়েছে। এ দুটি ক্যানেল দ্বারা ১০ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একর জমিতে সেচকার্য সম্ভবপর হয়েছে। ক্যানেলগুলি মোট চারটি জেলাকে সহায়তা করেছে। এগুলি হলো

বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, এবং হাওড়া। দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মিত হবার ফলে খারিফ এবং রবি শস্য চাষ উভয়ই উপকৃত হয়েছিল। হুগলি, বর্ধমান এবং হাওড়া জেলায় মূলত রবিশস্য উৎপাদনের সহায়ক হয়েছিল ক্যানাল গুলি। তবে সেচের দ্বারা অন্যান্য শস্যও উৎপাদিত হতো। অন্যান্য ফসলের মধ্যে গম, আলু, সবজি ছিল অন্যতম। সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মিত হবার পর এবং সেচকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর পূর্বের তুলনায় এই জেলাগুলিতে রবি এবং খারিফ শস্য চাষের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৩] দুর্গাপুর প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন দামোদর উপত্যকায় কৃষি কাজের জন্য জলের যোগান দেওয়া। সেচ ব্যবস্থায় জলের যোগান ছাড়াও দুর্গাপুর ব্যারেজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন দামোদর উপত্যকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। এই দুটি উদ্দেশ্যই দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরি হবার পর সফল হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে সুস্থ জীবনের বিকাশ ঘটেছিল। নৌ- পরিবহনের উন্নতি ঘটায় ছোট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহনের সুবিধা হয়। ক্যানাল পরিবহনের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে সুবিধা হয়। কয়লা এবং অন্যান্য দ্রব্য বহনেরও সুবিধা হয়েছিল ক্যানাল পরিবহন হবার পরে। ফলে বর্ধমান জেলায় 'সচল অর্থনীতি'র বিকাশ হয়েছিল বলা যেতে পারে নৌ-পরিবহন দুর্গাপুর আসানসোল অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের সহায়ক হয়। কালক্রমে এই অঞ্চলটি 'ভারতের রূঢ়' নামে পরিচিতি লাভ করে। এককথায় বলা যায় এর ফলে বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হয়েছিল। ডি.ভি.সি.-র কার্যকলাপ পরিবেশের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন যে সমর্থক ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সবশেষে এই কথা বলা যায় বর্ধমান জেলা ছিল দামোদর নদের দান। দামোদর নদকে কেন্দ্র করেই বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীন লোকসাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে দামোদর নদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দামোদর নদ বর্ধমানবাসীর কাছে হয়ে উঠেছিল উন্নতির সহায়ক যদিও প্রাচীন সাহিত্যে দামোদরকে 'দুঃখের নদী' হিসাবে বহু ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা যায় বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক বিকাশ বিশেষত কৃষি ও শিল্প উভয়ের বিকাশে সহায়তা করেছিল দামোদর নদ ও দামোদর নদের জল সম্পদ। এজন্য বর্ধমানকে 'দামোদরের দান' বলা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. J.C.K.Peterson, *Bengal District Gazetteers, Burdwan,* Govt. Of West Bengal, Reprint 1994, p.1

২. *Ibid.*, p.-6

৩. সঞ্জীব চক্রবর্তী, দামোদর ও বর্ধমান, তারাকনাথ দত্ত (সম্পা), *একাদশ বর্ধমান উৎসব স্মরণিকা উদ্যোগ,* বর্ধমান পৌরসভা, বর্ধমান, ২০০৮, পৃ: ৬৪.

৪. সঞ্জীব চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত,* পৃ:- ৬৪

৫. তদেব, পৃ: -৬৫-৬৬

৬. ঋষি গোপাল মন্ডল, বর্ধমান ও দামোদর: প্রবাহ থেকে পত্রিকা, প্রণব চক্রবর্তী (সম্পা:), *৯ম বর্ধমান উৎসব স্মরণিকা উদ্যোগ,* বর্ধমান পৌরসভা, বর্ধমান, ২০০৮, পৃষ্ঠা -২১

৭. *তদেব,* পৃ:,২২-২৪

৮. J.C.K. Peterson, *op.cit.*, p.13-14

৯. সুধীর চন্দ্র দা, *বর্ধমান শহরের ইতিবৃত্ত,* দি জেনারেল বুকস, কলকাতা, ২০০২,পৃ: -৪২
১০. এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, *বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* রেডিকাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ: -৪৪-৪৫
১১. J.C.K.Peterson, *op, cit.*, p.1-12
১২. Achintya Kumar Dutta, *Economy and Ecology in a Bengal District, Burdwan,* Firma KLM, Kolkata, 2002, p.24--25
১৩. W.A.Inglis, The Canal and Flood bank of Bengal, in Kumud Ranjan Biswas (Ed.), *Rivers of Bengal -A Compilation series, vol-5, part-1, Govt. of West Bengal*, Kolkata, Reprint, 2002, p.215--228
১৪. *Ibid.*, p.230-235
১৫. *Completion Report of the Damodar Canal Project,* p-1.
১৬. বিনয় চৌধুরী, দামোদর ক্যানাল ট্যাক্স আন্দোলন, ড.গোপীকান্ত কোনার, (সম্পা:), *বর্ধমান সমগ্র,* ১ম খন্ড, কলকাতা, ২০০০,পৃ: -২৯৩
১৭. *Eight Years of DVC, DVC*, Cal, p.8
১৮. সুধীর চন্দ্র দা, *পূর্বোক্ত,* পৃ: -৪২
১৯. *তদেব,* পৃ:-৪২-৪৩
২০. *Eight Years of DVC,* DVC, Cal, p.8-15
২১. *Completion Report of Durgapur Barrage,* p. 1—7।

ঝাড়খণ্ডে বাংলা ও কুড়মালি সাহিত্যের চর্চা অনুশীলন

রাজশ্রী মাহাত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
এস. এস. মেমোরিয়াল কলেজ
রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: ঝাড়খণ্ডে বাংলা সাহিত্য সাধনা বহুচর্চিত। তবে তা প্রকাশে আসেনি। বাংলার মানুষ এখানে যখন থেকে আসতে শুরু করে মোটামুটি সাহিত্যিকমণ্ডল গড়ে তোলে। মধ্যযুগেই এর সূত্রপাত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিগভ্রমিত মহাপ্রভু চৈতন্যের ঝাড়খণ্ডে অবস্থানকালের চিত্র তুলে ধরেছেন চৈতন্য জীবনীগ্রন্থে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য মধ্যে। এ থেকেই ঝাড়খণ্ডকে নিয়ে সাহিত্যের শুরু গতির পথে এর অগ্রগতি হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করে ঝাড়খণ্ডী কবিদের হাতে ঝুমুর রচিত হয়ে উত্তাল করেছে ঝাড়খণ্ডকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম ঝাড়খণ্ড নামটির উল্লেখ করেছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে। ঝাড়খণ্ড সেই থেকেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বাংলার মানুষকে মুগ্ধ করে। ঝাড়খণ্ডের বন শ্রীচৈতন্যের কাছে বৃন্দাবন তুল্য মণে হল। এখানের শৈল তার কাছে গিরি গোবর্দ্ধন বলে মনে হল। স্বাভাবিক ঝাড়খণ্ডে কিছুকাল তিনি অতিবাহিত করেছিলেন।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের এই গতিবিধি শুরু হয়ে আধুনিক কালেও এর প্রভাব ধরা পড়ে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীর মতো সাহিত্যিকেরা ঝাড়খণ্ডের কথা লিখেছেন এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় অসংখ্য কবিতাও লিখেছেন। ভ্রমণ কাহিনি, উপন্যাস, কাব্য-কবিতা রচনা হয়ে চললেও ঝাড়খণ্ডের আদিম সমাজের প্রসঙ্গ ধরে লোকসাহিত্য রচনার স্পৃহাও জাগে। যে লোক-গবেষণায় গবেষকরা রত হয়ে পড়েন। তাদের সংখ্যা অনেক—সুধীরকুমার করণ, ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, রাধাগোবিন্দ মাহাত, ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত, বিনয়কুমার মাহাত, ভগবানদাস মাহাত, নন্দকুমার বেরা, গৌতম মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের রচনাগুলো সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্য, ধলভূমের লোকসাহিত্য, মানভূমের লোকসাহিত্য, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য রূপে মর্যাদা লাভ করেছে ঠিক কিন্তু প্রকৃত অর্থে কুড়মালি সাহিত্যের মাঝেই এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কুড়মালি ভাষা এক স্বাধীন ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জনজাতীয় ক্ষেত্রীয় ভাষা বিভাগ (১৯৮২) নির্মাণ হলে, এই প্রকার কুড়মালি সাহিত্যের অনুশীলন হয়ে আসছে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে।

সূচক শব্দ: ঝাড়খণ্ডের বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব, মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চা, আধুনিক যুগে সাহিত্য চর্চা, লোকসাহিত্য, লোকগবেষক, সাহিত্য সম্ভবনা।

মূল আলোচনা:

ঝাড়খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অনুশীলন বহু পূর্বের থেকেই হয়ে আসছে। যদিও বিষয়টি তেমন একটা প্রকাশে আসেনি। অবশ্য বাংলার বাইরে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে বাঙালি কবি ও সাহিত্যিকদের সারস্বত সাধনা প্রশংসার দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড এদের সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান ছিল এবং এখনও আছে। তারা ঝাড়খণ্ডের বিষয়ে চর্চা বিমর্শ করার পথে সময়

সময় অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলার মানুষের বৈশিষ্ট্যই হল যেখানে গেছে, যাদের সঙ্গে থেকেছে সেখানের পরিবেশ, প্রকৃতি, জন-মানুষকে বাংলা সাহিত্যের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেছে। এতে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে আপনজনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে বাংলার মানুষ কেনই বা ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত করে আসছে। আসলে পূর্বে বিহার (ঝাড়খণ্ড), বাংলা, উড়িষ্যা জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ড বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী, সংস্কৃতির অনুযায়ী এর বিভাজন হয়ে যায়। সেই থেকেই সবার কাছে পশ্চিম ভাগের এমনি পাহাড়ি শৃঙ্খলায় ঘেরা উপত্যকাটি পাহাড়ি অরণ্য অঞ্চল বলে খ্যাত হয়। পরে এই ঝোপঝাড় পূর্ণ পাহাড়ি ভূখণ্ডটিই লোকমুখে ঝাড়খণ্ড নামে বিখ্যাত হয়। বস্তুত ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক দৃশ্য মানুষের কাছে আকর্ষণের হয়ে পড়েছিল। এর মনমোহক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাংলার মানুষকে মুগ্ধ করে তোলে। ঝাড়খণ্ডের পাহাড়, পর্বত-অরণ্য-ঝরনার সেই নৈসর্গিক ছবি দেখে সেখানের জগতে লোক মিশে যায়। ঝাড়খণ্ড এমনই রূপ বিস্তার করে নিজেকে মেলে ধরেছে যে তা দেখে বাংলার লোকের মন জুড়িয়ে যায়। এর বন্ধুর উপত্যকা, ঘন অরণ্য, উন্মুক্ত ঝরনা সবই সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে; যা ছবির মতো ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির মতোই এখানের জনমানবও একেবারে সরল-সহজ-উদার। তারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে ঝাড়খণ্ডী সংস্কার, সংস্কৃতি পালনের দ্বারা, ঝাড়খণ্ডী ভাষার চলনেও তারা নিজস্ব ছাপ বজায় রেখেছে। এই সমস্ত কিছুর টানে প্রতিবেশী সমতল বাংলার মানুষের মন ঝুঁকে পড়ে ঝাড়খণ্ডের প্রতি। এখানের মানুষকে ঝাড়খণ্ড তাই সর্বকালেই হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর এর বুকে লোকের যাতায়াত হতে থাকে।

একেবারে প্রাচীনকালে যখন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না তখন থেকে বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা সুমিত্রা-জাভা যাত্রার কালে ঝাড়খণ্ডের পথেই যাতায়াত করেছে। সে সময়ে হাতি-ঘোড়া-পালকীতে চড়ে লোক এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যেত। এমন কি তীর্থযাত্রীরা ও ধর্ম করতে গয়া, কাশী, বৈদ্যনাথধাম, তারাপীঠ, পুরী ইত্যাদি বিখ্যাত বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র দর্শনে বেরিয়ে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে দিয়েই পরিক্রমা করেছে, পালকী বা পদব্রজেই। অনেক সময় দূর দূর থেকে আগত পর্যটক-পরিব্রাজকও দেশভ্রমণ করতে বেরিয়ে ঝাড়খণ্ড দিয়েই যাত্রা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন রাজা-মহারাজারা এই পথ ধরে গন্তব্যস্থলে গেছে। এ সময়ে কিন্তু ঝাড়খণ্ডের নিজস্ব নাম ছিল না। উক্ত যত সবাই বিভিন্ন সময়ে এই স্থানটিকে এক এক নাম দিতে থাকেন—কেউ এসে এর নাম 'কর্কখণ্ড' রাখে, বৈদিককালে একেই 'কলিকাবন' বলে উল্লেখ করেছে, হিউয়েন সাঙ 'কিরণসুবর্ণ' নামে সম্বোধন করেন। তার থেকেই 'কর্ণসুবর্ণ' নামের ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতে বর্ণিত 'সুক্ষ্ম' দেশটিকেও অনেকে ঝাড়খণ্ড বলে মনে করে। পূর্বে এভাবে যত প্রান্তের লোক ঝাড়খণ্ডে এসেছে তাদের মুখে মুখে এক এক নামের ব্যবহার হতে থাকে। পণ্ডিতদের মতে সেই সব স্থানগুলিই হিসাবে ঝাড়খণ্ড রূপে প্রকাশে আসে।

এমনই ভাবে মধ্যযুগে ১৫০১ শতাব্দীতে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলে পূর্ব ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণশাখার প্রচারক রূপে ভক্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। দক্ষিণ ভারতে রামানুজ, মাধবাচার্যের মতো ধর্ম গুরুরা এই ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য উক্ত সময়ে ধর্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত যত্রতত্র গমন করার মুহূর্তে ঝাড়খণ্ডে তার আগমন ঘটে। এর পরিণাম স্বরূপ ঝাড়খণ্ড নবরূপে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে—এই ঘটনা বড়ই রোমাঞ্চকর। শ্রী চৈতন্যদেব নীলাচল (উড়িষ্যা) থেকে মথুরা যাত্রাকালে পথভুলে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন। তার উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগে রচিত কৃষ্ণদাস

কবিরাজের লিখিত জীবনীগ্রন্থে। যার নাম—'শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'। তার এক শ্লোকে ঝাড়খণ্ড নামটি প্রথম উচ্চারণে আসে—

"মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড।।
বন দেখি ভ্রম হয় এহি বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় গিরি গোবর্দ্ধন।।" (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই শ্লোকের প্রথম ছত্রেই 'ঝারিখণ্ড' নামের ব্যবহার হয়। এর থেকে প্রমাণিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম 'ঝারিখণ্ড' নামে উক্ত স্থানটির নামকরণ করেন। ইতিপূর্বে যতই ব্যাপারী-রাজা-মহারাজা তীর্থযাত্রী ও পর্যটক পরিব্রাজক এখানে এসেছে কেউ 'ঝারিখণ্ড' নামে সম্বোধন করেনি। কৃষ্ণদাস কবিরাজই পাহাড়ি উপত্যকা অধ্যুষিত, ঝোপঝাড়ে পূর্ণ, নদী নালা বেষ্টিত, ঝরনার ধারায় উচ্ছ্বসিত স্থানটিকে 'ঝারিখণ্ড' নামে চিহ্নিত করেছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে।

বলা বাহুল্য এখানে প্রবেশ করেই শ্রীচৈতন্য ও তার ভক্ত সাথী যত বৈষ্ণব বুঝতে পেরেছিলেন ভুল দিশায় পরিক্রমা করে দিগভ্রান্ত অবস্থায় তারা এই 'ঝারিখণ্ডে' চলে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের তারা তক্ষুনি আর মথুরার রাস্তা ধরার চেষ্টা করলেন না। তার কারণ—ঝাড়খণ্ডের বন শ্রীচৈতন্যের কাছে বৃন্দাবন তুল্য মনে হল, এখানের শৈল তার কাছে গিরি গোবর্দ্ধন বলে মনে হল। ঝাড়িখণ্ডের এই অরণ্য সুন্দরী রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। তেমনি পাহাড়ের সারি দেখে খুশি হয়ে যান। তবে 'ঝারিখণ্ডে'র বাসিন্দারা বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখায়নি বলে এদেরকে 'পাষণ্ড' বা পাষাণ হৃদয়ের বলেছেন। এই কারণেই এখানের মানুষগুলি তার নজরে ভিল্ল সম বলে মনে হয়েছে। তাতেও তার মনপ্রাণ চায়ল 'ঝারিখণ্ডে' কিছু সময় ব্যতীত করার। আর তিনি সংকল্প করলেন 'ঝারিখণ্ডে'ই কিছুদিন অবস্থান করে এখানের লোকের মাঝে থাকবেন—

"ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।
যেহ গ্রাম দিয়া যান যাহা করেন স্থিতি
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি।"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ঝারিখণ্ডের পূর্ব ভাগে তার পদচারণা ঘটল। স্থাবর বা স্থিতিশীল একেবারে দুর্গম জায়গাতেও হাজির হলেন। যেখানে যেতে লোক সাহস করে না। সব সমুদায় এবং জাতির সঙ্গে তার যোগ সাধিত হয়। তাদের মাঝে কৃষ্ণের নাম গান কীর্তন শুনিয়ে ভক্তিভাব জাগরিত করেন। এখানের লোক তার প্রেম ধর্মে আকর্ষিত হলেন। কিন্তু তারা বৈষ্ণব আচরিত নিয়ম পালনে অসমর্থ হন। শাকাহারী বা নিরামিষ ভজন করার নিয়ম যেমন তারা পালন করেনি, না তো বৈষ্ণব ধর্মে তারা দীক্ষিত হয়েছিলেন। উক্ত সময়ই ঝাড়খণ্ডের আনাচে-কানাচে ঘুরে শ্রীচৈতন্য 'জঙ্গম' বা শৈব ভক্তির কেন্দ্রগুলিকে দর্শন করে চললেন। এখানে এসে তিনি একপ্রকার জঙ্গমের সন্ধান জানতে পেরে গেছলেন। আদিবাসী মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, কুড়মি প্রভৃতি আদিম জনজাতিদেরকে শিব (বুঢ়া বাবা) ও বোংগার (সর্বশক্তির) উপাসক রূপে দেখতে পেলেন। শৈব অনুরাগী কুড়মিরা গ্রামে গ্রামে শিবের থান, শিবমাড় বানিয়ে শিবের পূজা-উপাসনা করতেন। তাদের কাছে এই শিবের রূপ ছিল না, প্রস্তর রূপে বা লিঙ্গ রূপে দেবতা বিরাজিত। তবে যারা বোংগার মতো প্রাকৃতিক

দেবতার আরাধনা করে, আর যারা বুঢ়া বাবা শিবের মতো প্রকৃতি দেবের আরাধনা করে একই ভাবে পাহাড়-শৈল-পাথর রূপে এর ছবি গড়ন করল। বোংগা পাহাড় আকৃতির সঙ্গে বিরাজমান হয় লৌকিক দেবতারূপে বন্দিত ও পূজিত হল। শিব গোটা পাথর ও শৈলখণ্ড রূপে বিরাজমান হয়ে লৌকিক দেবতা রূপেই পূজ্য। ঝাড়খণ্ডের যত সমস্ত জনজাতি এদেরই ধর্ম মতকে অনুসরণ করে এবং এক এক স্থানে বিখ্যাত বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়। এখনও তার প্রমাণ আছে ঝাড়খণ্ডের সর্বত্রে—গুমলার ডুমরির অন্তর্গত পাহাড়ের উপরে 'টাঙ্গিনাথ মন্দির' (বিখ্যাত এই শিবমন্দিরে ১০৮ শিব লিঙ্গ ও লৌহ নির্মিত বিশ্ববিখ্যাত উচ্চ ত্রিশূল রয়েছে)। এই মত তামাড় থানায় আছে 'হারাডিহি বুঢ়াডিহি মন্দির' (১০৮ টি শিব লিঙ্গ রয়েছে) এছাড়াও জয়দা, ঢইসাগড়, হারিন, বাঁকু, চিত্রেশ্বর, কোশজুড়ি, আনাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে শিব মন্দির অবস্থিত। ঝাড়খণ্ডের আদিম সমাজ শৈবধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় এদের সান্নিধ্য লাভে শ্রীচৈতন্য অভিভূত হয়ে যেতেন। ভক্তি আন্দোলনের সময়ে ঝাড়িখণ্ডে এসে এমনি শৈব উপাসকদেরকে পাওয়া ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব রক্ষিত হয়েছিল। যার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝারিখণ্ডের 'জঙ্গম' বা শৈব আরাধনা বিষয়টিকে কাব্য মধ্যে স্থান দিয়েছেন। জঙ্গম সেটাই যেখানে সর্বশক্তি সূর্য ও শিবের উপাসনা আরাধনা হয়।

এই ভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত গ্রন্থের থেকে ধরা পড়ে মধ্যযুগেই বাংলা সাহিত্যে মাঝে ঝারিখণ্ডের প্রসঙ্গ চর্চিত হয়েছে। ঝারিখণ্ড নামটির প্রচলন হয় বিশেষ ক্ষণে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের বক্তব্য তুলে ধরা হল—

ড. বঙ্কিম মাহাত বলেছেন—"বাংলা সাহিত্যেই ঝাড়খণ্ডের প্রথম উল্লেখ সম্ভবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই করা হয়েছে।" (ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, পৃ. ৫)

রাধাগোবিন্দ মাহাত বলেছেন—"অনুমিত হয় যে ঝাড়খণ্ড নামটি সমতল ভূমির তীর্থযাত্রীদের দেওয়া নাম।" (ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৩১৩)

অবশ্য করে বলা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত 'ঝারিখণ্ড' নাম চৈতন্য মণ্ডলী দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এই নামটিই একসময় ব্যবহারিক ভাষায় ঝাড়খণ্ড রূপে জায়গা পায়। এর পরবর্তী সময়ে প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকরা আলোচ্য প্রদেশটির কথা বলতে গিয়ে একে ঝাড়খণ্ড নামে চিহ্নিত করেছেন।

History & Culture of the India Pepole—Combrige History of India
History of Bengal & Bihar Though Ages—Dr. Quanungo
Mundas & Their Country—S.C. Roy
The Bhumij Revolt—J.C. Jha
প্রাক্‌মৌর্য বিহার—ড. দেবসহায় ত্রিবেদী
মুঘল সম্রাট হুমায়ুঁ—ড. হরিশঙ্কর শ্রীবাস্তব।

এরা সবাই ঝাড়খণ্ড নামটি বলা শুরু করে ঝাড়খণ্ডের ইতিহাস লিখেছেন। ঝাড়খণ্ডকে নিয়ে সাহিত্য চর্চার প্রারম্ভ হল। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না চৈতন্য জীবনীগ্রন্থাকারের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজই 'ঝারিখণ্ড' বা অধুনা ঝাড়খণ্ড নামটির জন্মদাতা। এর শ্রেয় শ্রীচৈতন্যকেও দেওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডের যে গতি বিধি প্রকাশে আসে তার প্রতিফলন ঘটে চলে আধুনিক কালেও। ঝাড়খণ্ডে এসে একে চেনার পরই বাংলার লোক ঝাড়খণ্ড সম্পর্কে সাহিত্য চর্চা অনুশীলন চালিয়েছে। অনেক সাহিত্যিকের আর্বিভাব ঘটে এক এক সময়ে।

ঝাড়খণ্ডের অবস্থা এবং এখানের মানুষের প্রসঙ্গে অনেক ধরণের—গল্প, কবিতা, উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে লেখার ঝোঁক আসে। আর এক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) প্রথম 'পালামৌ' নামে এক ভ্রমণ কাহিনি লিখলেন। এরপরই অন্যতম কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) উপন্যাস লিখেছেন তাতে ঝাড়খণ্ডের প্রকৃতি ও এখানের মানুষের ছবি উঠে আসে। এই দুই সাহিত্যিক অবশ্য কর্ম উপলক্ষে কিছুকাল ঝাড়খণ্ড অতিবাহিত করেছিলেন। তারপরই অন্যতম সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) এই ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ নিয়ে লিখেছেন। এমনকি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-১৯৯৫) মতো কবিও ঝাড়খণ্ড সম্পর্কে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন।

অতএব কর্ম উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডে যারা কিছু কাল অতিবাহিত করেছেন তারাই ঝাড়খণ্ডের বাস্তবিকতাকে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেখানের জনজীবনের ছবিও অঙ্কন করেছেন। তবে নিছক ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী জনজাতির ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হয়েছেন মহাশ্বেতা দেবীর মতো বাংলার স্বনামধন্য লেখিকাও। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় ঝাড়খণ্ডের সম্পদ বলে সমাদৃত হয় এদের সবার রচনা।

এরপরে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে লোকসমাজ ও লোকসাহিত্যের উপহার। তখন গল্পকাহিনি, উপন্যাস, কবিতা শোনা ছেড়ে দিয়ে আসে ঝাড়খণ্ডের মানুষের সামাজিক জীবন ও আচার, সংস্কার, সংস্কৃতিকে নিয়ে লেখার আগ্রহ। ঝাড়খণ্ডের বহু লোকগবেষক লোকসাহিত্য রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। লোকসাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হয়—এখানের আদিম জনজাতি। এদের মধ্যে কুড়মি, মাহাত সমাজের লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতিক রূপটিবাংলা সাহিত্যে তুলে ধরা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী কুড়মির সামাজিক জীবন, আচার ও সংস্কার-সংস্কৃতি নিয়ে চলে লেখার পালা। যার ফলে কুড়মালি লোকসাহিত্য নিয়ে বাংলা ভাষায় চর্চা, অনুশীলন হতে থাকে। এই ধারাটি বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। এতদিন বাংলা লোকসাহিত্যের নামে কুড়মালির চর্চা, অনুশীলন হয়ে আসছিল। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের প্রকাশ ঘটে ঝাড়খণ্ডে অবস্থানকারী প্রতিভাবান গবেষকদের দ্বারা। দেখা যায় কুড়মি সমাজ ও কুড়মালি ভাষাভাষীদের কথা এই লোকসাহিত্যের মধ্য যুক্ত হয়ে পড়ে। তখন ঝাড়খণ্ডে বসত বাংলার বাইরের বাঙালিরা ও স্থানীয় কুড়মিরা মিলিত হয়ে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যকে রূপ দিয়েছে।

এই যে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য রূপে কুড়মালি লোকসাহিত্যের অবতারণা বাংলা সাহিত্যে ঘটে—এই ধারাটিতে অসাধারণ গবেষণামূলক রচনার সৃষ্টি হয়। আদিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত কুড়মি জাতির প্রসঙ্গ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। এর সূত্রপাত ঝাড়খণ্ডের থেকেই হয়েছে। এই ধারা দুটি পথে অগ্রসর হয়ে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় কুড়মালি সাহিত্যের পরিচয় ধরা পড়ে। প্রথমে বাংলা ভাষায় লিখিত ধারাটির কথায় আসা হল— ড. সুধীর কুমার করণ দুটি গ্রন্থ রচনা করেন সীমান্ত বাংলার লোকযান (১৯৫৪), সীমান্ত রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ (২০০২)। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা দুটি গ্রন্থ রচনা করেন—ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান (১৯৭৩), ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা (১৯৮৩)। রাধাগোবিন্দ মাহাতর দুটিগ্রন্থ রচিত হয়—ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি (১৯৭৪), ঝাড়খণ্ডের কুড়মি (১৯৮৫)। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন—ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (১৯৭৮), ঝাড়খণ্ডের লোকভাবনা (১৯৮৩), ঝাড়খণ্ডি বাংলা শব্দকোষ (২০০৪)। ড. চিত্তরঞ্জন লাহা রচনা করেন—ধলভূমের লোকগীত (বাঁধনা) ১৯৭৮, ধলভূমের লোকগীত মকর (১৯৭৮)। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক

রচনার স্বাক্ষর রেখেছেন ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত—পুরুলিয়ার মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস (১৯৭৮), জনপদীয় সাহিত্য—মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ (১৯৯৪), Sanskritization VS Nirlakization (২০০০), JANGALMAHAL O JHARKHAND LOK DRSAN (২০০৮), ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, জঙ্গলমহল রাঢ়ভূম ও ঝাড়খণ্ডের ভূমি ব্যবস্থা সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ইতিহাসের রূপরেখা, পারফর্মিঙ আর্টস অফ ঝাড়খণ্ড, ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, সুন্দরবনের আদিবাসীদের আগমন ও তাদের অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। তারই সমসাময়িক কালে ড. বিভূতিভূষণ মাহাত লিখলেন অদম্য সাহস নিয়ে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কুড়মালি লোকসাহিত্য (১৯৯৯) এই দুই গবেষক ঝাড়খণ্ডী হিসাবে পরিচিত কিন্তু প:বাংলার বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁরা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. করার কাজে সেখানে সাত-আট বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

এরপরও অনেকে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য চর্চা অনুশীলন করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম শ্রী বিনয়কুমার মাহাত। তাঁর দুটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দুটি হল—সোনাবালির খোঁজে (২০০৪), আমার করম ভায়ের ধরম (২০০৭)। এছাড়াও পাওয়া যায় ভগবানদাস মাহাতর রচনা। তাঁর অন্যতম দুটি গ্রন্থ হল—লোকভাষা ও লোকায়ত জীবনের নানা দিগন্ত (২০১০), পল্লী প্রাঙ্গণের পরচা (২০১২)। এমনি ভাবে অনেকেই ঝাড়খণ্ডের কুড়মালি লোকসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। রচনা হল বহু বহু গ্রন্থের। ড. নন্দকুমার বেরা লিখেছেন দুখানি গ্রন্থ—ঝাড়খণ্ডের লোকউৎসব (২০১৬), ঝাড়খণ্ডের জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি (২০২১)। ড. গৌতম মুখার্জী রচিত দুটি গ্রন্থের নাম পাওয়া—ঝাড়খণ্ডের লোকগীতে নারী (২০১২), সীমান্ত বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য ও লোকজীবন (২০১৫)।

এরপরও হয়তো বাংলা ভাষায় আদিম কুড়মি জাতির জীবন সংস্কৃতি নিয়ে লোকসাহিত্যের রচনা হয়ে আসছে। সবার কথা একসাথে বলা সম্ভব নহে। তবে সমস্ত লোকসাহিত্য চর্চা অনুশীলনকারীদের উল্লেখযোগ্য যোগদান রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় ঝাড়খণ্ডে লোকসাহিত্য চর্চায় এখনও একটা অভাব রয়ে গেছে। স্বভাবতই বলা যায় এই সাহিত্যের মাঝে মহিলা লেখিকার যোগদান তেমন ধরা পড়ে না। যদিও কুড়মির পরব অনুষ্ঠান নারী সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ বলে পরিচিত। নারী হস্তেই এর ছবি অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন। এই জায়গাটি পূর্ণ হতে বিলম্ব হবে না। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য গবেষণায় ড. রাজশ্রী মাহাতর নাম এই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে। তার উল্লেখযোগ্য রচনা—ঝাড়খণ্ডের লোকগীতে নারীর কথা ও ব্যথা (২০২৫)। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য এমনই আদিমজীবন অধ্যায়ের ধারা। এর মাঝারে হিন্দি ও কুড়মালি ভাষায় রচিত লোকসাহিত্যেরও স্থান আছে। যার আলোচনা বর্তমানে করা সম্ভব নয়।

এ যাবৎ দু পর্যায়ে এই বিষয়টিতে প্রবেশ করা হয়েছে। প্রথমে বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রসঙ্গ আলোচিত দ্বিতীয়ত কুড়মালি লোকসাহিত্যের চর্চাকে স্থান দেওয়া হয়। বাংলায় লিখিত সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্য, ধলভূমের লোকসাহিত্য, মানভূমের লোকসাহিত্য, জঙ্গলমহলের লোকসাহিত্যের মতো বৃহৎ ধারাটিই আসলে কুড়মালি সাহিত্য। তাতেই বাংলায় লেখা লোকসাহিত্যই সর্বোপরি ঝাড়খণ্ডের কুড়মালি সাহিত্য রূপে জায়গা পেয়ে আসছে। যা সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে বাংলা ভাষায় লিখিত হয়, আবার সীমান্ত উড়িষ্যার লোকসাহিত্য রূপে ওড়িয়া ভাষায় লিখিত হয়, ঝাড়খণ্ডের কুড়মালি সাহিত্যই দেবনাগরী লিপিতে হিন্দি ভাষায় লিখেছে সাহিত্যিকরা। এর এরিয়া বৃহৎ, কুড়মি অধ্যুষিত সীমান্ত বাংলা, সীমান্ত উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডে প্রকাশমান। ১৯৮২ সালে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় জনজাতীয় ক্ষেত্রীয় ভাষা বিভাগ

খুলে ৯টি স্থানীয় ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা চালায়। এর মধ্যে কুড়মালি ভাষাও স্বাধীন ভাষা রূপে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পায় এবং উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে।

ঝাড়খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের চর্চা অনুশীলন পর্বটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এর যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বুকে বাংলার মানুষ এসে এখানের বিষয়বস্তুকে নিয়ে সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন যা এমনই ইতিহাস হয়ে সাহিত্যের মাঝে বেঁচে আছে। তাদের হাতেই লোকসাহিত্যের চর্চা অনুশীলন হয়েছে তারা আদিম লোকসমাজের বিষয়ে যে কথা লিখেছেন সেটাই আসলে কুড়মালি সাহিত্য। এই সত্য আজকাল স্পষ্ট হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে বাংলা ও কুড়মালি সাহিত্যের পথ গতি পেয়েছে। এরপর কুড়মালি সাহিত্য অগ্রগতির মুখে অগ্রসর হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত (মধ্যলীলা)—দীপঙ্কর মল্লিক।
২. ঝাড়খণ্ডে মহাপ্রভু—সুহৃদ কুমার ভৌমিক
৩. ঝাড়খণ্ডী জনপদীয় সাহিত্য মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ—পশুপতিপ্রসাদ মাহাত।
৪. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য—রাধাগোবিন্দ মাহাত।
৫. ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য—ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত।
৬. ঝাড়খণ্ডে বাংলা সাহিত্য—রামরঞ্জন সেন।
৭. বাংলা ও বাঙালী—শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার।

ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব- পর্যালোচনা

নীলকান্ত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের অন্যতম জনবহুল এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রবেশদ্বার ও জেলা সমূহের অন্যতম এই ঝিনাইদহ। ঝিনাইদহ এক সমৃদ্ধ জনপদ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঝিনাইদহে রয়েছে অনেক কীর্তিময় গৌরবগাথা। ঝিনাইদহ নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। জেলাটি প্রশাসনিকভাবে খুলনা বিভাগের অন্তর্গত। সড়ক ও রেল পথে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে যুক্ত। গুরুত্বের দিক দিয়ে খুলনা কুষ্টিয়া যশোরের পর খুলনা বিভাগের চতুর্থ বৃহত্তর জেলা শহর ঝিনাইদহ। প্রাচীন কালের ঝিনুকদাহ থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের তোরণ হিসেবে পরিচিত। অর্থনৈতিক উন্নতি ভৌগোলিক অবস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধার কারণে ঝিনাইদহকে বাংলাদেশের মডেল জেলা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ ঝিনাইদহ। শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য জেলা থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে এই জেলা। বিভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ফুল ও ফলের জন্য বিখ্যাত এই ঝিনাইদহ জেলা। মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি ও প্রাণজুড়ানো আবহাওয়া ছাড়াও ঝিনাইদহ জেলায় রয়েছে প্রাচীন বিভিন্ন স্থাপনা মসজিদ, মন্দির ছাড়াও রয়েছে অনেক ঐতিহাসিক স্থান। এসকল স্থাপনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঝিনাইদহের ঢোল সমুদ্র দীঘি। আলোচ্য প্রবন্ধে ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: ঝিনাইদহ জেলা, রাজা মুকুট রায়, ঢোল সমুদ্র দীঘি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনি।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা:

হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠ স্থান এবং ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কারণে বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের অন্তর্গত ঝিনাইদহ জেলা ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় সপ্তম শতকে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ শাসকেরা তাঁদের রাজত্ব করতেন। পরবর্তী সময়ে হিন্দু রাজা ও স্বাধীন সুলতানদের আগমন ঘটে এই অঞ্চলে। স্বাধীন সুলতানী আমলে এ অঞ্চলের রাজা বা জমিদার ছিলেন ঝিনাইদহের রাজা মুকুট রায়, মতান্তরে রামচন্দ্র রায়। এই সকল রাজাদের শাসনকালে এই অঞ্চলটি ব্যাপক উন্নয়ন লাভ করে।[১]

গবেষণা পদ্ধতি:

বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কতগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা সমপন্ন করতে হয়। তবে "ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব" এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এক ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো-

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি:
ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব গবেষণা করতে গিয়ে পৌরাণিক আখ্যান, লৌকিক চিত্র, ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও বিভিন্ন অনলাইন/ অফলাইন পত্র পত্রিকা থেকে "ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব" সম্পর্কে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। এসকল গ্রন্থগুলো পঠন পাঠনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তুলে ধরা। তবে সামগ্রিকভাবে এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

➢ঝিনাইদহ জেলার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা।
➢ঝিনাইদহ জেলার রাজা মুকুট রায় সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা।
➢ঢোল সমুদ্র দীঘির পৌরাণিক ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা।
➢ঢোল সমুদ্র দীঘির পাড়ে পুরাবস্তু ধ্বংসস্তুপ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা।
➢বিভিন্ন অঞ্চলের পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি ফলকসমূহ থেকে রাজা মুকুট রায়ের ঢোল সমুদ্র দীঘি সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব:
"ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব" আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে ঐতিহাসিক ঢোল সমুদ্র দীঘি ও রাজা মুকুট রায়ের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ইতিহাস পূর্ণগঠনে আরও নতুন নতুন তথ্য সংযোজিত হবে একই সাথে গবেষক, সাধারণ পাঠক ও দর্শনার্থী ঢোল সমুদ্র দীঘি সম্পর্কে জানার ও দেখার সুযোগ পাবেন। যেকোন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের যেমন পুরাতত্ত্ব মূল্য বা গুরুত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য। ইতিহাস হলো অতীতের ঘটা কোন অবিশ্লেষিত ঘটনা সম্বন্ধীয় পাণ্ডিতপূর্ণ অধ্যয়ন। এই গবেষণাটি শুধু ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘি হিসাবেই নয় এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের পরিচয়সমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৌলিক উপাদান হিসেবে সাহায্য করবে। এই সকল স্থাপত্যগুলি সমাজের নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে এবং যার মাধ্যমে আমরা সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, ঐতিহ্য ও শিল্পবোধের পরিচয় লাভ করতে পারবো।

ভৌগোলিক অবস্থান:

আয়তন:
দক্ষিণ বঙ্গের প্রবেশদ্বার ঝিনাইদহ।[২] ঝিনাইদহ জেলার আয়তন ১৯৬৪.৭৭ বর্গ কি.মি.।

অবস্থান:
২৩° ১৩´ থেকে ২৩° ৪৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ৪২´ থেকে ৮৯° ২৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

সীমানা:
উত্তরে কুষ্টিয়া জেলা, দক্ষিণে যশোর জেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। পূর্বে মাগুরা ও রাজবাড়ী জেলা, পশ্চিমে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।

প্রশাসনিক এলাকাসমূহ:
ঝিনাইদহ জেলাতে ৬টি উপজেলা, ৬৭টি ইউনিয়ন, ৯৪৫টি মৌজা, ১১৪৪টি গ্রাম, ৬টি পৌরসভা, ৫৪টি ওয়ার্ড, এবং ১৩৬টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। ঝিনাইদহ জেলার উপজেলাগুলো হলো: ১. কালীগঞ্জ ২. কোটচাঁদপুর ৩. ঝিনাইদহ সদর ৪. মহেশপুর ৫. শৈলকুপা এবং ৬. হরিণাকুন্ডু উপজেলা।

নদ নদী:
দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ছয়টি উপজেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে বারটি নদ নদী। ১. নবগঙ্গা ২. চিত্রা ৩. কুমার ৪. বেগবতি ৫. গড়াই ৬. ইছামতি ৭. ডাকুয়া ৮. কপোতাক্ষ ৯. কালীগঙ্গা ১০. কোদলা ১১. ফটকী ও ১২. বুড়ী নদ নদী।[৩]

মুকুট রায়ের পরিচয়:

রায় মুকুট:
নবদ্বীপ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাঁর নাম রায় মুকুট। তিনি অমরকোষ নামে টীকা রচনা করেন। অনুমান করা হয় তিনি রায় মুকুট পদ্ধতি নামে স্মৃতি গ্রন্থ তাঁর নাম রক্ষা করেছে। সঠিক সময়ে সঠিক বিষয় অনুধাবন করতে পারতেন বলে বৃহস্পতি উপাধিতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রায় মুকুট ব্রাক্ষ্মণ ছিলেন।

জমিদার মুকুট রায়:
তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল বিনোদ রায়। কাশ্যপ গোত্রীয় চাটতি গাঞি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রাজবালা' নামক উপন্যাসে লিখেছেন "মুকুট রায়ের কন্যা দুর্গাবতীর সহিত নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোসাঞি দুর্গাপুরনিবাসী কুলীনাগ্রগণ্য কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়, এবং তজ্জন্য জয়দিয়ার রায় চৌধুরী বংশের সহিত সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন "যশোহরের অন্তর্গত জয়দিয়ারগণ যে উক্ত বিনোদ রায়ের বংশসম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বংশের সহিত দুর্গাপুরের বন্দ্যবংশের সম্বন্ধ ছিল কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ 'অধিকারী' উপাধিযুক্ত। অধিকারীরা প্রধান কুলীন এবং স্বভাবে আছেন। কাশ্যপ গোত্রীয় বিনোদ রায় বংশজ ছিলেন, তদ্বংশীয়ের সহিত বিবাহ হইলে কুল থাকে না। সুতরাং জয়দিয়ার সহিত দুর্গাপুরের বিবাহসম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। জয়দিয়ার সম্পর্কিত মুকুট একজন সাধারণ জমিদার ছিলেন; নলডাঙ্গার রাজবংশ প্রবল হইলে সে বংশের জমিদারীর লোপ হয়।"[৪]

রাজা মুকুট রায়:
ঝিনাইদহ অঞ্চলে মহাপ্রতাপশালী জনদরদী সমাজ সেবক সকল প্রজাদের জন্য যিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তিনি হলেন রাজা মুকুট রায়। তিনি "শ্রোত্রিয় ব্রাক্ষ্মণ, শাণ্ডিলা গোত্র ও পারিহাল গাঞি। রাজা মুকুট রায়ের একজন ভাই ছিল তাঁর নাম গন্ধর্ব্ব রায়। রাজা মুকুট রায়ের পতন হলে তার ভাই বঙ্গেশ্বর কর্তৃক খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। গন্ধর্ব্ব খাঁ জোর করে খড়দহমেলের অবসথী বংশীয় রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ঐ বংশে পারিহালভাবাপন্ন দোষ স্পর্শিয়াছিল। এখনও রাঘবের বংশীয়গণের পারিমেল রয়েছে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিলে কুলীনের কুল ভঙ্গ হয় না, শুধু দোষ স্পর্শ হয়।

সম্ভবত: দুর্গাবতী এই প্রতাপশালী রাজা মুকুট রায়ের কন্যা; রাজকন্যার নামানুসারে দুর্গাপুরের নাম হয়েছিল এবং দুর্গাবতীর পুত্রবংশেও পারিহাল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল।"[৫] তিনিও খাঁন জাহান আলী (রাঃ) প্রভৃতির মত রাজা মুকুট রায় বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ ও জলাশয় তৈরি করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হতেন। এখনো ঝিনাইদহ জেলায় বেশ কিছু রাস্তা ও জলাশয়ের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। জলাশয়ের মধ্যে 'ঢোল সমুদ্র দীঘি' সর্বপ্রধান।

এছাড়াও মিঠাপুকুর, নটিপুকুর নামে কয়েকটি পুকুর বর্তমান রয়েছে। ঝিনাইদহের পূর্ব পাশে বিজয়পুর রাজা মুকুট রায়ের রাজধানী ছিল বলে অনুমান করা হয়। রাজধানীর দক্ষিণে বাড়ীবাথান নামে রাজার গোভাণ্ডার ছিল। রাজা মুকুট রায়ের গোভাণ্ডারে প্রচুর গাভী ছিল বলে রাজাকে বৃন্দাবনের নন্দ মহারাজ হিসেবে রাজার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজার উদ্যানের নাম ছিল 'বেড়বাড়ী'। রাজা মুকুট রায়ের কোড়দার সৈন্যরা যেখানে বসবাস করতো সেই স্থানের নাম ছিল কোড়াপাড়া। এই সকল স্থানগুলোর নাম এখনো বর্তমান।[৬]

"রাজা মুকুট রায় বাড়ীবাথানের যুদ্ধে নবাবের ও পাঠান সৈন্যের সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজিন হন। নবাবের সৈন্যরা রাজা মুকুট রায়কে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। রাজার পরিচয় জানার পর নবাব রাজা মুকুট রায়কে মুক্তি দেন। রাজার পরিবারের সদস্যগণ রাজার অনিবার্য পরিণতি, মৃত্যু ভেবে সবাই আত্মহত্যা করেন। রাজা মুকুট রায়ের কন্যার আত্মহত্যার স্থানকে কন্যাদহদু'রাণীর আত্মহত্যার স্থানকে দুসতীনের, রাজ জ্যোতিষীর আত্মহত্যার স্থানকে দৈবজ্ঞদহ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যা আজও এ নামেই পরিচিত।"[৭]

ঢোল সমুদ্র দীঘি:

ঝিনাইদহ জেলার সর্ববৃহৎ দীঘি হলো ঢোল সমুদ্র দীঘি। প্রায় ৫২ বিঘা জমির উপর অবস্থিত রয়েছে এই দীঘিটি। রাজা মুকুট রায়ের ঢোল সমুদ্র দীঘিটি ঝিনাইদহ জেলার ঐতিহ্যবাহী পাগলা কানাই ইউনিয়নে বাড়ীবাথান নামক স্থানে খনন করেন। ঝিনাইদহ শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই দীঘিটি। ঝিনাইদহ শহর থেকে ব্যাটারী চালিত যে কোন প্রকার যানবাহনের মাধ্যমে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যায় দীঘিতে। ব্যক্তিগত গাড়িতে ঝিনাইদহ পাগলা কানাই থেকে পশ্চিম দিকে একটু দূর এসেই দক্ষিণ দিকে রাস্তা দিয়ে গেলেই ঐতিহ্যবাহী ঢোল সমুদ্র দীঘি। ঝিনাইদহ জেলার রাজা মুকুট রায়ের অনেক সৈন্য ছিল। প্রচলিত আছে রাজা মুকুট রায় যখনই বাহিরে বের হতেন কমপক্ষে ১৬ হল্কা হাতি, ২০ হল্কা অশ্ব ও ২২০০ কোড়দার নিয়ে বের হতেন।[৮] ঢোল সমুদ্র দীঘি খননের পেছনে একটি লোকশ্রুতি আছে-

রাজা মুকুট রায় যখন রাজ্য পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত তখন রাজ্যে জলের অভাব দেখা দেয়। রাজার রাজ্যে যত প্রকার জলাশয় ছিল তা পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে গেল। ফলে সকলের মাঝে জলের কষ্ট দেখা দেয়। জলের কষ্ট কিভাবে লাঘব করা যায় রাজা মুকুট রায় অনেক ভেবে চিন্তে বৃহৎ দীঘি খননের সিদ্ধান্তে উপনিত হন। দীঘি খনন করার জন্য বহু শ্রমিক নিয়োগ দেন। শ্রমিকেরা তাদের সাধ্যমতো দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগলেন দীঘি খননের কাজে। কিন্তু দীঘিটি গভীর হলেও জল উঠল না। রাজা মুকুট রায় দীঘিটি এতো গভীর করার পরও জল না উঠার কারণে চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন।[৯] তবে কি জলের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারবেন না প্রজাদের? এমন সময় রাজা মুকুট রায় স্বপ্নে দেখলেন, রানী যদি পুকুরের তলদেশে নিজে নেমে পূজা দেন তবে এই সুবৃহৎ দীঘিতে জল উঠবে। রাজা স্বপ্নের বিষয়ে তাঁর প্রিয় রাজমহিষীকে বললেন। রানী স্বপ্নের কথা শোনা মাত্রই সকাল থেকেই পূজার সকল প্রকার সামগ্রী নিয়ে দীঘির

পাড়ে যান। রাজমাতা মনে মনে চিন্তা করলেন রাজ্যে সকলের মঙ্গলের জন্য যেকোন কাজ করতে তিনি প্রস্তুত। রানী মনে মনে দীঘিতে নামার সিদ্ধান্ত নেয়া মাত্রই দীঘির তলদেশে নেমে পড়লেন। পূজার সকল নিয়ম মেনে ইস্ট দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা আরম্ভ করলেন। রাজমাতা পূজা আরম্ভ করা মাত্রই দীঘিতে জল উঠতে শুরু হয়।

কিন্তু সহসাই প্রবল বেগে জল আসতে থাকে। দীঘিতে জল দেখতে পেয়ে দীঘির পাড়ে যেসকল প্রজারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বাদ্যি বাজনা নিয়ে মেতে উঠে আনন্দে। দীঘির চারপাশে বাজনার শব্দ অন্যদিকে গভীর তলদেশে জল আসার আনন্দে কেউ লক্ষ্যই করেনি রানী উপরে উঠতে পেরেছিলেন কিনা। সকলের অলক্ষ্যে তীব্র স্রোতের বেগে হারিয়ে যান রাজা মুকুট রায়ের প্রিয় রাজমহিষী। রাজা রানীকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু রানীকে পাওয়া গেল না। এমন সংবাদ পেয়ে রাজা মুকুট রায় নিজে দীঘির পাড়ে উপস্থিত হন। রানীকে খোঁজ করার জন্য দীঘিতে অনেক লোক নামান কিন্তু রানীর কোন প্রকার তথ্য মেলেনি। রাজা মুকুট রায়ের রাজ্যে জলের কষ্টের লাঘব হয় ঠিকই কিন্তু রাজ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। রূপকথাকেও হার মানানো এই লোককথা যে দীঘিকে ঘিরে তার নাম 'ঢোল সমুদ্র' দীঘি।[১০]

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য:

ঝিনাইদহ জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঢোল সমুদ্র দীঘি। সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ এই দীঘির মূল আকর্ষণ। বহু বছর পূর্বে থেকে দীঘিটি ঝিনাইদহে বিনোদনের একটি অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রকার উৎসব যেমন পহেলা বৈশাখ, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, ঈদ, দুর্গাপূজাসহ হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে এই দীঘির পাড়ে। বাংলাদেশের দূর দুরান্ত থেকে ছুটে আসে দীঘিকে দেখার জন্যে। বর্তমান স্কুল, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব:

পৃথিবীতে পর্যটন একটি সমৃদ্ধ ও সফল শিল্প। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র আছে যাদের আয়ের সবচেয়ে বড় খাত এই পর্যটন শিল্প। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো পর্যটন খাত তাঁদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারত, চীন, নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা অন্যতম। এমনকি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম পন্থা পর্যটন শিল্প। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা গতিশীল করার জন্য পর্যটন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই দীঘিকে পর্যটন স্থান হিসেবে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে সেই সাথে পর্যটন আগমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাঙ্ক্ষিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটন আকর্ষণের বহুমুখিতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করলে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘিটি বিশ্বমন্ডলে পরিচিতি লাভের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনি করি।[১১]

উপসংহার:

ঢোল সমুদ্র দীঘিটি শতাব্দী পরিক্রমায় পানীয় জলের অফুরন্ত আধার হিসেবে এবং স্মৃতি হিসেবে আজও টিকে আছে ঝিনাইদহের বুকে। কালের স্বাক্ষী বহনকারী নবগঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠা ঝিনাইদহ সদর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত রাজা মুকুট রায়ের ঢোল

সমুদ্র দীঘি। রাজা মুকুট রায়ের রাজবাড়ির কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে ঢোল সমুদ্র দীঘির দক্ষিণে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের স্তপে কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন লুকায়িত থাকতে পারে বলে পুরাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। দীঘির চারদিকে ছোট ছোট টিলা রয়েছে। টিলার উপর দিয়ে উপভোগ করা যায় নজর কাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য। যেকোন প্রকৃতিপ্রেমীর হৃদয় মুহূর্তেই কেড়ে নিবে অনাবিল সেই সৌন্দর্য।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.jhenaidah police.gov.bd
২. https://www.jhenaidah.gov.bd
৩. বাংলাদেশ জার্নাল, ৭ই জানুয়ারি, ২০২০
৪. মিত্র, শ্রীসতীশচন্দ্র, 'যশোহর খুলনার ইতিহাস', চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১ম খণ্ড, ১৩২১, পৃ. ৩৮৩
৫. তদেব, পৃ. ৩৮৪
৬. তদেব, পৃ. ৩৮৫
৭. https://www.Sadar. jhenaidah.gov.bd
৮. https://www.paglakanai.jhenaidah.gov.bd
৯. https://ekushey- tv.com 22 Julay, 2020
১০. https://www.sarabangla.net, 23 Julay, 2020
১১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়রি, ২০১৯।

অথর্ববেদে প্রতিভাত মাতৃত্ব : একটি সমীক্ষামূলক অধ্যয়ন

বন্দনা দাস
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম
এবং
দীপঙ্কর সালুই
ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম
এবং
অভিজিৎ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওমেন

সারসংক্ষেপ (Abstract): 'মা'- ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু কি বিশাল তার পরিধি! সৃষ্টির সেই আদিলগ্ন থেকে মধুর এই শব্দটি শুধু মমতার নয়, ক্ষমতারও যেন সর্বোচ্চ আধার। 'মা' এর অনুগ্রহ ছাড়া কোনো প্রাণীরই প্রাণ ধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের গর্ভধারিণী, জননী। 'মা' শব্দটি গভীর ব্যঞ্জনাময় এবং এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে মায়ের স্থান পিতার চেয়ে উচ্চে-

"পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতো হি লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ"।।
(বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, অধ্যায়ঃ ৬৪, শ্লোকঃ ৭)

প্রচলিত আছে যে মানুষের মধ্যে দেবত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তিনিই 'মা'। কিন্তু এই দেবত্বের আরোপ সমাজে নারীর অবস্থানের বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত নাও করতে পারে। সময় অনুসারে, ভারতীয় নারীর বিভিন্ন দিক এবং বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ও তার জীবনের বিভিন্ন মাত্রা সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বৈদিক সাহিত্যগুলির মধ্যে অথর্ববেদে বিভিন্ন সূক্তে উল্লিখিত মা হিসাবে নারীর মর্যাদা নিয়ে মূল্যায়নের একটি প্রয়াস করতে চলেছি।
সূচক শব্দ (Key Words): মাতা, মাতৃত্ব, অথর্ববেদ, ভূমি, অদিতি, অপা, রাত্রি, বাসুপত্নী।

ভূমিকা (Introduction):

নারীর 'মাতা' রূপটি সর্বদা পূজনীয়। ঋগ্বেদে 'মাতৃ' শব্দ অন্তরিক্ষ, নদী, জল তথা পৃথিবী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈয়াকরণ মতে, 'মাতৃ' শব্দটি মান্+তৃচ্ প্রত্যয় দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে। 'মান্ পূজায়াং তৃচ্ ন লোপঃ'। এখানে 'মান' এর অর্থ হল 'আদর'। তাই 'মাতৃ' শব্দের অর্থ হল-নির্মাণ করেন যিনি সেই জননীকে বোঝায়। যাস্কাচার্যের মতে মা শব্দের অর্থ স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা। কঠিন পরিস্থিতিতেও মা তার স্নেহময় স্বভাব ত্যাগ করেন না। যার স্থান স্বর্গের চেয়েও উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়- 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective):
এই গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হল অথর্ববেদ নারীর পূজনীয় রূপ মাতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা এবং এই অধ্যয়নের মাধ্যমে নতুন ধারণা আবিষ্কার করা। যেমন-

1. অথর্ববেদ মাতৃত্বের স্বরূপ নিরূপণ করা।
2. নারীর ক্ষমতায়ণকে আবারও জাগিয়ে তোলা।
3. আধুনিক যুগে উপস্থাপিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা।

গবেষণার পদ্ধতি (Methodology):
বর্তমান অধ্যয়ণটি একটি গুণগত অধ্যয়ণ। এই গবেষণার বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস যেমন বই, পত্রিকা, জার্নাল, ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে।

অর্থবেদে মাতৃত্বের বিভিন্ন দিক:
প্রতিটি সমাজের মানবজাতির ইতিহাসে একজন মহিলা সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে মাতৃত্বের দ্বারা। অন্য ভাবে বলতে গেলে, একজন নারীর অন্য কোনো রূপ তার মা হওয়ার মতো এত মহিমান্বিত হয়নি। অর্থববেদেও মা হিসেবে নারীর অবস্থানকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মাতৃত্বের একটি বিস্তৃত চিত্র নির্দিষ্ট কিছু দেবীর চরিত্রে পরিলক্ষিত হতে পারে যেমন অদিতি, অপা, পৃথিবী, রাত্রি, বাসুপত্নী প্রভৃতি। অদিতিকে সর্বজনীন মা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং অথর্ববেদের ঊনবিংশকান্ডে বেদমাতার স্তুতি করা হয়েছে-

"স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্।
মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্"।।[1]

অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী (অথবা সাবিত্রী মন্ত্র জপকারী) আমার দ্বারা অভিষ্টুতা, অভিলষিত ফলদাত্রী, পাপ-পরিশোধিকা বেদমাতা (ঋগাদি বেদের সাররূপ মাতার মত প্রধানা সাবিত্রী, অথবা বেদই মাতা অর্থাৎ মায়ের মত হিতকারী) দ্বিজদের (ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের) আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্তি, ধন ও ব্রহ্মতেজ প্রদান করুক। তারপর সকলের ফল প্রার্থনাকারী আমাকে আয়ু প্রভৃতি দিয়ে ব্রহ্মলোক (সত্যলোকে অথবা বিদ্বদ্গণের অনুভূত ব্রহ্মরূপ পরতত্ত্ব) লাভ করো। (শব্দগম্য ব্রহ্মাকার পরিত্যাগ করে বাক্য ও মনের অতীত ব্রহ্মরূপ হও) এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্বানুষ্ঠিতবেদাধ্যয়ন অথবা গায়ত্রীমন্ত্র জপের দ্বারা দ্বিজাতি সকলের আয়ুরাদি প্রার্থনা করেছেন বেদমাতার কাছে।

অথর্ববেদে পৃথিবীকে মাতৃদেবী হিসাবেও স্তুতি করা হয়েছে। স্বর্গ এবং পৃথিবীর জুটি সকলের আদর্শ পিতামাতা হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

"যাস্যাং দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব"।।[2]

অর্থাৎ স্বর্গ তাদের পিতা, পৃথিবী তাদের মাতা এবং সমুদ্র হল গাছের মূল। রাত্রি ও নাভাসের বন্ধনকে সকলের অভিন্ন পিতা-মাতা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অথর্ববেদে 'মাতা' বোঝাতে 'মাতৃ' এবং 'জনয়িত্রী' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সায়নাচার্য 'মাতৃকে' বেশিরভাগই 'জননী' এবং 'জনয়িত্রীকে' 'জনাইত্রী' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এইভাবে এই দুটি শব্দের অর্থের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য

করা যায় না। কারণ উভয়ই একজন নারীর সৃষ্টিশীল দিক নির্দেশ করে। কিন্তু মাতৃত্বের ধারণাটি শুধুমাত্র দৈহিক জন্মের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এটি সৃষ্টির উৎস ও আশ্রয়স্থলের জন্য দায়ী ছিল। অথর্ববেদীয় বিবৃতিতে 'গাবো ঘৃতস্য মাতরঃ' অর্থাৎ গাভী হলেন মাখনের মাতা।

"যাসাং নাভিরারেহণং হৃদি সংবননং কৃতম্।
গাবো ঘৃতস্য মাতরোহমূং সং বানয়ন্তু মে"।।[3]

এই মন্ত্রে 'মাতরঃ' কে 'নির্মাত্র্যঃ' অর্থাৎ 'উৎপাদক' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এইভাবে গরুকে তাদের একই উৎসের জন্য মাখনের মা বলা হয়।

একজন মায়ের তার সন্তানের প্রতি ভালবাসা এবং তার লালন-পালনের আকাঙ্ক্ষা একটি অথর্ববেদীয় শ্লোকে প্রকাশ পায়, যেখানে জলের প্রতি আবেদন করা হয়েছে পুত্রসদৃশ আহ্বানকারীদের পরিবেশন করার জন্য তার সবচেয়ে ভালো স্বাদ প্রদানের মাধ্যমে। একজন মায়ের যত্নশীল প্রকৃতি এর মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে।

"যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ"।।[4]

অর্থাৎ হে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমার যে অত্যন্ত সুখকর সার বা রস আছে, স্নেহশীলা মাতার ন্যায় আপনি সেই রসের দ্বারা আমাদিগকে রসের ভাগী করুন। মায়েরা যেমন ভালোবাসা দিয়ে সন্তানদের সুখ দেন এবং জল যেমন পৃথিবীতে জীবন দেন, প্রাণীগণকে সিক্ত করেন তেমনই সকল মানুষের উচিত একে অপরের সাহায্যকারী হওয়া ও উপকার করা।
এছাড়াও অথর্ববেদে মা ও পুত্রের সম্পর্ক আদর্শ প্রেমকে বোঝাতে বলা হয়েছে-

"মাতেব পুত্রেভ্যো মৃড কেশেভ্যঃ শমি"।।[5]

এবং সুরক্ষার তুলনার বিষয় মাতৃগর্ভকে একটি স্থান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা সৃষ্টির উৎসের সাথে তুলনা করা যায়-

"তুভ্যমেব জরিমন্বর্ধতাময়ম্মেমমন্যে মৃত্যবো
হিংসিষুঃ শতং যে। মাতেব পুত্রং প্রমনা উপস্থে
মিত্র এনং মিত্রিযাৎপাত্বংহসঃ"।।[6]

অর্থাৎ যেমন ভাবে প্রসন্নচিত্ত বিদূষী মায়ের কোলে শিশু নির্ভয়ে খেলা করে, তেমন ভাবেই একজন নীতিজ্ঞ পুরুষ ভগবানের সাধনা করলে নিজের আপন জনের সাথে সুখে জীবন যাপন করতে পারবেন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে 'মা' হিসেবে একজন নারীকে যথাযথ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

"মা নো মেধাং মা নো দীক্ষাং মা নো হিংসিষ্টং যত্তপঃ।
শিবাঃ নঃ শং সন্ত্বায়ুষে শিবা ভবন্তু মাতরঃ"।।[7]

অর্থাৎ হে মাতা ও পিতা, তোমরা দুজনে আমাদের বুদ্ধির প্রতি, আমাদের দীক্ষা ও শিক্ষার প্রতি, আমাদের তপস্যার প্রতি শুধু নয়, সন্তানের শুভাকাঙ্খী এবং শান্তিদাতা হওয়া উচিত।
অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে মা কে তার ছেলেদের সাথে সমমনা হতে বলা হয়েছে-

"অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্"।।[8]

একইভাবে মায়ের সাথে সন্তানের আসক্তিও একটি অথর্ববেদিক অভিব্যক্তিতে চিত্রিত হয়েছে। এটি হল, একজনের মা এবং বাবার যত্নের জন্য যে রুদ্রকে তাদের আঘাত না করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

"মা নো হিংসীঃ পিতরং মাতরং চ স্বাং তন্বং রুদ্রমা রীরিষো নঃ"।।[9]

তাছাড়া কেউ যদি তার মা ও বাবাকে কষ্ট দেয় এবং তাদের সাথে সঠিক আচরণ না করে, তবে তা একটি পাপ কাজ বলে গণ্য হয়। সায়নাচার্য এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে মাতাকে অন্য সকলের উপরে তার আধিপত্যের কারণে প্রথমে গণনা করা হয়েছে। তিনি স্মৃতি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-"ইভয়ো মাতা গরিয়াসী" অর্থাৎ 'মা অন্য সকলের চেয়ে মহান'। এইভাবে অথর্ববেদে একজন নারীকে 'মা' হিসাবে একটি মহৎ স্থান দেওয়া হয়েছে, যা উপনিষদিক সাহিত্যে তার অবস্থান একটি দেবত্বের পদে উন্নীত হয়েছিল- 'মাতৃ দেবো ভবঃ'।[10]

ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য সভ্যতা হিসেবে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত সভ্যতার নিদর্শন গুলির মধ্যে যেসব পাথরের দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন, এই মূর্তিগুলির মধ্যে অন্তত কতকগুলো মূর্তি মাতৃদেবী-মূর্তি এবং এগুলোই আমাদের পরবর্তী কালের অনেক মাতৃদেবী-মূর্তির প্রাক্-রূপ বলে তাঁদের অভিমত। তাঁরা আরও অনুমান করেন, এই মাতৃদেবী-মূর্তির অনেকগুলিই মাতা পৃথিবীর মূর্তি। শস্যোৎপাদিনী পৃথিবীই ছিলেন মাতৃদেবতা। প্রাণশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীকরূপে তিনি প্রাচীনকাল থেকেই পূজিতা। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি মূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে, যে মূর্তির ক্রোড়দেশ হতে একটি বৃক্ষ বের হয়েছে। অন্তত এই মূর্তিটি যে পৃথিবীরই মাতৃমূর্তি সে সম্বন্ধে অনেক পন্ডিতই নিঃসন্দেহ। পৃথিবীকে এই দেবীমূর্তি রূপে কল্পনা যে শুধু প্রাচীন ভারতেরই বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু নয়।

অথর্ববেদের মধ্যে পৃথিবীর যে সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তির চমৎকার বর্ণনা দেখি, পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে এই ভাবধারার একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। বহু পুরাণেই পৃথিবী-দেবীকে আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সাথেই এক করে দেখা হয়েছে।

অথর্ববেদের মধ্যে পৃথিবী সূক্তে পৃথিবীর সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃ মূর্তির চমৎকার বর্ণনা আমরা পাই। ঋষি অর্থবা বলেছেন-

"যত্তে মধ্যং পৃথিবি যচ্চ নভ্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা-ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ।
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু"।।[11]

অর্থাৎ হে পৃথিবী যা তোমার মধ্যভাগ, যা তোমার নিম্নভাগ যা তোমার ঊর্জাশ্রিত রূপ, সেইসব শরীর দিয়ে তুমি আমাকে ধারণ কর। তোমার সন্তানকে পবিত্র কর। ভূমিই মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র, তিনি আমাদের পূর্ণ করুন।

ভূমি মাতার প্রতি তার সন্তানের সশ্রদ্ধ নিবেদন এখানে উচ্চারিত হয়েছে। পৃথিবীর কোমল-কঠোর তনুমধ্যে আশ্রয় চান ঋষি। পৃথিবীর সম্পদময়ী স্নেহের মাধ্যমে মুগ্ধ ঋষি ভূমি মাতার কাছে পুত্রের অধিকারে ঘনিষ্টতম আশ্রয় চান। ঋগ্বেদেও মাতা পুত্রের সম্পর্কের কথা ঋষি ভৌম অত্রি উচ্চারণ করেছেন- 'মা নো মাতা পৃথিবী'।[12]

"বিশ্বস্বং মাতারমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা"।।[13]

অর্থাৎ জগতের জন্মদায়িনী, ওষধিগণের মাতা ধ্রুবা ভূমি এই পৃথিবী। ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথিবী, মঙ্গলদায়ক এবং সুখদানকারী এই মাতা পৃথিবী, এই ভূমির কোলে আমরা সুখে বিচরণ করব।

ঋগ্বেদে যে পৃথিবী ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছিল, অথর্ববেদে সেই ভাবনা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সেখানে পৃথিবীর আধার রূপে আটটি আধেয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের আশ্রয়ে পৃথিবী অবস্থান করেন সেগুলি হল- সত্য, বৃহৎ, জল, দীক্ষা, উগ্র, তপ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ প্রাচীনকাল থেকে সকল জাতবস্তুর, বর্তমানে যে সকল প্রাণী আছে এবং ভবিষ্যতে যা উৎপন্ন হবে সেই সকল বস্তুর ধারক এবং পালক হলেন এই পৃথিবী। তাই বলা হয়েছে-

"সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু"।।[14]

মাতাভূমি সম্পর্কে ঋষি বলেছেন- "পৃথিবী যার মধ্যে সমুদ্র, নদী এবং অনেক জল রয়েছে, যেখান থেকে খাদ্য এবং শস্যের ক্ষেত উৎপন্ন হয়, যা আমাদের শ্বাস নিতে এবং চলাফেরা করতে সাহায্য করে, সে ভূমিরূপ মাতা আমাদেরকে তার সর্বোত্তম ফল দান করুক"।

একটু গভীর ভাবে ভাবলে দেখা যাবে পৃথিবী বিশ্বজগতের চালিকা শক্তি। তিনি ওষধি সমূহের ধারণ কর্ত্রী (১২।১।২) এবং নদী-সমুদ্র-শস্যে-ফসলে পরিপূর্ণ এই ভূমি মাতা। ভূমি সূক্তে বলা হয়েছে-

"যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎসা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু"।।[15]

অর্থাৎ "পৃথিবীতে আছে সমুদ্র, নদী ও কৃষিক্ষেত্র। কর্ষণকারী মানুষের বাস এই পৃথিবীতে। পৃথিবীর কর্ষিত অন্নেই সকল প্রাণীর তথা মানুষের প্রাণ ধারণ ও পুষ্টি লাভ হয়। তার জল, বায়ু, খাদ্য ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব"। অক্ষসূক্তেও একথা বলা হয়েছে। তাই ভূমি রূপ মাতার কাছে ঋষির প্রার্থনা তাৎপর্যপূর্ণ।

মাতা রূপে পৃথিবীর ধাত্রীরূপ আর বসুন্ধরার স্বরূপটি একাধিক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে অথর্ববেদে। যেমন-

"বিশ্বং-ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিইন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু"।।[16]

অর্থাৎ "যিনি সমগ্র বিশ্বকে ভরণপোষন করেন, যিনি সম্পদের আধার, প্রতিষ্ঠাদাত্রী, হিরণ্যবক্ষা এবং জগতের স্থাপনাকারিণী সেই পৃথিবী বৈশ্বানর বা জগতের সমস্ত অগ্নিকে ধারণ করেন। ইন্দ্র বৃষতুল্য যার কাছে, সেই পৃথিবী সম্পদের জন্য আমাদেরকে ধারণ করুক"।

এই মন্ত্রে পৃথিবীর ধাত্রীরূপ আর বসুন্ধরা স্বরূপটির পরিচয় আমরা পাই। ঈশোপনিষদে একটি উপদেশ আছে-'মা গৃধঃ কস্যস্বিদৎ ধনম্'।[17] ধন কার? প্রসঙ্গ বদল করে বলা যায় ধন তো পৃথিবী মাতার। এই নদী, গিরি, অরণ্য প্রকৃতির সব সম্পদ তাঁর। পৃথিবীর তলভাগে বিদ্যমান জল-তেল-কয়লা-সোনার খনিজ সম্পদে পৃথিবী হিরণ্যবক্ষা। বসুধা কিংবা বসুন্ধরা। তিনি শুধু ধারণ কারিণী নন, দানকারিণী বিশ্বদানী, অথচ স্বার্থপর ও ক্ষমতার অহংকারে মানুষ দুর্বলকে কিংবা প্রকৃতির অন্য সব অধিকারীকে উচ্ছেদ করে ছলে বলে কৌশলে চিরকাল নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করে। সভ্য জীবনের প্রথম ধাপ আগুন জ্বালানো। সেই অগ্নিকে মাতার ন্যায়

নিজের বুকে ধারণ করেন পৃথিবী। সেই মহত্তম শক্তির আধার ইন্দ্র-বৃষবৎ (বৃষভ অর্থাৎ ষাঁড় শক্তির প্রতীক) ভূমির রক্ষাকর্তা হয়ে থাকবেন এই প্রিয়তম গ্রহটির প্রার্থনা পৃথিবী প্রেমিক ঋষি অথর্বার।

পৃথিবী সব দিয়ে আমাদের পালন করছেন। যেমন ভাবে একজন মাতা তাঁর সর্বস্ব দিয়ে তার সন্তনদের পালন করেন।

"যা বিভর্ত্তি বহুধা প্রাণৎ এজৎ"।।[18]

অর্থাৎ এই হিরণ্যবক্ষা সম্পদময়ী পৃথিবা মাতার বুকে শুধু মানুষ নয় ইতরেতর প্রাণীও নিশ্চিন্তে আশ্রয় পায়। এই মধুময় ভূমির স্বাদ তার সন্তানরা ভোগ করে-

"সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা"।।[19]

অর্থাৎ "মাতা পৃথিবী আমাদেরকে মধুময় বিষয় সমূহ প্রদান করুক এবং তেজ দেন করুন"। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি'। ভূমি মাতার বৃক্ষ, ওষধি, ধূলি সর্বত্রই সেই মধুময় অনুভব, মধুর ক্ষরণ। মধুময় পৃথিবীর উজ্বল দীপ্তির আলোকে স্নাত হয়ে থাকতে চান তার সন্তানেরা। এই সূক্তে আনন্দ ধারা বাহিনী ভূমি মাতার কথাও ঋষি বলেছেন। অহোরাত্র তাঁর জলরাশি সমান ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে জগতে প্রাণ ধারনের নিমিত্ত।

"যস্যামাপ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ভূরিধারা পযো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা"।।[20]

অর্থাৎ "যে পৃথিবীর মধ্যে জলরাশি দিবারাত্র সমানভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই মা রূপী পৃথিবীর বুক থেকে তার সন্তানদের জন্য দুগ্ধ হয়ে ক্ষরিত হোক"।

পৃথিবীর সব উপাদানে মার্ধুযের স্বাদ আস্বাদন করতে চেয়েছেন ঋষি অর্থবা। আকাশ, বাতাস, ওষধি, গো, পৃথিবীর ধূলিকণাকে মধুর করে পেতে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন ভূমি মাতার কাছে।

"তা নঃ প্রজা সং দুহ্রতামং সমগ্রাঃ।
বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যমং"।।[21]

অর্থাৎ "সেই প্রাণীগণ আমাদের সম্যক্ রূপে দোহন করুন। হে ভূমি তোমার বাকের মধুময় রূপ আমাদের দান করো"।

ঋগ্বেদেও এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়-"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ"।[22] এখানে ঋষি অথর্বা সেই সুরটি ধরেই মধুক্ষরা ভূমিমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে যেন তার বাক্ শোভন, মধুঝরা হয়। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, বাক্ ব্যবহারেও শোভনতা কবির প্রার্থনা।

"যামশ্বিনাববিমাতাং বিষ্ণুর্যস্যাং বিচক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্র আত্মনেঅনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমির্বিসৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ"।।[23]

অর্থাৎ "যাকে অশ্বিদেবতাদ্বয় পরিমাপ করেছিলেন, যেখানে বিষ্ণু পরিক্রমা করেছিলেন, যাকে শচীপতি ইন্দ্র আপন ভেবে পৃথিবীকে শত্রু করেছিলেন, সেই পৃথিবী আমাদেরকে যেমন পুত্রের জন্য মাতা দুগ্ধ প্রদান করেন, তেমন মাতা ভূমি আমাদের জন্য পয়ঃ প্রদান করুন"।

এমন ভূমি কবির মাতৃরূপা এ স্বীকারোক্তি বারংবার। আমরা পৃথিবীর সন্তান। মাতা পুত্রের স্নেহাশ্লিষ্ট সম্পর্ক মনুষ্য জগতে গভীরতম, নিবিড়তম। ঋষি বলেছেন-'মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ'।[24] তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে পুত্রকে দেবেন সে ব্যাপারে সন্তান নিঃসন্দেহ তার প্রার্থনা এই মন্ত্রে। মাতা পুত্রের সম্পর্ক পৃথিবীতে ঘনিষ্টতম-সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে ঋষি ভূমির কাছ থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক চেয়েছেন।

বৈচিত্র্যপূর্ণা এই পৃথিবী। নানাধর্মের নানা বর্ণের নানা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস এই পৃথিবীতে। পৃথিবী সকলকেই সন্তানের ন্যায় সস্নেহে পালন করেন-

"জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্"।।[25]

অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যভাগ থেকে পুষ্টি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যা আমাদের শরীরকে পালন করে। বৃক্ষ, বনস্পতি, লতা-গুল্ম, ঔষধি সবকিছুকে পালন করে এই পৃথিবী। এই পৃথিবী অন্নজলের দ্বারা সকলকে পালন করে। ঋতুসমূহ ফল, পুষ্পের দ্বারা পৃথিবীকে সজ্জিতা করে। পুরুষ, নারী, অশ্ব, হস্তী, মৃগ সকল জন্তুর আশ্রয়দাত্রী এই পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবী সকলকে ধারণ করেন। কবি তাই পৃথিবীকে প্রণাম করেছেন।

ঋষিকবি মাতৃত্বের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন, আমরা কেবল পৃথিবী থেকে গ্রহণই করেছি, বিনিময়ে সেই মমতাময়ী মাকে আমরা কিছুই ফিরিয়ে দিতে পারিনি। আমরা অন্নের সন্ধানে পৃথিবী বক্ষকে কর্ষণ করেছি, বাসস্থান নির্মাণ করেছি, পৃথিবী মাতার সবথেকে নিকট আত্মীয় বৃক্ষকে আমরা নির্বিচারে ছেদন করে যাচ্ছি। এই সব দেখে কবির হৃদয়ে আক্ষেপের ধ্বনি অনুরণিত হয়েছে-

"যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতি।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি মা তে হৃদয়মর্পিপম্"।।[26]

বৈদিকঋষির এই মানসিক খেদের পরিচয় পৌরাণিক কালেও লক্ষ্য করা যায়, সেখানে কবি পৃথিবীর বুকে পা রাখার জন্য তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এইভাবে কবি তেষট্টিটি মন্ত্রে পৃথিবী মাতার বৈশিষ্ট্য নানাভাবে বর্ণনা করে শেষে বলেছেন-

"ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্"।।[27]

অর্থাৎ "হে পৃথিবীমাতা, আমাকে ভদ্রচেতনার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সঙ্গে সহমত হয়ে আমাকে শ্রী ঐশ্বর্যের মধ্যে স্থাপন কর"। এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋগ্বেদ তথা অথর্ববেদে মায়ের প্রতি সমাজের যে কর্তব্য তা ধ্বনিত হয়েছে। ঋষি এখানে নিজেকে পুত্রবৎ মনে করেছেন এবং পৃথিবীকে স্নেহময়ী মাতা রূপে তুলনা করেছেন। যার স্নেহস্পর্শে জগতের সকল প্রাণী লালিত পালিত হচ্ছে।

ঋষি ভূমিমাতার কাছে নতজানু হয়ে সমস্ত গৃহপালিত ও আরণ্য-পশু এমনকি তথাকথিত অশুভ গন্ধর্ব রাক্ষসাদির রক্ষার জন্যও প্রার্থনা করেছেন (অথর্ববেদ ১২।১।৪৯-৫০)। কি অপরিসীম ঔদার্য! পৃথিবীর রূপ, প্রকৃতির রূপ, রস, সোনার খনির ঐশ্বর্য (হিরণ্যবক্ষসা) তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন কবি এমন গভীর বন্ধনে যে এর সামগ্রিকতায় সত্যিই বিস্ময়ের অসংখ্য উপাদান ছড়িয়ে আছে। আজকের ক্ষুধিত, ঐশ্বর্যলুব্ধ, অরণ্যনাশী, পশুঘাতী মানুষদানবের সর্বগ্রাসী হিংসার প্রেক্ষিতে এই কবিতার আবেদন সত্যিই বৃহত্তর রূপ নেয়। পৃথিবীর কবি শেষ পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধায় তাই মাতা ভূমির কোলে আশ্রয় চান। তবে একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে

ভূমিকে মাতা হিসেবে আপন করার চিত্রটি অথর্ববেদে একেবারে আগন্তুক নয়-ঋগ্বেদেই এর পূর্বধ্বনি আমরা শুনতে পাই-

"তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যোঃ...।"[28]

অথর্ববেদে রূপটি আরো বিনম্র ও কবিত্বময়-

'ভূমের্মাতনিধেহি মা ভদ্রয়া সু-প্রতিষ্ঠিতম্'।[29]

প্রতিটি ছত্রে ছত্রে পৃথিবীসূক্ত উজ্জ্বল, বিস্ময়কর, কাব্যময় ও প্রকৃতির ঐশ্বর্য বর্ণনায় উচ্ছ্বাসিত। এর সঙ্গে তুলনীয় বাংলা ভাষায় আর একটি দীর্ঘ গদ্যকাব্য আমাদের পরিচিত, তা রবীন্দ্রনাথের পত্রপুট কাব্যের 'পৃথিবী'। সেখানেও মাতা পৃথিবীকে ঘিরে নির্মল প্রেম ও ঐশ্বর্যের প্রতিচ্ছবি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাতৃত্ব-

এই মাতৃকারা সর্বশক্তিময়ী, অসুর দমনে শ্রেষ্ঠা। অন্তত যে অশুভ শক্তি ক্ষতি করে বলে ভাবা হয়, তারা তাকে খর্ব করেন। স্তোত্রে তাদের স্তুতি করা হয় সন্তানদের রক্ষা করার জন্য। যখন আর্ত তাঁদের কাছে আসে, তারা বর দেন এবং আর্তি দূর হয়। এ দিক দিয়ে তাঁরা মর্ত্য মায়েদের থেকে ভিন্ন, যে মায়েদের ইচ্ছা ও উক্তি সাধারণত সম্পূর্ণ ফলহীন। তারা তাদের সন্তানদের জন্য যা চান তা ঘটে না, যখন মায়েরা সক্রিয় ভাবে সন্তানের মঙ্গল চেষ্টা করছেন, তখনও না। প্রধান পার্থক্য অবশ্যই এই মাতৃকারা পুরোপুরি মুক্ত, স্বাধীন কর্তা কিন্তু মর্ত্য মায়েরা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও অন্যান্য গুরুজনের অধীন, এমনকী বার্ধক্যে পুত্রেরও অধীন। এই মর্ত্য মায়েরা মাতৃকাদের মতো অতিলৌকিক শক্তির অধিকারী নন, এমনকী লৌকিক শক্তিরও অধিকারী নন। স্বামী ও গুরুজনের অধীন, প্রত্যক্ষ কর্ত্রী হিসেবে সম্পূর্ণ শক্তিহীন মর্ত্য মায়েরা ক্ষমতাহীনতার যন্ত্রনা ভোগ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে মাতৃ পূজাকারকেরা দেখান, তারা ভাবগত ভাবে মাকে কত উচ্চাসনে তুলেছেন কিন্তু যা তারা সত্যি সত্যি তুলেছেন তা হল 'মাতৃত্বের ভাবনা'। এই দুঃখিনী মর্ত্য মায়েরা কি মাতৃকার মূর্তি ও উপকাহিনি থেকে কোনও সান্ত্বনা বা মানসিক শান্তি পেতে পারেন?

উপসংহার (Conclusion):

মাতৃকা ও মর্ত্যের মাতার স্থান সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত ভূমিতে। একজন তার গুরুতর রূপে সীমিত সাংসারিক প্রদেশে, যেখানে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পিতার আয়ত্তে বলে তার সন্তানদের মঙ্গলের জন্যও নিজের ইচ্ছা খাটাবার স্থান নেই। তাকে কোনও পর্যায়ে তার মত জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা হয় না কিন্তু দেবী মায়ের ইচ্ছা মহাবিশ্বের স্তরে সৃজনশীল। মাতৃকা তার কাজ করে কোনও রকম ব্যাথা ছাড়ায় দৈব আনন্দে। মর্ত্যের মাতা মাতৃত্ব শুরু ও শেষ করে যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে। পুত্র তার শিক্ষা ও জীবিকা শুরু করলে, কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে, মা ফিরে যায়। তার একাকিত্বের বাঁধা গুটিতে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আবার গর্ভধারণ না করে। তার মাতৃত্ব তাকে কয়েক মাস আনন্দ দেয়, যতদিন তার শিশু খুব ছোট আছে, তার প্রতি নির্ভরশীল আছে। কিন্তু শীঘ্রই বড়বেশি শীঘ্র, এই সংক্ষিপ্ত মুক্তির কাল শেষ হয়ে যায় এবং মাতৃত্বের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে নিশ্চিত ভাবে মিলিয়ে যায়।

অন্ত্যটীকা (End Note):

1. অথর্ববেদ ১৯।৭।১২
2. অথর্ববেদ ৮।৭।২

3. অথর্ববেদ ৬।৯।৩
4. অথর্ববেদ ১।০৫।২
5. অথর্ববেদ ৬।৩০।৩
6. অথর্ববেদ ২।২৮।১
7. অথর্ববেদ ১৯।৪০।৩
8. অথর্ববেদ ৩।৩০।২
9. অথর্ববেদ ১১।২।২৯
10. তৈত্তিরীয়োপনিষদশিক্ষাবল্লী
11. অথর্ববেদ ১২।০১।১২
12. ঋগ্বেদ ৫।৪২।১৬
13. অথর্ববেদ ১২।১।১৭
14. অথর্ববেদ ১২।০১।০১
15. অথর্ববেদ ১২।১।৩
16. অথর্ববেদ ১২।১।৬
17. ঈশোপনিষদ
18. অথর্ববেদ ১২।১।৪
19. অথর্ববেদ ১২।১।৭
20. অথর্ববেদ ১২।১।৯
21. অথর্ববেদ ১২।১।১৬
22. ঋগ্বেদ ১।৯০।৬
23. অথর্ববেদ ১২।০১।১০
24. অথর্ববেদ ১২।১।১২
25. অথর্ববেদ ১২।০১।৪৫
26. অথর্ববেদ ১২।০১।৩৫
27. অথর্ববেদ ১২।০১।৬৩
28. ঋগ্বেদে ১।৮৯।৪
29. অথর্ববেদে ১২।১।৬৩

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography):

1. গোস্বামী, শ্রী বিজনবিহারী, ১৪ই আশ্বিন ১৩৫৮, অথর্ববেদ সংহিতা, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী।
2. শাস্ত্রী, সীতারাম, ১৯৬১, বেদার্থবিচার, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ।
3. অনির্বাণ, ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৭০, বেদমীমাংসা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।
4. অনির্বাণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (৪র্থ খণ্ড), রাজবাটী বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
5. আজীজ, আবদুল, ২০০০, অথর্ববেদ সংহিতা, কলিকাতা, আল-আমান (প্রকাশিত), হরফ প্রকাশনী।
6. ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ, অধিকারী, তারকনাথ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, জানুয়ারি ২০০১, বৈদিক সংকলন (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো।

7. বসু, যোগীরাজ, ১৯৫৭, বেদের পরিচয় (বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস), কলিকাতা ১২, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লি:।
8. চক্রবর্তী, সোমদত্তা, ডিসেম্বর ২০০০, বৈদিক সাহিত্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো।
9. লাহিড়ী, দুর্গাদাস, ১৩৩৬, ঋগ্বেদ সংহিতা (সায়নভাষ্যসহ), কলকাতা, অক্ষয় লাইব্রেরী।
10. দত্ত, রমেশচন্দ্র, ১৯৯২ বঙ্গাব্দ, ঋগ্বেদ সংহিতা, কলিকাতা।
11. Krishnaraj, Maithreyi, 2010, Motherhood Glorification Without Empowerment (1st edition), New Delhi, Routledge.
12. Bhattacharji, Sukumari, 1994, Women and Society in Ancient India, Kolkata, Basumati Corporation Limited.

আধুনিক শিক্ষা চিন্তায় বিদ্যাসাগর : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

নোটন সিং
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতাব্দীর কর্তব্যপরায়ণ, একরোখা, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা সংস্কারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি পড়াশোনায় এতটাই ভালো ছিলেন যে তাঁর পান্ডিত্য দেখে সংস্কৃত কলেজ তাঁকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি আপামর জনসাধারনের কাছে ‘দয়ার সাগর’ নামে ও পরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দীন ও দরিদ্রের আসল বন্ধু।তাই এদের তথা সমাজের সার্বিক কল্যাণে সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অন্ধকারময় সমাজকে জ্ঞানরূপ মশাল জ্বেলে আলোকিত করা। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত। তিনি বুঝেছিলেন পিছিয়ে পড়া এই সমাজকে গতিশীল করতে হলে প্রথমত মানুষের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার ঘটাতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংস্কারের। এই জন্য তিনি চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক ধাঁচে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাইলেন। যার ফসল ২০০ বছর পরেও আমরা ভোগ করছি। এই প্রবন্ধটিতে আমি আধুনিক শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের অবদান তুলে ধরেছি এবং তার সঙ্গে এটিও তুলে ধরেছি যে তাঁর শিক্ষা চিন্তা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করে।
সূচক শব্দ: নারীশিক্ষা, সংস্কার, আধুনিক, চিরাচরিত, শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিনির্ভর।

মূল আলোচনা:

বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আর মাতা ভগবতী দেবী। তৎকালীন ঔপনিবেশিক পরিমন্ডল ও সুসংস্কার সম্পন্ন পরিবারে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। তিনি একজন সর্ব গুনান্বিত কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রুপকার। রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময়ে বাংলায় সমাজ সংস্কারের হাল ধরেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বুঝেছিলেন কুসংস্কারের মায়াজালে আবদ্ধ এই মানব জাতিকে টেনে তুলতে হলে সমাজ সংস্কারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষা সংস্কারের। যা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে সাহায্য করবে। সেটা তিনি সিদ্ধ হস্তে সারাটা জীবন পালন করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা সমকালীন সময়ে এদেশে শিক্ষা চলত মূলত পাঠশালায়। এই পাঠশালার কোন নির্দিষ্ট গৃহ ছিলো না। পন্ডিত মশাই বা গুরু মশাই পড়াতেন গ্রামের চন্ডী মন্ডপে আর না হলে নিজের দোকানে বা ঘরে। পাঠক্রম ছিল বাংলা পড়তে ও লিখতে পারা আর যোগ বিয়োগ গুণভাগ জানা। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল কোনো রকমে কাজ

চালিয়ে নেওয়া; যেমন-সাংসারিক কাজ, ছোট বড় ব্যবসা, দোকানদারী ও লেনদেনের কাজ। শিক্ষাদানের জন্য ছিল না উপযুক্ত পাঠক্রম, উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং উপযুক্ত শিক্ষালয়। এমতাবস্থায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও আধুনিকীকরণ করার প্রয়াস অনস্বীকার্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষায় সংস্কার ও আধুনিকীকরণের শুভারম্ভ ১৮৫১ সালের জানুয়ারি থেকে। তখন তিনি সদ্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮৫১ সাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, বাংলা ভাষার উন্নতি, নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা; এককথায় জাতি গঠনের কাজে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এজন্যই তিনি ২০০ বছর পরেও আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়।

তিনি যেহেতু আধুনিক মনোভাবাপন্ন ও পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, সেহেতু জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথা মানতেন না। সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত করেন। বাংলা তথা ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এটি ছিল তাঁর অনন্য অবদান। তিনি জানতেন অন্ধকারময় সমাজকে টেনে তুলতে গেলে, মানুষকে কুসংস্কারের মায়াজালের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হলে সবাইকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আধুনিক শিক্ষা চিন্তা ছিল, শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করা। তিনি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তাগুলির মধ্যে ছিল নারী শিক্ষার প্রচলন, বিধবা বিবাহের প্রচলন, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূর করা, সংস্কৃত কলেজে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন এবং বাংলা গদ্যকে সরল ও আধুনিকীকরণ। তিনি ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের জন্য এক নতুন পাঠক্রমের খসড়া রচনা করেন। এই খসড়ায় তিনি ২৬ ধরণের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশগুলির মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করলে সহজেই বোঝা যাবে যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচিতে তিনি কিরুপ পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন, লীলাবতি ও পদ্যরীতি যা প্রচলিত পাঠ্য তালিকায় ছিল তা যথেষ্ট দুর্বোধ্য।[১] শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনভাগের দুই ভাগ সংস্কৃতের জন্য এবং একভাগ ইংরেজি শিক্ষার জন্য দেওয়ার কথা বলেন। অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন শ্রেণিতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজি। অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ সময় ইংরেজি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করার কথা বলেন।[২]

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে? এক্ষেত্রে তিনি তিনটি উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩] উদ্দেশ্য তিনটি হল-যথাযথ সংস্কৃত শিক্ষা, বাংলা সাহিত্যে উৎসাহ প্রদান ও প্রয়োজন অনুযায়ী ইংরেজি শিক্ষা। প্রথমেই তিনি পাঁচ বছর থেকে চার বছরে নামিয়ে আনেন মুগ্ধবোধ, ধাতুপদ ও অমর কোষের মতো পাঠ। মূল নিয়মগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে বাংলায় ব্যাকরণ ক্লাস আরম্ভ করা এবং এর সঙ্গে ছিল খুব সহজ সরল ভাষায় সংস্কৃত পাঠ যা, পড়তে শিক্ষার্থীদের কোনো রকম অসুবিধা না হয়। শিশু সাহিত্যের ক্লাস তুলে দিয়ে সেই সময়টা ব্যয় হয় সংস্কৃত ও বাংলা রচনায়। কঠিন বলে অলংকারের পাঠ্যসূচি থেকে বাদ হয় সাহিত্য দর্শন। গণিতের উপর লেখা সংস্কৃতের ভাষ্যগুলি ছিল খুবই দুর্বোধ্য। সেজন্য ইংরেজিতে লেখা সর্বোৎকৃষ্ট গণিত বইগুলিকে ভিত্তি করে বাংলায় গণিত বই রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর স্বয়ং দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। বাংলা ভাষায় গণিত বইয়ের পাশাপাশি তিনি রচনা করলেন উপক্রমনিকা, ঋজুপাঠ, ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা, বর্ণপরিচয়,

বোধোদয়, কথামালা ও সীতার বনবাস এর মত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেন। ইংরেজি শেখার জন্য যথেষ্ট সময় বের করার উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত পাঠক্রম থেকে প্রয়োজনীয় কাট ছাঁটেরও পরামর্শ দেন। যেমন স্মৃতি থেকে বাদ দেওয়া হয় আঠাশটি তত্ত্ব এবং ন্যায় থেকে চারটি পুস্তক। ন্যায় শাস্ত্রের নতুন নাম দেওয়া হয় দর্শন। যেখানে পাশ্চাত্য দর্শনের ধারণাগুলি ও শেখানো হবে। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের 'A System of Logic' বইটিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মিলের এই বইটির যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী হবে।

চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদল আনার জন্য তাঁর পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছে ইংরেজি ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির মতো আধুনিক বিষয়গুলি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের সহজে সংস্কৃত শেখানোর জন্য তিনি যেমন 'উপক্রমনিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেছেন, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শেখানোর জন্য রচনা করেছেন বাংলা গদ্য। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন যে, "মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা জনগনের মধ্যে পরিশ্রুত হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগর সৃষ্ট বাংলা গদ্য গণশিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়ালো।"[৪]

পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের পাশাপাশি তিনি মূল্যায়ন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনেন। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা মূল্যায়নের জন্য মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়নের পদ্ধতি চালু করেন। তাছাড়া প্রশাসনিক স্তরেও বেশ কিছু নিয়ম চালু করেন।[৫] যেমন-ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষালয়ে উপস্থিত হওয়া ও বাড়ি যাওয়া। প্রয়োজনে ছুটি নিলে আগে থেকে অধ্যক্ষ মহাশয়কে আবেদন করা। ড্রপ আউট বা স্কুল ছুট বন্ধ করার জন্য অ্যাডমিশন ফি এবং রি-অ্যাডমিশন ফি প্রবর্তিত করা, পাশ-ফেল চালু করা, সব রকম শাস্তি নিষিদ্ধ করা, তিথি ভিত্তিক ছুটির পরিবর্তে রবিবার ছুটির দিন ঘোষনা করা এবং গ্রীষ্মবকাশের ব্যবস্থা করা। যার প্রতিফলন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংস্কারগুলি করেছিলেন, ভারতের বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম।

১) জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি ও শিক্ষার অধিকার আইন: ২০০৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি ও শিক্ষার অধিকার আইনে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা ঊনবিংশ শতকেই বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন।
এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা অর্জনে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে বাস্তব রুপ দিয়েছিলেন।

২) শিক্ষায় বেসরকারিকরণ: একবিংশ শতকে সমগ্র বিশ্বে শিক্ষা পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রয়াস। যা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার গুনমান, নতুন উদ্ভাবন, উন্নত পরিষেবা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরো সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিদ্যাসাগর যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ১৮৭২ সালের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

৩) আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য সামমেটিভ ও ফরমেটিভ মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছাড়াও প্রকল্প এবং বিভিন্ন ধরণের দলগত কার্যকলাপের মাধ্যমে মূল্যায়ন চালু করা হয়েছে। এই নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সারাবছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করা হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের সারা

বছর ধরে সক্রিয় রাখার জন্য প্রতি মাসে আংশিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪) পাঠ্যসূচি সরলীকরণ ও যুক্তিনির্ভর: বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিকে সহজ ও বোধগম্য করার জন্য অপ্রয়োজনীয় জটিল বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে আনন্দসূচক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা যায় এমন বিষয়গুলিকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচিকে সরলীকরণ ও যুক্তিনির্ভর করেছিলেন এবং সংস্কৃতের অপ্রাসঙ্গিক, জটিল বিষয়গুলিকে পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দিয়েছিলেন।[৬]

৫) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান: মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শিশুদের কাছে মাতৃদুগ্ধ স্বরুপ। তাদের জ্ঞানের বিকাশ, মানসিক সংযোগ, যোগাযোগ, সহজ বোধ্যতা ও আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার না করে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান খুব সহজেই শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হবে।

৬) অ্যাডমিশন ফি প্রবর্তন: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষালয়মুখী অর্থাৎ বিদ্যালয়-ছুট বন্ধ করার জন্য অ্যাডমিশন ফি এবং রি-অ্যাডমিশন ফি নেওয়া হয়। যার সূচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি তৎকালীন সময়ে বুঝেছিলেন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-ছুট কমাতে গেলে ন্যূনতম অ্যাডমিশন ফি এবং রি-অ্যাডমিশন ফি নেওয়া আবশ্যক।

৭) শিক্ষালয়ে উপস্থিতির নিয়মানুবর্তিতা: বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক মহাশয়দের হাজিরা সময় মাফিক করা হয়েছে। এর অন্যথা ঘটলে ন্যূনতম শাস্তির বিধান রয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন তিনি এই নিয়ম চালু করেন, যাতে শিক্ষক মহাশয়দের হাজিরা সময় মাফিক হয় এবং পঠন পাঠনে একটুও খামতি না হয়।

৮) শাস্তি নিষিদ্ধকরণ: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের উপর সবরকম শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের উপর কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনযোগ্য মামলা হতে পারে। বিদ্যাসাগর তাঁর সময়কালেও শিক্ষার্থীদের উপর কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে প্রকৃত বা যথাযথ শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন।

৯) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক হওয়ার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। যাতে তারা সঠিক পদ্ধতি মেনে সহজ সরলভাবে শিক্ষার্থীদের পড়াতে সমর্থ হয়। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি মনে করতেন যিনি শিক্ষক হবেন তার যেন পড়ানোর সবরকম দক্ষতা থাকে। যা এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি অর্জন করবেন।

১০) পরিদর্শন ব্যবস্থা: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তথা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ও এই পরিদর্শন ছিল নিয়মিত। কারণ তিনি জানতেন পড়াশুনা ও প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন করতে হলে এই পরিদর্শন আবশ্যক।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ভাবনার সুদূর প্রসারী ফল ২০০ বছর পরেও আমরা ভোগ করছি। বর্তমান অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত পরিবেশে খাপ খাওয়াতে গেলে আমাদের আধুনিক হতে হবে। আর তার সবরকম উপাদান পাই এই মহান মানুষটির কাছ থেকে। তিনি তৎকালীন সময়ে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত শিক্ষার কথা বলেছেন।

কারণ তিনি জানতেন ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে গোঁড়া, অন্ধকারময় জীবন থেকে বের করে নিয়ে আসা অসম্ভব। তাই তিনি বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যে শিক্ষা মানুষকে বাস্তবমুখী ও যুক্তিনির্ভর করে, জীবনে সঠিক পথে ও সঠিকভাবে বাঁচতে শেখায়। যেটা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান হল নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। তিনি জানতেন সমাজের এক বৃহত্তর অংশ বিশেষ করে নারী সমাজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজে নারী জাতির উন্নতি না হলে কোন সমাজ উন্নতির শিখরে উঠতে পারে না। তাই তিনি নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৭] বর্তমানে নারী ক্ষমতায়ন তাঁর কর্ম প্রচেষ্টার ফসল।

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ও বিদ্যাসাগর অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিশুদের পড়াশোনার সুবিধার্থে তিনি বেশ কতকগুলি বই রচনা করেন। যেমন-বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলী, নীতিবোধ ইত্যাদি। যে দুটি বই রচনার জন্য তিনি শিশুদের মনে চিরস্মরণীয় থাকবেন তা হল বর্ণপরিচয় এর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ।

শিক্ষার আধুনিকায়নে বিদ্যাসাগর সব সময় যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত ও নীতিসম্মত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি পাঠক্রম থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নিয়ম সবকিছুই শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখেই করেছিলেন। কারণ শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তারা যাতে কুসংস্কার দূরীকরণে ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তাঁর শিক্ষা চিন্তায় আধুনিকায়ন আজ ও সমান ভাবে প্রবাহিত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তারই দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে লক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল সমাজের দুর্দশাগুলিকে প্রশমিত করার এক মাধ্যম। আর এ কারণেই তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোতে এক আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর এই পরিবর্তন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত পরিশীলিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ভারতের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হল ঊনবিংশ শতকের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল চিন্তা ভাবনার ফসল।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র, অমলেশ, (২০১৯), দ্বিশত জন্মবর্ষ পূর্তিতে অনন্য অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর, কলকাতা, দে পাবলিকেশন, পৃ. ৫৯

২. মাহাত, প্রনব কুমার, (২০২২), আধুনিক ভারতের শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের ভাবনা, ত্রিসঙ্গম ইন্টারন্যাশনাল রেফার্ড জার্নাল, ভলিয়ম-২, ইসু-৩, পৃ.১১৬

৩. বসু, শ্যামাপ্রসাদ, (১৪২৬), বিদ্যাসাগর এক আধুনিক মানুষ, কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, পৃ. ৩৯

৪. মাহাত, প্রনব কুমার, (২০২২), আধুনিক ভারতের শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের ভাবনা, ত্রিসঙ্গম ইন্টারন্যাশনাল রেফার্ড জার্নাল, ভলিয়ম-২, ইসু-৩, পৃ. ১১৬

৫. বসু, শ্যামাপ্রসাদ, (১৪২৬), বিদ্যাসাগর এক আধুনিক মানুষ, কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, পৃ. ৪০

৬. মাহাত, প্রনব কুমার, (২০২২), আধুনিক ভারতের শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের ভাবনা, ত্রিসঙ্গম ইন্টারন্যাশনাল রেফার্ড জার্নাল, ভলিয়ম-২, ইসু-৩, পৃ. ১১৭

৭. মিত্র, ইন্দ্র, (২০২২), করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২০৪-২০৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রধান, কালীপদ, (২০২৩), বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য প্রবন্ধ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
২. ব্যানার্জী, ডঃ দেবশ্রী ও সেনগুপ্ত, ডঃ মধুবালা, (২০২২), নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পি.জি এডুকেশন, পেপার-viii, কলকাতা, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৩. মুখোপাধ্যায়, স্বপন, (২০১১), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কলকাতা, গ্রন্থতীর্থ
৪. মন্ডল, তীর্থ, (২০২২), বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা, আসাম, প্রতিধ্বনি দি ইকো
৫. Biswas, P. (2024). Pandit Iswar Chandra Vidyasagar: His Contribution to 19^{th} Century Education and Social Reform. A Social Science Review A Multidisciplinary Journal.
৬. Kaipeng, R., Malakar, J., Datta, S., Darlong, S. (2023). Great educator and educational reformer: Iswar Chandra Vidyasagar. IJSDR।

ভাসনাটকচক্রে প্রতিফলিত যোগতত্ত্ব

সুকন্যা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
কান্দী রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃত সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নাট্যকার ভাস। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে ভাসই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক নাটকের রচয়িতা। নাট্যকার ভাসের নাটকে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দর্শনের সুস্পষ্ট আলোচনা বা তত্ত্বানুসন্ধান সরাসরি চোখে পড়ে না। তবে তাঁর কিছু নাটকীয় চরিত্র, ঘটনা পরম্পরা, অন্তর্নিহিত ভাবনায় যোগ দর্শনের কিছু মৌলিক ধারণা বা প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। ভাসনাটকচক্রে এহেন যোগদর্শন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তারই আলোকপাত ঘটানো ‘ভাসনাটকচক্রে প্রতিফলিত যোগতত্ত্ব’ শীর্ষক গবেষণাপত্রের সামন্যতম প্রয়াসমাত্র।
সূচক শব্দ: যোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ভাসের নাট্যসম্ভার, যোগতত্ত্ব।

মূল আলোচনা:
সর্বসাধনার মূল এবং সর্বোৎকৃষ্ট সাধনা যোগ। এখন আলোচ্য বিষয় যোগ কি? মানুষ যখন সর্বচিন্তা পরিত্যাগ করে মনের যে লয়াবস্থায় উপনীত হয় তাই যোগ- “সর্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।”[1] যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন- “সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনঃ।”[2] অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। সাধারণভাবে মনের বৃত্তিগুলিকে বন্ধ বা নিরোধ করার নাম যোগ –“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”।[3] চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলাই কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন যুজ্ ধাতুর প্রয়োগ কেবল সংযোগ অর্থেই হয় না সমাধি অর্থেও হয়। যুজ্ ধাতু নিষ্পন্ন এবং ইংরাজী Yoke থেকে আগত যোগ শব্দের অর্থ হল যুক্ত করা বা মিলিত হওয়া। যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সমাধি ‘যোগঃ সমাধিঃ’ আর সমাধির অবস্থা লাভই যোগের পরম লক্ষ্য। পাণিনি বলেছেন, “যুজ্ সমাধৌ”[4], পূজনীয় ব্যাসদেবও বলেছেন, “যোগঃ সমাধিঃ স চ সার্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্মঃ।”[5] অর্থাৎ যোগ হল সমাধি, তা চিত্তগত সবরকম ভূমির ধর্ম। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই সব শব্দের ব্যবহার হয় না গো শব্দ গমনশীল বস্তু মাত্রকে না বুঝিয়ে কেবল গরুকে বোঝায় সেরূপ যোগ শব্দে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই বোঝানো পতঞ্জলির অভিপ্রায়।

“পতঞ্জলি মুনি ছিলেন গোনর্দপুর বাসী। প্রাচীন যোগের পুত্র, মা ছিলেন গোণিকা দেবী। আবার কোনো পণ্ডিতের মতে গোনর্দ দেশে কোনো ঋষির সান্ধ্যকালীন উপাসনা সময়ে অঞ্জলি থেকে নির্গত। তাইতো ‘পতন্ অঞ্জলি’ বিগ্রহ বাক্যে ‘পতঞ্জলি’ শব্দ নিষ্পন্ন। ইনি অনন্ত-নারায়ণের অবতার, তাই সহস্রফণীযুক্ততায় তাঁর রচিত *‘পাণিনীয় মহাভাষ্য’।*”[6] তবে অনেকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং যোগসূত্রকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি নন বলে মনে করেন।

যোগসূত্রকার পতঞ্জলি প্রায় ২২০০ বছর পূর্বে যোগের বিভিন্ন ধারাকে একত্রিত করে যে অত্যাশ্চর্য *‘পাতঞ্জল যোগসূত্র’* রচনা করেছেন তা মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নিকট অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলেছেন।

বৃত্তি মানে পরিণাম, আবর্তন বা পরিবর্তন। চিত্ত বা মন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, আবর্তিত হচ্ছে এই বহুমুখী চিত্তকে একমুখী করার নামই যোগ।

পতঞ্জলি প্রণীত যোগসূত্র চারটি পাদে বিভক্ত যথা সমাধি, সাধন, বিভূতি এবং কৈবল্যপাদ। মোট সূত্র সংখ্যা ১৯৫ টি। ৫১ টি সূত্রে বিরচিত 'সমাধিপাদে' যোগের লক্ষণ ও স্বরূপ, চিত্তবৃত্তি ও তার প্রকারভেদ। চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। 'সাধনপাদে' ৫৫টি সূত্রের মাধ্যমে সমাধিলাভের পূর্বাবস্থায় যোগসাধনের যোগ্যতা লাভ করবার উপায় অর্থাৎ ব্যবহারিক যোগের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। 'বিভূতি পাদে' যোগের অন্তরঙ্গ তিন সাধনা ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বর্ণনা করা হয়েছে কারণ এই তিনটি যখন কোনো এক ধ্যেয়তে (লক্ষ্যে) সম্পূর্ণতা লাভ করে তখন তার নাম হয় সংযম। যোগবিভূতি লাভ করার জন্য সংযম প্রয়োজন তাই বিভূতিপাদে এই অন্তরঙ্গ সাধনার আলোচনা রয়েছে। এই পাদে যোগক্রিয়ার দ্বারা লব্ধ অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। 'কৈবল্যপাদ' নামক অন্তিমপাদে সিদ্ধিলাভের কথা বলা হয়েছে। এই পাদে মুক্তির স্বরূপও মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে।

যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য অষ্টবিধ সাধন বা উপায়ের কথা বলা হয়েছে। এদেরকে 'যোগাঙ্গ' বলা হয়-

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"[7]

প্রাক্ কালিদাসযুগের নাট্যকারগণের মধ্যে প্রথিতযশা নাট্যকার হলেন 'ভাস'। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। ১৯০৯ খ্রীঃ মহামহোপাধ্যায় টি.গণপতি শাস্ত্রী বর্তমান তিরুবন্তপুরমের নিকটবর্তী পদ্মনাভপুরম্ অঞ্চল থেকে মালায়ালাম অক্ষরে লেখা ১৩টি সংস্কৃত নাটকের তালপাতার দুটি পুঁথি আবিষ্কার করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় নবাবিষ্কৃত নাটকসমূহের কোনটিতেই নাট্যকারের নাম বা তৎসম্পর্কিত কোন ইঙ্গিত ছিল না। এতৎসত্বেও শাস্ত্রী মহাশয় নাটকগুলি তুলনামূলক আলোচনা করে কালিদাস, বাণভট্ট এবং রাজশেখর প্রমুখ সাহিত্যিকগণের ভাস সম্পর্কিত উক্তি এবং বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে স্থির করেন নবাবিষ্কৃত নাটকগুলি 'লুপ্ত ভাসনাটকচক্রের'ই নিদর্শন। কবি কুলচূড়ামণি কালিদাস বলেছেন, 'প্রথিতযশা ভাস, সৌমিল্য, কবিপুত্র প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটক অভিনয় না করে কেনই বা অর্বাচীন নাট্যকার কালিদাসের নাটকের প্রতি এত সম্মান দেখানো হচ্ছে ?'[8] গদ্য সাহিত্যের রাজাধিরাজ বাণভট্ট ও বলেছেন, 'সূত্রধারের দ্বারা আরম্ভ করে পতাকাশোভিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাযুক্ত বহু অংক ও পাত্র-পাত্রী সমন্বিত নাটক রচনা করে ভাস যশোলাভের অধিকারী হয়েছিলেন।'[9] আলংকারিক রাজশেখর ও ভাসের নাটক সম্বন্ধে এক মহা মূল্যবান উক্তি করেছিলেন, 'ভাসের নাটক (সমালোচনার) আগুনে দগ্ধ হলেও স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকটি সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।'[10] সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন সাহিত্যের বহু খ্যাতনামা নাট্যকার, কবি ও সমালোচক ভাসের নাট্যরচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উপজীব্য বিষয় বস্তুর নিরীখে নাটকগুলিকে মূলত চারভাগে ভাগ করা যায় –

১। রামায়ণাশ্রিত – *অভিষেক, প্রতিমা*

২। মহাভারতাশ্রিত - *ঊরুভঙ্গম্, কর্ণভারম্, দূতবাক্যম্, দূতঘটোৎকচ্, পঞ্চরাত্রম্, মধ্যমব্যায়োগঃ, বালচরিতম্*

৩। উদয়নকথামূলক – *স্বপ্নবাসবদত্তম্, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্*

৪। লোকবৃত্তান্তাশ্রিত – *অবিমারকম্, চারুদত্তম্*

এই নাটকচক্রের কোনও- কোনওটিতে যোগের প্রসঙ্গ দেখা যায়।

রামায়ণাশ্রিত সপ্তমাঙ্ক বিশিষ্ট নাটক *'প্রতিমা'*। এই নাটকটির পঞ্চমাঙ্কে যোগশাস্ত্রের অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়। রাবণ একস্থলে বলেছেন – "অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বেদ, মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র, মহেশ্বর ভাষিত যোগশাস্ত্র, বৃহস্পতি প্রণীত অর্থশাস্ত্র মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র এবং বরুণরচিত শ্রাদ্ধবিধি অধ্যয়ন করেছি।"[11] রাবণ তাঁর অধীত বিদ্যার মধ্যে মাহেশ্বর যোগশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

একাঙ্ক নাটক *'দূতবাক্যম্'* -এ যোগের প্রসঙ্গ দেখা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বদিন পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ শেষ চেষ্টা করছেন ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ কোনভাবে যদি মিটিয়ে ফেলা যায়, এসেছেন পাণ্ডব শিবির থেকে দূত হয়ে কৌরব শিবিরে সেখানে বাসুদেব ও দুর্যোধনের কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধির প্রসঙ্গ এসে যায়।

"বাসুদেব বলছেন – ওহে সুযোধন বসতে পারি,

দুর্যোধন - (আসন থেকে পড়ে গিয়ে স্বগত) স্পষ্টতই কেশব (আমাকে) পেয়ে বসেছে। উৎসাহ করে মনস্থির করেও আমি বসে বসেই যেন সমাধিস্থ হয়েছি। এখন আবার কেশবের প্রভাবেই আসন থেকে পড়ে যাচ্ছি।"[12] সমাধি অষ্ট যোগাঙ্গের অন্তিম অঙ্গ।

'উরুভঙ্গম্' নাটকটিতেও যোগলীলার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় –

"যেনেন্দ্রস্য স পারিজাতকতরুর্মানেন তুল্যং হৃতো
দিব্যং বর্ষসহস্রমর্ণবজলে সুপ্তশ্চ যোগলীলয়া।"[13]

'মধ্যমব্যায়োগঃ' একটি একাঙ্ক শ্রেণীর নাটক। এই নাটকের 'স্থাপনা' অংশে আমরা জানতে পারি ভীমের ব্যায়ামচর্চার কথা যা যোগচর্চার নিদর্শন। ভীম একস্থলে বলেছেন – "ভীমঃ – ভোঃ! কো নু খল্বেতস্মিন্বনান্তরে মম ব্যায়ামবিঘ্নমুৎপাদ্য মধ্যম ইতি মাং শব্দাপয়তি।"[14] অর্থাৎ 'আঃ এই বনের মধ্যে আমার ব্যায়ামচর্চার ব্যাঘাত ঘটিয়ে কে আমাকে মধ্যম বলে ডাকছে।'

ভাসনাটকচক্রের অপর একটি নাটক হল *'অবিমারকম্'*। এটি ষষ্ঠাঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। এই নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে আমরা যোগশাস্ত্রের সাথে পরিচিত হই, যা ধাত্রী ও অবিমারকের কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারা যায়। ধাত্রী বলেছেন আর্য কী চিন্তা করছেন অবিমারক জানিয়েছে তিনি যোগশাস্ত্রের চিন্তা করছেন-

"ধাত্রী- অয্য কিং চিন্তীঅদি।
অবিমারকঃ- ভবতি। শাস্ত্রং চিন্ত্যতে।
ধাত্রী – কিং ণাম এদং রমণীঅং সত্থং বিবিত্থে চিন্তীঅদি।
অবিমারকঃ – ভবতি! যোগশাস্ত্রং চিন্ত্যতে।"[15]

এভাবে নাট্যকার ভাসের কয়েকটি নাটকে যোগশাস্ত্রের অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

1. স্বামী, নিগমানন্দ। *যোগীগুরু*। উত্তর চব্বিশ পরগণা : আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, ১৪২১। পৃষ্ঠা – ১৮
2. তদেব, পৃষ্ঠা – ৪০
3. স্বামী, ভর্গানন্দ (সম্পা.)। *পাতঞ্জল যোগদর্শন*। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪। পৃষ্ঠা- ৪
4. দাস, মায়া। *ষড়্দর্শনে পুরুষার্থ বিচার*। বোলপুর ; শ্রীলক্ষ্মী প্রেস, ১৪১৩। পৃষ্ঠা-৭৬
5. স্বামী, ভর্গানন্দ (সম্পা.)। *পাতঞ্জল যোগদর্শন*। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪। পৃষ্ঠা- ভূমিকা(ঝ)
6. তদেব, পৃষ্ঠা- ভূমিকা(জ)
7. তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৪

8. প্রথিতযশসাং ভাস সৌমিল্য কবিপুত্রদীনংপ্রবন্ধান্ অতিক্রম্য কথং বর্তমানস্য কবে: কালিদাসস্য কৃতৌ বহুমান:। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (প্রস্তাবনা)।
9. সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্ / নাটকৈর্বহুরভূমিকৈ: সপতাকৈর্যশো লেভে /ভাসো দেবো কুলৈরিব।। হর্ষচরিতম্ (১/১৫)
10. ভাস নাটকচক্রেঅপি ছেকৈ: ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্। স্বপ্নবাসবদত্তস্য /দাহকোহভুন্ন পাবক:।। সুক্তিমুক্তাবলী (৪/৪৮)
11. সেন, মুরারীমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর (সম্পা.)। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৬। পৃষ্ঠা – ৩১০।
12. চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (নবম খণ্ড)। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৬। পৃষ্ঠা – ২৬৭
13. তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬২ (ঊরুভঙ্গম্, শ্লোক – ৩৫)
14. চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দশম খণ্ড)। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১১। পৃষ্ঠা – ১০৯
15. চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (দ্বাদশ খণ্ড)। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪। পৃষ্ঠা – ১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. ঘোষ, গোবিন্দচরণ। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা : মিত্রম প্রকাশক, জুলাই ২০১২।
২. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।
৩. শ্রীমৎ, হরিহরানন্দআরণ্য। পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।
৪. স্বামী, প্রেমানন্দ। *পাতঞ্জল যোগসূত্র*। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪।
৫. স্বামী, ভর্গানন্দ। পাতঞ্জল যোগদর্শন। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, মে ২০০৪, আগস্ট ২০০১।
৬. সেন, মুরারিমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (*২য় খণ্ড)। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ২০১৬।
৭. সেন, মুরারিমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (তৃতীয় খণ্ড)*। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ২০১১।
৮. সেন, মুরারিমোহন, চাকী, জ্যোতিভূষণ, ভট্টাচার্য, তারাপদ, বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর ও ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ১৯৭৮।
৯. পাল, সুজিত, কবিরাজ, উদয়শঙ্কর ও পন্ডিত, অভিজিত। যোগশিক্ষা আত্মউপলব্ধি ও বিকাশ – কলকাতা: আহেলী পাবলিশার্স।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতায় চিত্রিত দেশ : একটি সমীক্ষা

সুরেন্দ্র নাথ দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অটোনোমাস), কলকাতা
দেবাশিস ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অটোনোমাস), রাঘবপুর ক্যাম্পাস

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের পাঁচের দশকের একজন প্রতিভাবান অথচ স্বল্পালোচিত কবি হলেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫-২০১১)। উক্ত সময়কালটি বাংলার সমাজ ও সাহিত্য উভয় দিক থেকেই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই দশকটি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের প্রথম দশক। দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ সর্বত্রই বিরোধ, টানাপোড়েন, বিবর্তিত পরিস্থিতি। অনিবার্যভাবেই দশকটির এই বিবিধতর রদবদল বাংলা কবিতার উপরেও পরিবর্তনের ছায়া ফেলেছিল। এই সময়পর্বের কবিতার সাধারণ প্রবণতা ছিল আত্মমগ্ন, আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা রচনা। কিন্তু সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এই স্বীকারোক্তিকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনযাপন ভাবনাযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশ-সমাজযাপন ও সে সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির মধ্যে। 'দেশ' তাঁর কবিতার একটি প্রিয় বিষয়। দেশের প্রকৃত অবস্থাটিকে সদাজাগ্রত অনুসন্ধিৎসু চোখে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে রূঢ়-কঠিন-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপপরায়ণ সমালোচনা করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাই জীবন যেখানে অভাবে, অত্যাচারে, ক্ষুধায়, শীতের কামড়ে শীর্ণ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাকে গ্লানিময় করে তুলেছে; অবক্ষয় ও আত্মিক সংকটে ক্ষয়ে যেতে ভাসছে ভবিষ্যৎ, তখন দেশব্যাপী সেই যন্ত্রনার সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকেও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সমন্বিত করে নিয়ে কবি অক্লান্তভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন অসঙ্গতিপ্রধান স্বদেশের কথা। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে– 'দেশ' বলতে কী বোঝায়; সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতায় স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ওঠাপড়াগুলি কিভাবে চিহ্নিত হয়েছে; দেশের আগত ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, এবং ফেলে আসা জন্মভূমি ওপার বাংলার প্রতি তাঁর আবেগ-অনুভূতি-আনুগত্য-স্মৃতিকাতরতা।

সূচক শব্দ: সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা কবিতা, দেশচেতনা, স্বদেশ, দেশভাগ, ভারতের ইতিহাস, ভারতের রাজনীতি, মাতৃভাষা।

মূল আলোচনা:

বিশ শতকের পাঁচের দশকের একজন প্রতিভাবান অথচ স্বল্পালোচিত কবি হলেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫ - ২০১১)। উক্ত সময়কালটি বাংলার সমাজ ও সাহিত্য উভয় দিক থেকেই ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই দশকটি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের প্রথম দশক। দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ সর্বত্রই বিরোধ, টানাপোড়েন, বিবর্তিত পরিস্থিতি। স্বভাবতই এই 'সময়' সাহিত্যেও তার প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন আর তার অনুষঙ্গে দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু স্রোত, রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থবুদ্ধি ও ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ

লড়াই, ১৯৫০ এ সংবিধান তথা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ, খাদ্য সংকট ও তার ফলশ্রুতিতে খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯) এমনই বিবিধতর পরিবর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে আছে পাঁচের দশক। অনিবার্যভাবেই দশকটির এই বিবিধতর রদবদল বাংলা কবিতার উপরেও পরিবর্তনের ছায়া ফেলেছিল। এই সময়পর্বের কবিতার সাধারণ প্রবণতা ছিল আত্মমগ্ন, আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা রচনা। বিশেষভাবে সমাজমনস্ক কোনো বীক্ষণ বা অভিপ্রায় তাঁদের কবিতায় প্রথম দিকে তেমন স্থান পায়নি। আমাদের আলোচ্য সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতাও প্রথম থেকেই স্বীকারোক্তি প্রধান, কিন্তু একটু তফাৎ আছে, "সমরেন্দ্র এই স্বীকারোক্তিকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনযাপন ভাবনাযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে চান দেশ সমাজযাপন ও সে সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির মধ্যেও"[১] এবং সেই সূত্রেই দেশচেতনা, স্বদেশ বিষয়ক ধারণা ও সমালোচনা হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার উজ্জ্বল একটি বৈশিষ্ট্য।

মূল বিষয়ের কেন্দ্রে প্রবেশ করার পূর্বে 'দেশ' সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া জরুরি। 'দেশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'পৃথিবীর ভৌগোলিক বিভাগ বিশেষ', 'পৃথিবীর রাজনৈতিক বিভাগ বিশেষ, রাষ্ট্র', 'জন্মভূমি',[২] 'অভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল'[৩]। দেশ-এর ধারণার মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। দেশ বলতে বোঝায় এমন এক অসীম ও অনির্দিষ্ট বিশাল ত্রিমাত্রিক স্থান যেখানে সমস্ত পার্থিব (earthly) বস্তু অবস্থান করে এবং সেইসঙ্গে সমস্ত ঘটনাগুলি ওই স্থানে ঘটে থাকে। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ দেশকে প্রত্যক্ষভাবে (perceptual) এবং ধারণাগতভাবে (conceptual) দেখেন। বাস্তব জগতের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে 'দেশ'-এর সৃষ্টি হয়। এটি বাস্তব জগতের একটি মূর্ত রূপ। কিন্তু যখন এই প্রত্যক্ষগত দেশকে বিমূর্তভাবে চিন্তা করি অর্থাৎ, যখন তার আকার, আয়তন এবং অবস্থান শুধু বিবেচনা করি কিন্তু এর বস্তুগত অংশ বাদ দিই তখনই সৃষ্টি হয় ধারণাগত দেশ[৪]। মোটামুটি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে 'দেশ' (Space)-এর ধারণা ভূগোলে 'আলাদা করে সনাক্ত করার মতো গবেষণার ঐতিহ্য' হিসাবে স্বীকৃতি পেতে থাকে। ভৌগোলিকরা দেখেছেন যে 'দেশ'-এর ধারণা দুই ধরনের হতে পারে। এক. নিরপেক্ষ দেশ, দুই. আপেক্ষিক দেশ। নিরপেক্ষ দেশ হল এক আধার (container of things), যার মধ্যে পার্থিব সব বিষয় (শহর-গ্রাম, রাস্তা-বাড়ি, কারখানা-চাষের খেত, নদী ও জঙ্গল প্রভৃতি) রয়েছে। এই মত অনুযায়ী দেশ হল সুস্পষ্ট, অভিজ্ঞতাগত এক বিষয় যাকে চোখে দেখা যায়, এবং পরিমাপ করা যায়। অন্যদিকে আপেক্ষিক দেশ মূলত বাস্তব অস্তিত্বহীন একটি বিমূর্ত ধারণা যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। দেশ-এর আলোচনায় সময়, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক বিভিন্নতা ইত্যাদির ধারণাও স্থান পায়। দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তি বা পদ্ধতির গভীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। দেশের নিজস্ব রূপ পাওয়া ও তার পরিবর্তন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে। একটি দেশ যখন সরকার, আইন-শৃঙ্খলা, সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে তখন তা রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়।

আমাদের আলোচ্য সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একদা তাঁর 'একবচন বহুবচন' শীর্ষক গদ্যে লিখেছিলেন, যে দেশে তিনি জন্মেছেন, যে সমাজে বড় হয়েছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রের যে শ্মশানে তিনি একদিন পুড়তে যাবেন তার কিছু দেনা শোধ করে যেতেই হবে। আর শব্দের চেয়ে দামি কোনো টাকা যেহেতু তাঁর হাতে নেই, সেহেতু শব্দের মধ্যেই তিনি রেখে যাবেন তাঁর

একমাত্র উইল।[৫] তাঁর এই স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে ‘দেশ’ তাঁর কবিতার একটি প্রিয় বিষয়। তাই তো প্রথানুগ প্রেমের কবিতার বাইরে গিয়ে তিনি লিখতে পেরেছিলেন—

“প্রেম ভাল, তার আগে ভাল দেশপ্রেম, রমণী শেখার আগে
মানুষ তো চিরকাল জননীকেই প্রথম শিখেছে।”[৬]
(‘এসো, আরো একবার চেষ্টা করি’/ *কান্নাবারুদ*, ১৯৮৯)

স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে অনেক কবি-গীতিকারই দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছিলেন; কিন্তু সমরেন্দ্র স্বদেশের ভাবময় রোমান্টিক কল্পনায় বিভোর থাকেননি, বরং দেশের প্রকৃত অবস্থাটিকে জাগ্রত অনুসন্ধিৎসু চোখে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে রূঢ়-কঠিন-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপপরায়ণ সমালোচনা করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সমরেন্দ্রর ছেলেবেলা কেটেছিল নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। কবির জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ও প্রবল অভিঘাত, ৪২-এর ভয়াবহ ঝড়, ১৯৪৩-এর ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও বস্ত্রসংকট, ১৯৪৬-এ রক্তক্ষতময় দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের মর্মান্তিক ব্যথার ওপর দিয়ে আসা স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি বাস্তুত্যাগ -এসবই তাঁর ছেলেবেলার জীবনকে ছুঁয়ে ছিল। তাঁর কবিতায় এই বিপন্ন দেশ, তার সাধারণ-উৎপীড়িত-অপমানে লাঞ্ছিত-মারীভয়ে পীড়িত-অন্নবস্ত্রাভাবে ক্ষীণ মানুষ বারবার ভেসে উঠেছে তাদের আর্ত জীবনখানি নিয়ে। কবি কৃষ্ণা বসু মন্তব্য করেছেন— “সমরেন্দ্রর কবিতায় রোমান্টিক আচ্ছন্নতার চেয়ে বাস্তব গ্রাহ্য পরিপার্শ্ব, সমস্যাক্ষুব্ধ, ক্ষুধাতুর স্বদেশ অনেক বেশি জরুরি ও গরিমাময় পটভূমিকা রচনা করে তুলেছে...।”[৭] তাঁর এই বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ মেলে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থেই। ‘যে কোনো নিঃশ্বাসে’ (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থের ‘বোধন’ কবিতায় কবি বাংলাদেশের ঘুমন্ত শুভচৈতন্যকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন—

“ভাঙো; চুরমার করো ওই তৃষ্ণাহীন শব্দের পাহাড়;
এমন নিস্তব্ধ আমি বাংলাদেশ কখনো দেখিনি।
যত সুর গান হয় সব যেন শ্রদ্ধায় প্রাচীন
কবির নিদ্রিত বুক দগ্ধ করা প্রতিভার নীরব প্রহার।”[৮]
(‘বোধন’ / *যে কোনো নিঃশ্বাসে*, ১৯৬২)

—উদ্ধৃত অংশে ‘বাংলাদেশ’ বলতে কবি কেবল বর্তমান বাংলাদেশ নামক দেশটিকে বোঝাননি, বরং স্বাধীনতা-পূর্ব অখণ্ড বঙ্গদেশ বা বাংলা ভাষা দিয়ে ঘেরা এক ‘ভাষাদেশ’কে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায়, তখন বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে পরিচিত ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তান’ হিসেবে। সমালোচক রবিন পাল সমরেন্দ্রর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন- “যে কোনো নিঃশ্বাসে বইয়ের পাতা উলটে গেলে পাঠক বুঝতে পারবেন এই কবি কখনই নিজেকে সরাতে চাইছেন না দেশ কাল পৃথিবী থেকে...।”[৯] সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতার দেশচেতনার আর একটি দিকের সন্ধান দিয়েছেন সমালোচক, সেটি হল— পরিভ্রমণের মাধ্যমে দেশকে চেনার আগ্রহ এবং সেই ভ্রমণের সূত্রে সত্তাসন্ধান, মানুষ ও মনুষ্যত্বের স্বরূপ সন্ধান,[১০] যেমন—

“আত্মার সন্ধানে আমি ভারতের পথে-পথে তীর্থেও ঘুরেছি।
যেখানেই গেছি, মনে হয়েছে আমার
আমি কোন-না-কোন বিগত জন্মে সেখানে ছিলাম।
প্রতিটি পথের প্রাপ্তি, উদ্ভিদের চকিত পল্লব,

সব চেনা মনে হয়েছে।”[১১]

(‘আত্মবিবরণধর্মী’/ *চারিদিকে পৃথিবী*, ১৯৬৫)

—এভাবে ভ্রমণের মাধ্যমে সত্তাসন্ধানের ব্যাপকতাকে পঞ্চাশের দশকের ব্যতিক্রমী স্বর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সমালোচক রবিন পাল।[১২]

পঞ্চাশের অধিকাংশ কবি যখন বিশেষ করে তাঁদের কবিতা জীবনের প্রথম পর্বের কবিতায় দেশ-সমাজ-রাজনীতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ উল্লেখকে এড়িয়ে চলতেন তখন সেই যুগ, বাস্তব জীবন, দেশ-সমাজের দুর্দশাকে অস্বীকার করা সমরেন্দ্রর বিবেকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশভাগের নামে মানুষে মানুষে ঘটে যাওয়া সর্বগ্রাসী বিভাজন, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বাস্তুচ্যুত হবার যন্ত্রণা, শারীরিক মানসিক দুর্ভোগ এবং জীবনধারনের সংকট কবি সমরেন্দ্র নিজ ব্যক্তিগত জীবনেও অনুভব করেছিলেন; কারণ স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে তিনিও বিমূঢ়, বাস্তুহারা অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এপার বাংলায়, ওপার বাংলার চেনা মাটি-নদী-আকাশ-গাছপালা-প্রিয়জনকে ফেলে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনিশ্চিত জীবনের ঠিকানা খুঁজতে থাকা দেশত্যাগী মানুষেরা কীভাবে ভেসে বেড়িয়েছে স্রোতের শ্যাওলার মতন রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্বাস্তু শিবিরে, কীভাবে প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষ নীরবে, বিনা প্রতিবাদে প্রস্তুত হয়েছে নিজস্ব বাস্তুভিটে থেকে চিরকালীন নির্বাসনের সমাধানহীন অবস্থানকে বাধ্যত মেনে নিয়ে অন্যত্র বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে ‘প্রস্থানপর্ব’ বলে একটি দীর্ঘ কবিতায় কবি ধরে রেখেছিলেন এই সকল অগণন হতভাগ্য বাস্তুহারাদের অসংখ্য পিছুটান, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনি—

“কলকাতায় যখন এলাম পনেরোর লাবণ্য ছিল
শরীরকে ঘিরে, টান টান মেরুদন্ড, কিছু কিছু পিছুটান ছিল
সবুজ মাখানো এক দ্রব্যহীন দেহে,
স্টিমারে বিদায়ী ভোঁ পদ্মার দুলুনি! পিতামহ নিমগাছটি কি স্নেহে
লক্ষ পল্লবে উড়িয়েছিলেন এক অলক্ষ্য রুমাল!
কোনো এক নেহেরুর ভুলে এ বঙ্গের দেয়াল
চলেছে নতুন বঙ্গে ঘর গড়ে নিতে?...
এসে পৌঁছলাম শিয়ালদহে।
স্টেশনের বাইরে এসে দেখি ও মাগো! এ যে এক তাজ্জব মস্করা
সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাস, কে মানুষ কে মেশিন যাচ্ছে না ধরা।
বিপন্ন দুহাত তুলে বললাম,
মা এ কোথায় এলাম?
চারদিকে কান-ফাটানো চিৎকার, এর মধ্যেই শুনলাম
কেউ ডাকছে আর বুক চাপড়াচ্ছে, “রানী রে কোথায় গেলি রে...”
বিশ ত্রিশ হাত পরে পরেই থেমে যাচ্ছে বাস ট্রাম, পথ থেকে কেড়ে
ছোঁ-মেরে নিচ্ছে মানুষ! কোথায় পৌঁছে দেবে কে জানে!”[১৩]

(‘প্রস্থানপর্ব’/ *কান্নাবারুদ*, ১৯৮৯)

কবি সমরেন্দ্রর দেশচেতনার পরিচয় আরও স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়ে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘চারিদিকে পৃথিবী’ (১৯৬৪) তে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘ কবিতা রচনার প্রতি কবির একটি বিশেষ প্রবনতা ছিল। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন সে কথা। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবকটিই

দীর্ঘ কবিতা। 'রাত আড়াইটা থেকে নিজের সঙ্গে কথাবার্তা', 'ওঁ', 'প্রিয় কুকুরের সমাধিতে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ', 'যাত্রা ও ভ্রমণ বিষয়ক', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা', 'আত্মবিবরণধর্মী' – প্রভৃতি দীর্ঘ আয়তনের কবিতাগুলি এই কাব্যগ্রন্থের সম্পদ। কবির বিষন্ন দেশচেতনা, সমসাময়িক অন্ধতা-নিস্তব্ধতা-নিশ্চেষ্টতার প্রতি চিত্তের ক্ষুব্ধতা প্রকাশ পেয়েছে 'প্রিয় কুকুরের সমাধিতে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ' নামক কবিতাটিতে—

"মধ্যরাত্রে তীব্রতম ডেকে উঠল কোথায় কুকুর।
এখন এ বাংলাদেশে অন্য কোন শব্দ নেই আর।
কুকুর জন্তুর শ্রেষ্ঠ, তাই বুঝি এমন চৌচির শব্দ করে
আমাদের শিল্পবোধ ভয়ানক ভাবে কামড়ে দেয়।"[১৪]

('প্রিয় কুকুরের সমাধিতে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ'/ *চারিদিকে পৃথিবী*, ১৯৬৫)

আসলে স্বদেশের প্রত্যক্ষ চেতনা রূপে বঙ্গভূমিই কবির চিত্তকে অধিকার করে রেখেছিল। তাই কবিতা রচনার প্রথম পর্ব থেকেই বাঙালি সমাজের জড়ত্বতে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন সমরেন্দ্র। কবি উপলব্ধি করেছিলেন এই নীরবতা, অন্ধতা, প্রতিবাদহীনতা অচিরেই বিনষ্ট করবে বাংলা দেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনাসমূহকে—

"বাংলাদেশে মাটি বড়ো সমতল বর্ষান্ধ-নরম,
যে-কোন বীজের সাথে জন্ম নেবে লক্ষ পরগাছা।"[১৫] (ঐ)

কবির দেশচেতনায় সমৃদ্ধ পরবর্তী কবিতাগুলিতে ধরা পড়েছে পটের প্রসারণা। শুধু বাংলাদেশ নয়, উঠে এসেছে সমগ্র ভারতবর্ষের কথা। দেশবিভাগ ও রক্তাক্ত হানাহানির মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এলেও সে মূহূর্তে আশা ছিল দারিদ্র্য দূর হবে, কৃষি ও শিল্পের ব্যাপকভিত্তিক দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে, সকলের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, কাজের সংস্থান হবে, দেশের সমৃদ্ধি আসবে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে স্বাধীন, উন্নত, আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটবে। বিশ্বাস ছিল, এসব পরিবর্তন নিয়ে আসার ব্যাপারে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সরকার সক্রিয় উদ্যোগ নেবে। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার আমলে অর্থনীতির উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচও হয়েছে। কিন্তু ভারতের সুবিশাল জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে সেই অর্থ ছিল সামান্যই। তদুপরি অর্থলোলুপ মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌলাতেও যথার্থ দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। তৎকালীন সরকারের উচিত ছিল আরো বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিল্পায়নের জন্য পরিকাঠামো, পরিবেশ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলা। এই কাজে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ না হলেও অভূতপূর্ব কোন সাফল্যও তারা পায়নি। এই অর্থনৈতিক দুর্যোগ এবং অর্থসংস্থানের নৈরাশ্যজনক পটভূমিকাতে ক্লান্ত পথিক কবি উপলব্ধি করেন স্বাধীনতার যুগাধিক পরেও প্রত্যাশামত কিছুই পায়নি স্বাধীন দেশের হতভাগ্য জনতা—

"আজ যুগাধিক স্বাধীনতা ঘুরছে পথিক
স্টিল-প্ল্যান্টে, গান-ফ্যাক্টরি, কিংবা হাইওয়ে থেকে নাতিদূর
নদীর বিদগ্ধ বাঁধে শস্যসমৃদ্ধির মতো স্থায়ী প্রত্যাশায়
দেখেছি চণ্ডাল ক্ষুধা শরীরের ধৈর্য ভেঙে ফেলে
ধুলোর প্রকাশ্য পথে যৌবনের দামে করে উলঙ্গ চীৎকার,
আমি ভারতবর্ষের পথে কিছু পরিত্রাতা নিঃশ্বাস খুঁজেছি,"[১৬]

('যাত্রা ও ভ্রমণ বিষয়ক'/ *চারিদিকে পৃথিবী*, ১৯৬৫)

স্বাধীনতার পরে খাদ্য সংকটের ছবিটা ছিল আরো ভয়াবহ। পাঞ্জাব ও বাংলার একটি বিশাল অংশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে চাল, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের বিপুল অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল ভারত। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়েছিল সরকার। এরপর ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই খাদ্যশস্যের গনবণ্টন (রেশন) পূর্বের তুলনায় কমে আসে; অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে খাদ্যশস্যের দাম, বিশেষ করে চালের দাম। ফলস্বরূপ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও গণবণ্টনের ব্যবস্থাভিত্তিক সরবরাহ তথা কালোবাজারি রোধের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এমনই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ১৯৫৯ সালের ৩১ শে আগস্ট খাদ্যের দাবিতে কলকাতায় সমাবেশ ডাকা হয়। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে সেদিনের সমাবেশে গ্রাম বাংলা থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। গ্রাম বাংলার অভুক্ত মানুষগুলোর উপর পুলিশি নৃশংসতা বুঝিয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতায় কারা ক্ষমতা লাভ করেছে। ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের আরো চড়া প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ১৯৬৬ সালে। এইসময় কেবল চাল নয়, কেরোসিন তেলের অপ্রাচুর্য ও মহার্ঘতা জনমনে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। জীবন সচেতন কবি সমরেন্দ্র জানতেন মানুষের প্রাথমিক চাহিদা বেঁচে থাকবার জন্য চাই খাদ্য। কিন্তু স্বাধীনতার এক-দু দশক পরেও এই দেশের মানুষদের খিদের কোনো সুরাহা হয়নি। সমরেন্দ্রর কবিতা তাই বিচরণ করেছে ক্ষুধার আশেপাশে, যেমন—

“নগর ভেঙেছে, গ্রামও প্রায় নষ্ট হয়ে এল।
একা নদীটির পাশে বসে-থাকা কাক
খাদ্যের সন্ধানে উড়ে
আর ফিরে আসবে না।
এখন শ্মশান কোনও দূর
পৃথক অগ্নির স্থান নয়,
নিশ্বাস বহন করে এমন প্রতিটি প্রাণ, অর্থাৎ মানুষ
আছে চতুর্দিক ব্যাপক শ্মশানে! আজ
কবিতা লেখার আগে, ছবি আঁকবার আগে যেটুকু সামান্য
খাদ্য পারে শিল্পকে জাগাতে
তাও নেই, পাখিরাও অনাহারে আছে!”[১৭]

(‘শনি’/ *ধ্যানে ব্যবধানে*, ১৯৭৪)

ক্ষুধাতুর স্বদেশ-স্বভূমির মানব সন্তানদের প্রকৃত মুখচ্ছবিই সমরেন্দ্রর কবিতার অন্যতম প্রধান ও প্রবল বিষয়। দেশের অগণিত অনাহারী মানুষদের ভিড়ে মিশে রয়েছে অসংখ্য মন্দভাগ্য শিশুদেরও আর্ত চীৎকার। শিশুরা অমৃতের সন্তান। কিন্তু যে সব শিশু সম্পন্ন গৃহস্ত ঘরে জন্মানোর সৌভাগ্য অর্জন করেনি তাদের অবস্থা কি নিদারুণ তা কবির কলমে পরিস্ফুট—

“একবারে এক থাবা ভাত মুখে তুলেছে বালক। এই
খাস না খাস না ওরে একবারে অতটা খাস না
ফুরিয়ে যাবে। কে ওকে বোঝাবে, আজ না
কাল না হয়তো পরশুও না—ভাত এই
হাভাতে গোগ্রাসপরায়ণ আঁস্তাকুড়-বালকের কাছে
আর নাও ফিরে আসতে পারে।”[১৮]

(‘অক্ষরজ্ঞানের অভাবে’/ *ভিন্ন যতিচিহ্ন,* ১৯৮০)

মানবদরদী কবি সমরেন্দ্রর প্রতিটি শব্দ উঠে আসে মানবিকতার তলদেশ থেকে। তাই মন্বন্তরে তোবড়ানো বিষন্ন মুখ নিয়ে জলভরা মেঘের প্রত্যাশায় বসে থাকা কৃষক আর ঘটি-মাটি বিকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনতে থাকা কৃষাণ বউয়ের অন্তর্বেদনা প্রত্যক্ষ করে কবির কলম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ‘বর্ষার প্রকৃত ঈশা’—

“গত কয়েকদিন বাংলার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছি
মৌরলা মাছের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে
নীলাম-আসন্ন কৃষাণ বৌ-এর সঙ্গে
দেখা হল, অবাক দেখেছি
উচু শঙ্খচিল আর বাকপটু কোকিল
এমন গভীর অসময়ে কী করে যে তারা ওড়ে, তারা ডাকে?
দেখলাম ঘন বাঁশঝাড়ের ওপরে পিচ্ছিল
সন্তর্পণ চলেছে খোলস পাল্টানো খরিশ
তারো খুব খিদে পেয়েছে, ধান নেই, জল নেই, আকাশ কপিশ;
নদীকে শাসন করে যে বাঁধ
সেখানেও জল নয় তেমন অবাধ
মন্বন্তর চাষীর তোবড়ানো গালে ছায়া ফেলছে! আমার
অক্ষর এমন গভীর স্বার্থপর যে তার এই চেনা হাহাকার
নামাতে পারবে না মেঘ, তবু হে ঈশ্বর
এ জীবনে যদি একটিও সত্য শব্দ লিখে থাকি
তবে এই ছন্নছাড়া মেঘ ছেঁড়ো, দাও বর্ষার প্রকৃত ঈশা;
এক বছর ধান না হওয়া যে কোনো কবির
সারাজীবন কবিতা লেখা বন্ধ করে দেওয়ার চেয়েও সর্বনাশা।”[১৯]

(‘জল নেই’/ *কান্নাবারুদ,* ১৯৮৯)

স্বাধীনতা লাভের এতগুলো বছর পার হওয়ার পরও আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের চিত্রটি নিদারুণ দুর্ভাগ্যজনক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমসাময়িক সমীক্ষা অনুসারে যে সকল দেশে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম। দেশের এই দারিদ্র্যতার জন্য দায়ী কারণগুলি হলো— দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্ন হার, কৃষিতে কম উৎপাদনশীলতা, আয় ও সম্পদের অসম বন্টন, শিক্ষার সীমিত সুযোগ, অপর্যাপ্ত সরকারি ভর্তুকি, সরকারি পরিকল্পনাগত ত্রুটি, সর্বোপরি রাজনৈতিক দুর্নীতি। সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হল উপরতলার ক্ষমতাসীনদের দৌলতে দুর্নীতির শিকড় আজ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ এখন কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধিটুকুর তাগিদেই ব্যতিব্যস্ত। এছাড়াও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিমূলক আচরণে সামাজিক জীবনে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা আর জাতিগত বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা ক্রমাগত আঘাত করছে দেশের ঐক্যবদ্ধ চেতনাকে। স্বদেশের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে নিজের সমসাময়িক অধঃপতিত সময়পর্বেই আঁচ করতে পেরেছিলেন সমরেন্দ্র—

"কী যে হচ্ছে, আরো কী কী শনির ঘটনা হবে
এই জনগণমন অধিনায়কবিহীন দেশে তা
হিন্দু ঈশ্বরও জানে না...
...এদেশের কি সত্যই কোনো
ভবিষ্যৎ আছে? আজ যে দিকে তাকাই শুধু ভূত,"[২০]

('জনগণেশ'/ *কফি হাউসের সিঁড়ি,* ১৯৯৪)

দেশকে দিশা দেখানোর দায়িত্ব ছিল যে দেশ নেতাদের তারাও সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার ধান্দাবাজিতে মত্ত। রাজনীতির মধ্যে থেকে আজ সমস্ত স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্ন মানসিকতা অবলুপ্ত, তাই সমকালীন রাজনৈতিক নেতাদের দেশের আবর্জনা বলে মনে করেছেন সমরেন্দ্র—

"...গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
যত ময়লা জমে এই পালার্মেন্টপ্রধান মহাদেশে
যত বচনফকির মিথ্যা সংবাদপত্রে এসে
নেতা হয়ে যায়, আবর্জনা সরাবে কি তারা তো নিজেই
আবর্জনা।"[২১]

('আবর্জনা'/ *কালনেমি,* ১৯৯৯)

এছাড়া অন্নাভাবে এবং অর্থাভাবে ধুকতে থাকা দেশে মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলন তথা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত এবং ভারতীয় রাজনীতির অভিমুখ বদলে দেবার মতন একটি ঘটনা — বাবরি মসজিদ রামমন্দির আন্দোলনের উল্লেখও মেলে সমরেন্দ্র কবিতায়—

"ধর্ম! তুমি এতদিন কোনখানে ছিলে প্রাণনাথ,
কুরুক্ষেত্রে হাড়ের পাহাড়ে তুমি নেই, রামে নেই, রাবণেও নেই
আমরা তো ছিলাম অনাথ
বনবাস ছেড়ে এতদিন পরে কেন টি. ভি. হয়ে এলে,
নাকি পার্লামেন্টেই চুপচাপ লুকিয়েছিলে
আমরাই বুঝতে পারিনি, আজ রথে চড়ে তুমি অযোধ্যায় যাবে
অভিসন্ধির মন্দির গড়বে নতুন কিংখাবে।"[২২]

('এখন স্বদেশ'/ *একবচন বহুবচন,* ১৯৯৩)

এবং—

"এ-স্বাধীন ধর্ম-পরাধীন দেশে 'রাম' তাই মসজিদ ভাঙার
কোনো বিষয় হওয়া উচিত ছিল না!
এ দেশে তো শুরু থেকেই রাম রহিমের, রহিম রামের
ভুল ধরছে,"[২৩]

('মুষলপর্ব'/ *আমার সময় অল্প,* ২০০৪)

ভারতের রাজনৈতিক চিত্র গত তিরিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে আমূল বদলে গিয়েছে। একসময়ের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় কংগ্রেস' বর্তমানে বিরোধীর আসনে এবং ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মাত্র দুটি কেন্দ্রে জয়লাভ করা 'ভারতীয় জনতা পার্টি' বর্তমানে দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে একক শক্তিতে এবং ২০২৪ সালে

জোটসঙ্গীদের সহায়তায় সরকার গঠন করার ক্ষমতা অর্জন করে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলটি। ভারতের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পেছনে অবশ্যই একাধিক কারণ রয়েছে, কিন্তু বাবরি মসজিদ – রাম জন্মভূমি ইস্যুটাই সম্ভবত এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ। এ দেশে পর্যবেক্ষকরা সবাই প্রায় একবাক্যে বলে থাকেন বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনা (১৯৯২, ৬ ডিসেম্বর) যেমন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের ভিতেই সমূলে আঘাত করেছে, তেমনি রামমন্দির আন্দোলনের সূত্রেই দেশের শাসনক্ষমতায় হিন্দুত্ববাদী শক্তির আসার পথ প্রশস্ত হয়েছে। রামমন্দির পুনরুদ্ধার নেতৃত্ব দেওয়া বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডভানির ছায়াসঙ্গী নরেন্দ্র মোদীই বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। 'প্রধানমন্ত্রী' নরেন্দ্র মোদীর শাসনকাল সমরেন্দ্র দেখে যেতে পারেননি কিন্তু মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০২ সালে গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গা কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিভেদকামী রাজনৈতিক মতাদর্শকে সমরেন্দ্র কখনই হৃদয়ে স্থান দিতে পারেননি। তিনি অনুভব করেছিলেন "সামান্য 'ধ' কেটে 'ম' বসালেই ধর্ম হতে পারত/ মর্ম,"[২৪] 'মর্ম' যার একটি অর্থ 'অন্তরের কোমলতম ও নিগূঢ়তম প্রদেশ'। সমরেন্দ্রর সেই নিভৃততম প্রদেশে ধর্মীয় গোড়ামীর কোনো জায়গা নেই। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানবতা, মনুষ্যত্বের তাৎপর্য অনুসন্ধান ছিল তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, 'মর্ম' শব্দটির আর একটি অর্থও হল 'তাৎপর্য'—

"ধর্ম এই গ্রামে কোনোদিন খেলাধুলো করেনি,
এ-গ্রামে পাথর হয়ে কোনোদিন পূজা পাবেন না শনি,
মসজিদের মুয়াজ্জিনআজান সান্ধ্যপাখিদের কখনো বলবে না
ও পাখিরে তুই কি হিন্দুর ডানা,
আকাশের সঠিক নীলিমা একবারও না ছুঁয়ে
খোঁজার চেষ্টাই কি সূর্যসাধনা!
না—এ গ্রামের নাম আমি এখনই বলব না।...

মানুষকে মানব রাখা ছাড়া বাতাসের আর কোনো ধর্ম নেই
সমুদ্রেরও রামায়ণ কোরান নেই!
এ-গ্রামের ধানপথে কোনোদিন প্রবেশ পাবে না মোদী,
ঘৃণ্য সিজ্ঘল, আর
গ্রামমানুষ পরস্পরকে উপহার দেবে সাহস, ক্ষুধার
মর্ম ছাড়া যখন আর কোনো ধর্ম থাকে না
জাগে না কোনো পাথরপ্রতারণা!
তখন কে হে তুমি তামসিক, পেটে ছুরি ঠেকিয়ে বলছ
আমি ধর্ম বিশ্বাস করি কি না?"[২৫]

('মর্মগ্রাস'/ *আমার সময় অল্প*, ২০০৪)

গণতন্ত্র শব্দটির অর্থ জনগণের ক্ষমতায়ন। কিন্তু জনগণের সচেতনতা এবং সংঘবদ্ধতার অভাবে রাজনীতির লাগামহীন দুর্নীতি ভারতীয় গণতন্ত্রকে কলুষিত করছে ক্রমাগত। জনগণকে বঞ্চিত করে নির্বাচিত সরকার হাত শক্ত করছে পুঁজিপতিদের। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত রাজনৈতিক চেতনায় সাম্যভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর কাব্যানুভবের অন্যতম উৎস ও অবলম্বন ছিল মানুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন 'জনতাই স্বদেশের ডাকনাম'। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর

কবিতায় উঠে আসে মানুষের সংগ্রাম ও মুক্তিচেতনার কথা। কমিউনিস্ট ইস্তেহারের রচয়িতা কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলেছিলেন প্রতিটি যুগে মূল দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধীতার ফলেই সেই প্রচলিত সমাজকাঠামো ভেঙে নতুন উন্নততর সমাজ সৃষ্টি হয়। বর্তমান সময়ে এই দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি হল শ্রমজীবী শ্রেণী ও পুঁজিপতিদের দল। এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে শ্রমিক শ্রেণীর জয় অবশ্যম্ভাবী এবং তাদের জয়লাভের মধ্যে দিয়েই একটি শ্রেণীহীন শোষনহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। সদাজাগ্রত, বিবেকবান কবি জানেন জনতার মিলিত শক্তি ছাড়া দেশের অন্তঃসারশূণ্য, অন্ধকার দশা কাটানো সম্ভব নয়—

“...আমাদের রাগ ছিল, আছে,
কিন্তু তা তো দেশলাইয়ের আলাদা আলাদা কাঠি–কাছে
গেলেই নিভে যায়, সিগারেট ছাড়া তাতে
জ্বলে না কিছুই!”[২৬]

(‘ভাবনাচিন্তা’/*কান্নাবারুদ*, ১৯৮৯)

সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধতা গড়ে উঠলে, তাদের চৈতন্যের জাগরণ ঘটলে তবেই সামাজিক শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে, মানুষ নতুন প্রত্যয়ে নতুন জীবন গড়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের স্বাধীনতা। কিন্তু বিপ্লবের এই পথ সহজ নয়, কণ্টকিত। কবির বিশ্বাস তাই প্রায়শ হয়েছে টলমল। একদিকে রাজনৈতিক অশান্ত পরিস্থিতির অনুষঙ্গ অন্যদিকে দেশের দশের নির্লিপ্ত জীবনযাত্রা, জনতার মূর্খামি কবিকে ম্রিয়মান করে তুলেছে। দেশ সম্পর্কিত হতাশায় এবং সময়ের বহমানতায় কিছুটা ভিন্ন পথগামী হয়েছে তাঁর কবিতা। কবি যেন মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন দেশচেতনামূলক কবিতা থেকে—

“...হে জনগণনির্বাচিত বছর বছর ধাপ্পা, মানচিত্র-স্বদেশ
ভাষার আশায় ভাসিয়ে কখনো আর রাখবো না তোমাকে!...
বুঝি হে দেশ তোমার জন্য, কবিতাকে এতদিন কীভাবে করেছি নষ্ট,...”[২৭]

(‘প্রত্যাবর্তন’/ *কান্নাবারুদ,* ১৯৮৯)

কিন্তু তাঁর এই অভিমানী প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত অটল থাকেনি। আসলে সমরেন্দ্রর সমগ্র সত্তা জুড়ে রয়েছে প্রিয় স্বদেশ। তাঁর সমস্ত আবেগের উৎস এই দেশ। দেশই তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসা, সকল মান-অভিমানের ঊর্ধ্বে যে ভালোবাসা সদা অমলিন—

আমার প্রথম নাম স্বাধীন স্বদেশ
আমার দ্বিতীয় নাম নতুন উন্মেষ
আমার রমণী হলো জননী এ দেশ
দেশ আমার শুরু, দেশই আমার অবশেষ।”[২৮]

(‘এই গ্রন্থের ভূমিকা’/ *কালনেমি*, ১৯৯৯)

দেশের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই তিনি দেশের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই জীবন যেখানে অভাবে, অত্যাচারে, ক্ষুধায়, শীতের কামড়ে শীর্ণ, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাকে গ্লানিময় করে তুলেছে; অবক্ষয় ও আত্মিক সংকটে ক্ষয়ে যেতে ভাসছে ভবিষ্যৎ, তখন দেশব্যাপী সেই যন্ত্রণার সঙ্গে কবি নিজের অস্তিত্বকেও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সমন্বিত করে নেন এবং অক্লান্তভাবে বর্ণনা করে যান অসঙ্গতিপ্রধান দেশটির কথা। নতুন শতাব্দীর শুরুতে কবি আবারো বুক বাঁধেন দেশের উত্তরণের আশায়—

"আমি চেয়ে থাকি কাগজের দিকে
লক্ষ করি কীভাবে আমার পরিশেষ
ভরে উঠছে অকল্প কালিতে, আর তারই নিভৃত বিবেকে
শিশু হয়ে বারবার কাছে আসছে দেশ!
আমি দু'হাত বাড়াই, বলি এসো শুদ্ধ হই, সত্য হই,
তুমি আমার ভরতরাজার নয়া মহাদেশ।"[২৯]

('একা, এই বর্ষাবিষণ্ন দেশে'/*একা, এই বর্ষাবিষণ্ন দেশে*, ২০০১)

কবিতার সাহায্যেই তিনি সচেতন জনগণকে চিনিয়ে দিতে চান কাকে বলে দেশ, আর প্রত্যাশা করেন হয়তো এই চেনা-জানার সূত্র ধরেই একদিন জনগণ তাদের ঘাড় গোঁজ করা জীবননির্বাহ প্রণালীর চির চেনা ছক ভেঙে সংঘবদ্ধ সুরে পেয়ে যাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-অধিকারবোধের মন্ত্রগুলি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে— দেশভাগ সংক্রান্ত বেদনাকে কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আজন্ম লালন করে বেড়িয়েছেন। দেশভাগের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও তাঁর কলম ভুলতে পারেনি মানচিত্রের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক্ষতচিহ্নকে —

"শৈশবে ভূগোলক্লাসে মানচিত্র যেরূপ আঁকিতে শিখিয়াছিলাম
আর এখন আমার পুত্র যে প্রকার আঁকে, তাহাতে কত না তফাৎ! এখন তো
শুনিতেছি কেউ কেউ বলিতেছে দেশচিত্র আরো কিছু ছোট হইলে
আঁকার সুবিধা হইত।
এইভাবে কত নদী যে পর হইয়া গেল, পাহাড় অসন্তুষ্ট হইল,
কত ফুল যে রাগ করিয়া আর
মুখই দেখায় না!..."[৩০]

('হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'/ *একবচন বহুবচন*, ১৯৯৩)

একটি দেশের মানচিত্র বলতে বোঝায় সেই দেশের রাজনৈতিক সীমানা। অর্থাৎ দেশের মানচিত্র আসলে রাজনৈতিক মানচিত্র। কিন্তু নির্জীব ভূমির উপরে খুব সহজে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া গেলেও মানবহৃদয় সহজে কাঁটাতারের সীমানাকে স্বীকার করতে চায় না। তাই কিশোর বয়সে ওপার বাংলা ছেড়ে কলকাতা চলে এলেও চিরকাল নিজের 'ঢাকাইয়া পোলা' পরিচয়কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সমরেন্দ্র। কবির দেশভাগ জনিত বিষাদ এবং ফেলে আসা পূর্ব বাংলার প্রতি গভীর অন্তরটান জনিত ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রকাশ ধরা পড়েছে 'ভাষাদেশ' কবিতায়—

"মানাচ্ছে না
এই শহরে আজও আমায় মানাচ্ছে না।
ছিলাম আমি নদীর মানুষ
পল্টন মাঠ সদরঘাটের বদর মানুষ
এখন আমি খুব অচেনা
এদেশ ওদেশ কোন দেশেই
আমার চোখের পরিপূরক আকাশ নেই।"[৩১]

('ভাষাদেশ'/ *ভাষাদেশ*, ১৯৯৬)

জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ এবং কর্মভূমি কলকাতা —নিজের ভেতরের এই দুটি জীবনের অস্তিত্ব সমরেন্দ্রকে আজীবন ক্ষতবিক্ষত করেছিল। এই দ্বিবিধ সত্তার দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে ধরা পড়েছে তাঁর আরেক কাব্যগ্রন্থ 'দুই নগরী'তে (২০০১)। 'দুই নগরী' বইটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের নাম কবি দিয়েছেন- 'জননী জন্মভূমি ঢাকা', এবং দ্বিতীয় পর্বের নাম- 'শব্দজীবনের ধাত্রী কলকাতা'। প্রথম পর্বের 'এ বাড়িটা কার' কবিতায় কবি চল্লিশ বছর পরে ঢাকা শহরে নিজের জন্মভিটার সামনে পৌঁছে অনুভব করেছেন—

"জন্মভিটের অদূরে একাকী মৃত্তিকালগ্ন চীৎ শুয়ে আছি।
কেউ কাছে নেই, আসলে নিজের বলতে
কেউ কি রয়েছে আর! ওগো ঢাকার জন্মমাটি পুরাণাপল্টন
তুমি চার-দশকে কতো বদলে গেছ! এখন তোমার
সেই পুরানো আমাকে চেনা আর কি সম্ভব!
যে স্বপ্ন একদা রাজনীতি-অনীতির অন্ধকারে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে
চলে এসেছিলাম পদ্মা ছেড়ে এ-রোগা গঙ্গায়
সেই অতীতের প্রত্ন থেকে, স্বপ্ন থেকে, স্মৃতিগুলি এইবার
শেষ ঝরে যাবে!
খোলা চোখে এত কিছু দেখি
স্বপ্ন দেখতে হলে চোখ বুঁজতেই হয়।
এই চোখ-বোঁজা রাত্রির একলা আমাকে এবার কেউ কেউ
জন্মের মাটি আঁকড়ে ধরা
জীবনতল্লাসক্লান্ত কোন এক সদ্য লাশ বলে
ভাবতেও পারে।"[৩২]

('এ বাড়িটা কার'/ *দুই নগরী*, ২০০১)

এই কবিতা দেশচেতনার ক্ষেত্রে স্মৃতিকাতরতার পরিচয়বাহী। স্মৃতির এই পিছুটান কাটানো সহজ নয়। বিশেষ করে সেই স্মৃতি যখন নিজের বাস্তুভিটেকে কেন্দ্র করে উৎসারিত। 'দেশ' এর অভিধান স্বীকৃত একটি অর্থ হল 'জন্মভূমি'। কিন্তু কবির সেই জন্যভূমি বর্তমানে অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত। নিজ জন্মভূমিতেই কবি প্রবাসী। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যখন কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী তাদের স্বভূমি ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের ভিতরে স্বাভাবিকভাবেই একধরনের অদম্য মানসিক কষ্ট তেরি হয়, তখন তাদের সেই অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন বা ডায়াস্পোরা বলে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর আলোচ্য কবিতাটি যেন পৃথিবীর সেই সকল ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর অবরুদ্ধ মানসিক যন্ত্রণা ও ফেলে আসা জন্মভূমির প্রতি দুর্দমনীয় আবেগের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর এই স্বদেশপ্রীতি আসলে জন্ম শিকড়ের প্রতি তাঁর দ্বিধাহীন আনুগত্য যার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর পরম আন্তরিকতা – অনায়াস এই সত্যভাষণটি করেছেন প্রাবন্ধিক মঞ্জুভাষ মিত্র।[৩৩] কবি বা শিল্পী যে কোনো কল্পলোকের মিনারবাসী ব্যক্তিত্ব নন, চলমান জীবনেরই তিনি রূপকার – তার প্রমাণ মেলে কবির এই স্বদেশচেতনামূলক কবিতাগুলি থেকে। কবিতাগুলিতে বক্তব্য প্রাধান্যর পাশাপাশি শৈল্পিক কারুকার্যের পরিচয়ও মেলে যথেষ্ট। প্রাবন্ধিক সুজিত সরকারের মতে– স্বদেশচেতনা সমরেন্দ্রর সমকালীন অন্য দুইজন কবি শঙ্খ ঘোষ এবং অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতারও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর

স্বদেশচেতনা তাঁর শব্দমনস্কতার সঙ্গে মিশে তাঁর কবিতাকে অনন্যভাবে শ্রীমণ্ডিত করেছে।[৩৪] সুতরাং শেষ বিচারে বলা যায় কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবি মানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল দেশপ্রেমের বীজ যা তাঁর কবিতাকে পঞ্চাশের দশকের প্রবল প্রতিপত্তিশালী এক ঝাঁক কবির কাব্যকীর্তির মাঝেও প্রাতিস্বিক মহিমায় অভিষিক্ত করেছিল।

পাদটীকা:

১. রবিন পাল,'সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা', *বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা ২,* এবং মুশায়েরা, ২০০২, কলকাতা, পৃ: ২৮৪।
২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক), *সংসদ বাংলা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ২০০০, কলকাতা, পৃ: ৪২১।
৩. গোলাম মুরশিদ (সম্পাদক),*বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান ২,* বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১৩, ঢাকা, পৃ: ১৩৮৫।
৪. মণিশ্রী মন্ডল, *সামাজিক ভূগোল,* নবোদয় পাবলিকেশনস্, ২০১৬, কলকাতা, পৃ: ৪২।
৫. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, 'একবচন বহুবচন', *দেশ,* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৭, কলকাতা, পৃ: ১০৯।
৬. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কান্নাবারুদ,* প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ: ৩৪।
৭. সুবোধ সরকার-শ্রীজাত- মল্লিকা সেনগুপ্ত (সম্পাদক), *মুখোমুখি দুই কবি: কৃষ্ণা বসু সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত,* প্যাপিরাস, ২০০৫, কলকাতা, পৃ: ৪৭।
৮. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *যে কোনো নিঃশ্বাসে,* বসু চৌধুরী, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ: ১৫।
৯. রবিন পাল, 'সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা', *বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা ২,* এবং মুশায়েরা, ২০০২, কলকাতা, পৃ: ২৭৫।
১০. ঐ, পৃ: ২৭৭।
১১. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *চারিদিকে পৃথিবী,* কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ১৯৬৫, কলকাতা, পৃ: ৫২।
১২. রবিন পাল, 'সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা', *বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা ২,* এবং মুশায়েরা, ২০০২, কলকাতা, পৃ: ২৭৭।
১৩. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কান্নাবারুদ,* প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ: ১২-১৩।
১৪. ঐ, পৃ: ৩০-৩১।
১৫. ঐ, পৃ: ৩১।
১৬. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *চারিদিকে পৃথিবী,* কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ১৯৬৫, কলকাতা, পৃ: ১৫।
১৭. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *ধ্যানে ব্যবধানে,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃ: ৬১।
১৮. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *ভিন্ন যতিচিহ্ন,* করুণা প্রকাশনী, ১৯৮০, কলকাতা, পৃ: ২৬।
১৯. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কান্নাবারুদ,* প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ:৪৪।
২০. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কফি হাউসের সিঁড়ি,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ ২০০৭, কলকাতা, পৃ: ১৯।
২১. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কালনেমি,* দীপ প্রকাশন, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ: ৫৬।
২২. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *একবচন বহুবচন,* এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ: ১৮-১৯।
২৩. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *আমার সময় অল্প,* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, প্রথম পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা, পৃ: ৯৬।
২৪. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *আমার সময় অল্প,* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, প্রথম পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ ২০১১, কলকাতা, পৃ: ২৮।
২৫. ঐ, পৃ: ২২।

২৬. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কান্নাবারুদ,* প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ: ৪৬।

২৭. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কান্নাবারুদ,* প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ: ৪৭-৪৮।

২৮. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *কালনেমি,* দীপ প্রকাশন, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ: ১০, ১১, ১২।

২৯. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *একা, এই বর্ষাবিষণ্ন দেশে,* লোকসখা প্রকাশন, ২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৬, কলকাতা, পৃ: ১৫।

৩০. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *একবচন বহুবচন,* এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ: ৭১।

৩১. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *ভাষাদেশ,* বিশাকা, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ: ৯।

৩২. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, *দুই নগরী,* আগামী প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা, পৃ: ৪৬।

৩৩. মঞ্জুভাষ মিত্র, 'কৃত্তিবাস গোষ্ঠী এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতা', *বিভাব,* Vol : 31 No : 3-4, ২০১১, কলকাতা, পৃ : ৭৫।

৩৪. সুজিত সরকার, 'কবিজীবন, শব্দজীবন', *বিভাব,* Vol : 31 No : 3-4, ২০১১, কলকাতা, পৃ: ৮৫।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও 'মানুষের ধর্ম'

পিউ মুখার্জী
গ্রন্থাগারিক, শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ: বর্তমান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মভাবনা নিয়ে একটি আলোচনা করেছেন। সময়ের ব্যবধানে মানসিকতার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর রচনায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনেও এহেন পরিবর্তন আসে। জীবন যতই এগিয়ে যায়, তার চিন্তা ভাবনা আচরণে মননে বিকাশ ও প্রগতি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের সেই পরিবর্তন তাঁর লেখনীতে দৃশ্যমান। তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের আগে যে ধর্মভাবনাকে ঈষৎ সংকুচিত দেখা যায়, য়ুরোপ ভ্রমণের পরবর্তী সময়ে সেখানে এক বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এতদিনের চিন্তাভাবনা গন্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বজনীনতায় ব্যাপ্ত হয়েছে। সবকিছুর ঊর্ধে সেই মহামানবের জয়গান গীত হয়েছে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সীমানা অতিক্রম করে মানবধর্মে, মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছেন। মানুষের ধর্ম বোঝাতে গিয়ে তিনি বিশ্বমানবের দরবারে সাধারণ মানুষের সহজ সরল আনাগোনা ও মিলতে পারার স্বাভাবিক সামর্থ্যকে নির্দেশ করেছেন। তিনি উপনিষদ, গীতা এমনকি নিরক্ষর বাউলের দর্শিত পথে সেই একমেবদ্বিতিয়ম্ ঈশ্বরকে মনের মানুষ করে নেবার পথনির্দেশ দিয়েছেন।
সূচক শব্দ: ধর্ম, সম্প্রদায়, উপনিষদ, গীতা, বাউল, মনের মানুষ, মানুষের ধর্ম, বিশ্বজনীন, বিশ্বমানবতা, ব্রহ্মোৎসব, মানবাত্মা।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। চিন্তার মৌলিক বিশিষ্টতায় এবং রচনারীতি ও ভাষাভঙ্গির অতি উচ্চ শিল্পগুণে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য দুর্লভ উৎকর্ষে ভূষিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ। শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি নানা জাতের চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ যেমন তিনি লিখেছেন তেমনই ডায়েরি, পত্রাবলী, আত্মজীবনী ও আরও নানা ধরনের সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধ মহাকবির জ্যোতির্ময় কিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত। তাঁর প্রবন্ধের রচনারীতি সম্পর্কে অতুল চন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন- "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। সাহিত্যের সমালোচনায় কি রাষ্ট্র ও সামাজিক সমস্যার আলোচনায়, বাংলা কবিতার ছন্দ বিচারে কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্দতত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটনে—সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্বত্র মহাকবির বাগবৈভব"[১]। রবীন্দ্র-গদ্যে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ স্থান পেলেও তা বস্তু বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না থেকে বস্তুকে অবলম্বন করে ভাব বিশ্লেষণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। মহাকবির বাগবৈদগ্ধ্য ও রূপক অলংকার প্রয়োগ গদ্যকে বহিরঙ্গে যেমন কমনীয়তা ও অভিনব সৌকর্ষ দান করেছে তেমনি বিষয়বস্তুকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে কবির অন্তর-দৃষ্টি বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকে একান্ত সহজ ভাবে তুলে ধরেছে। মানবতার অখন্ড অস্তিত্বের অতি গভীর আস্থা ও বিশ্বসমাজের কল্যাণকামিতা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধকে অনন্য-সাধারণ আভিজাত্য দান করেছে। সর্বত্র মননশীলতার গভীরতা, কল্পনার দীপ্তি, ভাবুকতার নিবিড়

স্পর্শ, সাবলীল সালংকারা ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রতিবেশ, প্রকাশভঙ্গির অপূর্ব চারুত্ব, বাণীবিন্যাসের আশ্চর্য কুশলতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ বা ধর্মদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হল মানুষের ধর্ম - 'দ্য রিলিজিয়ন অফ ম্যান'[২]। তিনি জাতি - ধর্ম - বর্ণ সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে চিরকালীন মানব ধর্মের আদর্শের প্রবক্তা। তিনি বিশ্ব মানব, বিশ্ব মানবতার ধর্মে ও আদর্শে বিশ্বাসী। উপনিষদের মানবধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মের শান্তি ও করুণা, হিন্দু পুরাণের লীলাবাদ, বৈষ্ণব ও বাউল এর প্রেমতত্ত্ব, ভারতীয় মধ্যযুগের সাধু-সন্তদের চিন্তাদর্শ, খ্রিস্ট ধর্মের প্রেমতত্ত্ব, তাঁর কবিমানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সকল মানুষকে নিয়েই মানুষের ধর্ম। যারা মন্দিরে দেব-বিগ্রহ নিয়ে পূজার্চনা করে, যারা ঈশ্বরকে কেবল বড় জাতের মধ্যে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে রাখে, যে দেবমন্দিরে তথাকথিত অজ্ঞ-দরিদ্র, মুচি-মেথর প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই, রবীন্দ্রনাথ সেই সংকীর্ণ ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম হল- "ঈশ্বরের আপনাকে দান—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদেরকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তর বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মলীত করিলেই হইল"। তিনি বলেছেন "...সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়া কর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনই গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক একজন অধ্যবসায়ী এক এক নতুন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই"[৩]। এর কারণ মানুষ সর্বান্তকরণে ধর্মের অনুগত না হয়ে ধর্মকে নিজের অনুরাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। ধর্মকে সংসারের অন্যান্য অবশ্য কর্তব্যের মতো নিজেদের বিশেষ ব্যবহারযোগ্য করে নেবার জন্য তাকে আপন আপন পরিমাপে খর্ব করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ বলেছেন- 'সত্যম জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। "তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসারের কিছুই সত্য হতো না। তিনিই জ্ঞান..., তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান"। এই বিচিত্র জগত সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অন্যান্য সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করে দেখেছেন। উপনিষদ কোন বিশেষ লোক কল্পনা করেননি, কোন বিশেষ মন্দির রচনা করেননি, কোন বিশেষ স্থানে তাঁর বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেননি- একমাত্র তাঁকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করে সমস্ত জটিলতা, সমস্ত কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করে দিয়েছেন। উপনিষদের ব্রহ্ম অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র। "তিনি অন্তরতম, তিনি সুদুরতম। তাঁহার সত্যে আমার সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত। এই ব্রহ্ম কে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় হল- "হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই নিঃশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার স্পন্দন কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়..."।

ধর্ম যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তা সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অভ্যস্ত অসারতায় বা অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হয়। ধর্মকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করে প্রচার করতে চেষ্টা করলে ধর্মকে জীবন থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। "ধর্ম বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া ওঠে"। সপ্তাহের একদিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়- বাকি সমস্ত দেশ কালের সঙ্গে তার

একটি পার্থক্য, একটি বিরোধ ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দেহের সঙ্গে আত্মার, সংসারের সঙ্গে ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্বেষভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহ বিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়[৪]। অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু তাহাকেই ধর্ম বলা যায়।

ধর্ম কি? ধর্মের আদর্শ কি? ধর্ম প্রচারের লক্ষ্য কি? ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ 'মানুষের ধর্ম'-এ উপনীত হয়েছেন। 'ততঃ কিম' প্রবন্ধে বলেছেন মানুষ শুধু জীব নয়, মানুষ সামাজিক জীব[৫]। জীবন ধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হয়। মানুষকে আত্মা রূপে দেখলে সমাজে তার অন্ত পাওয়া যায় না। সামাজিক জীবের পক্ষে শুধুমাত্র জীবলীলা- সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পেলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি। কিন্তু সামাজিক জীবকে যে সেই আদিম প্রবৃত্তি সংযত করে চলতে হয়। সমাজের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় ক্ষুধা তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাকেই ধর্ম বলা হয়। এমনকি সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলে গণ্য করা হয়। জীবধর্মকে সংযত করে সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষের সত্যকে যারা এখানেই সীমাবদ্ধ না করে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করে, তারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করার সাধনাকেই শিক্ষা বলে জানে। "মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য"। 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাঘের ব্রাহ্মোৎসবকে সমস্ত মানবসমাজের উৎসব বলে মনে করেছেন[৬]। এই উৎসবকে 'ব্রহ্মোৎসব' বলেছেন 'ব্রাহ্মোৎসব' নয়, কারণ মানুষ অমৃতের পুত্র-'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'। সে মূর্খই হোক আর পন্ডিত, রাজচক্রবর্তী হোক বা দিন-দরিদ্র- সে অমৃতের পুত্র। তপোবন কেন্দ্রিক ভারতবর্ষে একদিন অনন্তের বার্তা এসে পৌঁছেছিল। সেদিন উপনিষদ অমৃতপুত্রদের সভায় অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, বলেছিলেন- "যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না"। ভারতবর্ষ সেদিন নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, তার অমৃতযজ্ঞে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিল- তার ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। ভারতবর্ষ পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ক্রমশ নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুচরের মধ্যে খন্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল। রুদ্ধ জল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, তেমনি বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্য নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত তিরস্কৃত করেছে- কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছো, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছো। সে যে অন্ধকার, নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়..."।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় ('রিলিজিয়ন অফ ম্যান') মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত ও বাংলার বাউলদের মানবসাধনা তথা আত্মান্বেষণ কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্বকে আপন জীবনের প্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সুপ্রীম পার্সন' বা মহামানবকে তিনি এই মানবসংসারেই পেতে চেয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' -গ্রন্থে এই বক্তব্যেরই প্রতিষ্ঠা। সর্বজনীন মানবতাবোধের পরমতীর্থে উপনীত হওয়ায় আজকের মানুষের সাধনা-

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের এ-ই পরম সত্যোপলব্ধি। এই সত্যকে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'মানুষের ধর্ম' ভাষণমালার ভূমিকায়- "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব... সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়"[৭]। 'মানুষের ধর্ম' বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন- "যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম" এবং এ তো সাধারন মানুষের ধর্ম নয়, এর জন্য সাধনা করতে হয়। মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে। তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব। মানুষের আত্মোপলব্ধি বাইরে থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বিশ্বমানসলোকে। সফলতা লাভের জন্য একসময় মানুষ মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। অবশেষে সার্থকতা লাভের জন্য তার উপলব্ধি- তপস্যা অনুষ্ঠানে নয়, সত্যেই তপস্যা। "গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়, খ্রিস্টের বাণীতে শুনলে- বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্বোধন হল... যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে"। মানুষ আপন অন্তরের গভীরতর প্রতিষ্ঠায় অনুভব করেছে যে সে শুধুই ব্যক্তিগত মানুষ নয় সে বিশ্বগত মানুষের। সব মানুষকে নিয়ে সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে মানুষের বাস দেশে অর্থাৎ এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খন্ড খন্ড দেশ কাল পাত্র ছাড়িয়ে, যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। ভগবান নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেই মহিমায় তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত। মানুষেরও আনন্দ মহিমায়-'ভূমৈব সুখম্', পরম দুঃখের মধ্য দিয়ে, বিরোধের ভিতর দিয়ে সেই মহিমাকে লাভ করতে হয়। ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে পেতে হয়। ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া, তা স্ববিরোধী। মানুষের স্বভাবে শ্রেয় ও প্রেয় দুই-ই আছে। প্রবৃত্তির প্রেরণায় সে যা ইচ্ছা করে সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান। আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া।

মানুষের স্বভাব আত্মাকে প্রকাশ। মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্র সেদিকে তার অহংকার, যেদিকে তার আত্মা, সেদিকে তার সার্থকতা ভূমায়। সৌন্দর্য, কল্যাণ, বীর্য, ত্যাগ,

প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানব কে। সে আপন আত্মার গভীর অর্থ উপলব্ধি করেছে যে মানুষ মহৎ। মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে সে মহৎ। তবে প্রমাণিত হবে যে, সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে। কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব। তিনি মৃত্যুর অতীত। "মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মানুষ মনের মানুষকে পাই- অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে"। নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে 'মনের মানুষ'। বলে 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ'। উপনিষদও একই কথা বলেছেন- 'য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিঘৎ সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'- আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোক ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে। 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ'- এই যে তাকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এ বাইরে থেকে জানা বা পাওয়া নয়, এ আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভেতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, সেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কার পার হয়ে যে জ্ঞানকে পায়, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের। মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড় আমি সেই আমি'র সঙ্গে সকলের ঐক্য। তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমি'র কর্মই বন্ধন, সকল আমি'র কর্ম মুক্তি। বাউল বলেছে- "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ... একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সব ঠাঁই"। সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ। আপন মনের মধ্যে তাকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাকে পাওয়া যায়। মানবসত্যের সঙ্গে সংসারের সত্যের বিরোধ বাধে। এই বিরোধে মানবসত্যের পক্ষাবলম্বন যে করে তারই জীবন সার্থক- একথা রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথায়, রজ্জব বলেছেন, 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঠ'। সব সত্যের যা মেলে তাই সত্য, যা মিললনা তা মিথ্যা। আমাদের শাস্ত্রে 'সোহহম' তত্ত্বে সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত আমি কে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। যে আমি সকলের সেই আমি আমারও- এটা সত্য। এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। "যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমানে আমাদের জীবনে ও সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। আমার মন আর বিশ্বমন একই। এই কথাই সত্য সাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই 'সোহহম'"।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্রাহ্মণ রামানন্দ যেদিন নাভা চন্ডাল কে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে আলিঙ্গন করেছিলেন, সেদিন সমাজ তাকে জাতিচ্যুত করলেও সেদিন তিনি সকলের চেয়ে বড় জাতিতে উঠেছিলেন, যে জাতি নিখিল মানুষের। সোহহম সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব সকলেই বলেছে 'সোহহম'। বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতা শূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করতে। তিনি বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে। মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোহম তত্ত্ব।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানবাত্মাকে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে জ্ঞানে ও ভক্তিতে পেয়েছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ভারতের ধর্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ; সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপলব্ধিতে ভারতের সকল বিপরীত বিরুদ্ধ বিবদমান সম্প্রদায়ের সমন্বয় সার্থক হতে পারে- এটাই ছিল কবির বিশ্বাস। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বর্ণভেদ- চারবর্ণের আপেক্ষিক উচ্চতা নীচতার সমর্থন করেছেন। যে ভারতবর্ষের কল্পনা তিনি করেছেন সেখানে বৈশ্য বা শূদ্র নয়, সমস্ত অধিকার ও কর্তৃত্ব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত। শূদ্র অর্থাৎ 'সাঁওতাল ভীল কোল ধাঙড়ের দল'। এই অনার্যদের সঙ্গে বিশুদ্ধ আর্যরক্তের মিশ্রণ ঘটে যাওয়ায় ভারতবর্ষের ধর্ম আচার বিকৃত হয়ে দেশকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। তিনি অনার্যদের আর্যদের তুলনায় সর্ববিষয়ে নিকৃষ্ট, 'আগাছা' বলে মনে করেছেন[৮]। তাঁর মতে অনার্যরা আর্যদের বিশুদ্ধতা ও আর্যসমাজকে কলুষিত করেছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'বেশ একটু সংকীর্ণ অর্থেই হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন'[৯]। তিনি হিন্দু সমাজবিরুদ্ধ কোনকিছুই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মে। প্রাচীন ভারতের তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম-এর আদর্শে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেছিলেন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ছাত্র অব্রাহ্মণ শিক্ষককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে কিনা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কবির কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাকে জানিয়েছিলেন (১৯ অগ্রহায়ন ১৩০৯ বঙ্গাব্দ), "যাহা হিন্দুসমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে..."। "আসলে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমকে সমর্থন করেছিলেন সমাজস্থিতির কথা ভেবে- তা নিছক হিন্দু সংস্কার নয়"[১০]। কারণ তিনি মনে করতেন, "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজিয়ান নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র"[১১]। ধর্ম এখানে সমাজ-সংবিধান। সমাজের দায়দায়িত্ব পালন, কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ করে সমাজকে সঠিক পথে চালনা করবে এই ধর্ম, যার কাঠামোটা হবে বর্ণাশ্রম, নেতৃত্ব দেবে 'যথার্থ ব্রাহ্মণ'। তাহলেই প্রাচীন ভারত একদিন যেমন নানা জাতি, শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভেদকে স্বীকার করেও একটি সুবৃহৎ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সকলকে একসঙ্গে ধরে রেখেছিল একালেও তা সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বর্ণাশ্রমকে সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে বর্ণাশ্রমের সমালোচনাও করেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, একসময় আর্য সভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণে শূদ্রে ব্যবধান রচনা করেছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করেছে। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষার চেষ্টা করেছে কিন্তু ধর্মকে রক্ষার চেষ্টা করেনি। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্ব চর্চা থেকে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করল তখন ধর্ম তার প্রতিশোধ নিল। অভাজন জড় শূদ্র সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ উপরে উঠতে দেয়নি, কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নিচে নামিয়েছে। বর্ণাশ্রম উচ্চতর ধর্মবোধকে আঘাত করেছে বলেই তার অধঃপতন ঘটেছে। এই অবস্থার সংস্কার হলেই বর্ণাশ্রম আবার পূর্বের মতন হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমকে সমর্থন করে তার ত্রুটিগুলির প্রয়োজনীয় প্রতিকার করে রক্ষা করার কথা বলেছেন।

১৯০১ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ- এই ২০ বছরে রবীন্দ্রনাথের এইসব ধারণায় গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম-এর স্থানে স্থাপিত হল বিশ্বভারতী (১৯২০)- তা বাঙালির নয়, হিন্দুর নয়, তপোবন কেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতের নয়, তা বিশ্বের, আধুনিককালের।

বিশ্বভারতীতে বিশ্ব এসে নীড় বাঁধলো- 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ং'। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধে গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার যুরোপভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ 'যুরোপের অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি' প্রত্যক্ষ করেছেন। যুরোপের আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন তার যৌবন চাঞ্চল্যে, আত্মত্যাগেচ্ছায়, জীবনের প্রাচুর্যে ও বিপদ বরণের আগ্রহে। বিশ্বমানবতাবোধের পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই পর্বেই। ব্রহ্মোপলব্ধি বা কল্পনাসর্বস্বতায় নয়, নিতান্ত বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলনের আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে আসেন ১৯০৩ সালের শেষ ভাগে। এ কেবল তাঁর ঘরে ফেরা নয়, মানুষের দিকে ফেরা। এখানেই 'মানুষের ধর্ম'- এর যথার্থ সূচনা। রবীন্দ্রনাথ এখন থেকে অধিকতর বাস্তবসচেতন হলেন। আধুনিক যুগের মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যে রূপ দিলেন। জীবনকে আরও গভীরভাবে গ্রহণ করলেন। সর্বকালীন মানবের সন্ধানে বার হলেন, বিশ্বমানবতাবোধের পথে যাত্রা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমবার যুরোপ ভ্রমণে গিয়ে (১৯৩০) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দেন, তা 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' নামে মুদ্রিত হয়। দেশে ফিরেই লেখেন 'মানুষের ধর্ম'। বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। প্রথম জীবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, উপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্মসমাজ নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা- সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষপর্যন্ত মানবঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষপর্যন্ত বিশ্ব মানবতায় পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম উপলব্ধি। 'মানুষের ধর্ম' এই সত্যোপলব্ধির পরিচয়স্থল। ৭ই পৌষের উৎসবে (১৩৩৯) ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "... মানুষ একলা থাকতে পারেনা। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড় হয়। সকলের সঙ্গে মিলতে পারলেই তার সার্থকতা; এই হল মানুষের ধর্ম"[৭]। কবি জানিয়েছেন, তাঁর দেবতা রয়েছেন মানুষেরই মধ্যে, তাঁর সত্য মানব সত্য, তাঁর ধর্ম মানব ধর্ম। তাঁর ঈশ্বর 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি তাঁর দেবতাকে সেই মন্দিরে দেখতে চেয়েছেন যেখানে সবাই অনায়াসে মিলতে পারে। বেদান্তের অনুধ্যান রবীন্দ্রনাথকে এই উপলব্ধিতে উপনীত করেছিল যে, মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে মানুষই পারে অমৃত বারি সিঞ্চন করতে- কারণ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। মানুষ যে অমৃতের পুত্র- এ কথা যদি উপলব্ধ হয় তাহলে পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দর পবিত্র। "যেই মানব, সেই দেবতা, 'য একঃ'- যিনি এক"। তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ মহামানবরূপে নরদেবতারূপে আহবান করেছেন। বিশ্বজোড়া সভ্যতার সংকটের কালে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি কোন দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নন। কোন মানবসীমার অস্তিত্বে বাঁধা নন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সুবিকশিত সত্তা।

তথ্যসূত্র:

১। গুপ্ত, অতুলচন্দ্র. *কাব্যজিজ্ঞাসা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ বঃ.

২। Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man.* London: George Allen & Unwin, 1922 a, d.

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *ধর্মের সরল আদর্শ.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩০৯ বঃ.

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *ধর্মপ্রচার.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩১০ বঃ.

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *ততঃ কিম্.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩১০ বঃ.

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *নবযুগের উৎসব.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩১৫ বঃ.

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *মানুষের ধর্ম.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *প্রসঙ্গ-কথা.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩০৫ বঃ.
৯। আইয়ুব, আবু সয়ীদ. *পান্থজনের সখা.* কলকাতা: দে'জ, ১৯৩৩ খ্রীঃ
১০। নাথ, আভা. *সমাজ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ.* কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৪০৭ বঃ.
১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *সমাজভেদ.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩০৮ বঃ.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী.* সুলভ সং. Vol. ২য় খন্ড. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী.* সুলভ সং. Vol. ৫ম খন্ড. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী.* সুলভ সং. Vol. ৬ষ্ঠ খন্ড. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী.* সুলভ সং. Vol. ৭ম খন্ড. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী.* সুলভ সং. Vol. ১০ম খন্ড. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রবীন্দ্র-রচনাবলী.* সুলভ সং. Vol. ১৫শ খন্ড. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৩৯ বঃ.
আইয়ুব, আবু সয়ীদ. *পান্থজনের সখা.* কলকাতা: দে'জ, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

সিপাহি বিদ্রোহকালের উপন্যাস বৈষ্ণবচরণ বসাকের ‘দেবযানী’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অনুধ্যান

বাসব দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ময়নাগুড়ি কলেজ
এবং
বিনীতা রানি দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যে যেসকল উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার অন্যতম হল বৈষ্ণবচরণ বসাকের লেখা ‘দেবযানী’। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল দেবযানীর জীবন কাহিনি। তবে সেই জীবনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক তাঁতিয়া টোপির প্রসঙ্গ। বিদ্রোহের সূত্রে তাঁতিয়াকে চুরি, ছিনতাই, হত্যার মতো গর্হিত কাজ করতে হয়েছিল। এসব কাজের ফলে অনেকের কাছে তিনি ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তবে দেবযানীর পিতা সীতারামের সাহচর্যে তাঁতিয়া টোপির জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল। উপন্যাসে সিপাহি বিদ্রোহের লড়াইয়ের কাহিনি বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। এর পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে দেবযানীর বেদনাময় জীবন এবং তাঁতিয়া টোপির পরিবর্তিত জীবন কাহিনি। উপন্যাসের শেষে দেবযানীর মৃত্যু বিয়োগান্তক আবহ সৃষ্টি করলেও, তার অনাথ কন্যা মলিনার সঙ্গে তার মাতামহ সীতারামের মিলনের মাধ্যমে কাহিনির ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ হয়েছে।
সূচক শব্দ: দেবযানী, সিপাহি বিদ্রোহ, তাঁতিয়া টোপি, সীতারাম।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকের ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের কাহিনি যেসকল উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল বৈষ্ণবচরণ বসাকের ‘দেবযানী’ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দেবযানী। দেবযানীর দুঃখভরা জীবন এবং তার জীবন সংগ্রামই এই উপন্যাসের মূল বিষয়। দেবযানীর করুণ জীবনকে গবেষিকা শ্রীমতী চক্রবর্তী মল্লিক পৌরাণিক সীতা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] তবে দেবযানীর জীবন কাহিনি মুখ্য হলেও উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে সিপাহি বিদ্রোহের কথা। যদিও সিপাহি বিদ্রোহ দেবযানীর জীবনকে ত্বরান্বিত করেনি। সিপাহি বিদ্রোহ ব্যাপকতা লাভ করার পূর্বেই উপন্যাসের ইতি ঘটেছে। উপন্যাসের কাহিনি গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে সিপাহি বিদ্রোহের উপাখ্যানের উল্লেখ না থাকলেও মূল উপন্যাসের কাহিনিতে কোনো সমস্যা তৈরি হত না। সিপাহি বিদ্রোহের প্রতি লেখকের প্রবল আকর্ষণ এবং সহমর্মী মনোভাব ছিল। এজন্যই হয়তো লেখক কাহিনিতে সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছেন। উপন্যাসের মূল কাহিনি সিপাহি বিদ্রোহ সমকালের। এই প্রসঙ্গেই তাঁতিয়া টোপি এবং সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিটি উপন্যাসে নিয়ে আসা লেখক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাই এই উপন্যাসের কাহিনি অঙ্কন

করতে গিয়ে পশ্চিম ভারতের পটভূমি তুলে ধরা লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। কারণ সিপাহি বিদ্রোহের মূল পটভূমি ছিলো মধ্য-পশ্চিম ভারত।

তাঁতিয়া টোপি সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। কিন্তু তাঁতিয়া টোপিকে ইংরেজরা খলনায়ক হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা যে তথ্য নিয়ে এসেছেন, সেখানে তাঁতিয়াকে খল চরিত্র হিসাবে দেখানো হয়নি। তাঁতিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ফরেস্ট সাহেব বলেছেন, "সিপাহি বিদ্রোহের সময় যেসব নেতারা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সাংগঠনিক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ও নতুন প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা ছিলেন।"[২] এই উপন্যাসে তাঁতিয়াকে ঔপন্যাসিক আদর্শ চরিত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন। যাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল সমাজের হিতসাধন। সমাজের হিতসাধনকে তাঁতিয়া তার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁতিয়া টোপি এই গুণের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দেবযানী। উপন্যাসের সূচনা হয়েছে দেবযানীর স্বামী অজিত সিংহর মৃত্যু দিয়ে। অজিত সিংহ চিলেন যুদ্ধে যোগদান করেছিল। অজিতকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাঁচাতে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং তাঁতিয়া টোপি। কিন্তু অজিতকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে অজিতের কাছ থেকে তার স্ত্রী-কন্যার পরিচয় নির্দেশক একখানি পত্র তাঁতিয়া লাভ করেন। এই পত্রের জন্যই উপন্যাসের শেষে অজিতের স্ত্রী হিসাবে দেবযানী ও তার কন্যা স্বীকৃতি পায়। কারণ অজিত যে দেবযানীকে বিবাহ করেছিল এবং তাদের যে কন্যাসন্তান ছিল, তা কেউ জানতো না। দেবযানীর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনা উপন্যাসের মধ্যভাগে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে উঠে এসেছে। দেবযানীর জীবনের সঙ্গে তাঁতিয়া টোপিকে জুড়ে দিয়ে সিপাহি বিদ্রোহে তাঁতিয়া টোপির ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। অন্যদিকে তাঁতিয়া টোপির সেবামূলক কাজ, দেশাত্মবোধ ও শেষপর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন সন্ধানে গমন – এই সমস্তের মধ্য দিয়ে লেখক উপন্যাসে তাঁতিয়া টোপি চরিত্রের মহত্ত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

আমরা জানি যে, ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছিল না। এই বিদ্রোহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অন্যতম কারণ ছিল দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন। তবে সকলেই বিদ্রোহীদের সমর্থন করেনি। ইংরেজ-ভয়ে সেসময় দেশের দুর্বল বিদ্রোহে মানুষ যোগদান করেনি, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা করতে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাতকে শক্ত করেনি বহু দেশীয় রাজা। অন্যদিকে নেতৃত্বের অভাব ও বিদ্রোহের পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য সাধারণ মানুষের সমর্থন হারিয়েছিল বিদ্রোহীরা। 'দেবযানী' উপন্যাসের পটভূমি হল পাঞ্জাবের অমৃতসর। সেসময় সিপাহি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সর্বত্র। বিদ্রোহকে দমন করার জন্য নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপিদের মতো প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য ইংরেজরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ইংরেজের কোপানলে পড়ার ভয়ে ভীত সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। অচেনা মানুষকে দেখলেই তারা সন্দেহপ্রবন হয়ে পড়তো। এমনই এক বৈশাখ মাসের দুপুরে রুক্ষ ও মলিন বেশধারী এক যুবক অমৃতসরের বাজারে এসে উপস্থিত হয়। হাটবার না থাকায় বাজারের দোকানপাট বন্ধ ছিল। আর যারা দোকান খুলে রেখেছিল, তারাও কিছুটা চাপা আতঙ্কে সময় অতিবাহিত করছিল। কারণ – "বিখ্যাত দস্যু তান্তিয়া তোপী নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; অতএব নগরবাসীগণ বিশেষ সতর্ক থাকিবে।"[৩] মানুষের মনে ভয় এতটাই প্রবল ছিল যে, কোনো এক যুবক এসে খাবার দোকানে খাবার চাইলে ঐ দোকানের কর্মচারী যুবককে তাঁতিয়া ভেবে ভয়ে পালায়। কর্মচারী ছেলেটিকে পালাতে দেখে বাজারের অন্য লোকেরা কর্মচারী ছেলেটিকে তাঁতিয়া ভেবে পেটায়। ইংরেজ সিপাহিরা এসে ছেলেটিকে উদ্ধার করলে সে নিজের

পরিচয় দেয়। এরপর বলে, তাদের খাবার দোকানে লম্বা চুলওয়ালা যে যুবক ছেলেটি এসেছিল, সে হল তাঁতিয়া টোপি। এখানে লক্ষণীয় যে, তাঁতিয়া টোপির বিবরণ দিতে গিতে কর্মচারীটি লম্বা চুলের কথা বলেছিল। লম্বা চুলের কথা প্রচার হতেই বাজারের প্রায় সব লোক গ্রেপ্তারির ভয়ে নিজেদের লম্বা চুল কেটে ফেলে। জনমানসে এরকম আতঙ্ক প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজরা কতটা কঠোর হয়ে উঠেছিল, লেখক উপন্যাসে এই বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

সীতারাম সিংহ ছিলেন অমৃতসরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সেসময় বিদ্রোহীদের জন্য সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভীতি ছিল। তাই সকলেই রাতে দ্বারবদ্ধ করে গৃহে বাস করতো। যাতে সন্দেহজনক কেউ তাদের বাড়িতে আশ্রয় না নেয়। উপন্যাসের কাহিনিতে আমরা দেখি, আত্মগোপন করে চলতে চলতে পথশ্রান্ত তাঁতিয়া টোপি সীতারাম সিংহের অট্টালিকায় এসে উপস্থিত হয়। কারণ সেসময় অমৃতসর শহরের সকল মানুষ তাঁতিয়ার ভয়ে ভীত হয়ে দ্বাররুদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সীতারামের অট্টালিকা দ্বারমুক্ত ছিল। প্রহরীর অনুমতি নিয়ে বৃদ্ধ সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় যুবক। এরপর বৃদ্ধ ও যুবকের পরিচয় ঘটে। যুবক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে নিজেকে তাঁতিয়া বলে উল্লেখ করে। সীতারাম নির্লিপ্ত থাকলেও দ্বাররক্ষক যুবকের পরিচয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সীতারামের কাছে ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়হীন তাঁতিয়া খাদ্য ও আশ্রয় চেয়েছিলেন। বৃদ্ধ সীতারাম নির্বিকারভাবে যথাযথ সম্মানে অতিথির সেবা করে। রূপোর বাসনে খেতে দেওয়া হয় তাঁতিয়াকে। তবে সীতারাম বা তার প্রহরীদের ওপর নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি তাঁতিয়া। প্রাণ ভয়ে তিনি সারারাত ঘুমোতে পারেননি। তিনি এখান থেকেই লাহোরের উদ্দেশে পালিয়ে যান। তবে আশ্চর্যজনকভাবে যাবার সময় উচ্ছিষ্ট রূপোর বাসনগুলো চুরি করে নিয়ে যান। যাবার সময় যাত্রাপথে সশস্ত্র প্রহরীদের কাছে ধরা পড়েন তিনি। তাঁতিয়াকে সীতারামের কাছে নিয়ে আসা হলে সীতারাম চুরির কথাকে নস্যাৎ করে জানান যে, বাসনগুলো তিনি তাকে দান করেছেন। ফলে প্রহরীরা তাঁতিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সীতারাম এরপর তাঁতিয়াকে নীতি শিক্ষার পাঠ দেন। সীতারাম সরাসরি জানান যে, ডাকাতি করে দুর্গোৎসব করায় কখনো পুণ্য অর্জন হয় না। এসময় তাঁতিয়া জানান তার সীমাবদ্ধতার কথা - "এই সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ অধীনস্থ লোকদিগের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য ব্যয় করিতে হয়; নচেৎ তাহারা বশে থাকে না। আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে কোন কার্যই হইবে না।"[4] তাঁতিয়ার একথা শুনে সীতারাম বুঝতে পারেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাউকে বিচার করা ঠিক নয়। জননী জন্মভূমির উদ্ধারকল্পে যে কাজ তাঁতিয়া করছেন, তা পাপ নয়। তবে উদ্দেশ্য খারাপ না হলেও, তাঁতিয়ার কাজের পদ্ধতি সঠিক ছিল না। এক্ষেত্রে সীতারামের নীতিকথা স্মর্তব্য –

ক. "জননী জন্মভূমির উদ্ধারের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিবে, তাহাতে পুণ্য বই পাপ নাই।"

খ. "যাহাতে সাধারণের ভয় ও ভক্তির পাত্র হইতে পার, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।"

গ. "অর্থই অনর্থের মূল। প্রত্যহ যে সকল ঘটনা হয়, অর্থই তাহার অধিকাংশের মূলীভূত কারণ।"[5]

সীতারামের এসকল বক্তব্য শুনে স্মরণে আসে প্রফুল্লকে দেওয়া ভবানী ঠাকুরের নিষ্কাম কর্মের বাণীর কথা। ভারতীয় সংস্কৃতি, নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থতার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের

ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস নির্মিত। একই উপাদানে রচিত হয়েছে 'দেবযানী' উপন্যাস। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে রচিত ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলিতে সন্ন্যাসী বা সংসারবিবাগী চরিত্র এবং তাদের নীতিকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবিত কাহিনিজাল। প্রসন্নময়ী দেবীর 'অশোকা' উপন্যাসের জীবারাম গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চন্দ্রা' উপন্যাসের পরমানন্দ গোঁসাই প্রমুখ চরিত্রগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মাঝে উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে ঔপন্যাসিক প্রেমকাহিনি এনেছেন। এখানে লক্ষ করি যে, বঙ্কিমী স্টাইলে পাঠকের সঙ্গে বার্তালাপ করে লেখক দেবযানী-অজিত সিংহের 'প্রেম' কাহিনি এনেছেন। তবে উভয়ের সম্পর্ক কীভাবে শুরু হয়ে গভীরতা লাভ করেছিল, তার কোন বিস্তারিত বিবরণ ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করেননি। সীতারাম সিংহের কন্যা দেবযানী এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমকালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, দেবীচৌধুরানীর মতো স্বাধীনচেতা, সাহসী, ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি দেবযানী। বরং দেবযানী রজনীর মতো শান্ত, স্নিগ্ধ ও কোমল স্বভাবের। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারার জন্য দেবযানীকে সারাজীবন অন্যায়কে সহ্য করতে হয়েছে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করার জন্য বঞ্চনা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাকে। সম্পত্তির লোভে অজিত সিংহ দেবযানীকে বিবাহ করেছিল - "তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভালবাসার জন্য তোমাকে বিবাহ করি নাই। তোমার পিতা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইব বলিয়া তোমাকে গুপ্তভাবে বিবাহ করিয়াছি।"[৬] - এই 'গুপ্তভাবে বিবাহ' করার জন্য দেবযানীর পক্ষে পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রী এই বিবাহের সাক্ষী থাকলেও তার মৃত্যু হয়েছে। ফলে বিবাহের কথা সমাজের কাছে গোপন রয়ে গিয়েছিল।

পিতৃগৃহ থেকে যে গয়না দেবযানী এনেছিল, তা বিক্রি করে দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অজিত - দেবযানীর। কর্মহীন জীবন এবং মদ্যপান অজিতকে সংসার বিমুখ করে তুলেছিল। স্বামীর প্রতি দেবযানীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থাকলেও, স্বামীর কাছে দেবযানী কখনো ভালোবাসা পায়নি। স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ব্যবধানের সুযোগ নিয়েছিল যমুনা। যমুনার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল অজিত ও দেবযানী। কিন্তু অজিতের নামে সর্বদা কুকথা বলে দেবযানীর মন বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল যমুনা। তাই অজিত সিং যেদিন গর্ভবতী দেবযানীর পেটে লাথি দিয়ে চলে যায়, সেদিন মনে মনে খুশি হয়েছিল যমুনা। অজিতের পদাঘাতের পর অসুস্থ দেবযানী কন্যা সন্তান প্রসব করে। সন্তানের জন্মের পর ছয়মাস কেটে গেলেও অজিত ফিরে আসেনি। একদিকে অর্থাভাব, অন্যদিকে অভিভাবকহীন দেবযানীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যমুনা দেবযানীকে অসামাজিক কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। একদিন রাতে আকস্মিকভাবে আগমন ঘটে প্রেমজী ধরম সেনের। প্রেমজীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে দরজা বন্ধ করে দেয় দেবযানী। দেবযানীর এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ যমুনা সেদিন রাতেই দেবযানী ও তার কন্যা সন্তানকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

গৃহহীন হওয়ার পর ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালানোর চেষ্টা করে দেবযানী। কিন্তু প্রেমজীর লোলুপ দৃষ্টি সর্বদা তাড়না করে দেবযানীকে। যমুনা প্রেমজীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েছিলো বলে প্রেমজীকে সে ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। পার্শী নারী-পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রেমজী ও যমুনা দেবযানীর সন্ধানে বের হয়। স্বামী পরিত্যক্ত এবং অভিভাবকহীন দেবযানীকে যমুনা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। একসময় দেবযানীর সঙ্গে উভয়ের সাক্ষাৎ

ঘটে। ছদ্মবেশের কারণে দেবযানী তাদের চিনতে পারেনি। তাই দেবযানীকে প্রতারিত করে যমুনা তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বাড়িতে ফিরে এলে দেবযানী তাদের চিনতে পারে। যমুনা পুনরায় দেবযানীকে প্রেমজীর সঙ্গে অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হতে বললে দেবযানী তা প্রত্যাখ্যান করে। দেবযানী এবং যমুনার উচ্চস্বরে বাক্যবিনিময় শুনে প্রতিবেশীরা বের হলেও কেউ এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। কারণ প্রতিবেশীরা সকলেই যমুনাকে ভয় পেতো। তবে লোকজনকে দেখে প্রেমজী ভয়ে যমুনার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। দেবযানীর কাছে যমুনার কিছু টাকা প্রাপ্য ছিল। যমুনা তার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য দেবযানীর মেয়ে মলিনাকে আটকে রাখে। এসময় প্রতিবেশী প্রৌঢ়ার পরামর্শে সহায়সম্বলহীন দেবযানী দাদাভাই ভুনজী ভাইয়ের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য করাচীতে গমন করে। দেবযানী শুনেছিল দাদাভাই ভুনজীভাই আর্তদের সাহায্য করে থাকেন।

দেবযানী করাচীতে দাদাভাই ভুনজী ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নিলে প্রেমজী দাদাভাইয়ের কর্মচারী গণপৎ শ্যামরায়কে চিঠি লিখে দেবযানীকে চরিত্রহীন বলে চিহ্নিত করে। প্রেমজীর চিঠি পেয়ে গণপৎ বিবেচনা না করেই দেবযানীকে অনাথ আশ্রম থেকে বের করে দেয়। পরবর্তীকালে নিজের ভুল বুঝতে পেরে গণপৎ দেবযানীকে পুনরায় অতিথিশালায় আশ্রয় দেয়। এদিকে টাকা না পাঠানোয় শিশু মলিনার খাবার দুধ বন্ধ করে দিয়েছে বলে দেবযানীকে চিঠি লিখে জানায় যমুনা। যমুনার পত্র পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেবযানী। দেবযানীর উৎকণ্ঠা দেখে অনাথ আশ্রমের কর্মচারী কাশীবাঈ তাকে অর্থ সাহায্য করে। এরপর পাঁড়েজীকে দিয়ে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। দেবযানীকে অর্থ সাহায্য করার জন্য নিজের অন্ধ মা ও বোনকে টাকা পাঠাতে পারেনি কাশীবাঈ। অন্ধ মা ও বোনকে টাকা না পাঠানোয় অতিথিশালার মহিলা কর্মচারী ক্ষুব্ধ হয়। কাশীবাঈ জানায় দেবযানীর মেয়ে অনাহারে রয়েছে জন্য সে অর্থ সাহায্য করেছে। সবকিছু শুনে সেই মহিলা কর্মচারী দেবযানীকে অতিথিশালা থেকে বের করে দেয়।

অতিথিশালা থেকে বিতাড়িত হয়ে মেয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে দেবযানী পথে নামে ভিক্ষা করতে। পথের পাশে থাকা কিছু ব্যক্তি দেবযানীকে উত্যক্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে দেবযানীকে টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তার গায়ে জল ঢেলে দেয়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে দেবযানী লোকটির মাথা ফাটিয়ে দেয়। এই অপরাধে পুলিশ দেবযানীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। সকলে দেবযানীকে 'পাগলি' মনে করে। দেবযানী নিজের পরিচয় কিছুই জানাচ্ছিল না। কেবলমাত্র সন্তানের কথা বলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এসময় দাদাভাই বিশেষ প্রয়োজনে থানায় এসেছিলেন। সেই সময় পুলিশ অফিসার রেডন সাহেব থানায় দেবযানীর ওপর অত্যাচার করছিল। সেই জন্য সাহেবের ওপর ক্ষুব্ধ হন দাদাভাই। দেবযানী দাদাভাইকে তার সমস্যার কথা জানায় এবং নিজের পরিচয় দেয়। এরপর দাদাভাই থানা থেকে দেবযানীকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করান। দেবযানী গুরুতর অসুস্থ জেনে তার কন্যা মলিনাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন দাদাভাই। কিন্তু পুলিশ এসে দাদাভাইকে গ্রেপ্তার করতে চায়। পুলিশি টানাপোড়েনের মাঝে মারা যায় দেবযানী। এসময় আদালতে তাঁতিয়াকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে বলে খবর রটে যায়। উক্ত ব্যক্তির ফাঁসির সাজাও ঘোষণা হয়ে যায়। এসময় আদালতে এসে দাদাভাই ভুনজীভাই স্বীকার করেন যে তিনিই তাঁতিয়া টোপি। এসময় আদালত কক্ষেই অনেকে দাদাভাইকে তাঁতিয়া বলে চিহ্নিত করে। যদিও সেসময় দাদাভাইকে গ্রেপ্তার করার সাহস কেউ দেখায়নি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, সেসময় তাঁতিয়াকে কেন্দ্র করে সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কীরকম ভীতি তৈরি হয়েছিল।

দাদাভাই ভুনজীভাই অর্থাৎ তাঁতিয়া টোপি দেবযানীর মুখে তার বিস্তারিত পরিচয় জেনেছিলেন। তাই পরবর্তিকালে তাঁতিয়া টোপি মলিনাকে উদ্ধার করেন এবং সীতারামের কাছে ফিরিয়ে দেন। সীতারামের সঙ্গে তাঁতিয়ার পরিচয় কীভাবে হয়েছিল, তা প্রবন্ধের সূচনাতে আলোচিত হয়েছে। মলিনাকে ফিরে পাবার পর সীতারাম পিতৃ-মাতৃহীন মলিনার বিবাহের উদ্যোগ নেন। তাঁতিয়া টোপি উক্ত বিবাহে কন্যা সম্প্রদান করেন।

দেবযানীর এই ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি উপন্যাসের সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে 'চিলেন যুদ্ধের' বর্ণনা। সমকালীন পরিস্থিতিকে তুলে ধরার জন্য চিলেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ এনেছেন ঔপন্যাসিক। এই যুদ্ধ বর্ণনা উপন্যাসে ঐতিহাসিক সুর সংযোগ ঘটিয়েছে। এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবযানীর স্বামী অজিতের জীবনের শেষ অধ্যায়ের কাহিনি। এই যুদ্ধেই অজিত সিংহের মৃত্যু হয়েছিল। তাই এই অধ্যায়ের গুরুত্ব অনেকখানি। ইংরেজরা প্রথম শিখ যুদ্ধে জয় লাভ করার পর যে সন্ধি করেছিল, সেই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড় কোটি টাকা না দেওয়ায় ইংরেজরা কাশ্মীর প্রদেশ কিনে নেয়। এসময় ইংরেজ বিরোধিতা করায় পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের স্ত্রী রানী চন্দ্রাকে নির্বাসিত করা হয়। রানী চন্দ্রার স্বামী রাজা রণজিৎ সিং নিয়োজিত সাবনমল্ল মূলতান শাসন করতেন। গুপ্তহত্যায় তার মৃত্যুর পর সাবনমল্ল-পুত্র মূলরাজ মূলতানের শাসক হন। পরবর্তীতে মূলরাজ পদত্যাগ করলে তার দায়িত্ব সর্দার খাঁ সিং অধিকার করেন। মূলতানের সেনারা ইংরেজদের ওপর আক্রমণ করে এবং পরের দিন প্রকাশ্যভাবে মূলরাজকে অধিনায়ক করে যুদ্ধ সজ্জায় সেজে ওঠে মূলতানের অধিবাসীরা। লাহোর দরবারের চারজন লোক ব্রিটিশ সরকারের সিপাহিদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল বলে তাদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য সিপাহি বিদ্রোহে (১৮৫৭) যেসকল ব্যক্তি ইংরেজ বিরোধিতা করে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল, তাদের খুঁজে বের ইংরেজরা ফাঁসি দিয়েছিল। প্রকাশ্যভাবে নির্মম অত্যাচার করে ভারতীয়দের একটি সতর্কবার্তা ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল ইংরেজরা।

রানী চন্দ্রাকে বারানসীতে নির্বাসন দেওয়ার ঘটনা এবং সেসময়ে ইংরেজদের অবস্থান লক্ষ করে শিখ সেনাপতি সেরসিংহ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসময়ে রেসিডেন্ট গোলযোগ করায় ছত্রসিংহ তার কন্যার বিবাহ দলীপ সিংহের সঙ্গে দিতে পারেননি। একদিকে ধর্মে আঘাত, অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে ইংরেজের নজরদারি মেনে নিতে পারেনি প্রাদেশিক শাসকরা। মহাবিদ্রোহের পশ্চাতে এটিও অন্যতম একটি বড় কারণ।

কানোরা নামে একজন মার্কিন অধিবাসী ছিলেন হাজারার শাসনকর্তা ছত্রসিংহের সেনাপতি। কানোরা ছত্রসিংহের নির্দেশ মতো মুসলিম বিদ্রোহীদের দমন করতে অগ্রসর হয়নি। স্ববিরোধিতা করায় কানোরাকে হত্যা করা হয়। কানোরার মৃত্যুর জন্য ইংরেজরা ছত্রসিংহকে দায়ী করে তার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে। ছত্রসিংহ এসব কথা সেরসিংহকে লিখলে সেরসিংহ ক্ষুব্ধ হয় এবং মূলরাজের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে চায়। মূলরাজ তাকে বিশ্বাস না করলে সেরসিংহ ফিরে আসে। এরফলে মূলরাজ ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়। চন্দ্রার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে লাহোর দরবারের যে চারজনের ফাঁসি হয়েছিল, তাদের একজনের বংশধর হল তাঁতিয়া টোপি বা 'তান্তিয়াতোপী'। আর দেবযানীর পিতা সীতারাম সিংহ হলেন ছত্রসিংহের ইষ্টদেব বা গুরু।

উপন্যাসের ঐতিহাসিক ঘটনার অংশখানি পাঠ করলে অনুভব করা যায় যে, ভারতীয়দের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজকে হারানো

সম্ভব হয়নি। তবে যেসকল রাজারা ইংরেজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যুদ্ধ চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো সেরসিংহ। ইংরেজরা প্রথমে তার সঙ্গে লড়াই করে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেরসিংহ প্রচার করেছিল 'চিলেন যুদ্ধ' হলো ধর্ম রক্ষা করার যুদ্ধ – "এখানে এখন এমন কে আছেন, যিনি ফিরিঙ্গির হস্ত হইতে গুরু নানকের ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য এই গোলাবৃষ্টির ভিতর হইতে শিখ সৈন্যের সংবাদ আনিতে পারেন।"[৭] - একুশ বছরের এক যুবক সম্মত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও নিহত হয়। এই যুবকই ছিল দেবযানীর স্বামী তথা অজিত সিংহ। খালসারা এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রচুর ইংরেজ সৈন্য হত্যা করেছিল। শেষপর্যন্ত সেরসিংহ যুদ্ধে জয় লাভ করে।

খালসা সৈন্যদের যে দল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তার অধিপতি ছিলেন তাঁতিয়া টোপি। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ কেন্দ্রিক বিভিন্ন রচনায় তাঁতিয়া টোপিকে ইংরেজরা বা ইংরেজের রক্তচক্ষুর ভয়ে ভীত ভারতীয় লেখকরা খল চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। 'দেবযানী' উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক তাঁতিয়াকে 'দস্যু' বলে বহুবার সম্বোধন করেছেন। তবে উপন্যাসের শেষে তাঁতিয়ার মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। একসময় রডক সাহেবকে স্বহস্তে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁতিয়া। কারণ এই রডক সাহেবের জন্য দেবযানী মারা গিয়েছিল। রডককে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁতিয়া পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন তাঁতিয়াই হলেন দাদাভাই ভুনজীভাই। রডক প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তাঁতিয়া তাকে ছেড়ে দেন। শেষপর্যন্ত তাঁতিয়া সীতারামের সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করেন। আর এভাবেই উপন্যাসের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ঘটে।

উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে অনেকটা মেলোড্রামার মতো। এই উপন্যাসে বঙ্কিমী প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। পাঠকের উদ্দেশে লেখকের বার্তা, যুদ্ধ বর্ণনায় কাব্যিকতা, ছদ্মবেশ ধারণ প্রভৃতি ঘটনা তার বড়ো প্রমাণ। উপন্যাসের শেষভাগে 'পরিশিষ্ট' অংশে সংযোজিত হয়েছে 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের ন্যায় গীতার নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে প্রফুল্ল যেমন ডাকাত সর্দার থেকে গৃহস্থ জীবনে ফিরেছে, 'দেবযানী' উপন্যাসেও তেমনি তাঁতিয়া টোপি দস্যু জীবন থেকে ধর্ম জীবনে ফিরেছেন। ভবানী পাঠকের মতো সীতারাম সিংহও নিষ্কাম তত্ত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁতিয়াকে বলেছেন - "তুমি যে যে কর্ম করিয়াছ, তাহা প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু কামনাশূন্য হইয়া কর নাই, এই জন্য জয় স্থায়ী হইবে না। অদ্য তোমাকে নিষ্কাম ধর্ম শিক্ষা দিব; মন দিয়া শুন - যখন যে কর্ম করিবে মনে তাহার ফলভোগী হইবার ইচ্ছা রাখিয়া করিও না - করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইবে না। কর্ম করিয়া ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে।"[৮]

'দেবযানী' উপন্যাসের দেবযানী বঙ্কিমের 'রজনী'র মতোই সহায় সম্বলহীনা এবং পরনির্ভরশীল এক নারী ছিল। ঘটনাক্রমে উদ্ধার হয়েছে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির ইতিহাস। অবলা, অবগুণ্ঠনবতী না হয়ে দেবযানী সন্তানের জন্য লড়াই চালিয়েছে। তবুও তাকে ব্যক্তিত্বময়ী নারী বলতে বাঁধে। বরং সে যেন বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের ন্যায় জীবন চালিয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দেবযানী হলেও তার চেয়ে কিছুটা উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রেরা। উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে মহাবিদ্রোহের চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার পূর্বে। তবু মহাবিদ্রোহের অগ্রজ নায়ক তাঁতিয়ার টোপির জীবন ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জি:

১। “তার জীবনের মধ্যে সীতার আর্কেটাইপ পাওয়া যায়। অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে তার মৃত্যু যেন এক সম্ভাবনাময় জীবনের অপচয় মনে হয়।”
চক্রবর্তী মল্লিক, শ্রীমতী, বাংলা উপন্যাসে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ৯৪

২। সেনগুপ্ত, প্রমোদ, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সুবর্ণরেখা, সংস্করণ- ২০১৪, পৃষ্ঠা – ৪১৫

৩। বসাক, শ্রীবৈষ্ণবচরণ, দেবযানী, আর্য পুস্তকালয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১০
(কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই)

৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫

৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬

৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৯

৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮৬।

হিজল বিল ও কোপাই নদীর বাঁক : দুই অনন্য উপকথা

সন্ধ্যা মন্ডল
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
চকদিঘী সারদা প্রসাদ ইনস্টিটিউশন (উ.মা.)

সারসংক্ষেপ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনজাতি চেতনার দুই মহত্তম উপন্যাস 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। দুটি কাহিনিই গড়ে উঠেছে জলধারার পাশে। হিজল বিল আর কোপাই নদী। হিজলের ধারে বিষবেদে-দের গ্রাম। সমগ্র দেশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক জাতি। অন্ধকারেই তাদের জীবন আবর্ত হয়। রয়েছে তাদের নিজস্ব কিছু উপকথা, মিথ। সেই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে চলে জীবনধারা। একজন নাগিনী কন্যা থাকে সকলের উপরে। সবাই মানলেও অন্তঃস্রোতে চলে বেদেদের কর্তা শিরবেদের সাথে তার দ্বন্দ্ব। নারীত্বের সাথে পৌরুষত্বের চিরকালীন সংঘর্ষের ছবি পাওয়া যায় 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে। আর যেখানে আছে অন্ধত্বের সাথে, অন্ধকারের সাথে একাত্ম হওয়ার আদিম প্রবৃত্তি।

অন্যদিকে, কোপাই-এর বাঁকে গড়ে ওঠে কাহার-দের জাতি। অন্ত্যজ জনজীবন। সেখানেও মিথ আছে। কত্তাঠাকুর ও তার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপ। গ্রামের মাতব্বর বনওয়ারীর সাথে সাথে পঁচিশ ঘর লোকেরাও তা মানে সেই উপকথা। কিন্তু করালী মানতে পারে না। কারণ তার যোগাযোগ শহুরে বাবুদের সাথে। বিবাদ শুরু হয় সেখানেই। একদিন পুড়িয়ে মেরে ফেলে সেই বাবাঠাকুরের বাহনকে। সকলের বিশ্বাসে আঘাত হানে। ক্রমশ সেই জনজাতির মধ্যে প্রবেশ করে আধুনিকতা। লেখক 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় এক বিরাট সময়কে তুলে এনেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষই যেন এসে মিশেছে এই হাঁসুলী বাঁকে। তেতাল্লিশের বন্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দেশ কাল সময় একাকার হয়ে যাচ্ছে। কাহারদের অবক্ষয়।

নদীর বাঁকে বাঁকে গড়ে ওঠা অবলুপ্ত দুই জনজাতির কথা গদ্যে তুলে এনেছেন তারাশঙ্কর। তাদের উপকথা, সংগ্রাম, বিশ্বাস, প্রেম লিপ্সা, ঈর্ষা, অন্তর্দ্বন্দ্ব সবকিছু যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই কাহিনিরই রূপায়ণ ঘটেছে প্রবন্ধটির আলোচনায়।
সূচক শব্দ: তারাশঙ্করের উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, নাগিনী কন্যার কাহিনী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কাহার উপজাতি।

মূল আলোচনা:

তারাশঙ্করের দুটি উপন্যাসে বিলীয়মান জনগোষ্ঠির কথা আছে। এই ক্ষুদ্র জনজাতিগুলি পুরোপুরি আঞ্চলিক। প্রাচীন মিথ ও উপকথা নিয়ে তীব্র সংগ্রামের মুখোমুখি তারা। হিজল বিল ও কোপাই নদীর বাঁকে যে রহস্যময় দুর্বোধ্য জগত, তা তারাশঙ্কর গভীরভাবে অন্বেষণ করেছেন একটি মৌলিক আবিষ্কারের মতো। এদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু ইতিবৃত্তের ধারা চলে আসছে বংশ-পরম্পরার ভাষ্যে।

হিজল বিলকে কেন্দ্র করে বিষ-বৈদ্যদের বাস। তাদের জীবনবোধ গোপন ও একমুখী। সেই কোন সাঁতালি পর্বত, মনসামঙ্গলের কাহিনি, তার সঙ্গে কালীয়নাগ দমনের কৃষ্ণ-কাহিনি মিশে একাকার হয়ে নাগিনী কন্যার কাহিনিতে বিষ-বেদের জীবনবোধ রচনা করেছে। সেই কাহিনির একটি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আছে। তবে তা সংস্কার, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে তৈরি

হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন যেন তাদের আলাদা একটি দেশ। সাধারণ মানুষের মধ্যে একমাত্র শিবরাম কবিরাজের সঙ্গে তাদের সংযোগ। কারণ কবিরাজ তাদের কাছে সাপের বিষ কেনে। এদের নেতারা শিরবেদে। মহাদেব ও গঙ্গারাম, এই দুই শিরবেদে এবং তাদের সময়ের দুই নাগিনী কন্যা সবলা ও পিঙ্গলার সঙ্গে এক যুবক ও নাগু ঠাকুরকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেম ও সংঘাতের কাহিনি উপন্যাসটিতে রয়েছে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' অতিলৌকিক ও রহস্যময়। তারাশঙ্কর এই জনজাতিকে দেখেছেন এক বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। লৌকিক বিশ্বাস, জনচেতনা ও কিছুটা বাস্তবের মিশ্রণে এ এক অপরূপ রচনা। পল্লব সেনগুপ্ত লিখলেন—

> *'সমাজ বিবর্তনের ইতিবৃত্তে সর্বত্রই একটা পর্ব দেখা গেছে: সামাজিক অনুশাসনের অধিকার যার হাতে তার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের অধিকারী কিংবা অধিকারিণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। এই উপন্যাসের দুটি পর্বে সেই সমাজতান্ত্রিক সমস্যাটি দুজোড়া পৃথক-পৃথক যুযুধান চরিত্রের মধ্যে উদঘাটিত হয়েছে: শবলা বনাম মহাদেব এবং পিঙ্গলা বনাম গঙ্গারাম...'।* [১]

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নাগিনী কন্যার থেকেও অনেক বৃহৎ পটভূমিতে বিধৃত হয়েছে। কোপাই-এর হাঁসুলী বাঁকে বাঁশবাদি গ্রামের কাহার-রা আঞ্চলিক হলেও সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-য় লেখক একটি বৃহৎ কাল সময় ও ঘটনাবলিকে ধরেছেন। কাহার জনগোষ্ঠির সঙ্গে সদগোপ পাড়া, মণ্ডল, ঘোষ, চৌধুরী, চন্ননপুরের মুখার্জীরা এবং রেল কলোনীর সাহেব ও শ্রমিকের কাহিনি মিশে একটি মহাকাব্য রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কোপাই একটি নদীর নাম। আরও ওপর দিকে তার নাম শাল নদী। নিচে এসে নাম কোপাবতী। পুরো বীরভূম দিয়েই বয়ে গেছে এই নদীটি। লাভপুরের কাছে এ শুধু বাঁকের পর বাঁক নিয়েছে। আঠারো বাঁক, তিরিশ বাঁক। এই অঞ্চলের নাম 'হাঁসুলী বাঁক'। জাঙল গ্রাম, তারই গা ঘেঁষে বাঁশবাদি গ্রাম। উঁচুতে সাহেব ডাঙা। একসময় নীলকর সাহেবরা থাকতেন। তাদের ভাঙা কুঠিবাড়ি। পাশেই জমি ছিল তাদের। নদীর তীরে জমি। সেই কবে যেন কাহার-রা এসেছিল এখানে। সাহেবদের নীল বাঁধ একটি বৃহৎ পুকুর। সেই সেচের পুকুরের চারিধারে এবং আরও একটি পুকুরের পাড়ে কাহার-দের দুটি পাড়া এই বাঁশবাদি মৌজায়। বেহারা-কাহার, তারা প্রায় পঁচিশ ঘর। আর 'গোরার বাঁধ' বলে মাঝারি গোছের পুকুরটার পারে কয়েকটা ঘর কাহার, আটপৌরে কাহার তারা।

এই ছোট্ট অঞ্চলটি নিতে তারাশঙ্কর রচনা করলেন মহাভারত। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। বেহারা কাহার-দের মাতব্বর বনওয়ারী। সে কোশ-কেঁধে বংশের এক মহা শক্তিশালী পুরুষ। এক কাঁধে এক ক্রোশ, দু-ক্রোশ পথ পালকি বয়ে নিয়ে যেত তারা।

সাহেবরা শেষ হয়ে গেছে। নীল চাষও। পালকির দিনও আর নেই। কাহার-রা চাষী হয়ে গেছে। জাঙল গ্রামের ভদ্রলোকেদের জমি চাষ করে। মাইতো ঘোষ, পাকু মন্ডল, হেদো মন্ডল, সদগোপ পাড়ার মানুষেরা কাহার-দের মনিব। সাত মাস কাহার-রা নিজেদের ভাগের ধানে খায়। বাকি পাঁচ মাস মনিবদের ঋণে।

বাঁশবাদির ঘন বাঁশবনের মাঝে কাহার-দের কত্তাবাবার থান। পাশে একটি বৃহৎ শিমুল বৃক্ষ। কাহারদের দেবতা বাবাঠাকুর, মানে কত্তাবাবা সেখানেই থাকেন। পাশেই কালরুদ্দ, অর্থাৎ কালরুদ্র শিবের ভাঙা মন্দিরের মতো বেলগাছের তলায়। মাতব্বর বনওয়ারী এই কত্তাবাবার হয়েই কাহারদের চালনা করে। আর এর উপকথাটি জানে গ্রাম-বৃদ্ধা সুচাঁদ। সে কত্তাবাবার

কথা, নিদেন সব বলেই চলে। সুচাঁদের মেয়ে বসন্ত। বসন্তের মেয়ে পাখি। তার রঙ কাহারদের মতো কালো নয়। হলুদ বর্ণ। বসন্তর প্রেমিক ছিল চৌধুরী বাড়ির পুত্র। সাহেবরা চলে গেলে সবকিছুর মালিক হয় এই চৌধুরীরা। কাহার নারীগণ নানা প্রেমে, নানা মানুষের সাথে জড়িয়ে পড়ে প্রায়ই। এসব তাদের চলে। সুন্দরী পাখি-র প্রেমিক ছিল করালী। পৌঢ় বনওয়ারীর সমকক্ষ এক অতীব বলশালী যুবক।

করালী কাজ করে জাঙল গ্রাম পেরিয়ে, বড় মাঠ পেরিয়ে অনেকটা দূরে 'চন্নপুর' (চন্দনপুর) রেল কলোনীতে। সে বাবাঠাকুরের থান মানে না। কাহারদের আদ্যিকালের 'মিথ' মানে না। করালী স্বাধীন, একরোখা।

গণ্ডগোলটা বাঁধলো শিষের শব্দ নিয়ে। দিনে দুপুরে রাত-বেরোতে সেই শিষের শব্দে কাহাররা কেঁপে ওঠে। করালী একদিন আবিষ্কার করল শিষটি আর কারুরই নয়, একটি বিশাল চন্দ্রবোড়া সাপের এবং সাপটিকে সে মেরে ফেললো। কত্তাবাবার শিমুলগাছের তলায় ধোঁয়া দিয়ে। সুচাঁদ বুড়ি বলল, ওটাই ছিল কত্তাবাবার বাহন। মাতব্বর বনওয়ারীর-ও তাই মত। কাহাররা এবার বাবাঠাকুরের কোপে পড়বে। করালী এসব গ্রাহ্যও করে না। সে চন্নপুরের রেলের সাহেবদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে করালী ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

বনওয়ারী আর করালীর মধ্যে শুরু হল বিরোধ। পালকি বাহক কাহার-রা এখন চাষী হয়েছে। সেখান থেকে করালী আবার রেলের শ্রমিক। পাখির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বনওয়ারীর বউ থাকলেও, আটপৌঢ়ে পাড়ার মাতব্বর পরমের বউ 'কালোশশী' তার ছোটোবেলার প্রেমিকা। দুজনের গোপন দেখা সাক্ষাৎও হয়। কালোশশী একদিন গোখরোর কামড়ে মরে। পরে আবার কালোশশীর ভাইঝি তরুণী সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ে হয়। পাখি, করালী, সুবাসী, বনওয়ারী। কত্তাবাবার মিথ, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা সবকিছু নিয়েই শুরু হল বিপুল দ্বন্দ্ব।

এই কাহিনিকে তারাশঙ্কর ধরেছেন এক বিপুল বিস্ময়ে। কাহারদের মুখের ভাষার অনবদ্য রূপে। কাহাররা 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। রক্তকে বলে অক্ত। এরকম কত যে শব্দ, বাক্য, তার বলার ধরণ তারাশঙ্কর এমনভাবে লিখলেন, আমাদের মনে হল যেন কাহার পাড়াতেই আছি। 'পাগল' কাহার আর নসুবালার ছড়া। গান। সবকিছু তারাশঙ্কর তুলে এনেছেন তাঁর কলমে।–

> *'কি করব আজ্ঞেন! চা খেতে দেরি ক'রে ফেলালেন আপুনি। সতর গমনে না এলে এনারে ধরতে লারতেন। উনি তো দাঁড়ান না। টায়েম হ'লেই ছেড়ে দ্যান'।* [২]

এই হলো ট্রেন। কাহার-পাড়া থেকে মাঠের ওপর দিয়ে চলে রেলগাড়ি। কোপাইয়ের ব্রিজের ওপর তার ঝমাঝম শব্দ। ট্রেনের শব্দই তাদের ঘড়ির কাজ করে।

এই কাহারদের হৃদয়ে যখন তখন প্রেম আসে। ওরা বলে 'অঙ' (রঙ) ধরেছে। রোজ মদ খায়। মার খায় মনিবের কাছে। তবুও রঙ যেন আর যায় না। নিজেদের বাবাঠাকুরের পুজো ছাড়াও। কালরুদ্দ, গাজন। মাতামাতির শেষ নেই। ওদের ঘরে আলো জ্বলে না। রাতের অন্ধকারে মানবের আদিম প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। চোলাইয়ের হাঁড়িতে। পাকি মদের বোতলে। নৃত্যের তালে তালে। আবাদ, বিবাদ, সুবাদ নিয়ে। কাহার জাতের ছবির পর ছবি এঁকে গিয়েছিলেন তারাশঙ্কর।

কাহাররা একমাত্র ভয় খায় তাদের কত্তাঠাকুরকে। আর তারই বাহন সেই মস্ত চন্দ্রবোড়াটিকে অক্লেশে মেরেছে করালী। সে এসব কিছু মানে না। বাঁশবাদি থেকে দেড় মাইল

দূরের চন্নপুরের রেল কলোনীর জীবনধারায় সে চলবে। বনওয়ারী কাহারদের ভালো রাখার কথা ভাবে। করালীও। শুধু পথটি উলটো। এখানেই মূর্ত হয়ে ওঠে দুটি প্রজন্মের সংগ্রামের কাহিনি।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে শুধু কাহার পাড়াতে আটকে থাকেননি। সদগোপ পাড়া, মণ্ডল, ঘোষ, চৌধুরী কে নেই! চন্ননপুরের মুখার্জী বাবুরা, রেলের শ্রমিক সকলে এসে ভিড় করেছে তাঁর কাহিনিতে। আর ধরেছেন একটি বিরাট সময়কে। পালকি বাহকগণ চাষী হল, সেখান থেকে রেলের কুলি। কারখানার শ্রমিক। পুরো ভারতবর্ষই যেন এসে মিশেছে এই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়। তেতাল্লিশের বন্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দেশ কাল সময় একাকার হয়ে যাচ্ছে। কাহারদের অবক্ষয়। তারই সাথে সাথে নিজেদের একক সম্বল বাবাঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে। নদীর বাঁকে বাঁকে এদের শষ্য উৎপাদন, প্রেম লিপ্সা, মারামারি সবকিছু যেন একাকার হয়ে গেছে। 'পাগল' গেয়ে চলে ঘেঁটুর গান।–

'লালমুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ—
দ্যাশ বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
—ও সাহেব আস্তা—
ও সাহেব আস্তা বাঁধালে—কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক!
—ও সাহেব আস্তা—'[৩]

তবুও কাহাররা সাহেবদের যত না ভয় করেছে, তার থেকে বেশি করেছে চন্ননপুরকে। চন্ননপুরের ঠাকুরমশায়দের। চন্ননপুরের দোকানদার, বণিক, দেব-দেবীদের। ওরা ও-পথ মাড়াতে চায় না, তবু যেতেই হয়। 'পাগল' কাহার গান ধরে—

'লক্ষ্মীরে চঞ্চল ক'রে অলক্ষ্মীর কারখানা
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।'[৪]

মাতব্বর বনওয়ারীর সঙ্গে তাই করালীর বিরোধ নেই। আসল যুদ্ধটা হয়ে গেল বাঁশবাদির সঙ্গে চন্ননপুরের। কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁকে যে উপকথা আদ্যিকাল থেকে চলে আসছিল। চন্ননপুরের রেল, বাবুদের টাকা সেই সবকিছুকে অনায়াসে গ্রাস করে নিল। কারণ আলো বেশি নেই কাহার পাড়ায়। 'তাঁরা অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়।'

'অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে!
অন্ধকারেই পরাণপাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে!'[৫]

যে ছোট্ট নদীটিকে, কত্তাঠাকুরকে আঁকড়ে তারা বেঁচে থাকছিল। তারাই বন্যায়, ঝড়ে তাদের শেষ করে দেয় নিয়ত। তবুও তারা থাকে। তাদের উপকথাকে বুকে জড়িয়ে।

তারাশঙ্কর এই জীবনের মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। তাঁর চরিত্ররা কথা বলে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায়। তিনি অসামান্য গদ্যে পাশাপাশি এঁকে যান ছবি। মনে হবে যেন ঢুকে পড়েছি বাঁশবাদির জঙ্গলে। বাঁশবনের আঁধারে।

সেই বাঁশ একদিন কাটা হয়ে যায় সব। খটাং খটাং শব্দে। বনওয়ারী মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সেই শব্দ শোনে। করালীর কাছে সে হেরে গেল। কাহারপাড়ার সব বৃক্ষ ফাঁকা হয়ে গেল। বাঁশ নেই, গাছ নেই, মানুষ নেই। পুরো বাঁশবাদিই চলে গেছে চন্ননপুরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গ্রাস করে নিল সমগ্র হাঁসুলী বাঁককেই। সুচাঁদ চন্ননপুর স্টেশনে বসে হাঁসুলীবাঁকের উপকথা বলে চলে

অবিরাম। নসুবালা বনওয়ারীকে শেষযাত্রায় সেবা করে। তার যুবতী বউ সুবাসী পালিয়ে গেছে করালীর কাছে। পাখি আত্মহত্যা করলো।

তারাশঙ্কর নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখে গেছেন সবকিছু। তিনি তাঁর মত চাপিয়ে দেননি পাঠকের ওপর। তাঁর গৌরবময় ভাষায় রচিত 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র মতো আঞ্চলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই।

তথ্যপঞ্জি:

১। পল্লব সেনগুপ্ত, 'হিজল বিল আর কোপাই নদীর পার'; সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের দুটি অন্বেষণ ভূমি', পশ্চিমবঙ্গ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ১৪০৪।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ৭৭-৭৮।

৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৬২।

৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৬৪।

৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ২১৯।

রবীন্দ্রগল্পে নারীর জীবনে অনাচার ও প্রথার প্রতিচিত্র : একটি নির্বাচিত পাঠ

সন্দীপ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পগুলিতে উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থায় নারীর অবদমিত অবস্থান ও সামাজিক অনাচার অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছেন। 'বিচারক' গল্পে পুরুষের ছলনায় বিভ্রান্ত হেমশশী তথা ক্ষীরোদার করুণ পরিণতি সমাজের নির্মম দ্বিচারিতার ছবি আঁকে। অপরদিকে 'মহামায়া' গল্পে দেখা যায় এক কুলীন কন্যার আত্মমর্যাদার লড়াই, যেখানে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। 'দেনা-পাওনা' গল্পে পণপ্রথার শিকার নিরুপমার মৃত্যুর মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মূল্যহীনতার নির্মম বাস্তবতার চিত্র উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি মানুষের চেতনা ও মননের রূপান্তর। তাঁর গল্পগুলিতে তাই কেবল সামাজিক প্রথার নিন্দা নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ও নারীর আত্মসম্মানের উদ্দীপ্ত প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।
সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, নারী, সামাজিক অনাচার, অবদমন, সহমরণ প্রথা, পণপ্রথা, আত্মমর্যাদা, মানবিক মূল্যবোধ।

মূল আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ প্রতিভা, যাঁর সাহিত্যকর্ম মানবজীবনের নানা দিককে স্পর্শ করেছে গভীর সংবেদনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। তিনি একজন সংবেদনশীল, সমাজচিন্তক লেখক। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বাঙালি সমাজের গঠন, শ্রেণি-বৈষম্য, মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং নারীর অবস্থান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে। মেয়েদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। সতের বছর বয়সে প্রথম বার বিলেত গিয়ে সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা করে ধারাবাহিক লেখা লিখেছিলেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে।' সেই থেকে তাঁর নারী সংক্রান্ত ভাবনার সূত্রপাত। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই ভাবনা বির্বতনের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

নারী পুরুষের অধিকার বৈষম্য সব সমাজেই বর্তমান, আমাদের সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশে মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য রামমোহন রায়ই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। এরপর বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন করে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সমাজ সংস্কারক না হয়েও নারীদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে মেয়েরা আজ যেভাবে চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথের সময়ে মেয়েরা তেমন করে ভাবতে অভ্যস্থ ছিল না। নারী মুক্তির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে সেসব আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক আলোচনায় এসব কথা অবশ্যই মনে রাখা উচিত। শিশির কুমার দাস বলেছেন -

> "রবীন্দ্রনাথের গল্পে যত অসম্মান, যত অপমান, যত বঞ্চনা-তার বেশিরভাগই নারীর।"[১]

আঠেরো শতকের শুরুর দিকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবদমিত, অধিকারহীন ও নির্যাতনের শিকার। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা ও পণপ্রথার মতো নিষ্ঠুর সামাজিক অনাচার নারীর জীবনে দুর্বিষহ কষ্ট ডেকে আনত। একদিকে সতীদাহের ভয়াবহতা নারীজীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল অন্যদিকে পণপ্রথা কন্যাপক্ষের উপর সমাজের একপ্রকার নিপীড়ন চাপিয়ে দিত। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অত্যন্ত মানবিক ও মর্মস্পর্শী ভাবে তুলে ধরেছেন নারীর নিঃসঙ্গতা, নিপীড়ন ও আত্মসংঘাতের চিত্র। তাঁর গল্পগুলিতে নারী কখনও সহানুভূতির পাত্র, কখনও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, আবার কখনও নিঃশব্দে সমাজের অন্যায়কে মেনে নেওয়া এক বেদনাময় প্রতিচ্ছবি। 'বিচারক', 'মহামায়া', 'দেনা পাওনা' ইত্যাদি গল্পে গভীর মনোযন্ত্রণা রূপে নারীর জীবনসংগ্রাম ফুটে উঠেছে, যা আজও পাঠকের হৃদয়কে আলোড়িত করে।

আসলে আমাদের সমাজ আজও পুরুষতান্ত্রিক, যেখানে পুরুষই সর্বেসর্বা। সমাজের নিয়ম এমন যে কোনো পুরুষ যদি অনাচার করে তাহলে তার সাত খুন মাফ, কিন্তু কোনো মেয়ে যদি সামান্য ভুল করে বা কোনোভাবে পুরুষের ছলনায় ভুলে অনাচার করে, তাহলে সমাজে তার আর স্থান থাকে না। আত্মীয় পরিজন হোক বা সমাজ সব স্থানেই সে হয়ে যায় অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে পুরুষ অনাচারী যার ছলনায় নারীর এই সর্বনাশ হল সেই পুরুষই আবার উঁচু গদিতে বসে কঠোরভাবে সেই মেয়ের বিচার করে। এমনই এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে।

গল্পটি আটত্রিশ বছরের বারবিলাসিনী নারী ক্ষীরোদাকে নিয়ে। যার পূর্ব নাম ছিল হেমশশী। ১৪-১৫ বছরের এক বিধবা কন্যা। সে একসময় সোনার চশমা পরা গোঁফ দাড়িতে ভর্তি সাহেবী ধরনের কেস বিন্যাসের মোহিতকে দেখে এক কল্পিত মায়াস্বর্গ তৈরি করে। একইসঙ্গে এই মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়ে এবং বিনোদচন্দ্র নামে মিথ্যা স্বাক্ষরে বারবার পত্র লিখতে শুরু করে। অবশেষে হেমশশীও সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ-পূর্ণ উত্তর দিয়ে পত্র লিখল মোহনকে। তার কিছুদিন পর এক গভীর রাত্রে পিতা, মাতা, ভাই, গৃহ সবকিছু ছেড়ে বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামধারী মোহিতের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠে পালিয়ে গেল হেমশশী। যাবার সময় হিমশশীর মনে পড়ল তার বাবা, ভাই, মা, বাড়ির সেই ক্ষুদ্র কোণ এবং বাড়ির বিভিন্ন কাজের কথা। তখন সে কাকতি মিনতি করতে শুরু করল তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য –

> "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।"[২]

স্বার্থলুব্ধ মোহিত তা করল না। তাকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ চালালো এবং শেষে হেমশশীকে দিল একটি দামি আংটি। তার কিছুদিন পর এই প্রেমে মোহিতকুমারের চিত্তে অবসাদ তৈরি হল এবং হেমশশীকে ত্যাগ করে সে চম্পট দিল। পুরুষের অনাচার করে সমাজে ফেরা সোজা তাই মোহিতমোহন আবার সমাজে ফিরে এলো কিন্তু একজন নারীর পক্ষে তা আর সম্ভব নয়। তাই হেমশশী আর সমাজে ফিরতে পারল না। সে বারবনিতার পেশা গ্রহণ করল

এবং নাম নিল ক্ষীরোদা। সে এই আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বহু প্রণয়ীর সেবা করে কাটাল তারপর একরাতে শেষ প্রণয়ী তার যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালালো। তার ফলস্বরূপ তার দুর্দশা তৈরি হল, অন্যদিকে বহু জনের সেবায় তার রূপযৌবন আর নেই, তার উপর তার কোলে একটি তিন বছরের শিশু। নিজে তো উপোস থাকেই সঙ্গে শিশুকেও অনাহারে থাকতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত সেই বেদনা সহ্য করতে না পেরে একরাতে শিশুকে বুকে জড়িয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিকটের এক কূপে। কূপে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ শুনে প্রতিবেশীগণ সেখানে এসে কোনো রকমে ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলল। ক্ষীরোদা পরে সুস্থ হয়ে উঠলেও শিশুটি মারা গেল। তারপরেই হত্যার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সেশনে চালান করে দেয়। উকিলরা তাকে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা করলেও জজ মোহিতমোহন দত্ত বিচারে তার ফাঁসির হুকুম দিলেন। তার কারণ স্ত্রী জাতির প্রতি তার আন্তরিক অবিশ্বাস। এই সেই মোহিতমোহন যার অনাচারে হেমশশির এই অবস্থা।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দু'একদিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান থেকে তরিতরকারি সংগ্রহ করতে গেল। সেখানে গিয়ে অনুতপ্ত ক্ষীরোদাকে দেখতে বন্দিশালায় প্রবেশ করেই দেখল ক্ষীরোদা প্রহরির সঙ্গে ঝগড়া করছে। জজ মহিতমোহনকে দেখেই ক্ষীরোদা কাছে এসে করুণস্বরে হাত জোড় করে বলল -

> "ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"[৩]

মোহিত মনে মনে হাসতে হাসতে ভাবল -

> "আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব!"[৪]

তারপরে প্রহরীর হাত থেকে তিনি আংটিটি নিলেন এবং চমকে উঠলেন। আংটির এক দিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটা গম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, আর অপরদিকে সোনার গায়ের খোদাই করা রয়েছে বিনোদচন্দ্র। তার মনে পড়ল এই আংটি সেই দিয়েছিল হেমশশীকে। জজ্ মোহিত ফিরে তাকালো ক্ষীরোদার দিকে -

> "চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।"[৫]

হেমশশীর মত অনেক নারী একসময় মোহিতমোহনের মত পুরুষের অনাচারে এইভাবে সমাজচ্যুত হয়েছে, আবার তাদেরই বিচারে শাস্তি পেয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে।

এরকমই এক দুর্ভাগিনী কুলীন কন্যার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর 'মহামায়া' গল্পে। আমরা জানি একসময় কুসংস্কার ও বিভিন্ন প্রথা মানুষকে বিশেষত নারীদেরকে জর্জরিত করে রেখেছিল। তার মধ্যে সবথেকে বেদনাদায়ক ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলীন্য প্রথা।

> "এটা প্রথমে ব্রাহ্মণ্য সমাজেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ প্রভৃতি সমাজেও প্রবর্তিত হয়। এই প্রথা সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্য প্রথা ছিল কন্যাগত। অকুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ের বাপের কৌলীন্য ভঙ্গ হত, এবং সমাজে তাকে হীন মনে করা হত। কুল রক্ষার জন্য কুলীন পিতাকে যে ভাবেই হোক কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কুল রক্ষা করতে হত।"[৬]

কৌলিন্য প্রথার কারণে এই দেশের কুলীন সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিল মূল্যহীন। তাদের জীবনের বিন্দুমাত্র দাম ছিল না পরিবার ও সমাজের কাছে। তার সঙ্গে প্রচলিত ছিল সহমরণ প্রথা বা সতীদাহ প্রথা। সতীদাহ প্রথা একটি ঐতিহাসিক হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর ও পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি, যেখানে একজন বিধবা নারী তাঁর মৃত স্বামীর দাহক্রিয়ায় নিজেকে জীবন্ত উৎসর্গ করত বা সমাজ তাঁকে জোরপূর্বক তা করতে বাধ্য করত।

'মহামায়া' গল্পে আমরা এক ভিন্ন ধাঁচের নারী চরিত্র পাই। মহামায়া কেবল আত্মমর্যাদাসম্পন্নই নয়, সে সাহসিনী, সচেতন এবং সম্মানের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত এক নারী। গ্রামে বাস করে কুলীন ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং তার বোন মহামায়া। মহামায়ার বয়স চব্বিশ বছর। যোগ্য কুলিন ঘরের পাত্র পাওয়া যায়নি বলে চব্বিশ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও মহামায়া অবিবাহিত, যদি বা পাওয়া যায় সে পাত্রে কন্যাদান করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। ভবানীচরণের পক্ষে সে টাকা দেওয়ার সাধ্য নাই। অন্যদিকে গ্রামে রেশমের কুঠিতে কাজ করে রাজিব, বড় সাহেবের প্রিয় পাত্র। ছোটবেলা থেকেই রাজীবের সঙ্গে মহামায়ার ভাব, এমনকি রাজীবের বাড়িতে মহামায়ার ছোট থেকে যাতায়াতও ছিল। রাজীবের বয়স উনিশ এবং তারও এখনো বিবাহ হয়নি। এর ফলে বয়সের ধর্ম অনুযায়ী মহামায়া এবং রাজিব দুজন দুজনের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। কিন্তু মনের ভাব কখনো কেউ কারো সামনে প্রকাশ করে না। আসলে মহামায়া কথা বলে কম তার মনে প্রচন্ড তেজ এবং তার দৃষ্টিকে রাজিব ভয় করে। তাই রাজিব এই প্রণয়ের কথা সহজে মহামায়াকে বলে উঠতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাজিব ব্যাকুল হয়ে একদিন দুপুরে গ্রামের প্রান্তে এক ভাঙ্গা মন্দিরে মহামায়াকে ডেকে বলল -

> "চলো, আমরা বিবাহ করি গে"[৭]

কিন্তু মহামায়া তাতে রাজি হয়নি। যখন মহামায়া আর রাজিবের মধ্যে এই কথোপকথন চলছে সেই সময় সেখানে পৌঁছে যায় মহামায়ার দাদা ভবানী চাটুজ্জ্যে। তাকে দেখে রাজিব পালাবে ঠিক সেই মুহূর্তে মহামায়া তার হাতখানা চেপে ধরল, ভবানী সেই অবস্থায় তাদেরকে দেখল। মহামায়া ভবানীচরণকে শুনিয়েই বলল -

> "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"[৮]

সেই রাত্রেই মহামায়াকে লালচেলি পরিয়ে এক শয্যাশায়ী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিল ভবানীচরণ। যথারীতি পরদিনই মহামায়া বিধবা হল। সমাজের আচার অনুযায়ী তাকে এবার হতে হবে স্বামীর চিতায় সহমৃতা। কিন্তু চিতা যখন জ্বলছে তখন হঠাৎ করে প্রলয়ের ঝড় জল ছুটে এল। মানুষজন সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে দূরে আশ্রয় নিল। ঠিক সেই সময় বাঁধন খুলে ঘোমটা মুখে অসহ্য দাহ যন্ত্রণা নিয়ে মহামায়া পালিয়ে গেল রাজীবের ঘরে।
রাজিব চমকে উঠে বলল -

> "মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?"[৯]

মহামায়া বলল -

> "হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তোমার ঘরে আসিব সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি।"[১০]

মহামায়া রাজীবকে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করালো যে রাজিব কখনো মহামায়ার ঘুমটা খুলবে না, কখনো মহামায়ার মুখ দেখবে না, তবেই মহামায়া তার ঘরে থাকবে না হলে সে চিতায় ফিরে যাবে। রাজীব সেই প্রতিজ্ঞা করল এবং ঘোমটায় ঢাকা মহামায়াকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

রাজীবের জীবনে সুখের অভাব রয়ে গেল শুধু একখানি ঘোমটার জন্য। সেই ঘোমটা রাজিবের জীবনে হয়ে উঠলো -

"মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।"[১১]

অবশেষে এক বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোয় রাজীবের মন হল উতলা। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সে গেল মহামায়ার ঘরে। জানালা খুলে মহামায়া তখন তার শয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সেই সময় খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পরলো ঘোমটা খোলা মহামায়ার মুখে। তা দেখে রাজিব শিউরে উঠলো। সে দেখলো -

> "চিতা নল শিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগন্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"[১২]

ঠিক তখনই মহামায়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাজীবের হাজার ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে মুহূর্তের মধ্যে মহামায়া সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন -

> "সংসারের হাতে অবহেলা ও পীড়ন ছাড়া তাহারা আর কিছু পায় নাই, তবু শ্মশান হইতে মুক্তি পাইবামাত্রই তাহারা আবার সেই সংসারেই ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো বৃক্ষে আর তাহাদের স্থান হয় নাই।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সমাজের সত্যিকার পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র মানুষের চেতনার মাধ্যমে। কেবল বাইরের আচারে পরিবর্তন এনে কাজ হবে না, মানুষের মনোজগতের রূপান্তরই আসল। মহামায়ার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে কোনো বাহ্যিক বিপ্লব নয়, বরং অন্তরের বিপ্লবের মাধ্যমে একজন নারী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। 'মহামায়া' কেবল একটি প্রেমের গল্প নয়, এটি এক মানবিক আবেদন—সমাজ বদলের এক নীরব, অথচ দৃপ্ত আহ্বান।

এরকমই আরেকটি গল্প 'দেনা-পাওনা'। গল্পটি বিশেষভাবে সামাজিক বদ্ধতা, পণপ্রথা, এবং নারীর অসম সামাজিক অবস্থানের এক মর্মস্পর্শী চিত্র উপস্থাপন করে। তিনি গল্পের শিরোনামেই সমাজের লেনদেনের মনোবৃত্তিকে নির্দেশ করেছেন। বিয়ে এখানে নিছক প্রেমের বন্ধন নয়, বরং এক অর্থনৈতিক চুক্তি। নারীর মর্যাদা ও সামাজিক মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় সম্পদ-বিনিময়ের ভিত্তিতে।

রামসুন্দর মিত্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তার পাঁচ পুত্র এবং একটি মাত্র কন্যা নিরুপমা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিতা রামসুন্দর মিত্র মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলের সঙ্গে নিজের কন্যা নিরুপমার বিয়ের প্রস্তাব দেন। বরপক্ষ পণ স্বরূপ দশ হাজার টাকা এবং বহুল দান সামগ্রী চেয়ে বসে। রামসুন্দর কিছু মাত্র বিবেচনা না করে তাতে সম্মত হয় কারণ এমন পাত্র কোনমতেই সে হাতছাড়া করতে চায়নি। কিন্তু এত টাকা সে কোথায় পাবে? বাড়ি বাঁধা দিয়ে, গয়না বিক্রি করে, বহু চেষ্টায় কিছু টাকা জোগাড় হল কিন্তু এখনো ছয়-সাত হাজার টাকা বাকি। সেই বাকি টাকা একজন বলেছিল সুদের পরিবর্তে ধার দেবে কিন্তু বিবাহের দিন তার দেখা মিলল না। টাকা না দিতে পারার জন্য রায় বাহাদুর এই বিয়েতে বেঁকে বসলেন –

"টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্ত করা যাইবে না।"[১৪]

রামসুন্দর সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরে কাকুতি জানালেন -

"শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব।"[১৫]

পণের টাকা না পেয়ে বরকে নিয়ে রায় বাহাদুর বিবাহ সভা থেকে বিদায় হবেন এমন সময় বর বলে উঠলো -

"কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।"[১৬]

এই কথা শুনে রায় বাহাদুর এবং বিবাহ সভায় উপস্থিত একদল প্রবীণ একালের শিক্ষার দোষ দিতে লাগলেন। কিন্তু বর সেসব কথায় কর্ণপাত না করেই বিয়ে করতে বসল। যথারীতি পরের দিন অশ্রু বর্ষণের মধ্য দিয়ে কন্যা বিদায় হল।

রামসুন্দর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও টাকা জোগাড় করতে পারে না। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার না হয় যত্ন, না কেউ তাকে গ্রাহ্য করে। রামসুন্দর মেয়েকে দেখতে এলে রায়বাহাদুর তো তাকে মানুষ বলেই মনে করে না, চাকর দাস-দাসীরাও তার দিকে ফিরে তাকায় না। অনেকক্ষণ বসে থেকে মেয়ের সঙ্গে কোন রকমে একটু দেখা করতে পায়, আবার কোন কোন দিন দেখা করতে পায় না। অন্যদিকে নিরুপমার খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। শাশুড়ি বলে -

"যদি বাপ পুরো দাম দিত তাহলে মেয়ে পুরো যত্ন পেত।"[১৭]

বাড়িতে এমন ভাব দেখানো হয় যেন বধূর কোন অধিকার নেই, সে ফাঁকি দিয়ে এই বাড়িতে প্রবেশ করেছে। এরপর একদিন রামসুন্দর নিরুপমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে নিরুপমা রামসুন্দরকে বলে -

"বাবা আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।"[১৮]

কিন্তু সহজে তার উপায় নেই কারণ পণের টাকা সে এখনো শোধ করতে পারেনি। তাই শ্বশুর বাড়ির লোক তাকে বাপের বাড়িতে আসার অনুমতি দেয় না। তাই উপায় স্বরূপ রামসুন্দর স্ত্রী এবং ছেলেদের না জানিয়ে তার বসতবাড়ি খানা বিচে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করল। তা না হওয়ার কারণে বহু চেষ্টায় পাঁচ জনের কাছ থেকে কিছু কিছু ধার করে তিন হাজার টাকা নিয়ে রামসুন্দর রায়বাহাদুরের বাড়ি গেল মেয়েকে আনার জন্য। কিন্তু ওইটুকু টাকা দেখে নাক তুলে রায় বাহাদুর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কথা বললো।

এই ঘটনার পর সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করে দিচ্ছে ততদিন সে বেহাই বাড়ি যাবে না। তার বহুদিন পর আশ্বিন মাসে পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে বাড়িঘর বেচার টাকায় পণের সব টাকা নিয়ে সে বেহাই বাড়ি পৌঁছালো। আজ তার কাছে সমস্ত টাকা আছে সে কাউকে পরোয়া না করে নিঃসঙ্কচে বেহাই বাড়িতে প্রবেশ করল। যেন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করছে। মেয়েকে বলল -

"এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোন গোল নাই।"[১৯]

ঠিক এমন সময় রাম সুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন তা দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে রামসুন্দর কে বলল-

"বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?"[২০]

তাদের দুজনের মধ্যে এই তর্কাতর্কি নিরুপমা শুনতে পেয়ে তার কণ্ঠে উঠে এল এক নিরব প্রতিবাদ -

"টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনঝ মর্যাদা নেই।"[২১]

এর কিছুদিন পর নিরুপমা অসুস্থ হয়ে উঠলো। একে তো খাওয়া পরার অযত্ন, তার উপরে আবার বাক্যযাতনা। তাই নিজের শরীরের সম্বন্ধে নিরুপমা উদাসীন হবার কারণে হল কঠিন অসুখ। এই অসুখে ডাক্তার-বৈদ্য এল না। শাশুড়ি বলে এসব ন্যাকামি, বাপের বাড়ি যাবার জন্য নাটক করছে। তারপর এক সন্ধ্যায় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হল সেদিন প্রথম ডাক্তার দেখলো আর সেদিনই শেষ। মৃত্যুর পর রায়বাহাদুরের বড় বউ বলে মহাসমারোহে হল তার সৎকার এবং শ্রাদ্ধ। সকলে দেখল এ বাড়ীর বউয়ের কতখানি মর্যাদা!

অন্যদিকে ছেলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পর তার স্ত্রী অর্থাৎ নিরুপমা কে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলে চিঠি লিখলে প্রত্যুত্তরে মহিষী জানায় -

> "বাবা তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে। এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।"[২২]

আসলে আমাদের দেশে পুত্রের বিবাহে কন্যা পক্ষের কাছ থেকে পণ নেওয়ার বর্বর প্রথা সমাজ চিরদিন নতশিরে মেনে আসছে। যে প্রথার কারণে বহু সংসার শ্মশানে পরিণত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে।

সুকুমার সেন বলেছেন –

> "বিবাহের পণ লইয়া স্বার্থপর বরপক্ষের সহিত স্নেহমুগ্ধ অবিবেচক পিতার সঙ্ঘর্ষ দেনাপাওনার কাহিনীকে অত্যন্ত করুণ করিয়াছে। আধুনিক কালে ভদ্র বাঙালীর ঘরের এই নির্মম হৃদয়হীনতার পরিচয় সাহিত্যে এই প্রথম।"[২৩]

রবীন্দ্রনাথ চিরদিন বলেছেন যে সংস্কার আমরা নিজেরা সৃষ্টি করেছি যে সংস্কারের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত অশান্তি এবং যাতনা দুঃখ হয় সেই সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে। আসলে নারী এবং পুরুষের সাম্য এই যুক্তি আমরা যতই মুখে এবং কলমের লেখায় প্রচার করি না কেন নিজের স্বার্থে নারীকে তথাকথিত বহু শিক্ষিত পুরুষ এখনো পদদলিত করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পগুলিতে নারী জীবনের অনাচার ও প্রথার যে প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে তা শুধু উনিশ ও বিংশ শতকের সমাজব্যবস্থার দলিল নয়, আজও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। 'বিচারক', 'মহামায়া' ও 'দেনা-পাওনা' গল্পগুলিতে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে সামাজিক কুসংস্কার, প্রথা এবং পুরুষতান্ত্রিক নির্মমতায় নারীরা জীবনভর লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল দুঃখের চিত্র আঁকেননি, বরং মানবিক মমতা, আত্মমর্যাদা এবং নীরব অথচ দৃপ্ত প্রতিবাদের মাধ্যমেও নারীর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের পরিবর্তন কেবল আইনী নয়, মননের জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের শিখিয়ে দেয় যে, নারীকে করুণা নয়, সম্মান ও সম অধিকারের দৃষ্টিতে দেখা জরুরি। তাঁর গল্পগুলো তাই আজও পাঠককে সচেতন করে তোলে, সমাজের প্রতি গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং মানবিকতার আদর্শ স্থাপন করে। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পসমূহ নারীজীবনের অন্তর্লীন বেদনা ও সংগ্রামের অনুপম সাহিত্যিক দলিল হয়ে রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র:

১. দাস, শিশিরকুমার, ১৯৬৩, বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩), কলকাতা, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা: ১০২

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫২, গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), নতুন সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা: ৩৯৩
৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৪
৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৫
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৯৫
৬. সেন, অতুল, ১৩৬৪, আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা, সাহিত্যলোক, পৃষ্ঠা: ৮৪
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৩, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), নতুন সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা: ১৪৮
৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫১
১০. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫১
১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫২
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫৩
১৩. বিশী, প্রমথনাথ, ১৩৬১, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৫
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৫৩, গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), নতুন সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা: ১৩
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬
২০. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬
২১. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬
২২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮
২৩. সেন, সুকুমার, ১৩৫৩, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা: ২৬২।

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা : বোধির একান্ত অভিশাপ

সৌরভ মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ যেমন বাংলাভাষাভাষী একটি বৃহৎ ভূখণ্ডকে ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে মুক্ত করেছিল, তেমনি সেই ভূখণ্ডের অনুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মননে ও চিন্তনে এনেছিল সর্বাত্মক পরিবর্তন—যার প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল সাহিত্যে, বিশেষত কবিতায়। একাত্তরের সংগ্রামী চেতনা বাংলাদেশের কবিতাকে পূর্ববর্তী দুটি দশকের কবিতার ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও তরল ভাবালুতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক নির্ভার সমসময়-আশ্রিত শ্লোগানধর্মী কাব্যপ্রচেষ্টার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল—যার নিরাবেগ রক্তহীনতা থেকে বাংলা কবিতাকে আবেগময় ঔজ্জ্বল্যের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন আটের দশকের কবিরা। বস্তুত আশির কবিতায় প্রেম-প্রকৃতির পুনরাবির্ভাবের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল এক কঠোর বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি, যার আওতায় ছিল সমাজ-সমকাল থেকে কবি নিজেও। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমিক অবনমন কবিকে কোনো জনবিচ্ছিন্ন ফুলবাগিচার বুলবুল হয়ে গান গেয়ে যাওয়ার অবকাশ দেয়নি—বরং তাঁকে নেমে আসতে হয়েছে দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-মৌলবাদ-গুন্ডামির রক্তগন্ধী প্রতিবেশে, পা রাখতে হয়েছে দুর্বলের প্রতি সবলের অমানুষিক অত্যাচারের রক্ত ও অশ্রুতে পিচ্ছিল ধূসর রাজপথে। সচেতন ইন্দ্রিয়সংঘাতে যে বোধির জন্ম হয়েছে কবির মননে—তা তাঁকে চাঁদ-ফুল-রমণী-নিষিক্ত মধুর গৃহকোণে থাকতে দেয়নি—দিয়েছে অন্ধকারের দৃষ্টি, বাধ্য করেছে আত্মসমীক্ষণে। 'বোধি' তথা আত্মসচেতন ও সময়সচেতন মননের দৃষ্টিসক্ষমতার এই অভিশাপ তাড়া করেছে আটের দশকের অন্যতম কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে। তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টার কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত এই বোধিজাত অনুভবকেই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে বর্তমান প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ: খোন্দকার আশরাফ হোসেন, কবিতা, বাংলাদেশ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, আত্মবীক্ষা, সমাজবীক্ষা।

মূল আলোচনা:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আটের দশকের কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০-২০১৩)-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'পার্থ তোমার তীব্র তীর' (১৯৮৬), 'জীবনের সমান চুমুক' (১৯৮৯), 'সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর' (১৯৯২), 'যমুনাপর্ব' (১৯৯৮), 'জন্মবাউল' (২০০১), 'তোমার নামে বৃষ্টি নামে' (২০০৭), 'আয়(না) দেখে অন্ধ মানুষ' (২০১১), 'কুয়াশার মুশায়েরা' (২০১৩) ইত্যাদি। এই কবি বয়সানুযায়ী হতে পারতেন ষাটের শেষ বা সত্তরের সূচনাপর্বের কবি, কিন্তু তিনি আত্মপ্রকাশ করেন আশিতে, তথাকথিত বেশি বয়সেই। সদ্যযৌবনে একদিকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকের কালো হাত গুঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান, আর অন্যদিকে দেখেছেন কীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্রমশ স্বৈরাচারিতার দিকে,

গণতন্ত্র-বিরোধিতার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। মুজিবহত্যার (১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫) পর দেড় দশকব্যাপী (১৯৭৫-৯১) সামরিক শাসন, পুঁজিবাদের একাধিপত্য, দারিদ্র ও বুভুক্ষার যুগপৎ আক্রমণ, ধর্মীয় গোঁড়ামির আগ্রাসন ব্যক্তির অন্তর্লীন শুভত্বেও ভাঙন ধরায়। আর এই প্রেক্ষিতে সমসাময়িক কবিকর্মীদের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ, ভূয়োদর্শী, মেধাবী এই কবির কবিতায় তাই স্বাভাবিক ভাবেই মৌল বিষয় হয়ে ওঠে সময়, সমাজ ও ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্ক। ফলত, প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর মধ্যে এক ধরনের পরিণতির ছাপ লক্ষ করা যায়, অনুধাবন করা যায় তাঁর নিজস্ব আত্মবীক্ষা ও সমাজবীক্ষা।

মানুষের এই পৃথিবীতে কবি নিজেকে অনুভব করেনএক নিঃসঙ্গ একক সত্তা হিসেবে—এক 'এলিয়েন' যেন, অথবা কোনো এক ঈশ্বরপ্রতিম সত্তা। মধ্যরাতে তিনি নেমে আসেন এ পৃথিবীতে, 'নক্ষত্রের টুপি' আর 'কালো মেঘের আলখাল্লা' খুলে রেখে পরে নেন সামাজিক বেশ— 'মসৃণ গোঁফ, দোলানো চুলের বাহার', আর তারপর দূর থেকে নিরীক্ষণ করেন একটি বিফল বিভ্রান্ত দিনের কর্মসূচী। সাদা জ্যোৎস্নায় ক্লান্ত বেশ্যার মতো শুয়ে থাকতে দেখেন তিনি মানুষের শহরকে—যেখানে করোটির দাঁতের মতো অপার্থিব ভয়ালতায় জেগে থাকে নিয়ন আলোর সারি। ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা ভিখারির পায়ের মতো অকিঞ্চিৎকরতায়, অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখেন মানুষের বস্তি, কসাইখানা আর বিশ্ববিদ্যালয়—স্বরূপে তাদের মধ্যে কোনো তফাৎ খুঁজে পান না হয়তো। শেষরাত্রির নৈঃশব্দ্যময় আশীর্বাদ ভেঙে যেতে দেখেন তিনটি মাইকের কর্কশ ধমকে—'নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ভালো'; বোঝেন— 'বোধহয় তোমাদের সামনে মাঝামাঝি পথ নেই', নেই কর্মময় জীবনের মাঝে ঈশ্বরকে সন্ধানের প্রয়াস। বস্তুত আটের দশকের বাংলাদেশে ধর্মীয় গোঁড়ামি পুনরায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়, "জিগির ওঠে সাম্প্রদায়িক-ইসলামি মূল্যবোধের, সামরিক লেবাসে গণতন্ত্র আর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত রাষ্ট্রের মৌল স্তম্ভগুলো বাতিলের প্রচেষ্টার।"[১] কবি তাই অনুধাবন করেন, কর্মময়তা এ শহরে ভাবনাহীন অন্ধ শ্রম, যা দিনের শেষে ক্লান্তি ক্লেদ আর মালিন্য ছাড়া কিছুই উপহার দেয় না—

মানুষেরা কেমন ঘোরের মধ্যে হাঁটে সারাদিন,
পালানো পাখির খোঁজে মাঠঘাট রাজপথ, প্রমত্ত এভিন্যু
হেঁটে যায়, জীবনের কণ্ঠা ধ'রে ঝুলে থাকে বাসের যাত্রীরা,
এ-পাড়া ওপাড়া ঘুরে ক্লান্ত হয় ফেরিঅলা, তার
মুলিবাঁশ-চেরা হাত নেমে আসে বেলুনের সুতা থেকে,
মুখোশের বাঘ
একলাফে খেয়ে নেয় দ্বিপ্রহর স্বপ্নাবলী, কপালের ঘাম।

('ইনসমনিয়া'/ তিন রমণীর ক্বাসিদা)

রমণী এখানে রতিপতাকা উঁচানো গালে সঙ্গীবদলের উত্তেজনাময় খেলায় মাতে। তাঁর কবিতায় নান্দনিকতার ক্লাসিক প্রতিমূর্তি বনলতা সেনকে বলতে শোনা যায়— "কি যে কন মিয়াভাই, মোরে তো চ্যানেন?/ দুচোখে মাস্কারা মেখে বলে গ্যালো বনলতা সেন।" ('পুরনো কবিতা'/ সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর)। যে শহরে উপাস্য হতে পারতেন প্রেমের দেবতা, সে শহর নিমগ্ন কামচণ্ডালীতে। তাই এ শহরে প্রেমিকযুগলের অন্তিমপ্রাপ্তি বিষণ্ণতা আর বিচ্ছেদ। সমকালীন আর্থসামাজিক কাঠামোতে পুঁজিবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে একট বিশেষ শ্রেণির হাতে। অন্যদিকে কৃষিজীবী বাঙালি ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির তীব্র অবক্ষয়ে ১৯৭৪-এ দেখা দেয়

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। স্পষ্টত শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টি হয়, গজিয়ে উঠতে থাকে কায়েমী স্বার্থপর ভোগবাদী শ্রেণি—যারা স্বেচ্ছাচার, অপরাজনীতি, ক্ষমতালোভের বৃত্তে পড়ে ক্রমে দুর্বৃত্তায়নের দোরগোড়ায় পৌঁছয়। সামরিক শাসনে পুনর্জন্ম হয় বিলাসব্যসনে মগ্ন স্থবির আমলাতান্ত্রিক শ্রেণির। আর অন্যদিকে, উপবাসী কাকের মতো একদল মানুষ চেয়ে পায় না কোনো সাহায্য এমনকি মনোযোগও, গোরস্থানই হয়ে ওঠে তাই তাদের শেষতম গন্তব্য। তাই এ শহরে মরা চাঁদ শেষ রাতে খাটিয়ায় চেপে গোরস্তানে যায়। পিছনে চলে এক দীর্ঘ শবযাত্রা—

অগম্যাগমনকারী, মাতাল শুঁড়িওলা, অন্ধ ভিখিরি
তার পাশে দণ্ডায়মান।
ক্রমে শবযাত্রা দীর্ঘ হতে থাকলো। তোমাদের লম্পট কবিরা
আর সংস্কৃতির ধাড়ি শকুন হাফ আমলা, মোল্লা ধড়িবাজ,
গলায় ক্রুশ এ যুগের যুডাস—
সকলেই যোগ দিল সে যাত্রায়: ঈশ্বর-প্রশস্তি উঠলো গলায় গলায়
ধর্মগন্থ থেকে পাঠ করতে থাকলো সবাই—
'কুল্লে নাফসেন জায়েকাতুল মউত'
'জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু'

('এলিয়েন'/ তিন রমণীর ক্বাসিদা)

এই শ্বাপদ সময়ের থাবা থেকে বাঁচতে চান কবি, চলে যেতে চান ঘুমের গভীরে, নিভৃতির মগ্নতায়। তাঁর আশা, নিভৃতের নিমগ্ন সন্তাপ তাঁকে লুকিয়ে রাখবে গহিন আলকোভে, সেখানে "হন্তারক সময়ের উদ্যত সঙীন, তার অশ্বমেধ ঘোড়া/ গহন বনের মধ্যে আমাকে পাবে না খুঁজে কোনদিন আর।" ('বনপথে নগ্নপদ'/ঐ) রোম্যান্টিসিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তপোধীর ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছিলেন—

এরকম বলা যেতে পারে যে রোমান্টিকতাবাদের মূল ভিত্তি হল যথাপ্রাপ্ত বাস্তবতার অগ্রহণযোগ্যতা, বাস্তবের সংরূপ ও স্বভাব সম্পর্কে সংশয় ও আতঙ্ক। আর, অনিবার্যভাবে বাস্তবতার সন্ত্রাস থেকে বহু দূরে সরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে বাস্তবের বন্দীশালা থেকে সৃজনী কল্পনার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। নির্জনতা ও ব্যক্তিগত অনুভূতির একান্ত নিজস্ব পরিসরে সত্তার মুক্তি সন্ধানই রোমান্টিকতাবাদের প্রধান অন্বিষ্ট।[২]

রোম্যান্টিকতার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন, তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, নির্জনতায় মুক্তি সন্ধান ইত্যাদি এসব কবিতায় অনুধাবনীয়। কিন্তু ক্রমশ কবি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন রোম্যান্টিক বিহ্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে। বস্তুত সুতীব্রভাবে সময়সচেতন ও আত্মসমীক্ষণাত্মক প্রবণতাসম্পন্ন, অনুভূতিশীল একজন কবি— যিনি নিজেই একসময় শামিল হয়েছিলেন অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার, স্বাধীনতায় বেঁচে থাকবার কঠোর লড়াইয়ে, তাঁর পক্ষে এভাবে সময়ের ক্ষতের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকা অসম্ভব। তাই হয়তো তাঁর কাছে এসে পৌঁছয় 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' (ক্বাসিদা=সংবাদ বহনকারী)। তারা শুদ্ধ জগতের মেয়ে তিনটি বোন, তারা যাচ্ছিল দূরে মুগ্ধতার রাজবাড়ি, কাঁখের কলসে ছিল পূর্ণতার অবিমিশ্র ফল ও জলধি। কবি দেখেছিলেন, তাদের তিন বোনকে ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া বেয়ে নেমে আসতে, সামনে এসে দাঁড়াতে তিনটি বৃক্ষের প্রাজ্ঞতায়। তারা কবিকে উপহার দিয়েছিল অন্ধতা—

ওরা বলে, 'চক্ষু দিয়ে তুই শুধু আলোক দেখিস,
ফুল আর মমতা শৈবাল তোর হৃদয় খেয়েছে, বৃদ্ধাঙ্গুলে
সবুজ পাতার অন্তর্ভেদী শিকড় গজায়, তুই
মানুষ চিনিস না, চিনিস না অন্তর্গত শূন্য আর পূর্ণের জ্যামিতি:
তোর চোখ অন্ধকার, অন্ধকার আজ তোর চোখ হোক তবে।'

('তিন রমণীর ক্বাসিদা'/ঐ)

তারা তিন বোন নিয়তি দেবী, বুনে যায় 'সূক্ষ্মতন্তু জাল'—এক বোন ক্লোদো, সে ঘোরায় 'তারার চরকা'-য় ভাগ্যের চাকা; দ্বিতীয় বোন ল্যাচেসিস, সে মাপে সুতোর দৈর্ঘ্য; তৃতীয় বোন আত্রোপস, সে ইচ্ছেমতো কেটে দেয় জীবনের সূক্ষ্মতন্তু সুতো। গ্রিক পুরাণকথার এই তিন বোন আসলে কালচক্রের তিনটি বিন্দু—আত্রোপস অতীত, ক্লোদো বর্তমান, ল্যাচেসিস ভবিষ্যৎ। নবজাতকের জন্মের সময় এরা আসে, বলে যায় তার আজীবনের কর্মধারা, আর তার মৃত্যুর পথ। বাতলে দেওয়া সে পথ এড়ানোর সাধ্য নেই জাতকের। তাদের ছুঁড়ে দেওয়া 'সুতলির টাক'-এর ঘূর্ণ্যমান চক্রব্যূহে 'নিবদ্ধ শিকার' কবিও—সময়ের হাত এড়িয়ে নিজের জন্যে একান্ত কোনো বিশুদ্ধতার আলয় খুঁজে নেওয়া কবির পক্ষে অসম্ভব। আলোকের সন্ধান আর পাবেন না তিনি, পাবেন না কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। আসলে তারা কবিকে দিয়ে গেছে প্রজ্ঞার দৃষ্টি, বোধি— যা তাঁকে আর আবদ্ধ থাকতে দেবে না একাকী সুখভোগের ক্ষুদ্র পরিসরে। অথচ তিনি তো চেয়েছিলেন সামান্যই— শুধু 'জীবনযাত্রার মতো অমরতা'! কিন্তু বোধির অভিশাপ— কোনোদিনই তিনি পাবেন না কোনো ঘরের আশ্রয়, পারবেন না স্থিতু হতে। তিন দিক থেকে তিনটি পথ এসে তাঁর পায়ের গোড়ালি চুম্বন করে যাবে, অতীত-ভবিষৎ-বর্তমান—পথের এই ত্রিকাল রেখা তাঁকে আজীবন পথেই ঘোরাবে। ত্রিকালজ্ঞ অন্ধ টিরেসিয়াসের মতো অকৃতকার্যতার অক্ষমতায় সময়ের সুতীব্র হননলীলা দেখে যাওয়াই তাঁর নিয়তি, পৌরুষের গোপন অসুখ নিয়ে হেঁটে যাবেন তিনি চৈত্রের দীঘল প্রহর আজীবন —

শুধু তোর মুক্তি নেই, আলোকে আলোকে কিংবা তারায় তারায়
ছোটে না স্বপ্নের ঘোড়া, হাত থেকে ঝরে গেছে পিছল লাগাম।
রুক্ষ পথে নগ্নপদ তোর দিন তোর রাত্রি, কুয়াশা শিশির
রৌদ্রতাপ, ঝড়ঝঞ্ঝা উৎপাটিত প্রাজ্ঞবর বৃক্ষের শরীর,
নর্দমায় মৃত পশু অন্ধকার গলিপথে হিংসায় পড়ে থাকা লাশ,
বেশ্যার গোপন ব্যাধি, পরিত্যক্ত অবাঞ্ছিত শিশুদের দেহ
একদিন শরীরে তোর উঠে যাবে, আয়ুব নবীর মতো ঘায়ে
কোমল শরীরে তোর ফুটবে গোলাপ, গালে তোর
সময়ের সব দুঃখ, অশ্রুপাত হাহাকার সন্ত্রাস সংঘাত
এঁকে দেবে লাল বৃত্ত। তুই মানুষের হবি, তুই
পথ হবি, পথের প্রশ্বাস হবি, জ্বালা হবি, দগ্ধ হবি,
হবি পাপ, নিহত চন্দ্রের নীচে বেওয়ারিশ লাশ, গ্রাম থেকে
উঠে আসা কিশোরীর বিপন্ন ইজ্জত, হবি নরকের প্রথম প্রহরী—

('বাস কোথা যে পথিক'/ পার্থ তোমার তীব্র তীর)

সময়ের ক্রীড়ার এই বোধই তাঁকে বিপর্যস্ত করেছে, বিনিদ্র করেছে। ঈশ্বরপ্রতিম ‘এলিয়েন’ ঐ সত্তার মতো তিনি আর দূর থেকে দেখতে পারবেন না মানুষকে, তাঁকে দাঁড়াতে হবে এসে তাদের দুঃখের উঠোনে। তাঁকে দেখে যেতে হবে সুন্দরের হনন, তাঁর বিনিদ্র চেতনায় কেটে বসবে মানুষের যন্ত্রণার দাগ। উপদ্রুত প্রজ্ঞার ছায়ায় তিনি দেখতে পাবেন নিদারুণ ভবিষ্যৎ, তাই “পৃথিবী বিরুদ্ধে যাবে, বন্ধুরা ঈর্ষায় দেবে কালোরং থুতু/ কোনো ঘর কোনদিন পথ থেকে ডাকবে না তোকে”(ঐ)। দেখে যেতে হবে মৃত্যু ও মারীর উৎসব, রমণীর অসতীত্ব, পুরুষের ভণ্ড ধার্মিকতা। অনুভূতির তীব্রতায় সমস্তই গ্রহণ করতে হবে তাঁকে, বহন করতে হবে মানুষের পাপের ভার, মানবতার বিপন্নতা আর অমানবতার নারকীয়তা সমানভাবে আক্রমণ করবে তাঁকে।

সময়ের, সমাজের বিকৃত গলিত রূপে বীতশ্রদ্ধ কবি নিজে হাতেই ভেঙে দেন জীবনের নান্দনিক দর্পণ। সেই বিচূর্ণ কাচে শোনা যায় শতচক্ষু কোকিলের বাক্যালাপ—সেন সমাজমোড়লদের প্রতিভূ সে। সৌন্দর্যের প্রতীক গোলাপ কামনার তীরবিদ্ধ, আর ছিন্নভিন্ন চাঁদ লুটায় ধুলোয়। প্রকৃতি বা মানুষের প্রতি নিহিত ভালোবাসা আর করুণাকে কবি স্বেচ্ছানির্বাসন দেন। তুমুল বৃষ্টি তাই তাঁর কাছে ঠ্যাং ফাঁক করা বিপুল জলস্রাব, আজীবন-কাঙ্ক্ষিত সুখের পাছায় কষে তিন লাথি মেরে বলতে পারেন ‘ভাগ্ শালা’, রাজপথে হেঁটে যাওয়া বেশ্যা আর বণিকের কপিশ মুখে ছুঁড়ে মারতে পারেন থুতু—

এখন আমার নেই অতীত অথবা ভবিষ্যৎ
আমি গালের চামড়া চিরে ত্রিফলা ছুরির টানে
আঁকতে পারি আঁকাবাঁকা বাঘের টোটেম
পর্বতের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়তে পারি
জীবনের ঘাড়ে

(‘হনন’/জীবনের সমান চুমুক)

তবু দেখেন, ‘আয়নার ভাঙা কাচে একটি জীয়ল কৈ লাফাচ্ছে ভীষণ’—এখনো ছেড়ে দিতে পারেন না সুন্দর, সুস্থ জীবনের আশা। সেই কল্পনারই প্রতিভূ হয়ে আসেন কি রবীন্দ্রনাথ? হয়তো বা, তাই সেই আয়না-বাড়ির স্তব্ধ কোকিলেরা রবীন্দ্রনাথের দাড়ি আর চোখের উদ্ভাস দেখে ‘অকস্মাৎ মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায় বলে/ গলায় বসাল ছুরি’(ঐ)। ছিটকে যায় দুটো চোখ দুদিকে, চূর্ণিত পায়ের কাছে পড়ে থাকে অলৌকিক আলখাল্লা, শিশ্ন ও কলম। যা কিছু ছিল সৃষ্টি-সক্ষম, স্বপ্নদেখানোর যোগ্য—সে সমস্তই একে একে বিরূপ সময়ের গ্রাসে গ্রসিত হয়। তীব্র জিঘাংসায় কবি নিজেকেই ছুরিবিদ্ধ করেন, সে কি ‘মৃত্যুর স্বাধীনতা’ পাওয়ারই আশায়? মৃত্যু তো নিশ্চিতই, তবু বেঁচে থাকার জন্যে বুকের গভীরে নামাতে হয় বিষের দানা, মানবিকতার বিশাল সমুদ্রকে বাঁধতে হয় তীরের পাথরে, আর তাঁবুর পিছনে ডেকে নিয়ে মমতাকে করতে হয় নিমখুন। ঘৃণা, করুণা আর ব্যঙ্গ মিলেমিশে তৈরি হয় এইসব পঙ্ক্তি—

অনেক দিন তো গেলো গোলাপের প্রতীক্ষায়
ফুটন্ত জলের মধ্যে দেখে মুখ নিজের দুঃখের
এবার সহর্ষে দাও হাততালি
দুধারে প্রচণ্ড হোক তীব্রতার ঘোড়া
শপাং শপাং নেমে আসুক চাবুক
অপেক্ষায় তুঙ্গ কর চূড়া (‘সার্কাস’/ঐ)

নিষ্ঠুরতা আর হিংস্রতার বাষ্পস্রোতের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা, মৃত্যুর অপেক্ষায় বেঁচে থাকা, তবু, বেঁচে থাকা। শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই কবিকে হয়ে উঠতে হয় এক নরভোজী শ্বাপদ, যে নিরন্তর মানুষকে পিষ্ট করে নিজের স্বার্থান্ধতার থাবার নিচে। কিন্তু তার ফলভোগও করতে হয় অনুভূতিশীল মানুষকে। যে বাঘ হরিণের শিঙেল যৌবন থেকে ঘুম চুরি করে, সে নিজেও কিন্তু রাত কাটায় নির্ঘুম উৎকণ্ঠায়—বনের হাওয়ার শাবল তার ঘুম কেড়ে নেয়। এ বাঘ তাই 'অর্ধশিক্ষিত' বলে মনে হয় কবির। নিজের অস্তিত্বকে তিনি বাস্তব পৃথিবীতে নির্বিকারে বসবাসের উপযুক্ত করে তুলতে পারেননি এখনো—এখনো সে শিখে উঠতে পারেনি ভেল্কি আর মেকির বিদ্যা, এখনো সে 'রক্তপিপাসাকে শিল্প বলে চালাতে পারে না', 'ছুরির হিংস্রতাকে বিকোতে পারে না শল্যচিকিৎসা বলে'। ব্যঙ্গ করে কবি বলেন, এ বাঘ একদিন তাঁকেই খাবে। তিনি তো বাকিদের মতো নির্বিকার হতে পারেননি, তীব্র বিবেকের তাড়না তাই তাঁকেই ভোগ করতে হয়।

ঘূর্ণ্যমান সময়ের কালোছায়া চক্রনেমির তলায়, বিনাশি প্রহরে এ অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। চারপাশে তাকিয়ে দেখা যায়, "এখন উদ্ভটতার ব্যাকরণ হাতে দীর্ঘ আলখাল্লা-পরা অন্ধকার/ আলোর উঠোনকে খুব শাসাচ্ছে" ('বর্ষা ১৩৯৫'/ সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর), দেখা যায়— 'বাস্তুঘুঘুর সময় এসেছে তুলনাহীনের দেশে' ('ঘোড়সওয়ার'/ যমুনাপর্ব)। আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখা যায় স্বৈরাচারী ইস্পাতের চাদর। ক্ষমতায় ব'সে হাস্যকর, অকর্মণ্য 'প্যাণ্ডেলে ঘেরা ম্যাজিকের দল'। ভণ্ড, ভেল্কিবাজ শ্রমণের দলই আজ জ্ঞানী বুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ফলশ্রুতি, তাদের অধীন 'ধর্মসংঘ' পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে নরখাদক বকরাক্ষস আর মস্তানে। দেশ যদিও অত্যাচারে উজাড় হয়ে যায়, তবু মধ্যবিত্তের কোনো হেলদোল নেই। পুরুষ নারীলোলুপ, নারী বস্ত্রলোলুপ, তরুণ অস্ত্রসজ্জায় মগ্ন, তরুণী মত্ত টিভিপর্দায় স্বপ্নবয়নে। বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ ও ভোগবাদী পণ্যায়নের সার্বিক আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়ে ব্যক্তিমানুষ ক্রমে হয়ে ওঠে স্বার্থান্ধ, আত্মউন্নতিসর্বস্ব। দেশ বা জাতির কল্যাণভাবনার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তিগত স্বার্থ, মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত জাতিগত প্রগতিচেতনার মূল বিনষ্ট হতে থাকে ক্রমে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ছোট ছোট বৃত্তে আটকে পড়া মানুষ ক্রমে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর হয়ে উঠতে থাকে অপশাসনের সহায়ক। প্রতিশ্রুত ঘোড়সওয়ারের কাছে কবি উদ্ধার চান না, চান 'চোরাগোপ্তার গোপন পার্ট' শিখতে, ভোটের বাক্সে ফুল ফোটানো শিখতে, কিংবা রানির নফরের নেড়ি আর বেড়ালগুলোর মত কী-করে ভাজা মাছের উল্টো পিঠে বেশ করে চর্বি মাখানো যায়, তাই শিখতে। এগুলোই তো এখন বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র! বাকিদের মতো তিনিও চান অত্যাচার সামনে দেখেও চোরাচালানের চোলাই মদে ডুবে যেতে, প্রখর পদ্য লিখে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে, এড়িয়ে যেতে যাবতীয় দায়িত্ব—এ চোরাবালিতে যেন তাঁকে না ডাকা হয়—'আমি শুয়ারের নবীন বাচ্চা/ আছি বড় সুখে বিমলানন্দে'—

আমার দুচোখে ঘনায় যদিও শ্রাবণ-মেঘ
তুড়ি মেরে তাকে গুঁড়াও তোমার খুরের মধ্যে
ভিটেতে ঘুঘুর বিলাপ উঠুক
নির্বিকার
সোনার মেকুর খেয়ে যাক এসে পাতের মাছ
ম্যাজিকে ভুলেছি, মনোহারিণীর
রূপের ছাঁদ

ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট ভোলালো চমৎকার

আস্‌সালাম্ হে ঘোড়সওয়ার!
আল্‌বিদা হে ঘোড়সওয়ার!

(‘ঘোড়সওয়ার’/ঐ)

এই ভণ্ড ক্ষমতাবানদের নিশানায় থাকে শিশু আর নারীরা, কারণ তারাই ‘সফ্‌ট টার্গেট’। আর সেই শিশুঘাতী নারীঘাতী নরপশুদের বৈধতা দেয় তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, কবিও যাদের একটি অংশ। তাই আসে এই স্বীকারোক্তি—‘আমরা মৃগয়ায় গিয়েছিলাম কাল/ পাঠকক্ষ থেকে অনেক আনন্দ বেশি মৎসশিকারে’ (‘ট্রিগার হ্যাপি’/যমুনাপর্ব)। নারী আর শিশুর রক্তে চোবানো রোহিতমৎস শিকারের আনন্দে মশগুল বুদ্ধিজীবীর চোখে নগরীর প্রশস্তপথ, ছায়াময় বৃক্ষতল, রেনট্রির চায়ের আসর—সমস্তই হয়ে ওঠে মৃগয়াক্ষেত্র। হাঁক ওঠে, ‘নগরীতে জাল ফেলো’, কারণ— ‘আমিষের কাল এলো’—

খুলেছে অহিংস স্কুল নিরূপিত ধর্মের বেড়াল
কাঁটা এঁটো হৃদয়ে নমস্য হলো উত্তরপাড়ায়
গেঁথে নাও চুলের খোঁপায় কিছু আর কিছু জেবের ভেতর
ভোজ হবে শিশুদের, খাওয়া হবে কচিমাংস কেটে
উহাদের মাংস খুব নবনীত কোমল ইস্‌থেটিক (ঐ)

কবি দেখতে পান—তাঁর স্বপ্নের শব পড়ে থাকে পথ জুড়ে, পড়ে থাকে মৃত শিশুদের হাড় আর ঘরপোড়া নারীর সিঁদুর। বাংলাদেশের ন’হাত মাটির নিচে তৈরি হয় এক বিরাট হাড়ের খনি। কবরের আবরণের নিচে, অশ্রুজলের তোড়ের নিচে স্তবকে স্তবকে সাজানো থাকে নারী পুরুষের খুলি, জঙ্ঘা আর চোয়াল। সে অস্থিসমুদয় ডাক পাঠায় কবিকে, মৃতবৎ ঘুমের ভেতরে। সেইসব করোটিতে রোদ নয়, দেখতে পান ‘ধুলোমাটি বিস্মৃতির পলেস্তারা, আমাদের নির্বেদের কাদা’। সারে সারে নারীপুরষ তাদের কর্তিত শির হাতে সামনে এসে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে ছট্‌ফটিয়ে ওঠে ভয়, ঘৃণা—

ঐসব নারীদের হলুদ যৌবন নিয়ে যারা
খেলেছে কৌতুক ক্রীড়া
তাদের মধ্যে কি ছিলাম আমিও?

(‘বধ্যভূমি থেকে’/জন্মবাউল)

কিন্তু কবিকে পড়ে থাকতে হয় গোষ্পদলাঞ্ছিত নুড়ি পাথর হয়ে, কারণ ‘কবি একা তার হাতে নিদ্রাহীন কুকুরের গান’ (‘অনিদ্রার গান’/ সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর)। কবি আজ আর সেই আদিম মন্ত্রদ্রষ্টার ভূমিকায় নেই, যে বিপর্যয়ের কালো মেঘ কিংবা অত্যাচারের অনন্তশীর্ষ নাগকে ধুলোপড়া মন্ত্রে বশ করতে পারবে। কবিতার সেই সুরবাহার আজ ভোরের আকাশে মাতালের শিস্। কবি আজ পায় শুধু কুষ্ঠরোগীর সেলাম, আর কবিতা পড়ে থাকে খন্নাস (শয়তান)-এর হাতে। অতিরোম্যান্টিক ‘কুমড়োর ডগা’ অথবা সমাজভাগাড়ে মাংসখোর শকুনের চঞ্চুপুটে ছাড়া আজ আর ‘কবিতেশ্বরী’-র স্থান নেই, কবিও আজ ‘আনন্দ হি কেবলম্’ জপমান ‘সুধন্য কার্তিক’ মাত্র। আসলে তো—

আকাশ অক্‌শনে বিক্রি হয়ে গেছে ফ্ল্যাটব্যবসায়ীদের হাতে
সমুদ্র এখন বহুজাতিকদের যথেচ্ছ চিংড়ির ঘের

প্রতিটি কবির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে নেড়িকুত্তার দল
এখন দুন্দুভি বাজাবো, সেই উন্মাতাল যুদ্ধক্ষেত্র কই?

('অনন্তনাগের গল্প'/ যমুনাপর্ব)

প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয় রাজনীতি, শুরু হয় দলাদলি, আর অনুজ কবি বয়োজ্যেষ্ঠের পিঠে পোঁতে ছুরি। কবিদের 'তুমুল পশ্চাৎ আঠা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত', পারস্পরিক পিঠচুলকানিতে ব্যস্ত কবিদের চোখ সেলাই করে সাঁটা, 'রাহমান' (শামসুর রাহমান) বা 'সৈহক' (সৈয়দ শামসুল হক)-দের মতো প্রবীণ কবিরা রোম্যান্টিকতার জাবর কাটেন, রভসরসে আত্মরতির মালা জপেন। কবিতা লিখেই খেয়ে-পড়ে বাঁচতে হবে, তাই কলাকৈবল্যের নামে বিকোয় খিস্তি-খেউড়, 'এবং বিষয় বাঁধা—নারীর পেয়ার।' এই সময়ে প্রকৃত কবির আর কীই বা করার থাকে, নিজের প্রতি অন্ধ আক্রোশে পুড়তে থাকা ছাড়া?

আর এই নিরন্তর ঘৃণা
কাঁধে-কাঁধ ধাক্কা থেকে বহুদূর নির্জনতাকে বলি,
অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালাও, বসি দুইজনে,
পোড়াই ঘৃণার তাপে কালের কহ্লা
অথবা নিজের ক্রোধে অসহায় পুড়ি
দু'ধারে জ্বালানো মোমবাতি।।

('সদানন্দের পদাবলী'/ জন্মবাউল)

আর তাই তাঁর এপিটাফ হয়ে ওঠে বোধির নিরন্তর যন্ত্রণায় একাকী জীবনের বিধুর কণ্ঠস্বর—"আকাশের শেষ সূর্য নিভে গেলে জেগে থাকে তিমির সফেন—/ দুঃখের ত্রিতল ঘরে মুখোমুখি বসিবার আশরাফ হোসেন।"

যুগন্ধর কোনো মসীহার মতো নয়, নিতান্তই একজন সাধারণ কিন্তু অনুভূতিশীল মানুষের মতো খোন্দকার আশরাফ হোসেন যুগযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। আলোর পথ খুঁজেছেন বারবার, চেয়েছেন জেগে উঠতে, প্রতিকার করতে সময়ের গভীর অসুখের, কিন্তু অকৃতকার্য হয়েছেন। মৃত্যুনীল উপত্যকায় সময়ের হাত ধরে হেঁটে গেছেন কবি দুধার ছুরির খর পথ, অকৃতকার্যতার আত্মগ্লানিতে হয়েছেন বিক্ষত, কিন্তু বিসর্জন দেননি তাঁর 'ট্রেডমার্ক অহংকার', বিচ্যুত হননি কবির ধর্ম থেকে। সকল ব্যর্থতার মাঝে এটুকুই তাঁর চরম পুরস্কার।

তথ্যসূত্র:

১. ইকবাল, শহীদ, ২০১৫, 'বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস', ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, পৃ. ২৫৯

২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০৬, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', তৃতীয় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৫

আকর গ্রন্থ:

খোন্দকার আশরাফ হোসেন। 'কবিতাসংগ্রহ'। দ্বিতীয় প্রকাশ। শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।

প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত সমস্ত কবিতা উপরিউক্ত গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

সেলিনা হোসেনের তিনটি উপন্যাস : শিল্পী জীবনের ছবি

সায়ন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সেলিনা হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত লেখিকা। তিনি নানাবিধ বিষয় নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন, যার মধ্যে শিল্পী-জীবনভিত্তিক উপন্যাস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিল্পীর জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস কখনো কল্পনাপ্রসূত, রূপকধর্মী বা তথ্যভিত্তিক হতে পারে। একজন শিল্পীর জীবন স্বাভাবিক জীবন থেকে ভিন্নধর্মী হয়। শিল্পীর জীবনে যে সৃজনশীলতা, চিন্তাভাবনা, বেদনা ও সৃষ্টির উৎস নিহিত থাকে, তা সাধারণ মানুষের কাছে ভীষণভাবে আকর্ষণীয়। ফলে সেই জীবনকে সাহিত্যের আকারে উপস্থাপন করা এবং যথাযথভাবে তুলে ধরা অন্য এক শিল্পীর পক্ষেও একটি কঠিন কাজ। এই প্রক্রিয়ায় লেখকের নিজস্ব আবেগ, ভাবনা ও দার্শনিক চিন্তাধারা অবচেতনে চিত্রিত জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এই প্রবন্ধে সেলিনা হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনজন শিল্পীর জীবনের উপস্থাপন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: জীবনী আশ্রিত উপন্যাস, শিল্পীজীবন ভিত্তিক সাহিত্য, তথ্য ও কল্পনার সংমিশ্রণ, ইতিহাস ও সাহিত্য, বাংলা জীবনী সাহিত্য, সৃষ্টিশীলতা ও সমাজ, আত্মজৈবনিক উপাদান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শিল্পী ও ব্যক্তি।

মূল আলোচনা:

বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যে জীবনী, আত্মজীবনী, জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যের ধারাটি বর্তমান। সব ধরনের সাহিত্যেই মানুষের ঘটনাবহুল জীবনের স্মৃতি সংরক্ষিত। জীবনী বা জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যে বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাস্মৃতির সঙ্গে সময়ের চিহ্ন সংরক্ষিত হয়। এই বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনার ক্ষেত্রে সেই বিশেষ ব্যক্তির ভাবনা-জগৎ সংরক্ষণ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কোনও বিশেষ ব্যক্তি, সে কবি, দার্শনিক কিংবা শিল্পী, তার আত্মজীবনী থাক অথবা না থাক, মানুষের অপার কৌতূহলের কারণেই সাহিত্যের এই জীবনী সাহিত্যের শাখার সৃষ্টি সেটি বোঝা যায়। এই জীবনী সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ হল জীবনীকেন্দ্রিক উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের বহু শাখা-প্রশাখার মধ্যে জীবনীকেন্দ্রিক উপন্যাস একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। যে-কোনও উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সন্ধান মেলে, কিন্তু যে উপন্যাসগুলি গড়ে ওঠে বিশেষ জীবনকে কেন্দ্র করে সেই উপন্যাসগুলিকে জীবনীকেন্দ্রিক বা জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস বলে চিহ্নিত করছি। এই বিশেষ জীবনগুলির মধ্যে উপন্যাসগুলি শিল্পী জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেই উপন্যাসগুলি আলোচ্য প্রবন্ধের আকর।

শিল্পীর দেখার দৃষ্টি, অনুভবের ক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা প্রভৃতি তাকে সাধারণ থেকে আলাদা করে। শিল্পীর প্রতিভা, মেধা, নন্দনবোধ ধীরে ধীরে তাকে তৈরি করে, সৃষ্টিশীল পথে চালিত করে। সারাটা জীবন ধরে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাবসায়ে, অমানুষিক শক্তিতে লালন করে রাখেন নিজস্ব নন্দনবোধকে। এই সাধনা করতে গিয়ে সাধারণ সমাজ, আবেগ, রীতি-নীতি, দুঃখ, অভিযোগ, অভিমান থেকে শিল্পী নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলেন। এক অর্থে বলতে পারি

নিজেকে সমাজচ্যুত করে ফেলেন। অথচ শিল্পীর যা আকর সেসব সমাজ বা বাস্তব থেকেই উঠে আসে। সেজন্য বোধহয় তার এই সমাজচ্যুতি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। যাইহোক শিল্পী জীবনটি বা তার গড়ে ওঠা যে আর দশটি জীবনের সঙ্গে এক সারিতে আসে না সেটা সত্য।

এবার বাংলা উপন্যাসের দিকে যদি চোখ ফেরায় তবে দেখব শিল্পীজীবনকে আশ্রয় করে বেশ অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও বিশেষত্ব কিছু আছে। সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কালের এই সময়রেখায় অজস্র শিল্পী এসেছেন, সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের সকলের জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়, আবার সকলের জীবন উপন্যাস উপযোগী নয়। এই জন্য শিল্পী জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ঘটনাবহুল, অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পী জীবনকে বেছে নেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাই। আবার এই বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক শিল্পী ও আখ্যানের শিল্পীর মধ্যে নন্দনতত্ত্বগত বোঝাপড়াটিও জ্ঞাতব্য।

জীবনের প্রতি জীবনের আকর্ষণ দুর্নিবার এবং সেটা স্বাভাবিকতাও একধরনের। বিশেষত সেই জীবন যদি হয় ঘটনাবহুল, বিস্ময়কর, জৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। সাহিত্যে জীবনকে ছুঁয়েই তাকে প্রকাশ করে, মানুষের জীবন, অনেকক্ষেত্রে মনুষ্যেতরের জীবনও। যাইহোক কোনো বিশেষ জীবনের প্রতি আমাদের কৌতূহল, আকর্ষণ, আকাঙ্ক্ষা প্রবল, এই রিপু চরিতার্থের কারণেই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি বোধহয়। এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত সম্পর্কিত একটি বক্তব্যের আলোচনায় তিনি বলছেন:

প্রকৃত ইতিবৃত্তের সঙ্গে যাঁর পরিচয় ঘটে গেছে তখন তিনি কেন আর 'সাময়িক' 'অনিত্য' ব্যাপারে কৌতূহলী হবেন? অবশ্য হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, বরং প্রবলভাবেই মানবিক। কবিদের জীবনের শুধু 'অলৌকিক' মুহূর্ত নয়, স্বাভাবিক, প্রাত্যহিক, সাময়িক ঘটনাগুলিতে মানুষের কৌতূহল স্বাভাবিক। এমনকী বলা চলে যে জীবনী রচনা- তা সক্রেটিস বা বুদ্ধের, হিটলার বা চার্চিলের, চার্লি চ্যাপলিন বা ধ্যানচাঁদ যারই হোক না কেন, তার পেছনে আছে মূলত কৌতূহল, অন্যকে জানান, বিশেষত খ্যাতিমানদের জানা। মূলত সেজন্যই জীবনী লেখা হয়। যেখানে তথ্যের অভাব সেখানে কল্পনার সাহায্যে, অনুমানের ভিত্তিতে শূন্যতা ভরিয়ে নেওয়া হয়।[১]

কোন বিশেষ ব্যক্তি, সে কবি, দার্শনিক কিংবা শিল্পী, তাঁর আত্মজীবনী থাক অথবা না থাক, মানুষের অপার কৌতূহলের কারণেই সাহিত্যের এই জীবনী সাহিত্যের শাখার সৃষ্টি সেটি বোঝা যায়। এই জীবনী সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ হল জীবনী কেন্দ্রিক উপন্যাস। বাংলা ভাষার উপন্যাসের ধারায় চোখ রাখলে আমরা দেখব বহু বিশিষ্ট জনের জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা হয়েছে।

স্পষ্টতই জীবনী ও জীবনী ভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। একটি জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতার প্রয়োজন, ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতা উপন্যাসে নিয়ে আসে কাল্পনিক রসদ, যেটি তথ্যের নিরসতা থেকে উপন্যাসকে সজীবতায় উত্তীর্ণ করে। আবার উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ জীবনটিকে বেছে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কালের স্রোতে বহু শিল্পী এসেছেন, সৃষ্টি করেছেন, শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা মানুষকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তাঁদের জীবনী রচনায় আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু সকলের জীবন নিয়ে রচনা সম্ভব নয়। প্রভূত তথ্যের অভাব, উপন্যাসের কাহিনী

হয়ে ওঠার অনুপযোগী জীবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এইদিক মির্জা গালিবের জীবনী কতটা উপযোগী সেই আলোচনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত এই উপন্যাসের লেখিকা মির্জা গালিবের জীবন সম্পর্কে আগ্রহী হন আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রণীত 'গালিবের গজল থেকে' বইটি পাঠ করে, তিনি বলছেন:

আবু সয়ীদ আইয়ুবের মননধর্মী বিশ্লেষণ আমাকে গালিবকে বুঝতে সাহায্য করে। 'কবিজীবনী' অংশে গৌরী আইয়ুব গালিবের বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। তখন আমার মনে হয়েছিল এই জীবন উপন্যাসের উপাদান। লিখবই তখন পর্যন্ত আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইনি। তবে বিষয়টি মাথায় রেখেছিলাম।[২]

উপন্যাসের ভূমিকা অংশে এই বক্তব্যে লেখিকা আরও জানান কীভাবে দিল্লি ভ্রমণ, মির্জা গালিবের জীবনীসংক্রান্ত বিভিন্ন বই তাঁকে উৎসাহিত করে মির্জার জীবন ভিত্তিক উপন্যাস লেখার জন্য। এর পাশাপাশি ঔপন্যাসিক কিছুটা কৈফিয়তের সুরেই ভূমিকা অংশে জানান মির্জার জীবনকে উপন্যাসের কাহিনি হিসাবে বেছে নেওয়ার কারণ—

১৮৫৭ সালের গালিবের বয়স ছিল প্রায় ষাট বছর। একজন অসাধারণ কবির জীবন বৈচিত্র্য—মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় ইংরেজদের উত্থান ছিল ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। এই উপন্যাসে সেটুকু ধরতে চেয়েছি।

পাশাপাশি মনে করি একজন বড় কবি বা সাহিত্যিক একটি বিশেষ সময়ের মানুষ মাত্র নন। তাঁরা সময়কে অতিক্রম করেন। তাঁরা সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত লাভ করেন। তাঁদের জীবন ও সময় সাহিত্যেরই বিষয়। সে জন্যই গালিবকে নিয়ে উপন্যাস লেখা।[৩]

ভূমিকা অংশে ঔপন্যাসিকের বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, ব্যক্তি গালিবের জীবনে তিনি পেয়েছেন উপন্যাসের উপাদান, সঙ্গে মির্জার যাপন সময়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বকেও ধরতে চেয়েছেন। তাছাড়াও লেখিকার দিল্লি ভ্রমণকালের বর্ণণায় মির্জা গালিবের স্মৃতি সমূহের অবহেলায় পড়ে থাকা, মির্জা গালিব সম্পর্কিত বই ও তথ্যের অলভ্যতার কথা বলেন, তার মধ্যে যেন একটু আক্ষেপের সুর পাওয়া যায়। সেই তাগিদও উপন্যাস রচনার পরোক্ষ কারণ মনে হয়।

উপন্যাসের কাহিনিকে ঔপন্যাসিক পুরোপুরি জীবনী কেন্দ্রিক রেখেছেন। মির্জা গালিবের জন্ম লগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই আখ্যানের একরৈখিক গতি। নয়টি অংশে ভাগ করে কবির জীবনকে কাব্যিক আঙ্গিকে ধরতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

জীবনচরিত ও জীবনী-উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, জীবনীকার ঐতিহাসিক সালতামামি ও তথ্যের ভিত্তিতে কাজের নিষ্পত্তি করতে পারেন। কিন্তু একজন ঔপন্যাসিকের চাই বিস্তর ভাবনা-চিন্তার স্বাধীন পটভূমি। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন মির্জা গালিবের জীবনে 'উপন্যাসের উপাদান' পেয়ে যে বৃহৎ আখ্যান রচনায় ব্রতী হলেন, মির্জা গালিবের সুদীর্ঘ যাপন বৃত্তান্তের উপর ছড়িয়ে দিলেন নিজের কল্পনার ঝরনাধারা, অতীত ইতিহাসের মির্জার চারপাশের অজস্র মানুষেরা, কিছু কাল্পনিক কিছু বাস্তবিক, জেগে উঠলেন উপন্যাসের পাতায়। মির্জা গালিবের জীবন বৃত্তান্তের এই কথন স্রোতের মুখর অংশীদার তারা। মির্জার যে জীবন, যে দর্শন, যে যন্ত্রণা তাকে বোঝাতেই ঔপন্যাসিক জাগিয়ে তুলেছেন এইসব মানুষকে, এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে মির্জার জীবনযাত্রাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্যও।

তবে উপন্যাস মির্জা গালিবের জীবনকে অবলম্বন করে, মির্জার জীবন বৃত্তান্তের কাহিনি বলার জন্য এই আয়োজন। ইতিহাসের এবং জীবনীকারদের দেওয়া তথ্যের ব্যক্তি

গালিবকে সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করেন, সেখানে মিল-অমিলের সহাবস্থান স্বাভাবিক, এই প্রেক্ষাপটে তথ্য ও মির্জার সৃষ্টিকে আকর করে মূলত মির্জাকে বিবর্তিত করেন আমরা বুঝতে পারি। জীবনকথার বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে ঔপন্যাসিকের জীবন-অনুধ্যান, চিন্তাও প্রকাশিত হয় এটিও সত্য, সেসবের মধ্যে দিয়েই তিনি মির্জাকে দেখেন, গড়ে তোলেন। মির্জার জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, মন্দলাগা কোনো কিছুকেই আড়াল করেন না ঔপন্যাসিক, বরং বিশাল-বপু এই উপন্যাসে মির্জার জীবনের প্রত্যেকটি মাত্রা ধরতে চেষ্টা করেন। একজন ব্যক্তি মির্জা, একজন স্রষ্টা মির্জা, এই দুইজনের হাত ধারধরি করিয়ে চালনা করেছেন ঔপন্যাসিক। ব্যক্তি মির্জার জীবনের অজস্র দুঃখ, যন্ত্রণা, বিপন্নতা ছিল, দিনে যার পরিমাণ বেড়েই চলেছিল, আখ্যানে সেসবের পরিচয় দিতেও ভোলেন না ঔপন্যাসিক। এমনকী এই দুঃখ, যন্ত্রণা যে কবি গালিবের সৃষ্টির আকর হয়েছিল সেই সত্যও উঠে আসে উপন্যাসে। ব্যক্তি গালিবের জীবনের খামতি বারংবার উন্মোচিত হয়েছে আখ্যানভাগে সেই সঙ্গে স্রষ্টা মির্জা গালিবের সৃষ্টির আড়ালের যে কাহিনি তারও উন্মোচন হয়েছে।

বস্তুত, তথ্যের ভিত্তিতে একটি জীবন চরিতের কাঠামো গড়েছেন এবং সেই কাঠামোর পরত পড়েছে মির্জার চিন্তা ও সৃষ্টির, এভাবেই মির্জা গালিবের জীবন বৃত্ত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণতায় আসে 'যমুনা নদীর মুশায়রা'-র আখ্যানে।

'সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার পরিচয়', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এই কথাটি কেমন ভাবে প্রযোজ্য বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বৃহৎ প্রতিভাকে এই বাক্যে সম্পূর্ণ রূপে এঁটে ফেলা সম্ভব? আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি বললে আপামর বাঙালির মধ্যে যে ভাবোচ্ছাস হয় সেটা রবীন্দ্র প্রতিভার সার্বিকতার কারণে।কিন্তু এসব ছেড়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন স্রষ্টা, একজন শিল্পী। ছোটোগল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, ছবি, নাটকের স্রষ্টা তিনি। তাঁর এত সৃষ্টির পিছনেও রয়েছে বিশাল পটভূমি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন বাঙালি মাত্র জানে, কিন্তু তাঁর সেই সৃষ্টির জীবনের পিছনের রহস্য নিয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই সৃষ্টি রহস্যের পরিসর নিয়ে আলেখ্য নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সময় জমিদারির কাজে শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুরে কাটিয়েছিলেন, সেই সময় লিখেছিলেন অনেক ছোটোগল্প, গান, কবিতা, চিঠি প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজীবনের এই সময়টিকে সেলিনা হোসেন ধরতে চেয়েছেন 'পূর্ণ ছবির মগ্নতা' উপন্যাসে।

দেবন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলেন শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার কাজে। কিন্তু তিনি যে শিল্পী মানুষ, অন্য সব জমিদারের মতো তাঁর জমিদারি পরিচালনা যেমন হবে না, তেমনি কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের প্রকৃতির বুকে নেমে এসে সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেই প্রকৃতির কোলের মানুষগুলো অচেনাও থাকবে না তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীতে শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুরের প্রকৃতির বর্ণণা, রবীন্দ্রনাথের অনুভবের কথা আছে। ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন এই অঞ্চলের মাটিতে একসঙ্গে নামিয়ে আনলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সৃষ্টিকে একসঙ্গে। এই আখ্যান জুড়ে জমিদার রবীন্দ্র ও গল্পের চরিত্রদের একসঙ্গে পাশাপাশি ঘোরাফেরা। রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের চরিত্ররা, সুভা, রতন, প্রতাপ, ফটিক, শশিভূষণ, অপূর্ব, মৃন্ময়ী কত সব চরিত্রেরা ঘুরে ফিরে বেড়ায় জমিদার রবীন্দ্রনাথের সামনে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখেন আর ভাবেন গল্পের কথা। শুধু গল্প নয় সময়পঞ্জী মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতার রচনার উল্লেখ হয় আখ্যানভাগে।

তবে শুধু যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টির মধ্যে তাঁর জীবনের ঐ সময়কে ধরার চেষ্টা হয়েছে তাই নয়। এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সূত্রের বাস্তব সূত্রগুলোও একে একে জুড়েছেন ঔপন্যাসিক। যেমন, জমিদারি কাজকর্মের বিভিন্ন খুঁটিনাটি, জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাজকর্ম, সাধারণ মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক প্রভৃতি ইতিহাস সম্মত কথাগুলো আখ্যানভাগে রয়েছে। কাঙাল হরিনাথের[৪] মতো বাস্তবের জ্বলন্ত চরিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি হাত ধরাধরি করে রয়েছে গগন হরকরার কথাও। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনের ছোটো ছোটো সুখ, দুঃখ, অনুভব গুলিও জানাতে ভোলেন না ঔপন্যাসিক।

বস্তুত, শিল্পী বা স্রষ্টাকে দেখার, তাঁর জীবন কে অনুভব করার একটি অভিনব প্রয়াস সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাস। ব্যক্তি জীবন, ইতিহাস, কল্প ইতিহাস, সৃষ্টি জীবনের উপাদানের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে শিল্পী জীবন জানার কৌতূহল। এই আখ্যানের রবীন্দ্রনাথ কখনো হিতকারী জমিদার, কখনো স্বামী, কখনো পিতা, কখনো শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের এই জমিদারি জীবনের সূচনা থেকে শেষ বারের মতো এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি মায়াময় ছবি এই আখ্যান।[৫]

বাংলা প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদের অন্যতম কবি ও সিদ্ধাচার্য কাহ্ন পা। চর্যায় প্রাপ্ত কবিতা ও 'চতুরশীতি সিদ্ধ প্রবৃত্তি'-তে প্রাপ্ত কাহ্নের জীবনকথা মূলত কবি কাহ্নের জীবনীর প্রমাণ্য নিদর্শন। ২০০৯ সালে প্রকাশিত সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসটি কাহ্নের জীবন আশ্রিত উপন্যাস। এই উপন্যাসে শিল্পী জীবনকে ছোঁয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদ, এই চর্যাপদের ছোঁয়া বর্তমান যুগে দুর্লভ। কালের গর্ভে তলিয়ে গেলেও বিদগ্ধজন ও গবেষকের চেষ্টায় চর্যার কবিতা দুর্লভ কবিতা পাঠকের কাছে এসেছে। এই কবিতার রসাস্বাদন ও আলোচনার সঙ্গে এই কবিবর্গের জীবন সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল মেটাতে এবং নিজেদের প্রাচীন ইতিহাসের সংরক্ষণে কবি জীবনী গড়ে তোলা হয় উপন্যাসে।

চর্যার কবিদের রচনা ও প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি কতটা সংগ্রাম, প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধাচার্যরা এই রচনা করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন কবি কাহ্নের জীবনের সেই প্রতিকূলতা ও সংগ্রামের চিহ্নকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে। উপন্যাসে আমরা দেখি ব্রাহ্মণ্যবাদের পঙ্কিলতা কবলিত এক রাজ্যের এক অসহায় অথচ প্রতিবাদী মানুষ কাহ্নপাদ। সে বোঝে মাটি ও মানুষকে, সেই মাটির মানুষদের ভাষাকে জীবনকে। উপন্যাসের কাহিনিতে একটি প্রধান বিষয় উচ্চবর্ণ তথা রাজধর্মের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম। আখ্যানজুড়ে প্রাধান্য পায় মানুষের লড়াইয়ের কাহিনি। এই লড়াইয়ের অংশ কাহ্ন পা। এখানে তিনি কোনো সিদ্ধাচার্য নয়। ঔপন্যাসিক মাটি থেকে উঠে আসা শিল্পীকে আঁকতে চেয়েছেন। কাহ্নের জীবনও এখানে শৈশব কৈশোর থেকে শুরু হয় না, আখ্যানের শুরুতে একজন সংসারী, পল্লিবাসী কাহ্নকে আমরা দেখি। যার মনে আছে মাটি ও মানুষের প্রতি প্রেম, নিজের ভাষা, সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা। সেই সঙ্গে আছে কাব্য সৃষ্টির ও কবিতার মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা। ঔপন্যাসিক দেখান সমাজের উচ্চবর্ণ তথা রাজন্যবর্গ কিভাবে নিম্নবর্ণের মানুষের ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনকে পদপিষ্ট করে। কাহ্নের শিল্পী মন এই উচ্চবর্ণের হীনতাকে উপলব্ধি করে, সে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে মানুষকে। প্রতিকূলতা তাঁর শিল্পীসত্তাকে আরও বেশি ধারালো করে তোলে।

সমাজের হীনতা, দুর্বলের প্রতি অত্যাচারে শিল্পীর ভূমিকা কেমন হয় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই উপন্যাস।

ইতিহাস ও রূপকের ব্যবহারের সঙ্গে শিল্পীর মানসিক গঠন প্রণালী বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। শিল্পীর প্রেম, প্রতিবাদ, সৌন্দর্যবোধ, চিন্তা প্রভৃতি কাহ্ন চরিত্র গঠনে চোখে পড়ে। এই উপন্যাসে বাস্তব ইতিহাসের থেকে কল্পনা ও রূপকের আধিক্য বেশি থাকলেও বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের কবি ও তাঁর সময়ের নির্মাণটি লক্ষ্য করার মতো।

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে জীবনীমূলক সাহিত্যের অভাব নেই। এই শ্রেণীর সাহিত্যের জন্ম সেই মধ্যযুগ থেকেই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ জীবনকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা রয়েছে। কাব্যে, প্রবন্ধ, কথাসাহিত্যে। সাহিত্যে আধুনিকতার চলনে শিল্পী জীবনীমূলক রচনার প্রাবাল্য দেখা গেছে কথাসাহিত্যে। বিভিন্ন লেখকের কলমে এই শিল্পী জীবন তুলে ধরার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের তিনটি উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি উপন্যাসকে একমাত্র ‘শিল্পী জীবন’ এই শব্দবন্ধে সম্ভবত একসূত্রে জুড়ে দেওয়া যায়। তিনটি উপন্যাসের আলোচনায় ও পাঠে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তিনজন শিল্পীর জীবন, যথাক্রমে মির্জা গালিব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাহ্ন পা-এর জীবনকে ধরতে চেয়েছেন লেখক। মির্জা গালিব কেন্দ্রিক উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে তথ্যমূলক জীবনী উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন্দ্রিক উপন্যাসটি সৃষ্টি ও স্রষ্টার একটি কাল্পনিক মেলবন্ধন। অপরদিকে কাহ্ন পা-এর জীবন ও তাঁর সময় নিয়ে লেখক এঁকেছেন রূপকের ছোঁয়াতে। একই লেখকের শিল্পী জীবন তুলে ধরার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করতে পারি বাংলা কথাসাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটির সম্ভাবনা ও বৈচিত্র্যময়তা।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ শিশিরকুমার, *আত্মজীবনী: জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ,* দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা ১৩
২. হোসেন সেলিনা, *যমুনা নদীর মুশায়রা,* ভূমিকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৭
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮
৪. হোসেন সেলিনা, *পূর্ণ ছবির মগ্নতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা ৩১৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭।

‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পের বহুমাত্রিক অনুসন্ধান

সাথী নন্দী

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: আমরা জানি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। সাহিত্য জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ষাটের দশকে। তিনি তাঁর সুঠাম গদ্য এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রথম গল্প ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ (১৯৬৪), যেখানে তিনি বাবা-মেয়ের সম্পর্কের মাধুর্যতা ও পবিত্রতাকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে সমাজের নগ্ন, কর্কশ বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। একজন বাবা তার মেয়েকে বাধ্য করেন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে অর্থের জন্য মিলিত হতে। গল্পের ভেতরে কাহিনি বলতে ওই এতটুকুই। আর বাকি যা আছে তাহল বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। আর এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্টোরি উইদাউট স্টোরির সূচনা হয় বাংলা সাহিত্যে। দ্বিতীয়ত, একজন বাবা হিসেবে আত্মজার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিক মৌল আবেগ থাকা উচিত তা এই গল্পে নেই। ফলে গল্পে বাস্তবের সত্য ও ব্যবহারিক জীবনের সত্য সমান্তরালভাবে অবস্থান করছে। যা ইঙ্গিত দেয় সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচারের। তৃতীয়ত, এই গল্পে তিনি শব্দ দিয়ে ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ হাসান আজিজুল হক চিত্রশিল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রয়োগ করেছেন ওয়ার্ড পেন্টিং-এর মাধ্যমে। ফলে ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পটি কেনো ‘স্টোরি উইদাউট স্টোরি’-র আওতায় পড়ছে, গল্পের মূল উপপাদ্যকে সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার' হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে কেনো এবং এই গল্পের নির্মাণটি যে ওয়ার্ডপেন্টিং তা নিয়ে আমাদের আলোচনা।

সূচক শব্দ: গল্পহীন গল্প, বর্ণনা-বিশ্লেষণ, বাস্তবের সত্য, ব্যবহারিক জীবনের সত্য, শব্দছবি।

মূল আলোচনা:

বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার হাসান আজিজুল হক। ছোটগল্পের ধারায় তিনি সংযোজন করেছেন এক স্বতন্ত্র মাত্রা। মূলত উত্তর-বাংলার গ্রামীণ জীবন ও জনপদের ভাঙন, মূল্যবোধের ধ্বস, সামাজিক শোষণ, কখনো প্রতিবাদ, বাঁচার সংগ্রাম তাঁর ছোটগল্পের মূল উপাদান। বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোয় তিনি উন্মোচন করতে চেয়েছেন সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত ও দলিত মানুষের হাহাকার, কখনোবা তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনি। সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয় ধরতে ব্যক্তি মানুষের যৌনজীবনের পদস্খলনকেই তাঁর গল্পের শিল্প উপাদান হিসেবে নির্বাচন করতে দেখা গেছে প্রাক-সত্তর গল্প পর্বে। কিন্তু ক্রমে তিনি অবগাহন করেছেন রাঢ় বাংলার বৃহত্তর জনজীবন সাগরে এবং সেখান থেকে এনেছেন বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী সুধা, দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সূর্যদীপ্ত বাণী। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক সমতার সমাজ নির্মাণের একজন কারিগর। তাঁর গল্পে শৈল্পিকতার আড়ালে একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণের ইঙ্গিত থাকে। যেমন 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'রাঢ়বঙ্গের গল্প', 'মা-মেয়ের সংসার', 'বিধবাদের কথা ও অন্যান্য' গল্পসহ তাঁর প্রতিটি গল্পে পাওয়া যায় সাম্য ও সমতার ইঙ্গিত। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আগুন পাখি', এছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি উপন্যাস, অসংখ্য প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, নাটক, গল্প এবং আত্মজীবনীমূলক কাহিনি। দেশের প্রতিটি সাম্প্রদায়িক ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁকে সোচ্চার হতে দেখা গেছে এবং যে কোনো

সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রতিবাদ করতে তিনি পথেও নেমেছেন। অভিন্ন নামের গল্পসংকলন - 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' (১৯৬৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পটিকেই এই প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। গল্পের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

গল্পটি মূলত দেশ-বিভাগের পটভূমিতে লেখা। দেশ-বিভাগ জনিত মানবিক বিপন্নতার পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিকতার যে দাপট এসব নিয়েই এই গল্প। আসলে দেশ-বিভাগ মানুষকে, বিশেষ করে বাংলার জনসাধারণকে যেভাবে বিপন্ন, উন্মুলিত ও লাঞ্ছিত করেছে তারই যেন প্রতিকীরূপ গল্পের কেশো বুড়ো। এই বৃদ্ধ মানুষটির মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু ছন্নছাড়া শরণার্থী জীবন যাপনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে আছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার এক ইঙ্গিত, আছে তরুণ যুব সমাজের বিপথগামী হয়ে যাওয়ার চিত্র। বৃদ্ধটি নিজের মেয়ের ঘরে বখাটে যুবকদের ঢুকতে দেন কিছু পয়সার বিনিময়ে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় কী পরিমাণ দারিদ্র তাদের ঘরে বাসা বেঁধে আছে। পাশাপাশি মনে প্রশ্নও জাগে যে কতটা দরিদ্রতার কবলে পড়ে একজন বাবা তার মেয়ের শরীরকে ব্যবহার করেন? যদিও এই কাজ করে একসময় তিনি ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করেন। অপরাধবোধের মারাত্মক অনুশোচনা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়। মুক্তির উপায় খোঁজেন, বেছে নেন আত্মহননের পথ। তিনি মনে করেন একমাত্র আত্মহত্যার মাধ্যমেই এরকম কঠিন পাপ থেকে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবেন। তাইতো নিজের আত্মহননের জন্য তিনি একটি করবী গাছ লাগিয়েছেন। করবী ফুল দেখতে অনেক সুন্দর হলেও এই ফুল থেকে যে বীজ পাওয়া যায় তাতে থাকে প্রাণঘাতী বিষ। এই বিষ খেয়ে বৃদ্ধ লোকটি একসময় আত্মহত্যা করে মুক্ত হয় মেয়ের ওপর করা অন্যায় কাজ থেকে। অর্থাৎ মানবিকতা ও মূল্যবোধ যে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে এবং আমরা এক ভয়ঙ্কর সময় ও সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেই সংকেত এই গল্পের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন লেখক। লক্ষ করার বিষয় গল্পে তেমন কোন কাহিনি নেই। গ্রামের তিন বখে যাওয়া যুবক, দেশ ছাড়া এক বুড়োর কন্যাকে ভোগের আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়েছে, পৌঁছেছে তারা বুড়োর বাড়িতে এবং অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে শাসন করে দুই যুবককে পাঠিয়ে দেয় নিজের আত্মজার ঘরে।

এই গল্পকে কেন্দ্র করে আমরা তিনটি বিষয় আলোচনা করব। প্রথমটি স্টোরি উইদাউট স্টোরি, দ্বিতীয়টি সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার, তৃতীয়টি ওয়ার্ড পেইন্টিং। স্টোরি উইদাউট স্টোরি অর্থাৎ কাহিনিহীন কাহিনি বিষয়টি ১৯১৫ সালে ফ্রাঞ্জ কাফকা বিশ্ব সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'মেটামরফোসিস' নামে যে নভেলা সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে শুধু আখ্যান, বর্ণনা আর বিশ্লেষণ। সেরকম কোনো কাহিনি ছিল না। যেমন গ্রেগর সামোসা নামের একজন সেলসম্যান কোনো এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে সে একটি খুব বড় পোকাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তারপর তার বাড়ির লোকের প্রতিক্রিয়া, তার অফিসের কেউ একজন তার বাড়িতে এলে তার প্রতিক্রিয়া আর এভাবে চলতে চলতেই একসময় সে মারা যায়। কাহিনি বলতে এটুকুই কিন্তু তার ভেতরে তিনি যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ রাখলেন নিজের মতো করে, তাতে তিনি একটি মারাত্মক বার্তা রাখলেন যেটা কাহিনির ঘনঘটা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা কখনোই সম্ভব হত না। আসলে একটি পরিবারে যত জন সদস্য থাকে যারা একসঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করে, এই বসবাস সম্ভব হয় আত্মকেন্দ্রীকতার কারণে। ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের কারণে নয়। এ রক্তের সম্পর্ক ব্যাপারটি একটি কন্ডিশন মাত্র। যে কন্ডিশন তাদের একসঙ্গে থাকতে সাহায্য করেছে মাত্র, তাই তারা একসঙ্গে থাকে। আসল কারণ হচ্ছে তারা একসঙ্গে থাকতে পারছে এজন্য যে

প্রত্যেকে প্রত্যেকের কোনো না কোনোভাবে প্রয়োজনে লাগে সেজন্য। এটা ছিল কাফকার বার্তা। অর্থাৎ গ্রেগর সামোসার রোজগারে যখন সংসার চলত তখন তার পরিবারের তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল এক রকম। এই গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতেই তার পরিবারে তার প্রতি ভালোবাসা কতটা হবে তা নির্ভর করত। যে মুহূর্তে সে একটি পোকায় পরিণত হল তার গ্রহণযোগ্যতা নিমেষে পাল্টে গেল কারণ সে রোজগার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে সে এখন তাদের বোঝা।

আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সারা পৃথিবীর অর্থনীতি পাল্টে দিয়েছে। সমাজ এত জটিল হয়েছে যে, শুধুমাত্র কাহিনির পরম্পরা ও তার সামান্য বিশ্লেষণের সাহায্যে আজকের সমাজ-অর্থনীতির জটিলতা ধরা যায় না। আজকের দিনে একটি দর্শন বা বার্তাকে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, একটি ছোট্ট ঘটনার বিশ্লেষণ-বর্ণনাতেই অনেকটা জায়গা চলে যায় কারণ তা অত্যন্ত জটিল বলে। এতটাই যে ওই পরিমাপে একটা স্বতন্ত্র গল্প বা একটা উপন্যাস হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যে কাফকা যে স্টোরি উইদাউট স্টোরি-র সূত্রপাত করলেন তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই তখনই এসে পড়েনি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে হাসান আজিজুল হক প্রথম বাংলায় এর সূত্রপাত করলেন এই 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে। গল্পের কাহিনি আমরা শুরুতেই কিছুটা আলোচনা করেছি। যে কোনো এক শীতকালের রাতে তিনজন লুম্পেন যুবক খানিকটা হেঁটে একটি খুব গরিব বাড়িতে গিয়ে ঢোকে, এক বৃদ্ধ বাবার হাতে টাকা দিয়ে তার যুবতী মেয়েকে ভোগ করে তাদেরই দুজন। ব্যাস এটুকুই কাহিনি। বাকি যা আছে তা শুধুই বর্ণনা আর বিশ্লেষণ। ফলে হাসান আজিজুল হকের হাত ধরেই কিন্তু 'স্টোরি উইদাউট স্টোরি'র ইতিহাস তৈরি হয় বাংলা গল্পে।

এবারে আলোচনা করা যাক সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার নিয়ে। অ্যালব্যের কাম্যু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ সালে উপন্যাস লেখেন 'দি আউটসাইডার' নামে। যা সারা বিশ্বকে চমকে দেয়। কারণ এমন তিনটি মতবাদ আছে যা সাহিত্যে ব্যবহার করা যায় কেউ কোনোভাবে ভাবেইনি অথচ এই তিনটিকে এমনভাবে দধিকর্মার মতো মেখে ব্যবহার করলেন যে তাদের কোনোভাবে আলাদা করা যায় না। এই তিনটি মতবাদ হল Absurdism, Syntactic structure, existentialism। তবে উপন্যাসটির মূল উপাদান হিসেবে ছিল সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার। যদিও এটা ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপার কিন্তু কাম্যু তাকে অভিনব ভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ করলেন। যেমন একটি নির্দিষ্ট বাক্যের ভেতর থেকে নির্দিষ্ট একটি শব্দার্থ পাওয়া যায়, একে একটি সত্য হিসেবেই বিবেচনা করা হত। কিন্তু চমস্কি বুঝিয়ে দেন যে এখানে দুটি সত্য কাজ করে। একটি বাক্যতত্ত্বের সত্য ও একটি শব্দার্থতত্ত্বের সত্য। এই দুটি বিষয়ই সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেকে তার সত্য অনুযায়ী চলে। দীর্ঘদিন গবেষণায় রত থেকে ১৯৫৭ সালে নোয়াম চমস্কি তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার নামে। লক্ষ্য করার বিষয় হল কাম্যু পনেরো বছর আগে ১৯৪২ সালে এই মতবাদের প্রয়োগ করে দিলেন তাঁর উপন্যাসে এবং একেবারে সার্থক ভাবে। আর এটাও তাঁর প্রথম উপন্যাস।

কাফকা তাঁর 'মেটামরফোসিস' প্রকাশ করেছিলেন একটি ইভেন্ট বা কন্ডিশনে। সেটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আর কাম্যু তাঁর 'দি আউটসাইডার' ও প্রকাশ করলেন একটি ইভেন্ট বা কন্ডিশনে। সেটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কাফকা যেমন 'মেটামরফোসিস'- এর একেবারে প্রথম লাইনেই সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন, তেমনি কাম্যুও 'দি আউটসাইডার'- এর প্রথম লাইনে সারা বিশ্বকে চমকে দেন। কাফকা প্রথম লাইনেই একটি মানুষের পোকায় পরিণত হয়ে যাবার কথা বলেন। আর কাম্যু তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদের খবর জানান, কিন্তু কবে মৃত্যু হয়েছে সেটা

বলতে পারেন না। আসলে যত ইতিহাসের ঘটনা ঘটে তা কোনো একটি কন্ডিশন থেকেই ঘটে। আর তা ঘটানোর জন্য সময় একজন যোগ্য মানুষ তার সময়মতো বেছে নেয়। এই সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার বিষয়টি হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের মূল উপপাদ্য। প্রথম বিশ্ব সাহিত্য প্রয়োগ হয়েছিল 'দি আউটসাইডার'- এ এবং তার ২২ বছর পরে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যবহার করেছেন হাসান আজিজুল হক।

এই সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার মতবাদটি পোস্ট মডার্নের একটি অংশ বলা যায়। যে সত্য আপেক্ষিক। মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা গেছে দুটি সত্যের অস্তিত্ব। একটি বাস্তবের সত্য, আরেকটি ব্যবহারিক জীবনের সত্য। এই দুটি সাধারণত এক রকম হয় না কারণ সম্পর্ক থাকলেই তা মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। বাস্তবের সত্য হচ্ছে কাছের মানুষ বা দূরের অচেনা মানুষ, যেই হোক না কেনো সে যখন জন্মেছে সে অবশ্যই মারা যাবে। এটাই বাস্তব এটাকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সত্য হল বাস্তবের সত্যের ভেতরে মায়া ঢুকে পড়ে। যেমন, কাছের মানুষের মৃত্যু হলে আমরা মেনে নিতে পারি না, দুঃখে মূহ্যমান হয়ে পড়ি। কান্নাকাটি করি, পরিবার পরিবেশকে অস্বাভাবিক করে তুলি। কিন্তু বাস্তবের সত্যকে পাল্টাতে পারি না, এসব করেও মৃত মানুষটিকে ফিরিয়ে আনতে পারি না বা প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে ঘটা ঘটনাকে আমরা পাল্টাতে পারি না। এটি কিন্তু চিহ্নিত সব কাছের মানুষের ক্ষেত্রে সব সময় নাও ঘটতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে অন্যেরা কী মনে করবে ভেবে, অনেক সময় ভান করতে হয়। আবার ভান না করলেও অনেক সময় এরকমও ঘটে যে আমার মন যেটা চাইছে তা ভাষায় ঠিকমতো প্রকাশ করা গেল না। অন্যরকম হয়ে গেল, মানে মনের সত্য আর ভাষার সত্য দুটো দু-রকম হয়ে গেল। কিছু কিছু বিরল মানুষ আছেন তাদের এই দুটি সত্যের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। এই দুটির মধ্যে ফারাক না হলে হয়ে যায় সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার। যেমন 'দি আউটসাইডার'- এর নায়ক মারসো জানে না তার মা ঠিক কখন মারা গেছে। শুধু তাই নয়, সে মায়ের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। যা সমাজ মেনে নিতে পারেনা। আসলে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের যে আবেগ তা এখানে অনুপস্থিত। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পেও গরীব, অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা কিছু টাকার বিনিময়ে নিজের মেয়েকে বাধ্য করেন দেহ ব্যবসা করতে। ফলে বাবা হিসেবে তার নিজের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের যে মৌল আবেগ থাকা উচিত ছিল তা এখানে নেই। একটু আগেই আমরা বাস্তবের সত্য ও ব্যবহারিক জীবনের সত্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এই গল্পে বাস্তবের সত্য হল অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। অর্থাৎ বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যেভাবেই হোক। পরিস্থিতি অনুযায়ী লড়াই করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। সমাজের দিকে তাকালে চলবে না। এটা হচ্ছে বাস্তবের সত্য। এর সঙ্গে সাধারণত ব্যবহারিক জীবনের সত্য মেলেনা। কিন্তু হাসান আজিজুল হক এই দুটো সত্যকে মেলালেন তাঁর 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের বৃদ্ধ বাবার মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম বাস্তবের সত্য ও ব্যবহারিক জীবনের সত্য সমান্তরালভাবে অবস্থান করছে। একে আমরা চিহ্নিত করলাম সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচার নামে।

এবার আমরা আসব তৃতীয়টিতে। যার নাম - ওয়ার্ড পেন্টিং। আমরা সবাই জানি ইম্প্রেনিস্টদের ছবি সাধারণত প্রকৃতির ছবি হয় এবং তাতে সময়ের ইম্প্রেশন থাকে, বোঝা যায় ছবিটি সকাল, দুপুর না রাত্রির ছবি। ওয়ার্ড পেন্টিং-এর মোদ্দা কথা হল - হঠাৎ করে কোনো চিত্রশিল্পীর কাছে কোনো ছবি, বিশেষ করে কোনো প্রকৃতির ছবি যদি ধরা দেয়, যদি তখন তাঁর কাছে কোনো ছবি আকার সরঞ্জাম না থাকে, পরে যদি সেই ছবি হারিয়ে যায়, এই আশঙ্কায়

সেই চিত্রশিল্পী ওই ছবিটিকে সেই মুহূর্তে শব্দ দিয়ে এঁকে ধরে রাখেন। এই শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার নামই শব্দ ছবি বা ওয়ার্ড পেন্টিং। হাসান আজিজুল হক তাঁর এই 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে চিত্রশিল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রয়োগ করেছেন ওয়ার্ড পেন্টিং-এর মাধ্যমে। কীভাবে? আমরা সেটি বোঝার জন্য গল্পের একদম শুরু থেকে খানিকটা অংশ হুবহু এখানে তুলে ধরছি -

'এখন নির্দয় শীতকাল, ঠান্ডা নামছে হিম, চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ির টিনের চাল হিমঝকঝক করে। একসময় কানুর মায়ের কুঁড়ে ঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দুপাশের বনবাদাড় আর ভাঙা বাড়ির ইটের স্তুপ থেকে হু-উ-উ চিৎকার ওঠে। ঈশান কোণ থেকে ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার - ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জের রাস্তার ওপর উঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগি নিয়ে। ডানা ঝামড়ে মুমূর্ষু মুরগি ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মত ছায়া পড়ে শিয়ালটারও, চাঁদের দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে - তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ির লোক ঠ্যাঙারের দলের মত হল্লা করে রাস্তায় পড়ে - কোনদিকি গেল শালার শিয়েল, কোনদিকি ক দিনি।
আরও হিম নামে।'[১]

লক্ষ্য করার বিষয়, এই অংশটি নিছক গদ্য নয়, এটি অনুভূতির প্রকাশ? গার্নেট ম্যাকয় বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতে ওয়ার্ডপেন্টিংকে কবিতার সমগোত্রীয় বলেছেন, গদ্যকে নয়। কারণ ওয়ার্ডপেন্টিং বা কবিতা অক্ষর দিয়ে সৃষ্ট হলেও, সেগুলিকে অনুভূতির প্রকাশ হতে হয়। ফলে, যেহেতু প্রত্যেকের অনুভূতি আলাদা, তাই, একই বিষয় প্রত্যেকের অনুভূতিতে আলাদা আলাদাভাবে ধরা দেবে। অথচ হাসান আজিজুল হক তাঁর গদ্যে এই অনুভূতিকে ব্যবহার করছেন এবং তা অতি সূক্ষ্মভাবে, সার্থক ভাবে। যেমন গল্পের প্রথম বাক্যটির প্রথম তিনটি শব্দ - এখন নির্দয় শীতকাল। প্রকৃতির সত্য হচ্ছে - এখন শীতকাল। কারণ, এটি একটি কন্ডিশন। আবহাওয়ার। এটা বোঝাতে আর কিছু লেখার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ তিনি 'শীতকাল' শব্দটির আগে একটি বিশেষণ যোগ করলেন - 'নির্দয়'। আমরা জানি, এই 'নির্দয়' কথাটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু কথাটি যখন একটি ঋতুর গায়ে লাগানো হয়, তখন এই প্রয়োগে আমরা অতি বিস্মৃত হই। আর, যেহেতু এটা ব্যক্তিগত অনুভব, তাই তা ব্যাখ্যার জায়গায় থাকে না। লেখক এখানে শীতকালকে ব্যক্তিরূপ দিয়েছেন। আর, দিয়েছেন বলেই শীতকালের ছবিটা এঁকে ফেললেন তার আগে 'নির্দয়' কথাটিকে বসিয়ে। না হলে কী আঁকা যেত? শীতকাল তো একটা কন্ডিশন মাত্র। শীতকালের প্রকৃতি কী রকম হয়, সেটা আঁকা যায়। কিন্তু কোনা কন্ডিশনকে আঁকা যায় না!

এরপরে লিখছেন, চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায় - এখানেও তিনি একটি বিস্ময়কর প্রয়োগ করলেন। তিনি চাঁদের গায়ে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেন - ফুটে আছে। সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে আমরা জানি, চাঁদ নিচ থেকে ওপর দিকে যায়। তাই, আমরা বলি 'চাঁদ ওঠে'। তিনি একে পাল্টে দিয়ে বললেন 'ফুটে আছে'। প্রয়োগটা ভুল। কিন্তু আমাদের, কোনো পাঠকেরই ভুল মনে হল না। কেন ভুল? 'ফোটা' সাধারণত সামগ্রিকভাবে ঘটে। যেমন, ভোরের আলো ফুটছে। এই আলো সামগ্রিকভাবেই ফোটে, নির্দিষ্ট কোনো একটা অংশে নয়।

কিন্তু তিনি যখন লেখেন - 'চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়'। এতে বোঝায় বিশাল আকাশে একটা নির্দিষ্ট নারকেল গাছের মাথায় নির্দিষ্ট অংশে চাঁদটা ফুটে আছে। আসলে তিনি বোঝাতে চাইলেন চাঁদটা অত বড় আকাশে আলাদা করে শুধু তার নিজ-অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ। তিনি এভাবে আঁকলেন বলেই, আমাদের কাছে ছবিটা স্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাময় হল। এর পরেই তিনি যে অসামান্য অভিনব ছবিটি আঁকলেন, সেটি স্থির নয়, চলচ্চিত্র - অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। আশা করি এই ছবিটি নিয়ে বেশি কথা বলার প্রয়োজন হবে না। এখানেও ওই বড় কলাপাতাটিকে তিনি মানুষ বা ব্যক্তিরূপ দিয়েছেন। এর পরের বাক্যটি হচ্ছে - ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ির টিনের চাল হিমঝকঝক করে। কোন মোড়ে বা কার বাড়ি, সেটা বড় কথা নয়। আর, ওই বাক্যের মধ্যে আসল শব্দটি হল - হিমঝকঝক। এই শব্দটি তাঁর সৃষ্টি করা। নিজস্ব। কোনো অভিধানে নেই। তিনি কেনো এই শব্দটি সৃষ্টি করলেন? করলেন এইজন্য যে, এই শব্দটির ভেতরে তিনি একটা পুরো প্যারাগ্রাফ রাখলেন। তাতে তিনি কী কী বললেন?

১. বাড়ির ওই টিনের চালটি নতুন লাগানো হয়েছে। সে জন্যই সেটি চকচক করছে। পুরনো টিনের চাল কখনো চকচক করে না।

২. তাতে হিম পড়ছে। অর্থাৎ এটি শীতকাল। কারণ, শীতকাল না হলে হিম পড়ে না।

৩. ঝকঝক করছে কেন? নিশ্চয়ই ওই ভিজে টিনের চালে আলো পড়েছে, তাই। অথচ, এখন রাত্রি। রাতে টিনের চালে আলো না পড়লে, ওই স্বাভাবিক অন্ধকারে কখনো তা ঝকঝক করে না। আর, এটা গ্রাম। এখানে লাইটপোস্ট নেই। একমাত্র চাঁদের আলোই হতে পারে। আর, চাঁদের আলো তখনই পাওয়া যায়, যখন পূর্ণিমা হয়। অর্থাৎ এখন পূর্ণিমা।

আশা করি অবিশ্বাস্য হলেও নিশ্চয়ই বোঝানো গেল, এতগুলো কন্ডিশন, এতগুলো সত্যকে হাসান আজিজুল হক ধারণ করছেন একটি মাত্র শব্দে। সেটি হল - হিমঝকঝক। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত বাক্য আছে, এইভাবে প্রতিটিকেই স্ক্যান করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. গল্প সমগ্র-১, হাসান আজিজুল হক।
প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১১, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চন্দন আনোয়ার: হাসান আজিজুল হকের কথা সাহিত্য বিষয় বিন্যাস ও নির্মাণ কৌশল, প্রথম মুদ্রণ ২০১৯, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ।

২) জীনাত শারমিন: হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প:বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রথম প্রকাশ: ২০১৬, আজকাল প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

৩) শামস আলদীন:হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৫, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা- ১১০০।

৪) হাসান আজিজুল হক: গল্প সমগ্র-১, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাদেশ।

কাহিনি নির্মাণে চেতনাপ্রবাহ রীতি : প্রেক্ষিত জয় গোস্বামীর সংশোধন বা কাটাকুটি

সঙ্গীতা দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা রচনায় পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। বস্তুবাদী উপন্যাস রচনার পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা বৃদ্ধি পেয়েছে। মনের তিনটি স্তরের (সচেতন, অচেতন এবং অবচেতন) মধ্যে পূর্বে কেবল সচেতন স্তরের ক্রিয়াকলাপই ছিল মুখ্য। কিন্তু বর্তমানে অন্য দুটি স্তরের আলোড়নের উদ্ভাসও দেখা যেতে লাগে আধুনিক সাহিত্যে। এরূপ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের একটি ধারা - চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস। **১৯১৮** খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখিকা মে সিনক্লেয়ার, ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাস ‘pointed roofs’- এর সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথম চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির উল্লেখ পাই।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে চেতনাপ্রবাহ রীতির আংশিক প্রয়োগ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ (১৯০৩), ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) প্রমুখ উপন্যাসে। যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখের রচনায়। এই ধারার অন্যতম কথাসাহিত্যিক জয় গোস্বামী। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস এবং ছোটগল্পগুলিতে চেতনাপ্রবাহ রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে ‘সংশোধন বা কাটাকুটি’ গল্পটিকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং চেতনাপ্রবাহ রীতির বৈশিষ্ট্য কতটা পরিস্ফুট তা এখানে আলোচনা করা হল। সমগ্র গল্পটি প্রথম পুরুষীয় রীতিতে বর্ণিত। গল্পের মুখ্য চরিত্র কবি ও কবিপত্নীর পরোক্ষ অন্তর্ভাষণের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সংকটের চিত্রটি পরিস্ফুট। একইসঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ চেতনালোক মুক্ত অনুষঙ্গের মাধ্যমে উদ্ভাসিত। বস্তুত তাঁদের চেতনা তরল প্রবাহের মতো গতিশীল, সময়ের প্রচলিত কাঠামোয় আটক করা যায় না। অতীত - বর্তমান সব এলোমেলোভাবে মিশে যায় চেতনাপ্রবাহ রীতির মাধ্যমে।

সূচক শব্দ: আত্মকথন, চেতনাপ্রবাহ, অন্তর্মুখী, দাম্পত্য সংকট, একাকী।

মূল আলোচনা:

উত্তর জীবনানন্দ পর্বে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম কবি জয় গোস্বামী (জন্ম ১৯৫৪)। বিষয় নির্বাচন, ভাষা-প্রয়োগ, শব্দচয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি বাংলা কাব্যজগতে স্বতন্ত্র। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য লেখনশৈলী কেবলমাত্র কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা দেখে পাঠক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ওঠে। তাঁর ছোটগল্প-উপন্যাসে বহির্জগতের তুলনায় অন্তর্জগতের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বেশিমাত্রায়। মানবমনের চিন্তন প্রক্রিয়ার সূত্র ধরে বহির্বাস্তব হয়ে পড়েছে সংকুচিত, ভেঙে গিয়েছে কাল-পরম্পরা। নিগূঢ় রহস্যকে তিনি চিত্রাত্মক পরিচর্যার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন মানবমনের চিন্তন প্রক্রিয়ায়। কল্পনা, স্মৃতিময়তা, স্বপ্নচারিতা তাঁর ছোটগল্পে মুখ্য। সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে সংলাপের পরিবর্তে আত্মকথন। এই বৈশিষ্ট্য সূত্রেই কাহিনির বয়ানে অনিবার্যভাবে ফুটে উঠেছে চেতনাপ্রবাহ রীতি।

'চেতনাপ্রবাহ রীতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Stream of Conciousness', যার অর্থ জাগ্রত বা সজাগ মনের অবিছিন্ন চিন্তার প্রবাহ বা সচেতনতা। প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁর 'Principles of Psychology' (1890) গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। গ্রন্থটিতে তিনি 'Stream of Conciousness' শব্দগুছকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, যা ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যায়-

'Stream of consciousness is a style or technique of writing that tries to capture the natural flow of a character's extended thought process, often by incorporating sensory impressions, incomplete ideas, usual syntax and rough grammer.'[১]

অর্থাৎ চেতনাপ্রবাহ রীতি (Stream of Conciousness) একটি সাহিত্য কৌশল বা শৈলী যেখানে কোনো ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, স্মৃতি, অনুভূতি এবং ইন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা ও অবিরাম প্রবাহকে শব্দে প্রকাশ করা হয় প্রায়শই প্রচলিত ব্যাকরণ ও বিরাম চিহ্ন ছাড়াই।

'Stream of Conciousness' বা চেতনাপ্রবাহ রীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য -

* Interior Monologue অর্থাৎ আত্মকথন, যেখানে বাহ্যিক বর্ণনা বা কথোপকথন ছাড়াই একটি চরিত্রের চিন্তাভাবনা সরাসরি উপস্থাপন করা হয়।

* Non-Linear Thought Process অর্থাৎ নন-লিনিয়ার চিন্তা প্রক্রিয়া, যেখানে চিন্তাভাবনাগুলির কোনো ক্রম থাকে না। একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় লাফ দেয়।

* Sensory Details অর্থাৎ সংবেদনশীল বিবরণ, যেখানে চরিত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলির স্পষ্ট বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সংবেদনশীল বিবরণগুলিকে ফিল্টারিং বা সংগঠিত না করে একটি সুসংগত বর্ণনামূলক কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয়।

* Free Association অর্থাৎ মুক্ত সমিতি, যেখানে চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি অবাধে প্রবাহিত হয়, কঠোর যুক্তির পরিবর্তে স্মৃতি, আবেগ বা সংসর্গের মাধ্যমে শিথিলভাবে সংযোগ স্থাপন করা হয়।

* Unconventional Punctuation and Grammer অর্থাৎ অপ্রচলিত বিরামচিহ্ন এবং ব্যাকরণ, যেখানে চিন্তার স্বাভাবিক প্রবাহকে প্রতিফলিত করার জন্য অসম্পূর্ণ বাক্য, খণ্ডিত চিন্তা এবং চলমান বাক্য ব্যবহার করে, ঐতিহ্যগত বিরাম চিহ্ন এবং ব্যাকরণ পরিত্যাগ করা হয়।

* Focus on Emotion and Psychology অর্থাৎ প্লটের উপর ফোকাস করার পরিবর্তে চরিত্রের মানসিক অবস্থার উপর ফোকাস করা হয়।

উইলিয়াম জেমসের এই তত্ত্ব এবং তথ্যবহুল আলোচনা এবং বিশ্লেষণ থেকে যে চেতনাপ্রবাহের সূত্রপাত, পরবর্তীকালে তাই আধুনিক সাহিত্যবোধের সম্পূর্ণ নতুন শিল্পাদর্শ, শিল্পরীতি এবং ভাষাপদ্ধতি এক ভিন্নতর রচনাকৌশল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই নতুন ধারায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও উপন্যাস- ছোটগল্প রচিত হল। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসগুলিতে চেতনাপ্রবাহ রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত। রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রয়োগ দেখা যায় গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস 'অন্তঃশলীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭), 'মোহনা' (১৯৪৩) এবং সতীনাথ ভাদুরীর 'জাগরী' (১৯৪৬) উপন্যাসে। পরবর্তীকালে চেতনাপ্রবাহ রীতিকে অনুসরণ করে একাধিক বাংলা

উপন্যাস ও ছোটগল্প রচিত হয়েছে। সেই ধারাকেই অনুসরণ করে জয় গোস্বামী একাধিক উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'সংশোধন বা কাটাকুটি'- ছোটগল্পে চেতনাপ্রবাহ রীতির প্রভাব কতটা পড়েছে আলোচ্য অংশে তা অন্বেষণ করা হল।

জয় গোস্বামীর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'সংশোধন বা কাটাকুটি', ২০০১ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত। এই গল্পগ্রন্থে চারটি গল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম 'সংশোধন বা কাটাকুটি'। গল্পটি প্রথম শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এখানে বর্ণিত হয়েছে এক 'কবি'র জীবনের কয়েক বছরের গল্প। সংসারের প্রতি উদাসীনতাই তাঁর জীবনে অশান্তির কারণ। তিনি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলেন – 'ভগবান ... সংসারের কোনো সুখই তো দিলে না। একটু ঘুমোব তারও উপায় নেই।'[২] কবিমন নিজের নির্ভুল নিখুঁত লেখা নিয়ে যেমন অশান্ত তেমনই স্ত্রীর অভাব-অভিযোগগুলির দায় নিতে নিতে তাঁর চিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে। সংশোধন বা কারেকশনে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই বিষয়টি কেবলমাত্র কবিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের ক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ তা গল্পকার অতীত-বর্তমান কাহিনির মধ্য দিয়ে এখানে ব্যক্ত করেছেন।

গল্পের মূল চরিত্র কবি ব্যক্তিত্বে অন্তর্মুখীসত্তা বর্তমান। এরূপ ব্যক্তি নিজ চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বেশি গুরুত্ব দেন এবং বাইরের জগৎ বা সামাজিক কার্যকলাপের থেকে অভ্যন্তরীণ জগতে বেশি মনোযোগী। নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকার কারণে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সৃষ্টি করেন কবি। ফলত তাঁর চারপাশের মানুষজন তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর নেশা ও পেশা কবিতা। স্বভাবতই তিনি সারাদিন লেখার চিন্তায় নিমগ্ন। '... মাথায় একবার লাইন এলে বা কারেকশনে এলে জগতের কোন কিছু তার খেয়াল থাকে না।'[৩] তিনি ভুলে যান অন্যের সুবিধা অসুবিধার কথা। কখনও তিনি নিজ ঘর স্যাঁতস্যাঁতে জেনেও একটি শব্দ–'আছিল' কারেকশনের কারণে সমস্ত ঘর-বিছানাকে ভিজিয়ে ফেলেন। আবার কখনও লেখা, কাগজে প্রকাশের পরও তিনি লেখা সংশোধন করেন। সে'কারণে 'প্রেসের শ্যামাপদবাবু থেকে, অফিসের সহকর্মী থেকে, নিজের গৃহিণী পর্যন্ত অনেকের কাছেই বারবার মুখঝামটা খেয়েছেন কবি। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বদলাতে পারেননি।'[৪] তাঁর কাছে শব্দ, 'অন্ধের যষ্টি'র মত। কোনো মানুষ যখন তার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর তখন তাকে 'অন্ধের যষ্টি' বলা হয়। অন্ধ ব্যক্তি যেমন লাঠির উপর নির্ভর করে পথের সন্ধান করে তেমন একজন কবিরও কবি হিসাবে বাঁচার চাবিকাঠি শব্দ। শব্দের মধ্যে দিয়েই তাঁর দুঃখ-আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জীবনের রূপ-রস-গন্ধের আস্বাদ লাভের জন্যেও তিনি শব্দকে মাধ্যম করেন।

শব্দ, কবির জীবন একদিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে অন্যদিকে দাম্পত্য সংকটেরও কারণ হয়ে উঠেছে। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ছোট ছোট চাহিদাগুলোকে গ্রাস করেছে শব্দ। স্ত্রীর সঙ্গে কথাবলার ফুরসৎ না পাওয়া, নিজের সন্তানকে সময় দিতে না পারার কারণে হোস্টেলে রাখা থেকে শুরু করে ভ্রূণহত্যার মতো গর্হিত কাজও করেছেন কেবলমাত্র এই শব্দের জন্য। বলাবাহুল্য কবিতার কারণে। '... কবি হবে তুমি। হ্যাঁ? স্বার্থপর কবি হবে? কেবল সেইজন্য তুমি বলে চললে নষ্ট করো নষ্ট করো।'[৫] যদিও কবি বলেন আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে তিনি এরূপ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন – '... যা রোজগার করি তাতে উপায় ছিল না, আরেকজনকে আনবার...'।[৬] আসলে পূর্বে সমাজ পরিচালনার অধিকারী পুরুষ, নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মনে করতেন। তাঁরা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতেন না, একাধিক সন্তানের জন্ম দেওয়ার মধ্যে তাঁদের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতেন। বর্তমানে নারী–পুরুষ

উভয়ের চিন্তাভাবনার মধ্যেই অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন অনেক পুরুষ নিজের উপার্জনের উপর নির্ভর করে পরিবার পরিকল্পনা করেন। কবিও যে এইধরনের মানসিকতা পোষণ করেন তারই পরিচয় আমরা পাই। কবির এই যুক্তি কবিপত্নী মানতে পারেননি।

পাঁচ বছর আগের ভ্রূণ নষ্ট করার বিষয়টি আজও তাঁর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। সন্তানের প্রতি স্পৃহা, ভালোবাসা তাঁর অবচেতন মনে আশ্রয় পেলেও বারবার চেতন মনের দ্বারে উপস্থিতির জানান দেয়। ঐকান্তিক ইচ্ছার অপ্রাপ্তি তাঁর মনকে অশান্ত করে রাখে। কারণ ভ্রূণ যখন জরায়ুর প্রাচীরে রোপিত হয় তখনই মায়ের সঙ্গে একটা বন্ধন তৈরি হয়। সেই বন্ধনকে কোনো মা-ই ছিন্ন করতে চান না। কবিপত্নীও চাননি। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাশক্তি কবির সিদ্ধান্তের কাছে পরাজিত হয়। অথচ তিনি '...জানতেন যে তাঁর রমণীর গর্ভস্থান কিছু ত্রুটিযুক্ত ছিল। ভ্রূণনাশের আগে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার সেনগুপ্ত।...পাঁচ বছর আগেই ডাক্তার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ওই নষ্ট করার ধাক্কায় আর কখনও কিছু হবে না।'[৭] তবুও তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। এসময় থেকেই তাঁদের দাম্পত্য জীবন সংকটাপন্ন। আমরা জানি যেকোন সম্পর্ক ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কেও এর অন্যথা হয় না। সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একে অপরকে যে সময় দেওয়ার প্রয়োজন, তারই অভাববোধ করেছেন কবিপত্নী। তিনি অসহায় হয়ে বলেছেন – 'সারাদিনে আমার সঙ্গে একটু কথা বলবার ফুরসত তোমার হবে না? ... আমি সারাটা দিন কী করব নিজেকে নিয়ে... ঐ বাচ্চাটা যদি থাকত...।'[৮] তাঁরা নিজ নিজ জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলেন বাঁচার জন্য। তার পরিণতি ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয় গল্পের শেষে।

সম্পর্কের মধ্যে থেকেও তাঁদের মধ্যে নিজ নিজ জগত তৈরি হয়ে যায়। কবির জগৎ তৈরি হয়ে যায় রাখালরাজাকে ঘিরে। সে তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী। তার পোশাক-পরিচ্ছদেরও বিশেষ বর্ণনা এখানে রয়েছে – 'রাজা একটি বালক। রাজার খালি গা। মাথায় ময়ুর পাখা। কোমরে বাঁধা উত্তরীয়ের মধ্যে গোঁজা একটা আড়বাঁশি।'[৯] ঘরে-বাইরে মানুষের অভিযোগের দায় তিনি তার উপর আরোপ করেন – '...তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। যখন তখন মাথায় কারেকশন আনবে। মনে লাইন আনবে। এনে আমাকে বিপদে ফেলা। যাও তো এখন। আমি অফিসে যাবার সময় বাড়িতে লোক আসা পছন্দ করি না।'[১০] এ যেন কবির নিজ মনের মানুষ, কবির বন্ধু, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাকে তিনি কাছে রাখেন আবার অভিমান করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। রাখাল রাজা আসলে কবির আর একটা সত্তা বা alter ego, একাকী সঙ্গী। শান্তস্বভাব কবির মনে এই দুরন্ত ছেলেটি তাঁর নিঃসঙ্গতাকে বারবার মোচন করেছেন। তাঁকে সাবধান করেছে – 'ত্রুটি সন্ধান করতে গেলেই কিন্তু মরবে'।[১১] অন্যদিকে কবিপত্নীও একা এবং অসুস্থ। একাকীত্বকে জয় করার জন্য তিনি কখনও হোমের বাচ্ছাদের দেখাশুনোর জন্য হোমে চাকরি নেন কখনওবা সদ্য মা হওয়া নিজ বোনকে নিজের কাছে রেখে দেখাশুনো করতে চান। কিন্তু তাঁর মনের বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। মাতৃত্বের অভাবকে প্রলেপ দেওয়ার জন্য তিনিও নিজমনে এক শিশুবালকের জন্ম দিয়েছেন। ঠাকুরঘরে থাকা জড়বস্তু ছোট্ট গোপালের মধ্যে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। নিজের মৃত সন্তানের রূপকে ছোট্ট গোপালকে দেখেন। একাকিত্বকে জয় করতে ছোট্ট গোপালের জন্য নানা পদ রান্না করেন, খেতে দেন। গোপালকে নিয়ে অবসর সময় কাটান। প্রত্যক্ষ অন্তর্ভাষনের কথা বর্ণিত না হলেও পরোক্ষ অন্তর্ভাষনের কথা আসে। একইসঙ্গে প্রকাশ পায় অন্তর্ভাবনা।

নিজ জগতের মধ্যে বেঁচে থাকার কারণে কবির মনের চাহিদা, অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ মনের পর্দায় এলোমেলোভাবে আসছে। কিন্তু এগুলি বাচনিক রূপে প্রকাশ পাচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে – '... আমার বাড়ি ছিল বসিরহাটে। আমার বাড়ি আছিল বনগাঁয়।... ছিল আর আছিল। একটা ঘটি এক্সপ্রেশন একটা বাঙাল এক্সপ্রেশন? হতে পারে। কারণ দু-ধরনের লোকই তো গ্রাম মফসল ছেড়ে এসেছে শহরে। কাজ খুঁজতে। নানাদিক থেকে নানা জাতি এসে মিলে যায় এখানে। নানারকম মেয়েরাও আসে। যেসব মেয়ে কাজ পায়না, তারা, শেষমেশ নিজের শরীরকেই জীবিকা করে। নিজের শরীর ভেঙেই খায়। আচ্ছা, যদি সন্তান এসে পড়ে, কী করে এরা। খবরের কাগজে যে প্রায়ই সন্ধান চাই শীর্ষক বিজ্ঞাপন বেরোয়, তাতে থাকে যেসব সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশুর ছবি, যাদের বাবা-মা-র সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তারা কি অনেক সময় এইসব মায়ের সন্তান? এরা কি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তার আগেই গর্ভপাত ঘটায়।...শরীরকে ভাঙিয়ে যারা খায়, শরীরকে বিক্রি করে, তারা কী আর করবে। শরীর ছাড়া তো কোনো মূলধন নেই তাদের।'[১২] এইভাবেই গল্পের মূলচরিত্রের চেতনায় একবার কবিতার লাইনের শব্দের উদয় হচ্ছে, পরক্ষণে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষগুলির কথা মনে আসছে, কখনও নারীদের বিভিন্ন জীবিকার কথা কখনওবা সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশুর পিতা-মাতার সন্ধান। এসমস্ত অসংলগ্ন ঘটনাগুলি স্মৃতিতে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যায়।

কবিতার মতো জীবনে করা ভুল সংশোধন করতে কবি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছেন। কিন্তু স্ত্রী '... বিদ্যুতের মতো ছিটকে সরে যান, ' না, তুমি ছোঁবে না আমাকে।... এ তোমার কবিতা নয় যে, যতবার খুশি, সংশোধন করবে কাটাছেঁড়া করবে। এটা জীবন, জীবনকে একবার দু-বার কাটাছেঁড়া করলে তা থেকে যে, রক্তপড়া শুরু হয় অনেক সময় তা সারাজীবন বন্ধ হয় না।''[১৩] কবির 'সংশোধন বা কারেকশন'-এর ভাবনা কবির দাম্পত্য জীবনকে মধুর করে তুলতে পারল না। তাঁর জীবনে সুখ-শান্তি দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেনি। তিনি লেখার সংশোধনে পারঙ্গম হলেও জীবন নামক চিত্রনাট্যে তা প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন।

'সংশোধন বা কাটাকুটি' গল্পের প্রধান চরিত্র 'কবি'র বিশেষ আকর্ষণ বা ঝোঁক তাঁর লেখা সংশোধন করা হলেও তাঁদের দাম্পত্য সংকটের চিত্রই বিশেষভাবে প্রতিফলিত। ব্যক্তিমনের সমস্যাকেই গল্পকার প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রায় সমগ্র ছোটগল্পটি প্রথম পুরুষে বর্ণিত। এই বর্ণনারীতিতে কবি ও কবিপত্নীর আত্মকথন এবং সংলাপের মধ্য দিয়ে তীব্র দাম্পত্য সংকট, একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ গল্পটিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তাঁদের চিন্তা, অনুভূতি, স্মৃতি এবং অবচেতন মনের ভাবনাগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ফলত বহির্বাস্তব সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় কালানুক্রম ব্যহত হয়েছে। কাহিনি সরলরৈখিক বিস্তার থেকে মুক্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির ক্রমবর্ধমান ধারায় জয় গোস্বামীর 'সংশোধন বা কাটাকুটি' গল্পটি অভিনব লেখকের নিজস্ব আঙ্গিকে।

তথ্যসূত্র:

১। studocu.com
২। গোস্বামী, জয়, গল্পসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃঃ ৩০
৩। তদেব, পৃঃ ২৬
৪। তদেব, পৃঃ ২৭
৫। তদেব, পৃঃ ৪৮
৬। তদেব, পৃঃ ৪৭

৭। তদেব, পৃঃ ৪৯
৮। তদেব, পৃঃ ৪৪
৯। তদেব, পৃঃ ২৯
১০। তদেব, পৃঃ ৩০
১১। তদেব, পৃঃ ৩৪
১২। তদেব, পৃঃ ২৮
১৩। তদেব, পৃঃ ৪৯-৫০।

তপন বাগচীর আলোকায়ন : রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ আখ্যান

শর্মিষ্ঠা ঘোষ (সিন্‌হা)
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

সারসংক্ষেপ: রাবীন্দ্রিক চেতনায় গৌতম বুদ্ধই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। গৌতম বুদ্ধকে দেবতার আসনে অনেক মানুষ বসালেও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে মানব জ্ঞানেই ভক্তি করেছেন। তিনি নিজেকে বুদ্ধের একজন ভক্ত হিসেবে মনে করেন এবং দেশ বিদেশে বুদ্ধের স্মৃতি জড়িত বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন করেছেন, যেমন – বুদ্ধগয়া, সারনাথ, জাভাদ্বীপের বোরোবুদুর, চীন, জাপান প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন বুদ্ধকে উপলব্ধি করতে। সেই উপলব্ধিই প্রাবন্ধিক তপন বাগচী আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধআখ্যান' নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন। যার মমার্থ হল – 'কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকলকালের মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন। যার চেতনা খণ্ডিত হয়নি, রাষ্ট্রগত, জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।'
সূচক শব্দ: বুদ্ধদেব, রাবীন্দ্রিক চেতনা, মৈত্রী, মানবাত্মা, মুক্তির প্রতীক।

মূল আলোচনা:
"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন গৌতম বুদ্ধই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। অনেকে বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মানুষজ্ঞানেই ভক্তি করেছেন। তাঁর বিবেচনায় গৌতম বুদ্ধ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কী কারণে গ্রাহ্য – এসব প্রশ্নর জবাব খোঁজার চেষ্টা রয়েছে এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বৌদ্ধসংস্কৃতি কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই সংস্কৃতির কী কী অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছিল তাঁর চেতনায়, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে নির্মোহ আয়োজনে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধ আখ্যান কীভাবে এসেছে, রবীন্দ্রনাথ কতটা গ্রহণ করেছেন, কতটা নবনির্মাণ করেছেন তারই ভাষ্য - এই গ্রন্থ। কিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র এই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গবেষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ এবং অধ্যয়নের প্রতিশ্রুতির স্মারক এই গ্রন্থ। এটি যে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ সেই

দাবি না করেও বলা যায় যে, এই গ্রন্থে বাংলাদেশের রবীন্দ্রগবেষণায় একটি নতুন দৃষ্টিকোণের প্রকাশ ঘটেছে।"[১] প্রাবন্ধিক তপন বাগচীর তথ্য নির্ভর আলোচনা থেকে জানতে পারি –

উনিশ শতকে বাঙালির জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তার পেছনে ইউরোপিয় রেনেসাঁর প্রভাব রয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, এই নবজাগরণের কালে প্রাচীন ভারতের সকল আদর্শ ও মতবাদ নতুন করে অনেকের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। গৌতমবুদ্ধের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এডুইন আরনল্‌ডের 'দি লাইট অব এশিয়া' (১৮৭৯)' নামক কাব্যগ্রন্থ শিক্ষিত মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহাবোধি সোসাইটি' (১৮৯১), 'বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি' (১৮৯২) ও 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কর সভা' (১৮৯২) প্রভৃতি। বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণে এই প্রতিষ্ঠাগুলোর ভূমিকা রয়েছে।

বাঙালিদের মধ্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)। 'ললিতবিস্তর' (১৮৭৭), 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি ললিতবিস্তর' (১৮৭৭), 'বুদ্ধগয়া – দি হারমিটেজ অব শাক্যমুনি' (১৮৭৮) এবং 'দি সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব নেপাল' (১৮৮২) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ আখ্যান ও বৌদ্ধসংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন।[২]

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) ও রামদাস সেন (১৮৪৫–১৮৮৭) বৌদ্ধধর্ম নিয়ে আলোচনার নতুন গতি আনেন। 'সাম্য' (১৮৭৯) গ্রন্থে, বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধদেবকে জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বুদ্ধের আবির্ভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যখন বৈদিক ধর্মসজ্ঞাত বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।'[৩]

বৌদ্ধসংস্কৃতি অনুধাবনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন – বঙ্কিমবন্ধু রামদাস সেন (১৮৯১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), গিরিশচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ (১৮৪১–১৮৮১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০–১৮৮৬) এবং রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯–১৯০০)।

পূর্বসুরী এইসকল মনীষীর পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বুদ্ধচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁরা বৌদ্ধসংস্কৃতি আলোচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বুদ্ধকে অবতাররূপে বিচার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেছেন মানব তথা মহামানবরূপে। মনুষ্যত্বের পূর্ণ-প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বুদ্ধের চরিত্রের মধ্যে। তাই 'বুদ্ধদেব' নামক রচনায় তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ : 'কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি অবতাররূপে দেখেছেন।
যাঁর চেতনা খন্ডিত হয়নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।'[৪]

বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কেবল ব্যক্তিবুদ্ধই নন, বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি স্থানের প্রতিও কবির আগ্রহ ও আকষর্ণ ছিল প্রবল। 'সমালোচনা' গ্রন্থে রয়েছে তারই প্রবল স্বীকারোক্তি - 'আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ড রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই ! যখন দেখি, ফুটন্ত ছুটন্ত বর্ত্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চলভাবে বসিয়া তাহার অমরতার অভিশাপের জন্য শোক করিতেছে, অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে!'[৫]

কবি তাই বুদ্ধস্মৃতিকে প্রত্যক্ষ করতে বুদ্ধগয়া, সারনাথ ছাড়াও জাভাদ্বীপের বোরোবুদুর কিংবা চীন ও জাপান দেশে গিয়েও বৌদ্ধমন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করেছেন। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে তিনি বুদ্ধমূর্তিকে প্রণাম করেছেন।

বুদ্ধদেবের কাছে তিনি প্রকৃতই বিনত হয়েছেন। 'বিচিত্র' কাব্যের গানের বাণীতে পাই – "আমায় ক্ষমা হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমারে স্মরি হে নিরুপম।"[৬]

এই একই গান প্রযুক্ত হয়েছে 'নটীর পূজা' নাটকে শ্রীমতীর নৃত্যের সঙ্গে। এই নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের প্রশস্তি করার পাশাপাশি কবির আত্মনিবেদন ধরা পড়েছে।

মহামানব বুদ্ধ এখানে কবির বন্দনায় 'ভগবান বুদ্ধ' হিসেবেই পরিগণিত হয়েছেন। বুদ্ধকে তিনি মনে করেছেন "অনন্তপুণ্য" হিসেবে। হিংসায় উণ্মত্ত পৃথিবীকে মুক্ত করতে তিনি বুদ্ধেরই আশ্রয় নিতে চান। পৃথিবীকে করুণাঘন ও কলঙ্কশূণ্য করতে তিনি বুদ্ধের কাছেই হাত পাতেন।

'বুদ্ধ জন্মোৎসব' কবিতায় সংস্কৃত ছন্দের শাসনে তাই তিনি বলেন –

"হিংসায় উন্মও পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্মলাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চির মধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূণ্য।
এসো দানবীর, দাও
ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহংকার ভিক্ষা।"[৭] (বুদ্ধ জন্মোৎসব, পরিশেষ)

করুণার মূর্তি হিসেবেই বুদ্ধ চিত্রিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে। আবার বুদ্ধদেবের এই করুণাগুণের ব্যখ্যাও তিনি দিয়েছেন 'ধর্ম' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'উৎসবের দিন' নামক প্রবন্ধে – "ঈশ্বর প্রয়োজন বশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।"[৮]

বুদ্ধদেবের বাণী ও আদর্শ নিয়ে কবি যেমন সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন। তেমনি নিজের জীবনাদর্শ গঠনেও প্রয়োগ করেছেন। ১৯৩৫ সালে জয়পুর নিবাসী এক যুবক কালীঘাটের মন্দিরে পশুবলি বন্ধ করার দাবিতে অনশন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করে কবিতা লেখেন। শিলাইদহের পর তিনি পাখি মারা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তিনি নিরামিষ খাওয়ার সংকল্পও করেছেন একাধিকবার। এটি যে বুদ্ধের দর্শনের ফল, তা বলাই বাহুল্য। জাতীয় জাগরণের পর্বে বুদ্ধদেবের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের অবদানই বেশি। বুদ্ধমাহাত্ম্য প্রকাশে তিনি তাঁর সৃষ্টির সকল অঙ্গনকেই উন্মুক্ত রেখেছেন। পৃথিবী-জুড়ে যখন বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, সেই সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। পারিবারিক মণ্ডলে উদার ধর্মীয় সংস্কৃতি একপর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রসার ও গ্রহণের ফলে তাঁর পরিবারে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয়। ১৮৫৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সিংহল যান কেশবচন্দ্র সেন ও ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে। এই সময় তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের

পরস্পর ঘাত – প্রতিঘাত ও সংঘাত (১৮৯৯) ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদ্ধধর্মচর্চার নিদর্শন। এই পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে এই সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। এছাড়াও এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত অঞ্চলে পরিদর্শন ও পরিভ্রমণের ফলে তাঁর মনে এই ধর্মের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। তবে অল্প বয়সেই তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সাথে পরিচিত হন। তিনি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' উপশিরোনামেই তাঁর সম্পর্কে লেখেন ... "এ পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সাথে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারো নহে।"[৯] ১৮৫৫ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহুভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং সেই সময়ের একজন সৃজনশীল বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি প্রগাঢ় মুগ্ধতা জন্মে। রাজেন্দ্রলালের লেখা 'দি সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব নেপাল' (১৮৮২) গ্রন্থখানি পড়েই রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক প্রভাবিত হন। তাঁর অনেক নাটক, কবিতা ও গান রচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে এই গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর অ্যানটিকস্ অফ ওড়িশা (১৮৭৫-১৮৮০) এবং 'বুদ্ধগয়া, দি হারমিটেজ অফ শাক্যমুণি' (১৮৭৮), আসাধারণ গ্রন্থদুটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এশিয়াতে বৌদ্ধসংস্কৃতির পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে ইংরেজ কবি এডুইন আর্নলডের (১৮৩২-১৯০৪) অবদান রয়েছে। তাঁর 'লাইট অব এশিয়া' কাজ সেই সময়ের তারুণ্যের মনেও প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থে বর্ণিত গৌতম বুদ্ধের সন্ন্যাস গ্রহণের আগের মুহূর্তের উপলব্ধি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'বিদায়' নামের একটি কবিতা যা 'কল্পনা' কাব্যের অর্ন্তভুক্ত –

"ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়
শুধু সমাপন ।"[১০]

এই কাব্যের 'বিদায়' নামে আরেকটি কবিতা স্থান পেয়েছে, যাতে বুদ্ধের গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তের বিবরণ – "এবার চলিলু তবে / সময় হয়েছে নিকট, এখন / বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"[১১]

এছাড়াও নববিধান আন্দোলনের গ্রন্থাবলির রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে। কেশবচন্দ্র সেনের পরামর্শে শুধু অঘোরনাথ রচিত "শাক্যমুণিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব" (১৮৮১) গ্রন্থখানিও রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে। এই গ্রন্থকেই বলা হয় বাংলাভাষায় বুদ্ধচর্চার প্রথম পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ। এই গ্রন্থের ধারা বেয়ে নববিধানমণ্ডলীর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কালীশঙ্কর দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ সদস্য বুদ্ধচর্চায় মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। ১৮৮২ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী সেনের 'বুদ্ধচরিত' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তাঁর 'অশোক চরিত' (১৮৯২) গ্রন্থখানিও বৌদ্ধধর্মচর্চার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এইসকল গ্রন্থগুলিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বুদ্ধদেব সম্পর্কে জ্ঞান আরোহণের সম্বল হয়ে উঠেছিল। এদিকে সিংহল থেকে ১৮৯১ সালে কলকাতায় আসেন অনাগরিক ধর্মপাল (১৮৬৪-

১৯৩৩)। কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটির (১৮৯১) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৯৩ সালে বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরূপে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় যোগ দেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও এতে যোগ দেন।

কলকাতার ধর্মরাজিক চৈত্যবিহার (১৯২০) ও সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের (১৯৩১) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ধর্মপাল। তাঁর আমন্ত্রণেই রবীন্দ্রনাথ ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারের বৈশাখী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এই ভাষণেই তিনি গৌতমবুদ্ধকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' হিসেবে শ্রদ্ধা জানান। চৈত্যবিহারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ স্থাপন উপলক্ষে 'বুদ্ধবরণ' একটি কবিতা লেখেন। সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি 'বুদ্ধদেবের প্রতি' নামে একটি কবিতা লেখেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধের জন্ম মানে মহাজাগরণ। তাই কবি লিখেছেন –

> "ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে তব জন্মভূমি।
> চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু, আয়ু করো দান।"[১২]

ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে ১৯০২ সালে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে জাপানি শিল্পবোদ্ধা কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে। জাপানের নবজাগরণের এই নায়কের 'এশিয়া ইজ ওয়ান' আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকর্ষণে ওকাকুরার ভূমিকাও প্রবল। গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিধন্য স্থান বুদ্ধগয়া ও সারনাথে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ করেছেন। ১৯১৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য যখন আসেন তখন তিনদিন অবস্থানের সময় "এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার" প্রভৃতি ১০ টি গান রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চার ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে বিশ্বভারতীতে আনেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি পালি ভাষা শেখেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবাস্থা করেন। বিধুশেখর শাস্ত্রীকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পালিপ্রকাশ' (১৯১১) ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করান। বিধুশেখরের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন (১৯০৬)। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাপান যান। জাপানিদের সংযম, সততা ও কর্মনিষ্ঠা দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং ভারতীয়রা সেই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেননি বলে লজ্জিতও হন। 'জাপানযাত্রীতে' প্রকাশ - জাপানীদের কথায় : "এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের এক দিকে সংযম আর-এক দিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে। এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম।"[১৩]

প্রথমবার তিনি রেঙ্গুন শহরে প্যাগোডা পরিদর্শন করেন। এছাড়া ১৯২৪ সালে রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বৌদ্ধসংস্কৃতি মন্ডিত সিংহলে রবীন্দ্রনাথ তিনবার ভ্রমণ করেছেন এবং রাজধানী অনুরাধাপুরে অনুষ্ঠিত বৈশাখী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে অসুস্থ অবস্থায়ও যোগ দেন। সিংহলবাসীও নবচেতনায় জেগে ওঠে। ১৯২৪এ - রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ। ১৯২৭ সালে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, যবদ্বীপ, বালি, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দ্বীপে ভ্রমণ করেন। বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার জাভাদ্বীপে বোরোবুদুর মন্দির দর্শনের বিবরণ 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থে রয়েছে। এখানে ৫০৪টি বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। বোরোবুদুরকে নিয়ে কবিতাও লিখেছেন কবি। এরপর শ্যামদেশ (বর্তমান থাইল্যান্ড) এর ঐতিহ্যবাহী এলাকা সিয়াম পরিদর্শন করেও তিনি ২টি কবিতা লেখেন। চীন - ভারত মৈত্রী পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও চিনা অধ্যাপক তানয়ুন সান ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হয় 'চীনভবন'। এই

'চীনভবনে' চীন, তিব্বত, জাপান, শ্রীলঙ্কা মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা আসেন বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা নিতে। রবীন্দ্রনাথের চেতনার বৌদ্ধ সংস্কৃতি যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে এই উদ্যোগ তারই প্রমাণ বহন করে। ২০১০ সালের ৩০শে মে সাংহাই শহরের নাং চাং সড়কে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশততম জন্মবর্ষে চীনদেশে স্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তির ফলক উন্মোচন করেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল। তবে জাপানের নাগানো জেলায় কারুইজাওয়ার আসামা পর্বতের পাদদেশে জাপানের নারীনেত্রী মাদাম তোরি কোরার প্রতিষ্ঠিত ব্রোঞ্জনির্মিত 'অহিংসমানবঠাকুর শান্তিমূর্তি' - রবীন্দ্রনাথের এই আবক্ষ মূর্তিটি খুবই উল্লেখ্য। নাগানো জাপানের স্বাস্থ্যকর স্থান ও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যেমন আকৃষ্ট ছিলেন তেমনি ঐ সংস্কৃতির লোকেরা তাঁকে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তার দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে। তাই বৌদ্ধসংস্কৃতি ও বৌদ্ধ আখ্যান হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রসঙ্গ:

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় বলতে গিয়ে বলতে হয় - উনিশ শতক বাঙালির নবজাগরণের সূচনায় সাহিত্য-সংস্কৃতির উপলব্ধির মধ্যে ধর্মচিন্তা-জাত দার্শনিক উপলব্ধির সংযোগ ঘটে। বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ ও সমালোচনা এই উপলব্ধিকে জাগ্রত রাখে। 'কথা ও কাহিনী' কবিতা গ্রন্থের সকল আখ্যানই তিনি গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধকাহিনী থেকে। এই গ্রন্থের আখ্যা-অংশে 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে মেলে। এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহিত।[১৪]

'কথা ও কাহিনী'র ৩৩ টি কবিতাই বৌদ্ধ কাহিনীজাত। এর বাইরেও অজস্র কবিতা রয়েছে যাতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির উপকরণ রয়েছে।

কথা কাব্য	**কাহিনী কাব্য**
কথা কও, কথা কও, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ, মস্তকবিক্রয়, পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী, অপমান বর, স্বামীলাভ, স্পর্শমান, বন্দীবীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, গুরুগোবিন্দ, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ, বিচারক, পণরক্ষা।	১। কত কী যে আসে ২। গান ভঙ্গ ৩। পুরাতন ভৃত্য ৪। দুই বিঘা জমি ৫। দেবতার গ্রাস ৬। নিষ্ফল উপহার ৭। দীনদান ৮। বিসর্জন

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'মস্তকবিক্রয়', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', 'সামান্য ক্ষতি', 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'নগরলক্ষ্মী', 'শাপমোচন' প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধ আখ্যানের প্রত্যক্ষ গ্রহণ রয়েছে। এছাড়া 'পুনশ্চ' কাব্যের শাপমোচন কবিতায় আছে বৌদ্ধ ধর্মীয় আখ্যান -

'গান্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীত সভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরু শিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী ।'[১৫]

পরিশেষ কাব্যের 'বুদ্ধজন্মোৎসব' এ আমরা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধপ্রশান্তি উপলব্ধি করতে পারি -

'হিংসায় উন্মত্তপৃথ্বী
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির মধুনিষ্যন্দ।'[১৬]

বোরোবুদুর দেখার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ এক অসাধারণ কবিতা লিখেছেন - তাতে তিনি বোরাবুদুরের বর্ণনার পাশাপাশি বুদ্ধের আদর্শের কথা প্রকাশ করেছেন একান্ত অনুসারীর মত।

"তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র, - 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।[১৭]

প্রাচীন সিয়াম নিয়ে কবিতা দুটিতে সিয়ামের পুরাকীর্তি এবং বৌদ্ধমূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ কেবল আপ্লুত নন, শ্রদ্ধায় আনন হন।

"কোন মে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম
হে সিয়াম।"[১৮]

'প্রার্থনা' শিরোনামের কবিতায় রয়েছে ভগবান বুদ্ধের নানাকৌণিক উপস্থাপনা। 'পত্রপুট' কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতাও বুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। 'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যের ও ৬ সংখ্যক কবিতা বুদ্ধ দর্শন ধন্য। 'খাপছাড়া' কাব্যের ৬৬ সংখ্যক কবিতায় বুদ্ধেকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে।

"দুর্জন মানুষেরে ক্ষমেছেন বুদ্ধ তো।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো –
এক ভিন্ন আঙ্গিকে বুদ্ধ তো। দ্বার করি শুদ্ধ তো।"[১৯]

প্রবন্ধ সাহিত্য যেহেতু চিন্তামূলক তাই তাতে বুদ্ধ প্রসঙ্গ বেশি উচ্চারিত হয়ে চলে।

প্রবন্ধ গ্রন্থ:

সমালোচনা, ভারতবর্ষ, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাচীন সাহিত্য, সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজাপ্রজা, ধর্ম, সঞ্চয়, পরিচয়, জাপানযাত্রী, লিপিকা, 'জাভাযাত্রীর পত্র', ভারতপথিক, মানুষের ধর্ম, ভারতপথিক, রামমোহন, শান্তিনিকেতন, কালান্তর, পথের সঞ্চয়, আত্মপরিচয়, সাহিত্যের স্বরূপ,

বিশ্বভারতী, ইতিহাস, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিকবার বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃতি ও আখ্যানের উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সেভাবে বুদ্ধ প্রসঙ্গ নেই। উপন্যাসের মধ্যে 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের আত্মকথায় এসেছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের প্রসঙ্গ। 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসেও আছে বুদ্ধপ্রসঙ্গের অবতারণা। লাবন্য ও অমিতের সংলাপে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পথ সম্পর্কে। আছে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা ও আলেকজান্ডারের যাত্রার খবর। এতে লেখকের ঐতিহাসিক জ্ঞানের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ধারণাও প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৌদ্ধ আখ্যান। রবীন্দ্রনাথ ৫০টিরও বেশি নাটক লিখেছেন। পৌরাণিক আখ্যান থেকে সারবস্তু, চরিত্র অবলম্বন কখনো করলেও বৌদ্ধ আখ্যানের তীব্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বৌদ্ধ আখ্যানের প্রয়োগ রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্যাদাকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে। তেমনি সনাতন ধর্মের অচলায়তন গোঁড়ামি অন্ধ কুসংস্কারকে আঘাত হেনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থারই প্রমাণ বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত অবদান সাহিত্য থেকে। এছাড়া ধর্মরাজ বড়ুয়ার 'হস্তসার' (১৮৯৩) গ্রন্থটিও তাঁর কাহিনী চয়নে সহায়ক হয়েছে।

নাটকের বৌদ্ধআখ্যানের উৎস – সন্ধান

এবারে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

রচনাকাল	নাম	কাহিনী উৎস	মূল অবদানগ্রন্থ
১৮৯৬	মালিনী	মালিন্যাবস্তু অবদান	মহাবস্তু অবদান
১৯১০	রাজা	কুশজাতক	মহাবস্তু অবদান
১৯১২	অচলায়তন	চূড়া পক্ষাবদান	দিব্যাবদান
১৯১৮	গুরু	চূড়া পক্ষাবদান	দিব্যাবদান
১৯২০	অরূপরতন	কুশজাতক	মহাবস্তু অবদান
১৯২৬	নটীর পূজা	জাতক	অবদান শতক
১৯৩৯	শ্যামা	জাতক	মহাবস্তু অবদান
১৯৩৩	চণ্ডালিকা	শার্দূলকণাবদান	দিব্যাবদান
১৯৩৮	নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	শার্দূলকণাবদান	দিব্যাবদান
১৯৩৯	শাপমোচন	কুশজাতক	মহাবস্তু অবদান

মালিনী (১৮৯৬) - বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকের নাম 'মালিনী'। বৌদ্ধ আখ্যান অক্ষুণ্ন রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকে সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর নামে দুটি পৃথক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ধর্মনাশের আশঙ্কায় হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীরা মালিনীকে দন্ড দেয়। রাজকন্যা মালিনীর শেষ সংলাপ 'মম ক্ষেমংকর' বলে ক্ষমার চরম পাঠ প্রকাশিত। যে ক্ষেমংকর একটু আগেই ধর্মপ্রাণ সুপ্রিয়কে বধ করেছে, তাকেও মালিনীকে ক্ষমা করে দেয়। এইতো বুদ্ধের আদর্শ। মালিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে যেমন আঘাত করা হয়েছে, তেমনি বুদ্ধের আদর্শ বিশেষত ক্ষমার বাণী প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে।

রাজা (১৯১০) ও অরূপরতন (১৯২০) – 'রাজা' নাটকটিরই পুনর্লিখিত রূপ এই 'অরূপরতন'। বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব রূপক নাটক।

অচলায়তন (১৯১২) ও গুরু (১৯১৮) - এই নাটকেও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংকীর্ণতাকে দেখানো হয়েছে। অচলায়তনের বাইরে এসে দাদাঠাকুর পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। 'ডাকঘর' নাটকের 'অমল মুক্তধারা' নাটকের 'অভিজিৎ' এবং 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জনের মতো 'অচলায়তন' নাটকের 'পঞ্চক' হলো মানবাত্মার মুক্তির প্রতীক। পূজারিণী (১৩০৬) ও নটীর পূজা (১৯২৬) পূজারিণী কবিতাটির বিষয়বস্তুকেই তিনি 'নটীর পূজা' নাটকে রূপান্তর করেছেন। বুদ্ধকে পূজার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার এই কাহিনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'নটীর পূজা'। মূল কাহিনীর শ্রীমতীই রবীন্দ্রনাথের নটী।

"বুদ্ধং, সরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি ।"[২০]

নটী শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের ত্যাগের বানী প্রচারিত হয়।

চণ্ডালিকা (১৯৩৩) ও নৃত্যনাট্য (১৯৩৮) - এই নাটকটি জাতিভেদ বিরোধী। হিন্দু সমাজের অশুচিতা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বক্তব্য প্রকাশিত। পরিশোধ কবিতার রূপান্তর শ্যামা (১৯৩৯) নাটক, ভগবান বুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই নাটকের যবনিকা ঘটে শ্যামা নাটকের।

"ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।"[২১]

রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় রয়েছে বৌদ্ধধর্মের বাণী ও দর্শন। উল্লেখ্য কয়েকটি এখানে ধরা গেল। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' (১৩০৪) – দানশীলতাকে মহিমান্বিত করেছে। মস্তক বিক্রয় (১৩০৪) – এখানেও মহৎ ত্যাগের মহিমা জয়ী হয়েছে। 'পূজারিনী' (১৩০৬) তে শ্রীমতী নিজেকে বুদ্ধের দাসী বলে পূজার সংকল্পে অটুট থেকে বুদ্ধের প্রতি অবিচল আস্থাশীল থেকেছেন। 'অভিসার' (১৩০৬) - এ উপগুপ্ত মানবজীবনের নশ্বরতা ও বুদ্ধের কল্যাণময় ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেন। বাসবদত্তার যন্ত্রণা ও করুণা কাহিনী দিয়ে এক চমৎকার শিক্ষামূলক কবিতা রচনা করেছেন।

'সামান্যক্ষতি' (১৩০৬) – বৌদ্ধ রাজাদের ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবে কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ।

'মূল্যপ্রাপ্তি' (১৩০৬) – গরিব মালির ভক্তির মূল্যই বিবেচ্য ।

'নগরলক্ষ্মী' (১৩০৬) – দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় সুপ্রিয়ার সুষ্ঠ ভূমিকা :

'আমার ভান্ডার আছে ভরে
তোমা – সবাকার ঘরে ঘরে
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে।
ভিক্ষা – অন্নে বাঁচার বসুধা –
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'[২২]

এরকম আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সুপ্রিয় ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরে বের হন, হয়ে ওঠেন 'নগরলক্ষ্মী'।

পরিশেষে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ঠ মানব বলে গণ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি কিছু তাঁর বানী গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মীয় মূলতত্ত্বের চেয়ে আদর্শকে গ্রহণ করেছেন তীব্রভাবে। তাই শাস্ত্র নয় আখ্যানের প্রয়োগকলার প্রতিই ছিল তাঁর পক্ষপাত। তাঁর বৌদ্ধ আখ্যানের প্রয়োগ বেশি ঘটেছে নাটকের ক্ষেত্রে। কবিতায় ও গানেও রয়েছে বুদ্ধের বানী প্রচার। বৌদ্ধসংস্কৃতির দেশগুলোতে ভ্রমনের সময়ে তিনি যে সকল বক্তব্য রেখেছেন, তাতে তাঁর নিজস্ব চিন্তার ছাপ পরিলক্ষিত। বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং নিজের মতো প্রয়োগ করেছেন।

যে ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম, সেই ভারতবর্ষে থেকে বুদ্ধের আদর্শ ক্রমশ আপসারিত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষের এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে জাপান, চিন, ইন্দোনেশিয়া ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত ফেরালেন ঐ সকল দেশের আদর্শের দিকে। আর তাই তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলাতে চাইলেন। আর এভাবেই সৃষ্টি হল রবীন্দ্রদর্শন। বৌদ্ধসংস্কৃতিকে তিনি নিজের মতো করে আত্মস্থ করেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা গৌতমবুদ্ধকে দেখতে পাই। বৌদ্ধ আখ্যানের ভিত্তিতে রচিত রবীন্দ্ররচনা, বাংলা সাহিত্যই নয়, বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই অমূল্য সম্পদ।[২৩]

"মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে : আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানব মহিমায় দেদীপ্যমান।

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।"

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মেধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।"[২৪]

তথ্যসূত্র:

১। বাগচী তপন, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধআখ্যান, অক্ষর বুনন, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০; ফেব্রুযারি ২০২৪। গ্রন্থ পরিচিতি অংশ থেকে গৃহীত।
২। বাগচী তপন, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধআখ্যান, অক্ষর বুনন, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০; ফেব্রুযারি ২০২৪, পৃঃ ১৮।
৩। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড সাম্য প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত, প্রকাশক সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৩৮২।
৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বুদ্ধদেব', প্রকাশক – শ্রী পুলিন বিহারী লেন, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা – ৭০০০০৭, থেকে গৃহীত।
৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সমালোচনা' গ্রন্থ (১৮৮৮) থেকে গৃহীত।
৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'বিচিত্রা' কাব্য গ্রন্থ (১৯৩৩) থেকে গৃহীত।
৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'পরিশেষ' কাব্য – র (১৯৩২) অন্তর্ভুক্ত 'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতা থেকে গৃহীত।

৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘ধর্ম’ প্রবন্ধগ্রন্থের (১৯০৯) অন্তর্ভুক্ত ‘উৎসবের দিন’ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃঃ ১৭, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা – ৭০০০১৭।
৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘জীবনস্মৃতি’ থেকে গৃহীত।
১০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘বিদায়’ কবিতা (১৯০০) থেকে গৃহীত।
১১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘বিদায়’ (২নং) (১৯০০) থেকে গৃহীত।
১২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘পরিশেষ’ কাব্যের - ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’ কবিতা (১৯৩২) থেকে গৃহীত।
১৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘জাপানযাত্রী’ (১৯১৯) থেকে গৃহীত।
১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘কথা ও কাহিনী’ (১৯০০) থেকে গৃহীত।
১৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ‘শাপমোচন’ কবিতা (১৯৩২) থেকে গৃহীত।
১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘পরিশেষ’ কাব্যের ‘বুদ্ধজন্মোৎসব’ কবিতা (১৯৩২) থেকে গৃহীত।
১৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘কথা ও কাহিনী’র (১৯০০) অন্তর্ভুক্ত ‘বোরোবুদুর’ কবিতা থেকে গৃহীত।
১৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘কথা ও কাহিনী’র (১৯০০) অন্তর্ভুক্ত ‘সিয়াম’ কবিতা থেকে গৃহীত।
১৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘খাপছাড়া’ কাব্য – ৬৬ সংখ্যক কবিতার পংক্তি বিশেষ (১৯৩৭)।
২০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘পূজারিণী’ (১৩০৬) এবং ‘নটীর পূজা’ (১৯২৬) কবিতা থেকে গৃহীত।
২১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘পরিশোধ’ (১৩০৬) কবিতা / ‘শ্যামা’ (১৯৩৯) নাটক থেকে গৃহীত।
২২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ‘নগরলক্ষ্মী’ (১৩০৬) কবিতা / ‘কথা ও কাহিনী’ (১৯০০৯) থেকে গৃহীত।
২৩। বাগচী তপন, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ আখ্যান, অক্ষর, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০২৪।
২৪। Editor : Chowdhury Hemendu Bikash, ‘JAGAJJYOTI’, Journal on Buddhism since 1908, “Tribute to Rabindranath Tagore” Buddha Dharmankur Sabha, (Bengali Buddhist Association), 1 Buddhist Temple Street, Kolkata – 700012 – এর অন্তর্ভুক্ত মহাবোধ সোসাইটি আয়োজিত বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ থেকে গৃহীত – ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৮ মে ১৯৩৫) প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২। ‘বুদ্ধদেব’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৭৮।

সহায়কগ্রন্থ (গৌণ সূত্র):

১) R. C. Dutt : Civilization of India, J. M. Dent and Sons, London, 1900.
২) Basanta Kumar Roy : Rabindranath Tagore, The man his poetry, Dodd Mead and Company, New York, 1915.
৩) প্রবোধচন্দ্র বাগচী : বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৯৪৩।
৪) প্রবোধচন্দ্র সেন : ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কোলকাতা, ১৮৬২।
৫) আশা দাস : বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা–১৯৬৯।
৬) সুধাংশুবিমল বড়ুয়া : রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, শ্রী মৈত্রেয় বড়ুয়া (প্রকাশক), দঃ ২৪ পরগণা, ২য় সং, ১৯৮৮।
৭) সুনন্দা বড়ুয়া : বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।
৮) শ্যামসুজ্জামান খান (সম্পা) : মাসিক উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, এপ্রিল, ২০১১।
৯) আবুল হাসনাত (সম্পা) : মাসিক ‘কালি ও কলম’, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১১
১০) ‘অনিল আচার্য’ : ত্রৈমাসিক ‘অনুষ্টুপ’ (অতিথি সম্পাদক অদ্রীশ বিশ্বাস), কলকাতা, বর্ষ ৪৪, সংখ্যা ৪র্থ, ২০১০।

শৈলীর নবনির্মাণ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প (নির্বাচিত)

রিঙ্কু ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract): গল্প বলার ইতিহাস মানব সভ্যতায় সুপ্রাচীন। গল্প-সাহিত্য মানব জীবনের উজ্জ্বলতম দর্পণ। মানব মনে গল্পের প্রধান উৎস হল জীবনের বিচিত্র রূপ ও তার ঘাত-প্রতিঘাত। আর এই সংঘাতের চিত্র আধুনিক কথাসাহিত্যের ছোটগল্প নামক শিল্পকলাতেও সমান সত্য। কবিতার মতো এখানেও জীবন রহস্যের বিচিত্র দিক নিবিড় ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্পের দ্বার উদঘাটন বহু পূর্বে ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম অসচেতন বিকাশ সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনের তাগিদে। বড় গল্প বা উপন্যাস রচনায় শিল্পীর অবচেতনার মধ্যেই অজ্ঞাত মুহূর্তে বাংলা ছোটগল্প প্রথম জন্মলাভ করে। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকার প্রবাহ ও জীবন প্রেরণাই ছোটগল্পের উৎস। প্রথম সার্থক ছোটগল্পের (মধুমতী) আবির্ভাব হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' এর পাতায়। উনিশ শতকের জটিল জীবনযন্ত্রণা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে বাঙালী জীবনধারা প্রবেশ করেছে বিশ শতকে। এই শতকের বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মন্বন্তর ও দাঙ্গা বাঙালী সত্তাকে জর্জরিত করে তুলেছিল। এই টানাপোড়েন ও একাধিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কথা সাহিত্যের ছোটগল্প প্রবহমান।

বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশকটি রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা ঘাত-প্রতিঘাতে উত্তাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন (১৯৪১), ক্রিপশের আগমন (১৯৪২), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬), মন্বন্তর (১৯৫০) এই সময়পর্বে গভীরভাবে ছাপ রেখে যায়। এই সব ঘটনা মানুষের মূল্যবোধের সংকটকে প্রতিফলিত করেছিল। সাহিত্যের অন্য শাখার মতো ছোটগল্পও প্রভাবিত হল। নতুন আঙ্গিক নিয়ে হাজির হলেন সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসুর মতো কালজয়ী ছোটগল্পকার। পালটে গেল ছোটগল্পের উপস্থাপন রীতি তথা শৈলী। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিমল করের গল্পে এল বিচিত্র শৈলী।

ছয়ের দশকে বাংলার আর্থসামাজিক পরিবেশে কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু ১৯৫৯ এর খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬২ ও ৬৫-র চীন-পাকিস্তান সীমান্ত যুদ্ধ, ১৯৬৪ তে জওহরলাল নেহরু ও ১৯৬৬ তে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু বাংলার রাজনীতিতে পালাবদল ঘটালো। ১৯৬৭ এর যুক্তফ্রন্ট সরকার, ১৯৬৮ তে রাষ্ট্রপতি শাসন, ১৯৬৭ থেকে শুরু হওয়া নকশাল আন্দোলন সাতের দশককেও অগ্নিগর্ভ করে তুলল। এই সময়ের বিপন্নতা দিয়ে লেখা শুরু করলেন মহাশ্বেতা দেবী, সুবোধ ঘোষ, শৈবাল মিত্র, দেবেশ রায় প্রমুখ। অভিজিৎ সেন, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুবিমল মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, আফসার আহমেদ, নবারুণ ভট্টাচার্য এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মতো শক্তিমান গল্পকার এই সময়ে লিখতে শুরু করলেন। রাজনীতি থেকে এঁরা কিছুটা সরে এলেন। পরিবর্তিত হল গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক।

সত্তরের গল্পকারদের মধ্যে ব্যক্তিভেদে ভাষা, শৈলী ও সংরূপ আলাদা হয়ে যায়। প্রচলিত প্রথা ভেঙে ফেলেন। শব্দ ব্যবহার, গঠন, সংরূপ, বাগবিধি চয়নে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। স্রষ্টা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষা নির্বাচন করেন এবং শৈলী বা সংরূপ নির্মাণ করেন। কথ্য ভাষা, আঞ্চলিক শব্দ, শ্যাং, ইংরেজি শব্দ বা বাক্য ব্যবহার সত্তর থেকেই দেখা গেছে। সময়োপযোগী করে তুলতে গিয়ে ভাষাকে একেবারে মাটির স্তরে নামিয়ে এনেও ব্যবহার করেছেন তাঁরা। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে ভাষা ও শৈলীর নব নব দিক উদ্ভাসিত।

সূচক শব্দ (Key words): চামচেগিরি, ইদানীং, নির্ঘাত, রেডিয়াম, হ্যান্ডশেক, প্রাইমারি ওয়ার্ড।

মূল আলোচনা (Discussion):

সাতের দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক তথা ছোটগল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গল্পের প্রবাহ বর্তমানেও বহমান। তিনি স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন-

> ''আমরা যারা গত শতাব্দীর সত্তরের ঝোড়ো হাওয়ায় সাহিত্য আঙ্গিনায় ছুটেছিলাম, নতুন নতুন তত্ত্বকথা, উত্তর ঔপনিবেশিকতা ও তৃতীয় বিশ্বের কথাসাহিত্য যেমন চেতনায় তাঁদের ছায়া ফেলেছিল, দেশজ শিকড় হিসেবে পুরাণ, লোককাহিনী ও মিথ এর সন্ধান, বিনির্মাণের তাগিদও কম জরুরি ছিল না তাঁদের কাছে। আমার গল্পের ভুবনে সে-সবের প্রয়াস হয়তো মনোযোগ দিলে খুঁজে পাওয়া যাবে।"

অর্থাৎ সত্তরের দশকেই লেখকদের মধ্যে আমরা এই প্রবণতা খুঁজে পাই। সাধন চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রত্যেক গল্পেই আছে বিনির্মাণের ভাবনা। শৈলীর অনন্য ভাবনা। কখনো পৌরাণিক চরিত্রকে বাস্তবের কষাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছেন। আবার কখনো শ্ল্যাং ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপনে এনেছেন অভিনবত্ব। শৈলীগত বিশিষ্টতায় তাঁর প্রত্যেকটি গল্প বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায় শৈলীগত ভাবনার নবরূপতা। তাঁর লেখা দশটি গল্পের শৈলীগত উপাদান বিশ্লেষণই আমাদের প্রধান বিবেচ্য। এই গল্পগুলির নিরিখে আমরা তাঁর ছোটগল্পের শৈলী নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

১. সমান্তরলতা: শৈলীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমান্তরলতা। এই সমান্তরলতা তৈরি দলের স্তরে, শব্দের স্তরে, বাক্যের স্তরে। শব্দের এককেও সমান্তরালতা তৈরি হতে পারে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমান্তরলতার উদাহরণ অজস্র।

১.১. অটো ছোটে, সাইকেল যায়, বাসগুলো হাঁটে তবে সংখ্যায় কম। (সীতা) এখানে ক্রিয়াপদে (ঘটমান বর্তমান) সমান্তরলতা সৃষ্টি হয়েছে।

১.২. বাক্যের স্তরেও সমান্তরালতা তৈরি হয়েছে 'অপারেশন মিলেনিয়াম' গল্পে-ক্যালেন্ডারের পুরোনো পাতা উড়ল না, প্লাস্টার খসল না, সাইকেল স্থির হয়ে রইল।

১.৩. আবার দলের স্তরে সমান্তরলতা দেখা যায় 'সীতা' গল্পে-

গণেশ পা-বে, মালা গলায় দে-বে, ফেঁসে গেল সো- মা

এখানে পা-বে, দে-বে, সো- মা ইত্যাদি শব্দে দলের স্তরে সমান্তরলতা তৈর হয়েছে।

১.৪. একটি শব্দের মাধ্যমেও সমান্তরলতা সৃষ্টি হয়েছে' সীতা' গল্পে-

- তিন!
- চার!

-পাঁচ!

-ছয়!

-সাত!

মনোহারী দোকানের খ্যাপা কুণ্ডু ডাকল এগার।'

১.৫. একাধিক বিশেষণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সমান্তরলতা তৈরি হয়েছে 'একটি সন্ধ্যা' গল্পে-ম্যাডাম সুচেতা বক্সি -

'স্বদেশী'

'স্বয়ংসম্পূর্ণ'

'সার্বভৌম।

'জনগণের স্বপক্ষে'

'আত্মনির্ভর'।

এগুলোর পুরানো অর্থ হারিয়ে গেছে, নতুন অর্থও হয়নি। ফাঁপা ঘুরে বেড়ায়।'

এখানে একাধিক বিশেষণ পরপর বসে অদ্ভুত সমান্তরলতা তৈরি করেছে।

২. প্রমুখণ: শৈলীর গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি উপাদান প্রমুখণ। বাক্যসজ্জা তথা পদক্রমের অদল-বদল ঘটেই তৈরি হয় প্রমুখণ। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আমরা প্রমুখণ সৃষ্টি হতেও দেখি।-

২.১. কী যে ছ্যাঁকা গেল ভেতর ভেতর। (তাইতো খুকু রাগ করছে) এখানে 'ভেতর ভেতর' অব্যয়টি প্রথমে না বসে বাক্যের শেষে বসেছে।

২.২. অতিরিক্ত ভাতে কোন পয়সা লাগেনা এখানে। চালের দেশ এটা। (তাইতো খুকু রাগ করেছে। এই বাক্যে 'এখানে 'এবং 'এটা' প্রথমে না বসে বাক্যের শেষে বসে প্রমুখণ সৃষ্টি করেছে।

২.৩. হ্যাজাক জ্বলছে সামান্য শোঁ শোঁ শব্দ নিয়ে। (গান্ধারী)।

অসমাপিকা ক্রিয়া (শব্দ নিয়ে) কখনো বাক্যের শেষে বসে না। তা সবসময়ই সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। কিন্তু এই বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া একেবারে শেষে বসেছে।

২.৪. এখানে ডিম পেড়েছে ইদানীং।

কিংবা

তোমার বৈধব্য ছিল নির্ঘাত। (গান্ধারী)

এই উদাহরণ গুলো তেও' ইদানীং', 'নির্ঘাত' ইত্যাদি অব্যয় পদগুলো একেবারে শেষে বসেছে।

২.৫. সাত তারিখ দুপুর দুইটায় ইন্টারভ্যু....এই রোববারের পরের রোববার আজ্ঞে। (দাঁড়াবার জায়গা)

সম্বোধনসূচক অব্যয় সর্বদা বাক্যের প্রথমে বসে। তাই' আজ্ঞে' পদটি বাক্যের শেষে নয় প্রথমে বসা উচিত ছিল। পদটি শেষে বসে প্রমুখণ সৃষ্টি করেছে।

২.৬. রণো বুঝে ফেলে শ্যামের ছেলেপুলে, রণো একটা সিগারেট ধরায় হালকা মুডে।
(অপারেশন মিলেনিয়াম)

'হালকা মুডে' ক্রিয়া বিশেষণটি 'ধরায়' ক্রিয়াপদটির আগে বসেনি, পরে বসেছে।

৩. বিচ্যুতি: শৈলীর অন্যতম উপাদান বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি সাধন চট্টোপাধ্যায় ছোটগল্পে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত।

৩.১. উপস্থাপনায় বিচ্যুতি:

৩.১.১. পরিণতি বলে দিয়ে গল্পের সূত্র নির্মাণ আধুনিক কালের ছোটগল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বিভুর পৃথিবী', গান্ধারী' গল্পগুলোর শুরুও এইভাবে। 'বিভুর পৃথিবী' গল্পে আছে - "বিভুর বিপদ। খুবই। যে-কোনো অবস্থায়, বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। এমনকী জগদ্দলের বাসে উঠবার মুখেও কে যেন টুক করে শাসিয়ে গেল বিভুকে যাচ্ছিস তালে? নে, শেষবারের মতো ঘুরে নে!"

গল্পের পরিণতি বললেও, প্রকৃত কাহিনী, কেন বিভুর বিপদ তা পরে বর্ণিত।

৩.১.২. ছোটগল্পের উপস্থাপনার সংরূপ বদলে গেছে তাঁর গল্পে। পত্রের আদলে একটার পর একটা পত্রের সংযোগে। তাইতো খুকু রাগ করেছে' গল্পটি রচিত। মা-কে পত্র লিখেছে মেয়ে মান্তা। সংসারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা জানিয়েছে। কিন্তু গল্পের চমক পত্রের উত্তরে। মা চিঠির উত্তর দেয়নি, দিয়েছে বড় বৌদি। মা-কে বলা মেয়ের একেবারে গোপনীয় কথা পড়েও নিয়েছে বড় বৌদি। বিশেষ তাৎপর্যের বিষয় বড় বৌদি চিঠির উত্তর ননদকে দেয়নি, দিয়েছে ননদের স্বামী কিরণময়কে। এরপর মেজদাকে মান্তা পুনরায় চিঠি পাঠিয়েছে। শুরু হয়েছে গল্পের প্রকৃত ক্লাইম্যাক্স। অর্থাৎ চারটি পত্রের মাধ্যমে গল্পের বুনন করেছেন গল্পকার।

৩.১.৩. 'জল আগুনের ব্যাকরণ। গল্পের শুরু হয়েছে একরাশ প্রশ্ন দিয়ে। যার উত্তরের অন্বেষণ চলে গোটা গল্প জুড়ে।

কে বলেছিল যেন....? কথাগুলো..........? অস্পষ্ট আর্তনাদের মতো....?"

৩.১.৪. 'উট' গল্পটির প্রথম বাক্য 'শেষ রাতেই'। তারপর দ্বিতীয় লাইন- 'শেষরাতেই। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল শিবনাথের বাড়িতে। শ্যাম রক্ষিত আন্দাজ করতে পারল যখন, দিনের আলো সব ফুটে বেরুচ্ছে। "

প্রথম লাইনের শব্দ বলে দেয় ঘটনার গভীরতা, যা 'শেষ রাতের' মধ্যে নিহিত।

৩.১.৫. ছড়ার মধ্যে দিয়ে গল্পের উপস্থাপনও দেখা যায় গল্পকারের নানা গল্পে। বোবা ও কালার কাহিনী গল্পটি ছড়ার মাধ্যমেই এগিয়ে গেছে। বক, নদী, হাতি, জলপাই গাছ, ঘুঘু, বাগাল প্রত্যেকে। দাসী, রানিমা এমনকি রাজামশাইও ছড়া বলেছেন। এখানে ক্রমাগত ছড়া বলে গেছে শেষে মানুষ ছড়া কেটেছে। মঙ্গল দাসী রানিমা এমনকি রাজামশাইও ছড়া বলেছেন।

- বকছড়া কাটে - "উকুনে বুড়ি পুড়ে ম'লো,
বক সাতদিন উপোস র'লো!"

নদী বলল - উকুনে বুড়ি পুড়েম'লো,
বক সাতদিন উপোস র'লো,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল! "

রাজামশাই ছড়া কাটলেন -

বক সাতদিন উপোস র'লো,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
বাগালের হাতে খেটো লাগল,
দাসীর হাতে কুলো সাঁটলো,

রানির হাতে থালা আঁটল,
পিঁড়িতে রাজা আটকে গেল।"

অর্থাৎ ছড়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে।

৩.১.৬. 'অদৃশ্যমান' গল্পের উপস্থাপনে চমৎকারিত্ব তৈরি হয়েছে 'পাঠকবৃন্দ। 'শব্দে। (পাঠকবৃন্দ।) জ্যোতিশংকর বাবুকে চেনেন?'

এখানে যেন সব পাঠককেই জানতে হচ্ছে গল্পের চরিত্র তারা চেনেন কিনা।

৩.২. গঠনগত বিচ্যুতি: সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে গঠনগত বিচ্যুতিও লক্ষ করার মতো। বিবৃতি ও বর্ণনার মিশেল, নাটকের মতো সংলাপ, কখনো বা পরিচ্ছদ বা অনুচ্ছেদ বিন্যাস সবই দেখা যায়।

৩.২.১. রেডিয়াম! রেডিয়াম! গল্পের মধ্যে আছে স্পষ্ট পরিচ্ছেদ বিভাগ। আছে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ। দুই-তিন-চার-পাঁচ-এইভাবে বিন্যস্ত। এ বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের। এখানেও আছে গঠনগত বিচ্যুতি।

৩.২.২.' জল আগুনের ব্যাকরণ' গল্পে আছে একটু বর্ণনা, পরে বিবৃতি-

> "ঠিক বাজারে বেরোবার আগেই নামল। গম্ভীর সেজেগুজে। ফলসা রঙের দক্ষিণ আকাশ যেন দিগবিদিক অস্পষ্ট করে দিয়েছে। ভরা ড্রেন ছাপিয়ে মুহূর্তে রাস্তাঘাট তলিয়ে গেল।
>
> -আজ বাজার নাইবা গেলে! রানি বলে।
>
> - কেন?
>
> -বেরুবে কীভাবে? সহজে থামছে না।
>
> - মিতুল মাংস খাবে। বুলে গেলা? আমি যাবই।
>
> মস্ত কাঠের ছাতাটি চাপিয়ে, খাটো প্যান্ট ও ছেঁড়া গামবুট পরে অকাতরে ছপ ছপ বেরিয়ে যেতে রানি আনমনা ভেজা কদম পাতা গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও ঘরে মিতুল পড়ছে। শুনতে পায়, মাকে জিজ্ঞাসা করছে কদমের ভালো বাংলা কি বলো তো?"

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে বর্ণনা, পরে বর্ণনার অনুগামী বিবৃতি।

৩.২.৩. গল্পে নাটকের মতো সংলাপ দেখা যায় 'বিভুর পৃথিবী' গল্পে। দুটি চরিত্র পরপর যে কথা বলে চলেছে সংলাপের ভঙ্গিতে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

> "- কী ব্যাপার? লেখাটা? এনেছ?
>
> - আমার বাড়িতে আছে। তোমার বাড়িতে? কেন?
>
> -কাউকে পাঠিয়ে দিন, পেয়ে যাবেন।
>
> - তুমি যাবে না? কী বলছ যা-তা।
>
> - বেরুলেই পেছন থেকে মার্ডার।...... পারব না দাদা..... কিছুতেই না।
>
> - সত্যিই কি লেখাটা এনেছ? খোলসা করে বলো তো?"

৩.২.৪.' তাইতো খুকু রাগ করেছে' গল্পটির গঠনে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পত্রের অবয়বে উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে গল্প এগিয়ে গেছে। একদম শেষে পত্রের মাধ্যমে নয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখের ছবি বর্ণনা করেছেন গল্প বলেই।

৩.৩. আকারগত বিচ্যুতি: ছোটগল্পের আকৃতি হবে ছোট। কিন্তু আকারে অনেক বড় গল্প আছে সাধন চট্টোপাধ্যায় গল্পের ঝুলি তে। 'রেডিয়াম! রেডিয়াম!', 'অপারেশন মিলেনিয়াম, বোবা ও

কালার কাহিনী', অদৃশ্যমান', নদী অথবা ইত্যাদি গল্পগুলো আকারে অনেকটা বড়। এগুলো আসলে বড় গল্পের মতো। যদিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ছোটগল্পের আকার বেঁধে দেওয়া মান্যতা দেননি বর্তমান কালের ছোটগল্পকার। ছোটগল্পের মধ্যে ধরা পড়ে যায় এই গল্পগুলো।

৩.৪. ভাষাগত বিচ্যুতি: শব্দ নির্মাণ, ভাষার উপাদানগত বিচ্যুতি, রেজিস্টার শব্দ ব্যবহার, শ্ল্যাং প্রয়োগ, বিদেশি শব্দের অনাবিল প্রয়োগ সবই আছে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে। এই ভাষাগত বিচ্যুতি তাঁর গল্পগুলোকে অপরূপ শিল্পসত্তা দান করেছে।

৩.৪.১. ভাষার উপাদানগত বিচ্যুতি:

৩.৪.১.১. বিভক্তি, প্রত্যয় ও নির্দেশক, বহুবচনের দিক বদল গল্পে আছে। আছে নতুনভাবে শব্দ লিখনও। যেমন- সময়টুকুন, হবে খন, ৫০ খান, চোরগুলান, নব্বুই, মাত্তর ইত্যাদি।

৩.৪.১.২. বাংলা ভাষায় ছোটগল্প লিখলে ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার তিনি করেছেন। 'অদৃশ্যমান। গল্পে বাংলা ভাষার শব্দের মধ্যে অনর্গল ইংরেজি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে।

" এই চেয়ারে ছ'বছর পর, যেদিন প্রথম উকিলের চিঠি রিসিভ করতে হয়েছিল, কপাল ঘেমে, নাইকুণ্ডলের মোচড়ে ক্লাস ফাইভের পাশ দিয়ে ল্যাট্রিনে ঢুকতে হয়েছিল উটকো চতুর্থ পিরিয়ডে।" এছাড়া তাঁর বিভিন্ন গল্পে একাধিক ইংরেজি শব্দ; যেমন মর্নিং, ক্রসিং স্টেশন, হেড, ইন্টারভিউ, সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল, কলিংবেল, বেডসোর, রাবিশ, ফ্যাসিস্ট, টিভি, প্রাইমারি ওয়ার্ড, লাইট হাউস, আনস্মার্ট, হ্যান্ডশেক, ট্রিপিক্যাল গার্ল, ড্রেট পার্সেন্ট, ডগ, রক এন্ড রোল, লেফটেন্যান্ট ইত্যাদির ছড়াছড়ি।

৩.৪.২. ভাষার ব্যবহারগত বিচ্যুতি: গদ্য সাহিত্যে কাব্যময় ভাষা, চিত্রকল্পের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু আধুনিককালের ছোটগল্পকারদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কাব্যভাষা নির্মাণ। বিশেষ করে গল্প ও কবিতার মেলবন্ধন। সাধন চট্টোপাধ্যায় গল্পের আঙ্গিনায় কবিতাকে বসাতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর গল্পে এসেছে কাব্যিক ভাষা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ।

ক. তখন হ্যাজাক নিভে গেছে,

বাতাসে ভর দিয়ে স্তব্ধ অমাবস্যা ফের জাঁকিয়ে উঠেছে। ডানার শব্দে প্যাঁচাটি ফেরে এসে বসল চূড়ার খাঁজেই। ওখানে ডিম পেরেছে ইদানীং। সন্ধ্যার নক্ষত্ররা তখন দিগন্ত থেকে মাথার উপর সরে গেছে।' (গান্ধারী)

অমাবস্যার অন্ধকারে প্যাঁচার ডিম পাড়া, ডানার শব্দে নীরবতা ভেঙে খানখান করে দেওয়া, আর সন্ধ্যার নক্ষত্রদের দিগন্ত থেকে মাথার উপর সরে যাওয়ার বর্ণনা অপূর্ব এক চিত্রকল্পের ভাবনা বয়ে আনে। যার সঙ্গে মিশে থাকে অপরূপ সব কাব্যকথা।

খ. বাহিরে তখন মাঘশেষের সকালে আট ঘটিকাতেও পর্যাপ্ত রৌদ্র নামিয়া আসে নাই পৃথিবীতে। আকাশ একটি মিহি মেঘের চাদর পরিয়া আছে।... বৃষ্টি হয়। বিষন্নতা আসে। অপ্রস্তুত মানুষ মার খায়। আজ তাহারই রেশ হিসেবে আকাশ মলিন; কিন্তু মাঝে মাঝে বাধা ঠেলিয়া সাদা সূর্যটা দেখা যায়; তখন নবীন দিনটিকে ভীষণ আদর করিতে ইচ্ছা করে; গাছপালা, পাতাবর্গের রেখাগুলি, পাখির চক্ষু, ভুঁইকামড়ি লতা- গুল্ম কত কী! শীতের বুড়া বাতাস একটু দাঁত বাহির করিয়া দেখায় (অপারেশন মিলেনিয়াম) এখানে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা উপমা সমৃদ্ধ কাব্যভাষায় বর্ণিত। রৌদ্র, মেঘ, আকাশ-বাতাস, দিন সবই যেন ভাষার কারুকার্যে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

গ. ঠিক বাজারে বেরোবার আগেই নামল। গম্ভীর সেজেগুজে। ফলসা রঙের দক্ষিণ আকাশ যেন দিগ্বিদিক অস্পষ্ট করে দিয়েছে। (জল আগুনের ব্যাকরণ)

বৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণা আকাশের সখ্যতা অনুপম কাব্যভাষায় যেন এখানে বর্ণিত।

৩.৫. শব্দগত বিচ্যুতি: মান্য ভাষায় সাহিত্য লিখলেও রেজিস্টার শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে গল্পকার বিচ্যুতি সৃষ্টি করেছেন। অনায়াসে ব্যবহার করেছেন হিন্দুস্তানি, আদিবাসী, তামিল ভাষীর ব্যবহারের ভাষা।

৩.৫.১. রেজিস্টার শব্দ:

ক. কেমন ভদ্দনোক সব! চামার! (গান্ধারী)

খ. কোনো পিরিনসিপাল নাই আমাদের। (দাঁড়াবার জায়গা)

গ. দরকার মিলিটারির। ধইর‍্যা ধইর‍্যা গুল্লি করবার লাগে। (বান ২০০ ফুট)

ঘ. তেলেগুভাষী পিওনটি 'স্যার মি উত্তারামু' বলে। (রাষ্ট্র)

ঙ. সাত তারিখ দুপুর দুইটায় ইন্টারভ্যু এই রোববারের পরের রোববার (দাঁড়াবার জায়গা)

ভদ্দর (ভদ্র), নোক (লোক), ইন্টারভ্যু দুইটাই (ইন্টারভিউ দুটোয়) ইত্যাদি শব্দগুলো মান্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। 'ধইরা' শব্দটিতে অপিনিহিতি ঘটেছে। রোববার, পিরিনসিপাল একেবারে লোকজ শব্দ। ভাষায় এগুলি প্রবেশ করে শব্দগত বিচ্যুতি ঘটিয়েছে।

৩.৫.২. শ্ল্যাং কখনো মান্য সাহিত্যের ভাষা হতে পারে না। কিন্তু সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পে শ্ল্যাং এর প্রয়োগ শব্দগত বিচ্যুতি তৈরি করেছে। 'অপারেশন মিলেনিয়াম গল্পে শ্ল্যাং শব্দ ভরপুর।

ক. কুকুরটা কেবল ঠান্ডা মেরে রইল।

খ. জ্ঞান মারছে, হারামি।

গ. মুরোদ নেই ফুটো পয়সার।

'মারা' শব্দটি একক হলে শোভন, কিন্তু সংযুক্ত ক্রিয়া হলে অশোভন। ঠান্ডা মারা, জ্ঞান মারা, হারামি, মুরোদ নেই, সবটাই স্ল্যাং। ভাষাগত শোভনতা এখানে রক্ষিত হয়নি। এছাড়া অন্যান্য গল্পেও ব্যবহৃত হয়েছে শ্ল্যাং-

- খালপাড় ফতুর কত্তে এসেছ? (সীতা)
- বাথরুমে তলপেট খালাস করল। (তাইতো খুকু রাগ করেছে)
- বউকে কচলাতে থাকে। (তাইতো খুকু রাগ করেছে)

৩.৫.৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দগত বিচ্যুতি: প্রচলিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে অনন্য ধ্বনি ঝংকার সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। ব্যতিক্রমী এইসব ধ্বন্যাত্মক শব্দ অভিনব শৈলীগত বিচ্যুতি সৃষ্টি করেছে। যেমন –

- দুমদুম করে চলা (গান্ধারী)
- কৌতুহল খুটখুট করছে (গান্ধারী)
- রিনরিন হাসি (রেডিয়াম! রেডিয়াম!)
- খিস খিস ইঁদুরের হাসি দেয়। (বান ২০০ ফুট)
- থই থই চলছে মানুষ (বান ২০০ ফুট)
- পিরপির করে লেজ নাড়ছে (দাঁড়াবার জায়গা)
- কৎ কৎ তলপেট (তাইতো খুকু রাগ করেছে)
- তিন নম্বর মানুষটা হট হট (গান্ধারী)

'দুমদুম সবকিছু ভাঙার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু চলার ক্ষেত্রে লেখক বসিয়ে দিয়েছেন। আবার হাসির বিশেষণ 'রিন রিন, তা চুড়ির শব্দ নয়। ইঁদুরের হাসি অবশ্য 'রিনরিন নয়' 'খিসখিস'। 'থইথই' জলের বিশেষণ অনায়াসে মানুষের চলায় ব্যবহৃত। লেজ নাড়ার শব্দ 'পিরপির ' আর

মানুষের' ঢ্যাব ঢ্যাব' তাকানো অদ্ভুত ব্যাপার। 'কৎ কৎ তলপেট হতে পারে কিংবা বাতাস বইতে পারে 'হুহু' করে, এ ভাবনা লেখকের আশ্চর্য সব শব্দের মেলবন্ধনে সৃষ্টি। পাশাপাশি মানুষ যে' হট হট' করে চলে এটাও প্রচ্ছন্নভাবে বুঝিয়ে দেন লেখক।

৩.৫.৪. অনুকার শব্দগত বিচ্যুতি: প্রচলিত অনুকার শব্দের সীমা ছাড়িয় ভিন্ন ধরনের শব্দের প্রয়োগেও গল্পকার বিচ্যুতি সৃষ্টি করেছেন। যেমন-

- ম্যাড়মেড়ে আসর (সীতা)।
- দেশটাকে খলখলে করেদিল (তাইতো খুকু রাগ করেছে)।

এখানে ‘ম্যাড়মেড়ে’, ‘খলখলে’ অপ্রচলিত অনুকার শব্দ।

৩.৫.৫. বিশেষণে বিচ্যুতি: এই ধরনের বিচ্যুতি তাঁর গল্পে লক্ষ করার মতো। এমনকি বাংলা শব্দে ইংরেজি বিশেষণও বসেছে। চেনা ছকের বাইরে ব্যবহৃত বিশেষণগুলো বিচ্যুতি তৈরি করেছে, যা শৈল্পিক ভাবনায় পরিচালিত। যেমন-

- খ্যামটা ঢং (সীতা)
- বড় বড় বুলি (তাইতো খুকু রাগ করেছে)
- পিলে বাড়ন্ত পেট (সীতা)
- টকটকে ফর্সা (রেডিয়াম! রেডিয়াম!)
- ফুরফুরে হালকা মুড (দাঁড়াবার জায়গা)

৩.৫.৬ শব্দদ্বৈতে বিচ্যুতি: এই ধরনের বিচ্যুতি শৈলীর নবনির্মাণ ঘটিয়েছে। যেমন-

- জ্বালা জ্বালা ঢেকুর (তাইতো খুকু রাগ করেছে)
- ক্যাপ ক্যাপ হাততালি (সীতা) ইত্যাদি।

৩.৬. বানানগত বিচ্যুতি: বানানে হেরফের ঘটিয়ে বানানগত বিচ্যুতি তৈরি হয়ে যায়। কখনো বা আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ অপরূপ শৈলীগত বিচ্যুতি নির্মাণ করে। বানানগত বিচ্যুতি কিংবা আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তাঁর ছোটগল্পে অজস্র।

- জ্বালা জ্বালা ঢেকুর (গান্ধারী)
- টকটকে ফর্সা (রেডিয়াম! রেডিয়াম!)

'জ্বলা জ্বলা 'না হয়ে 'জ্বালা জ্বালা'এবং' টুকটুকে ফর্সা নয়, টকটকে ফর্সা 'হয়েছে বানানগত বিচ্যুতির কারণে। আবার আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করার জন্য মূল বানান পাল্টে গেছে। যেমন- চরিত্তির (চরিত্র), গরাস (গ্রাস), মাত্তরু (মাত্র), নব্বুই (নব্বই), বিষ্যৎবার (বৃহস্পতিবার) রোববার (রবিবার) ইত্যাদি।

৩.৭. বাক্যগত বিচ্যুতি: ক্রিয়াপদহীন বাক্যগঠন, সাধু-চলিতের মিশ্রণজাত বাক্য, আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে মান্য চলিতের মিশেল, সাধুর মধ্যে আঞ্চলিক শব্দ, কর্ম-কর্তৃবাচ্যের প্রাধান্য বাক্যকে আলংকারিক করে তুলেছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে বাক্যগত বিচ্যুতি অসামান্য শৈলী নির্মাণ করেছে।

৩.৭.১. সাধু-চলিতের মিশ্রণজাত বাক্য লেখকের গল্পে একাধিক। যেমন-

‘‘বাহিরে তখন মাঘশেষের সকালে আট ঘটিকাতেও পর্যাপ্ত রৌদ্র নামিয়া আসে নাই পৃথিবীতে। আকাশ একটি মিহি মেঘের চাদর পরিয়া আছে। শীতের পশ্চিমি ঝঞ্ঝাট ইদানীং কয়েক বছর ধরিয়া আফগানিস্তান পেশোয়ার ছাড়াইয়া উত্তর ভারত দিয়া পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত চলিয়া আসে। বৃষ্টি হয়।’’ (অপারেশন মিলেনিয়াম)

এখানে চলিত বাক্যে 'বাহিরে', 'ঘটিকা', 'নামিয়া', 'নাই', পরিয়া', ধরিয়া', ছাড়াইয়া', 'দিয়া', চলিয়া" ইত্যাদি সাধু শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে।

৩.৭.২. চলিত বাক্যে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগও অনবদ্য শৈলীগত বিচ্যুতি নির্মাণ করেছে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে।

ক. সময়টুকুন বাড়তি সেলাই করলে দুটো পয়সার মুখ দেখব (তাইতো খুকু রাগ করেছে)

খ. চরিত্তির কার কেমন, আমি কম জানিনা (গান্ধারী)

গ. সাত তারিখ দুপুর দুইটায় ইন্টারভ্যু। (দাঁড়াবার জায়গা)

ঘ. চোরগুলান দেশটারে শেষ করল। (বান ২০০ ফুট)

ঙ. কাঁকোই দিয়ে চুলের ফেত্তি আঁচড়ায় (বোবা ও কালার কাহিনী)

সময়টুকুন, চরিত্তি, দুইটায়, চোরগুলান, কাঁকোই, ফেত্তি, ইত্যাদি শব্দগুলো আঞ্চলিক। চলিত বাক্যে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ সত্যিই অবাক করার মতো।

৩.৭.৩. কর্ম- কর্তৃবাচ্যের প্রাধান্য একালের লেখকদের হাতিয়ার। এটি ব্যবহার করার ফলে বাক্য আলংকারিক হয়ে যায়। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সীতা' গল্পে কর্ম- কর্তৃবাচ্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ক. ফ্রুট এবং ডুগডাগ তবলা চলল চমর-চর ভঙ্গিতে।

খ. অটো ছোটে, সাইকেল যায়, বাসগুলো হাঁটে-

খাল-নদী-ক্রেন অকাতরে বুকের সমস্ত বল হাঁকিয়ে সে ডাক তুলেই যাই।

গ. আলো ঠোকরাচ্ছিল তার মুখের কোনো কোনো অংশে।

'অপারেশন মিলেনিয়াম 'গল্পে আছে-

ঘ. সদ্য মাস ফুরনো ক্যালেন্ডারের পাতাটা একবার চোখ পাকিয়ে ছিঁড়ে জানলা গলে উড়ে গেল।

ঙ. ক্যালেন্ডারের পুরনো পাতা উড়ল না, প্লাস্টার খসলো না, সাইকেল স্থির হয়ে রইল।

এই বাক্যগুলিতে ফ্রুট, ডুগডাগ, খাল-নদী ক্রেন, আলো, ক্যালেন্ডার, সাইকেল প্রভৃতি কর্ম (Object) কর্তার কাজ করে গেছে। এভাবেই শৈলীর নব নব নির্মাণের পথে হেঁটে গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের আঙিনায় নতুনের পথ দেখিয়েছেন।

তথ্যসূত্র (References):

১.০. আকর গ্রন্থ:

১.১. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'গল্প সমগ্র', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১০।

২.০. সহায়ক গ্রন্থ:

২.১. অপূর্ব কুমার রায়, 'শৈলীবিজ্ঞান' মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৯।

২.২. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭।

২.৩. উদয়কুমার চক্রবর্তী, 'আধুনিক কবি: কবিতার শৈলী', উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।

২.৪. তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০১০।

২.৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯।

২.৬. নারায়ণ হালদার, 'জীবনানন্দের কবিতা: শৈলী ও শিল্পরূপ', ভাষা সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ, মে ৩১, ২০২১।

২.৭. বিপ্লব চক্রবর্তী, 'শৈলী চিন্তাচর্চা', রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৩।

২.৮. বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (১-২ খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪।

২.৯. ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭-২০১৮।
২.১০. রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২।
২.১১. শিশিরকুমার দাস, 'বাংলা ছোটগল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭।
২.১২. শ্রাবণী পাল, 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক' অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
২.১৩. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার নস্কর (সম্পা), 'শৈলীবিজ্ঞান তত্ত্বে ও প্রয়োগে', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯।
২.১৪. সুভাষ ভট্টাচার্য, 'ভাষা সাহিত্য শৈলী', প্রমা, কলকাতা, ১৯৯৭।

বোকা তাঁতি : একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ

রঘুনাথ রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
এস. বি. এস. গর্ভমেন্ট কলেজ, হিলি

সারসংক্ষেপ: তাঁতবয়ন শিল্প একটি জটিল ও পর্যায়ক্রমিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কারিগর তাঁতি অর্থাৎ যে তাঁতবয়ন কার্য সম্পাদন করে। যাঁদের নিয়ে একটি প্রচলিত প্রবাদ হল – "বোকা তাঁতি" অর্থাৎ তাঁতিরা হয় বোকা। তাঁতি সমাজকে এই বিশেষণে কেন ভূষিত করা হয়? এর পেছনে কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা, পাশাপাশি সত্যিই তাঁতিসমাজ বোকা না চালাক তা নির্ণয়ের চেষ্টা করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। তাঁতির বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিহীনতা বিষয়টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক দিক থেকে শাক্ত-ব্রাহ্মণদের জাতিগত বিদ্বেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক দিকটি দুটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। এক, জটিল পর্যায়ক্রমিক উৎপাদনপদ্ধতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিচারে পরিমাপ করা। দুই, উৎপাদন পরবর্তী বাজারব্যাবস্থা সম্বন্ধে তাঁতি কতটা ওয়াকিবহাল সেটা তাঁতির ক্ষেত্রে বোকা বা চালাক নির্ণয়ের মানদণ্ড বলে বিবেচ্য হয়েছে। তাই "বোকা তাঁতি" এই প্রবাদের যথার্থতা নির্ণয়ে তাঁতি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে তাঁতির সামগ্রিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: তাঁতবয়ন, পর্যায়ক্রমিক, বোকা তাঁতি, শাক্ত-ব্রাহ্মণ, উৎপাদন পদ্ধতি, বাজার ব্যাবস্থা।

মূল আলোচনা:

বয়ন শিল্প একটি জটিল পর্যায়ক্রমিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরবিন্যাস থাকলেও এর প্রধান কারিগর তাঁতি। তাঁতিদের মধ্যেও অনেক স্তর বিন্যাস থাকে - যেমন হেড উইভার বা তাঁতি সরদার যার অধীনে তাঁতি ও শিক্ষানবিশ থাকে। আবার ধনী সম্ভ্রান্ত জাতীয় তাঁতি থাকে যাঁরা নিজের মূলধন খাঁটিয়ে অন্য তাঁতিদের দিয়ে কাপড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। যদিও এই প্রবন্ধে দরিদ্র তাঁতিদের কথাই বলা হয়েছে। যাঁদের নিয়ে একটি প্রচলিত প্রবাদ হল – "বোকা তাঁতি" অর্থাৎ তাঁতিরা হয় বোকা। তাঁতি সমাজকে এই বিশেষণে কেন ভূষিত করা হয়? এর পেছনে কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা, পাশাপাশি সত্যিই তাঁতিসমাজ বোকা না চালাক তা নির্ণয়ের চেষ্টা করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। তাঁতির বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিহীনতা বিষয়টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক দিক থেকে শাক্ত-ব্রাহ্মণদের জাতিগত বিদ্বেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থনৈতিক দিকটি দুটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। এক, জটিল পর্যায়ক্রমিক উৎপাদনপদ্ধতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিচারে পরিমাপ করা। দুই, উৎপাদন পরবর্তী বাজারব্যাবস্থা সম্বন্ধে তাঁতি কতটা ওয়াকিবহাল সেটা তাঁতির ক্ষেত্রে বোকা বা চালাক নির্ণয়ের মানদণ্ড বলে বিবেচ্য হয়েছে। তাই "বোকা তাঁতি" এই প্রবাদের যথার্থতা নির্ণয়ে তাঁতি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে তাঁতির সামগ্রিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই গল্প সাহিত্যে তাঁতিকে বোকা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুশর্মার লেখা পঞ্চতন্ত্রের 'বোকা তাঁতি' গল্পটি লোককাহিনী হিসাবে পরিচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পে সমগ্র তাঁতি জাতটাকেই বোকা বলা হয়েছে। আবার মনোহর বসাক তাঁর 'তাতিপাড়ার আখ্যান' বইতে দেখিয়েছেন কিভাবে উচ্চবর্ণের মানুষরা তাঁতী জাতিকে সামাজিক দিক দিয়ে নিচু বলে মন্তব্য করত। তিনি উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে আগত তাঁতিরা বৈঁচি (ফুলিয়া) গ্রামে কলোনি গড়ে তুলতে চাইলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা আপত্তি জানিয়েছিল। উচ্চবর্ণের মানুষরা আপত্তি করে বলেছিল, তাঁতি জাতি গরীব। গরিবরা সাধারণত মূর্খ হয়। বোকা তাঁতি বলে এদের প্রসিদ্ধিতে জগৎজোড়া। সুতরাং এই বোকা-হাঁদা তাঁতিদের এত বেশি সংখ্যায় এখানে ঠাঁই দিলে সমাজটাই হয়ে যাবে মূর্খের সমাজ, বর্বরের সমাজ। তাঁদের মাঝে উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোকরা কি করে শান্তিতে বসবাস করবেন।[১] তাঁতিদেরকে সামাজিক দিক দিয়ে মর্যাদাহীন করে বোকা-হাঁদা বিশেষণটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁতিদের কেন বোকা বলা হয়? অথবা কবে থেকে তাঁতিদের বোকা বলে অভিহিত করা হলো এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে প্রচলিত মতানুযায়ী শান্তিপুরের একটি তন্তুবায় বংশ প্রকৃত-ই বোকা নামে অভিহিত ছিল। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের ইতিহাসে বোকা তাঁতি এই বিশেষণটির গুরুত্ব ধর্মীয় দিক থেকেও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তিপুরের বোকা তাঁতি বা বোকা বংশের প্রথম পুরুষ ছিলেন শিবরাম। শিবরাম ছিলেন ঢাকার ধামরাই নিবাসী, যিনি চৈতন্যদেবের সময়কালে নবদ্বীপে এসেছিলেন। সেই সময় বহু মানুষ ঢাকা অঞ্চল থেকে বৈষ্ণব ধর্মের টানে শান্তিপুরে এসেছিলেন। যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভক্ত, কীর্তনীয়া ও গায়ক। শিবরাম সস্ত্রীক চৈতন্যদেবের নির্দেশে শান্তিপুরে চৈতন্যভক্ত অদ্বৈতচার্যের কাছে যান এবং কর্ম হিসাবে তাঁতবোনাকে বেছে নেন। অদ্বৈতচার্যের জীবনীমূলক পুঁথি অদ্বৈতমঙ্গল-এ শান্তিপুরের ভক্তিমান বৈষ্ণব তাঁতিদের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। শান্তিপুরের শাক্ত ব্রাহ্মণরা অদ্বৈতচার্যের ওপর জাতিগত কারণে ক্রুদ্ধ ছিল। অদ্বৈতচার্যের সাথে শিবরামের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠায় শাক্ত সম্প্রদায় শিবরামকে সুনজরে দেখেনি। শিবরাম অদ্বৈতচার্যের অনুগত হয়ে সর্বদা নাম-কীর্তন মেতে থাকতেন। তৎকালীন শান্তিপুরের অদ্বৈতবিরোধী শাক্ত ব্রাহ্মণগন শিবরামকে 'বোকা' বলে আখ্যায়িত করেন। সেই হিসাবে শান্তিপুরের প্রথম বোকা তাঁতি হন শিবরাম। শিব ও রামের নামের অর্থগুন ও কর্মগুণ থাকলেও শিবরাম বোকা হিসেবে পরিচিতি পান।[২] পরবর্তীকালে শিবরামের সপ্তম অধস্তন পুরুষ বিপত্নীক গোবিন্দরাম পুত্র লালমোহনকে তাঁর ইচ্ছানুসারে রান্নার জন্য বাজার থেকে ডাল ভেঙ্গে এনে রাখতে বললে লালমোহন ডাল ভাঙ্গার অক্ষমতা জানাই। এই বিষয়টি নিয়ে রাত্রে পিতা পুত্রের মধ্যে বিবাদ হয়; প্রতিবেশীগণ এসে বলে তোমরা প্রকৃতই 'বোকা'। এইভাবে বোকা খ্যাতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শান্তিপুরের শিবরাম তাঁতির 'বোকা' বিশেষণের কারণ মূলত শাক্ত-ব্রাহ্মণদের জাতিগত বিদ্বেষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপুরের আদি শাক্ত ব্রাহ্মণ ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব এর পশ্চাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তাঁতি সম্প্রদায় পরবর্তীকালে শুধু বোকা-ই নয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়েও সমাজে হীনস্থান পেতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে সাহিত্যগত উপাদানগুলিতে তাঁতিকে 'বোকা' বলেই বর্ণনা করা হতে থাকে। অথচ তুলা থেকে সুতা কেটে সেই সুতো দিয়ে অপূর্ব দক্ষতায় সুক্ষন কারুকার্যমন্ডিত বস্ত্রবয়নের মধ্যে যে নৈপুণ্যের পরিচয় তাঁতিরা দিয়ে থাকেন তার মধ্যে বুদ্ধিহীনতার কোন নিদর্শন নেই বরং তার মধ্যে সৃজনশীলতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] তাঁতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত বস্ত্র

মানব সভ্যতার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান নিদর্শন এবং তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত বয়নশিল্প মানবেতিহাসের প্রথম যুগে অন্যান্য শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

এবার জটিল পর্যায়ক্রমিক উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিচারে তাঁদের বুদ্ধিহীনতা বা বুদ্ধিমত্তার দিকটি আলোচনা করা হলো। তবে বৃহত্তর পরিসরে সমগ্র তাঁত বয়ন পদ্ধতি আলোচনা না করে বিশিষ্ট ও বিদ্বান ব্যক্তিরা এই পদ্ধতি সম্পর্কে কি বলেছেন সেগুলি তুলে ধরে বিষয়টিতে আলোকপাত করছি।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁতশিল্প নিয়ে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সাহিত্যগত দিক থেকে যত আলোচনা হয়েছে তাতে সবক্ষেত্রেই তাঁতি ও তাঁতশিল্পী সমাজের বয়ন পদ্ধতির বুদ্ধিমত্তার প্রসংশা করা হয়েছে। তুলা সংগ্রহ থেকে শুরু করে টানা ও পোড়েনের সুতা প্রস্তুত, ড্রাম হাঁটা, নক্সা করা, তাঁত বোনা প্রভৃতি জটিল পর্যায়ক্রমিক কাজগুলি সবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। বিদেশী পর্যটক ও লেখকরাও শুধুমাত্র তাঁতির দ্বারা উৎপাদিত কাপড় বা শাড়ির প্রশংসাই করেননি পাশাপাশি সমগ্র বয়ন পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আব্দুল করিম, সুশীল চৌধুরী, জেমস টেলর প্রমুখরা তাঁদের বইতে তাঁতি সম্প্রদায়ের কার্যাবলীর প্রশংসাসূচক বিবরণ দিয়েছেন। ১৭২১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস লিখছেন যে, বাংলার তাঁতীরা, "এতই বুদ্ধিমান যে তারা যেকোনো রকম কাপড় দেখে অবিকল সে কাপড় নকল করতে পারত"।[৪] তাঁতবয়নকালে তাঁতি প্রয়োগ করে তাঁর পরম্পরাগত ও ঐতিহ্যানুসারে প্রাপ্ত বয়ন শিক্ষাবোধকে। তাঁতি তাঁর হাত পা চোখ এবং মাথা (বুদ্ধি) ও মনন দিয়ে সমগ্র বয়নপদ্ধতি পর্যবেক্ষন ও পরিচালনা করেন। লোকশিল্পের বিজ্ঞানভাবনা ও প্রযুক্তির প্রয়োগের সঙ্গে এই শিল্পে যুক্ত হয় দেশীয় প্রযুক্তির নিজস্বতা। বয়নশিল্পের প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'লোকবিজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি' গ্রন্থে বলেছেন, "চরকার সাহায্যে সূতা প্রস্তুত ও তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রবয়নের কৌশল মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বহন করে...........বস্ত্রবয়ন একটি উচ্চমানের প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প।"[৫] সমরেশ বসুর তাঁতশিল্পকেন্দ্রিক "টানা পোড়েন" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিষ্ণুপুরের পঞ্চানন কীত ওরফে পাঁচু নক্সাদার তাঁতির জীবনসংগ্রাম আলোচনা করতে গিয়ে তাঁতি সমাজের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা তাঁর "তাঁত" নামক কবিতায় তাঁতের বিভিন্ন অংশের ও তাঁত বুননপদ্ধতির প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলেছেন, "তাঁতিকে আর যাই বলো বোকা তাঁতি বোলো না"।[৬] তাঁতবয়ন কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিচারে তাঁতির বুদ্ধিমত্তার একটা আভাষ পাওয়া গেল।

এবার দেখা যাক তাঁতি বাজারব্যবস্থা সম্বন্ধে কতটা সচেতন অর্থ্যাৎ তাঁর ব্যয়িত শ্রমমূল্য ও উৎপাদিত দ্রব্যমূল্যের বিচারে তাঁতির বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিহীনতার নির্নয়ীকরন। বাংলার গ্রামীন অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। লোকসংখ্যার বৃহৎ অংশই কৃষিকাজে যুক্ত ছিল। এই কৃষকদের মধ্যে অনেকেই আবার অবসর সময়ে তাঁতের কাজে লিপ্ত থাকত। এই চাষ পরবর্তী পর্যায়কে কাজে লাগিয়ে এই চাষিরাই তাঁতির ভূমিকায় অবতীর্ন হতে থাকে। চাষী একাধারে তাঁতি আবার তাঁতিরা হল চাষী। এই দ্বৈতসত্তার অবস্থান তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থাৎ চাষী ও তাঁতির এই পারস্পারিক সমঝোতা বজায় ছিল। পরবর্তীকালে বাজারভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার উৎপত্তি ও উদ্বৃত্ত উৎপাদন হেতু কর্মগত বিশেষীকরণ দেখা যায়। এই সময় থেকেই শুধুমাত্র পরিবারভিত্তিক বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা থেকে বাজারভিত্তিক বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনে তাঁতিকে দাদনীদার বা মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়। কারন তাঁতির কাছে তাঁত বা তাঁতের উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। এই পর্বেই বাংলার তাঁতশিল্পে দাদনী ব্যবস্থা একটি সনাতন ও অপরিহার্য

অঙ্গ হিসাবে পরিচিত হয়। মধ্যযুগে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া চললেও দাদনীদার/দালাল/পাইকারদের উপস্থিতি তাঁতিরা সবসময় অনুভব করত। এশীয় বনিকগোষ্ঠী থেকে ইউরোপীয় কোম্পানী সবাই-ই ছিল দাদনীবনিক। দালাল বা পাইকাররা দাদন দিয়ে বস্ত্র সরবরাহের জন্য চুক্তি করত। আধুনিক যুগে একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ অপরদিকে শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভুত ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগ্রাসন এই দু-দিক থেকেই তাঁতশিল্প সাঁড়াশি আক্রমনণের সন্মুখীণ হয়েছিল। এই পর্বে ব্রিটিশ অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা কুফল অবশিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সমগ্র তাঁতশিল্পী সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সূতাকল ও কাপড়কল স্থাপন দেশীয় তাঁতশিল্পের অবনতিকে আরও ত্বরান্বিত করে। যদিও বিংশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধীজীর জাতীয় আন্দোলন দেশীয় তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল। জাতীয় ভাবাবেগ এবং আর্ন্তজাতিক যুদ্ধপরিস্থিতি এই পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে গতি প্রদান করেছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, এই স্বদেশীয়ানার জোয়ারে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কারখানাগুলো লাভবান হয়েছিল। এই সুযোগে হস্তশিল্পে মহাজন, পাইকার আর ফোড়েদের প্রভুত্ব জোড়দার হলো। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় শিল্পপতিদের মুনাফা, ডিভিডেন্ড বেড়ে যায়। এই ঘটনাকে আন্দ্রে গুন্ডে ফ্রাঙ্ক বলেছেন, পাশ্চাত্য পুঁজিপতি সংকটের কাল ভারতীয় পুঁজিপতিদের শ্রীবৃদ্ধি কাল, অর্থ্যাৎ পশ্চিমী পুঁজির সর্বনাশ, ভারতীয় পুঁজির পৌষমাস।[৭] এভাবেই শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজিপতির স্থানে ভারতীয় পুঁজিপতিদের আধিপত্য স্থাপন প্রক্রিয়া বিকশিত হতে শুরু হল। অর্থাৎ তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পুঁজিবাদের শোষণ একই থাকলো শুধু পুঁজিবাদের নেতৃত্ব পরিবর্তিত হল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজ লাভের উদ্দেশ্যে যন্ত্রচালিত সুতাকল ও যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রসার ঘটাতে থাকলে ভারতীয় ঐতিহ্যমন্ডিত তাঁতশিল্প পুনরায় অবক্ষয়ের ধারা বজায় রাখলো। ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা পুঁজিপতির কবল থেকে তাঁতি কি প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল? স্বাধীনতাত্তোর পরবর্তী পর্ব পার করে বর্তমানকালেও কি মহাজনী দাদনী ব্যবস্থা তাঁতিদের নিয়ন্ত্রন করে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁতশিল্প সংক্রান্ত রচনাকার ও গবেষকদের লেখালেখির ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা, রমেশচন্দ্র দত্ত, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র, হামিদা হোসেন, মনোহর বসাক, সুজিত কুমার দাশ প্রমুখরা সকলেই তাঁতির ওপর মহাজনী দাদনী প্রথার নিয়ন্ত্রণ যা বৃহৎ পরিসরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণকে চিহ্নিত করেছেন। অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ অর্থাৎ সমাজের উচ্চমেধাসম্পন্ন সকলেই তাঁতির অবস্থা এবং অবস্থার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করেছেন। কিন্তু তাঁতি কি তাঁর অবস্থার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে পেরেছে? নাকী তাঁতির বোঝাপড়া শুধুমাত্র টানাপোড়েনের জীবনসংগ্রামে বা সানা-বোয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখানে তাঁতির বোঝাপড়ার থেকে গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে পুঁজিপতিদের শোষণের অবসান তার পক্ষে করা কতটা সম্ভব এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা। যদিও এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা তাঁতির কাছে পর্যায়ক্রমিক জটিল তাঁতবয়ন পদ্ধতির থেকেও জটিল বলে মনে হয়। আর এই জটিল শোষনতান্ত্রিক ব্যবস্থার লাভ লোকসান বোকা তাঁতির মাথায় ঢোকে না। বৃহত্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে মহাজনী দাদনী প্রথা অনুধাবনে তাঁতি প্রকৃত অর্থে বোকা-ই থেকে যায়। কর্মগত দক্ষতা ও বুদ্ধিগত বিচক্ষণতায় তাঁতির 'বোকা' বিশেষণটি লাঘব হলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানকল্পে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতে পারায় তাঁতি প্রকৃতই বোকা বা বুদ্ধিহীন থেকে যায়।

তথ্যসূত্র:

১। বসাক, মনোহর, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০২১, তাঁতিপাড়ার আখ্যান, কলকাতা, গাংচিল, পৃ-৯।

২। ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ, প্রথমখন্ড, নতুন সংস্করণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, শান্তিপুর পরিচয়, শান্তিপুর, নদীয়া, শান্তিপুর লোকসংস্কৃতি পরিষদ সম্পাদিত, পৃ-২১১- ২১৩।

৩। দত্ত, অশোক কুমার, সেপ্টেম্বর ২০০০, শান্তিপুরের লোকসংস্কৃতির পরিচয়, শান্তিপুর, পৃ-২৮৭।

৪। চৌধুরী, সুশীল, ২০১৪, পৃথিবীর তাঁতঘর, বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ১৬০০-১৮০০, আনন্দ, পৃ- ১৩১

৫। আহমেদ, ওয়াকিল, ২০০১, লোকজ্ঞান ও লোক প্রযুক্তি, ঢাকা, গতিধারা প্রকাশনী, পৃ- ৫০।

৬। লাহা, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৭, 'তাঁত', তন্তু ও তন্ত্রী, কলকাতা, পৃ-১৫২-৫৩।

৭। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, ১৪১৪, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি ১৮৫০-১৯৪৭, কলকাতা: আনন্দ, পৃ-১১৬।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : জেলেদের বাস্তব জীবন সংগ্রামের চিত্র

মনোয়ার আলী
সহকারী শিক্ষক, সরাই বুনিয়াদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার (Abstract): মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসটি নদীকেন্দ্রিক একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। এখানে কেতুপুর নামক গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক জেলে মাঝিদের জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তাদের প্রতিনিয়ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা, তাদের যৌনজীবন ও নিম্ন বর্ণের হওয়ার কারণে উচ্চবর্ণের লাঞ্ছনা বঞ্চনার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবের। যার একটা রাত্রিও ঘরে বসে থাকার উপায় নেই। যাকে প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে ব্রতী হতে হয় এবং গ্রামের মহাজন থেকে শুরু করে মুরুব্বীদের কাছেও লাঞ্ছিত ও ঠকতে হয়। অথচ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কথা মাথায় না রেখেই যার পরিবারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সন্তানের পর সন্তান। এই কাহিনি শুধু কুবেরের জীবন সংগ্রামের নয়; - তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলে পাড়ার হতদরিদ্র মানুষদের। গণেশ, রাসু, আমিনুদ্দিন - এই ব্রাত্য সমাজের মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেছে মাঝি কুবের। কারণ উপন্যাসে কেবল নায়ক কুবেরের জীবন কাহিনি বর্ণনা হলেও তা কেবল তার ব্যক্তিগত জীবন কাহিনি হয়ে থাকেনি, সমগ্র জেলেপাড়ার জীবন সংগ্রামের কাহিনি হয়ে উঠেছে। এখানে কুবেরের স্ত্রী মালার খোঁড়া পায়ের জীবন যন্ত্রণাময় চিত্র যেমন উঠে এসেছে, তেমনি মালার বোন কপিলার জৈবিক চাহিদা পূর্ণ জীবনকে উপন্যাসে খুবই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় সেখানে মাঝি কুবেরের সঙ্গে কপিলাকেও নিয়ে গেছেন ঔপন্যাসটিক। এইসব চরিত্রের মধ্যে দিয়ে জেলেদের বাস্তব জীবন সংগ্রামের পরিচয় উদ্ভাসিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
সূচক শব্দ (Keywords): আঞ্চলিক, জেলে, জীবন সংগ্রাম, যৌন জীবন, ব্রাত্য, রহস্যময়, ময়নাদ্বীপ, উপনিবেশ।

মূল আলোচনা (Discussion):

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের জীবন সংগ্রাম এবং পদ্মার ধীবর শ্রেণির মানুষদের বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট অধুনা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার একটি গ্রাম; - যার কোল বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিশাল পদ্মানদী। নদীর তীরবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করে তারা নদীকে অবলম্বন করে আজীবন বাঁচতে চাইবে, জীবিকা অর্জনের জন্য মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরতে চাইবে নদীকে - এটাই স্বাভাবিক। যে সময়কালকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে এই উপন্যাস সেই সময় একেবারে সাধারন মানুষের জীবিকা বলতে চাষাবাদ কিংবা মাছ শিকার ছিল একমাত্র পথ। নদীতে শিকার করা মাছ বিক্রি করে তাদের বেঁচে থাকা, জীবন যাপন করা। নদীর ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন। তাদের উপার্জিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য তারা কখনোই পায় না সভ্য মানুষের পৃথিবীতে। তার ফলে বেঁচে থাকতে গিয়ে তাদের প্রতিনিয়ত

সংগ্রাম করতে হয়। এই উপন্যাসের একদিকে বর্ষার পদ্মার ভয়াল প্রভাব মানব জীবনের উপর, অন্যদিকে নদীর ভয়ংকর সৌন্দর্যকে ঘিরে নদী তীরের বাসিন্দাদের প্রতি মুহূর্তে সংকট বর্ণনা করেছেন উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে কখনো কখনো তাদের জীবনে প্রেম আসে, প্রেমের বিলয় ঘটে। আবার প্রেম আসে অন্য পথ ধরে, কখনও সংঘাত হয় সেই প্রেমকে নিয়ে জেলেদের জীবনে সন্তান হয় কিন্তু তারা তাতে খুশি হয় না। কিন্তু সন্তানের জন্ম হয় নিরন্তর জেলে পাড়ায়। তাই এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন - "জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে।"[১] অর্থাৎ নবজাতকের আবির্ভাবকে জেলেপাড়ার পাড়ার মানুষরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। তারা সন্তান উৎপাদনকে নিছক জৈবিক প্রবৃত্তির ফল হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ তাদের কাছে পেটের অন্ন জোগানোটাই একমাত্র অপরিহার্য দাবি হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন - "উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুন হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্ন শ্রেণী অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তি গুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ।"[২]

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের অন্যতম মাঝি কুবের। পদ্মানদীর তীরে কেতুপুর গ্রামের মাঝিদের পল্লীতে দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম ও ক্রমশ বেড়ে ওঠা। দারিদ্র্যে জীর্ণ মাঝি সমাজের অশিক্ষার অন্ধকার ও উপরতলার মানুষদের নিপীড়ন; - এটাই তার জীবনের পরিধি। হতদরিদ্র কুবেরের নিজের অস্তিত্বকে প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য অবিরাম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বাস্তব জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তার যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা সেখানে এক নিরন্ন, নিরূপায় মাঝির জীবনের বাস্তবসম্মত চরিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কুবের বর্ষার মরশুমে ইলিশ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। দিনরাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরা থেকে সে বিরত থাকে না। জেলেদের নৌকার শতাধিক আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়ায় নদীর বুকে। মাছ ধরতে ধরতে শেষ রাতে কুবের মাঝির নৌকার খোল ভরে যায় মৃত সাদা ইলিশে। তার সঙ্গে আরও দু'জন লোক মাছ ধরে ধনঞ্জয় ও গণেশ। এই তিনজনের বাড়ি কেতুপুর গ্রামে। নৌকা ও জাল ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। তাই উপার্জিত অর্থের অর্ধেক ধনঞ্জয় পায় আর অর্ধেক কুবের ও গণেশ। জাল ও নৌকা ধনঞ্জয়ের হওয়ায় সে পরিশ্রমও করে কম। তাই মাছ ধরতে কুবের ও গণেশকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন— "এক হাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া ও শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লন্টনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণের সমস্ত রাত ধরে।"[৩] অধিক পরিশ্রমের পর ঝাকের মাছ তারা ধরে। প্রচুর মাছ পায় কুবের ও গণেশ। মাছ অধিক পেলেও তাদের জীবনে এত দুর্ভাগ্য যে দেবীগঞ্জের বাজারে মাছের দর খুবই কম। ফলে তাদের লাভ খুবই সামান্য ।কিন্তু মাঝি কুবেরের ক্রমাগত পরিশ্রম করার ফলে তার শরীর ভালো নেই। স্ত্রী মালা তাকে কাজে যেতে বারণ করে। কিন্তু শরীর খারাপ থাকলেও শরীরের দিকে তাকাবার অবসর নেই কুবেরের। তার কারণ সারা বছরের যা উপার্জন হয় তা এই ইলিশের মরশুমেই। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন— "ইলিশের মরশুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া

বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।"[৪] অর্থাৎ বর্ষার পর হালার মাছ ধরা যায় না নদীতে। এই প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামের চিত্র উপন্যাসিক তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

নদীর মালিককে খাজনা দিয়ে সঙ্গে হাজার টাকার মূল্যের জাল যেসব জেলেরা পাততে পারে তাদের মুনাফা হয় বেশি। বিশাল পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা গরীব কুবেরের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। এদিকে ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থায় যে মাছ তারা ধরে তার দু'তিন আনা ভাগে তাদের সংসার ভালোভাবে চলে না। যেহেতু এই ইলিশের মরশুমেই যা উপার্জন হয়। তাই ঘরে এক মুহুর্ত বসে থাকলে হবে না জেলে কুবেরের। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন— "শরীর থাক আর যাক এসময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।"[৫] সেইজন্য শরীরের দিকে খেয়াল না রেখে উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিতে হয় দরিদ্র কুবেরকে। নদীতে মাছ শিকারের সময় মধ্যরাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে কুবের ও গণেশ। শেষ রাতে কুবের আজান খুড়াকে বিশ্রামের জন্য বললে সে তাকে বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার কথা জানায়। নিজের শরীর ভালো না থাকার কথাও আজান খুড়াকে বলে। মাছ ধরার সময় গণেশ ও কুবের বহু পুরনো তামাক ব্যবহার করে। এই তামাক সে বারো বছর বয়স থেকেই তৈরি করে আসছে। গণেশ বহুক্ষণ জলে থাকায় তার শরীর ঠান্ডায় কাঁপছিল। তার কাছে এই সময়টা যেন সত্যি সত্যি শীতকাল মনে হয়। কুবেরের মাছ ধরার সঙ্গী গণেশ। গণেশ খানিকটা বোকা। কিন্তু কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের সমস্ত বিষয়ে সে কুবেরের পরামর্শে চলে। তার জীবনে কোন বিপদ হলে ছুটে আসে জেলে কুবেরের কাছে। আনুগত্যের জন্যই কুবেরের সঙ্গে তার অটুট বন্ধুত্ব হয়েছে। তার কাছে দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ ও পুনর্মিলনও আছে। তবে গণেশ নিরীহ প্রকৃতির বলে কুবেরের সঙ্গে তার ঝগড়া কম হয়। গণেশ গান জানে। তার গান গভীর দার্শনিকতার পরিচয় বহন করে - "যে যাহারে ভালোবাসে, সে তাহারে পায়না কেন।"[৬] গণেশের জীবনও কিন্তু কম সংগ্রাম পূর্ন নয়। তার পরিচয় পাওয়া যায় রথের দিন কুবেরের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। গণেশ বলেছে - "...... কাইলের কান্ড জানস ? বিহানে ঘরে ফির‍্যা শুমু, বউ কয় জাল বাড়ন্ত। খাও আইঠা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লাইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহে– চাল বাড়ন্ত।"[৭] যাকে সারা রাত জেগে কাজ করে গিয়ে ঘরে চাল নেই শুনতে হয় তার জীবন সংগ্রাম কতটা জটিল বলার অপেক্ষা রাখে না। জেলে পাড়ার জীবন সংগ্রামে জর্জরিত আর একটি চরিত্র হলো রাসু। যে সবকিছু হারিয়ে একসময় পাড়ি দিয়েছিল ময়নাদ্বীপে। তবে সেখানে সে থাকতে না পেরে পালিয়ে আসে এবং কেতুপুরে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাসুর মধ্য দিয়ে জৈবিক তাড়নাকে বেশি করে দেখাতে চেয়েছেন। কারণ সদ্য মারা যাওয়া স্ত্রীকে ভুলে রাসু বাড়ন্ত মেয়ে গোপিকে বিয়ে করতে চায়। অর্থাৎ তার জৈবিক চাহিদাকে চরিতার্থ করতে চায়। রাসুর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক জেলে পাড়ার সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর মানুষের চরিত্রকেও তুলে এনেছেন। জেলেপাড়ার নারী চরিত্রের মধ্যে যুগীর জীবনকে লেখক অঙ্কন করেছেন অন্যরূপে। মাঝি পাড়ার নারীরা জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকতে গিয়ে রক্ষিতাতেও পরিণত হয়। তারই প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুলেছেন যুগীকে। যুগী প্রীতম মাঝির মেয়ে এবং উচ্চ বর্ণের সমাজের মানুষের চোখের রক্ষিতা বলে পরিচিত। তবে সংগ্রামশীলা এই নারীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সহানুভূতির চোখে দেখেছেন। কেননা ঘৃন্য রক্ষিতা বলে পরিচিত হলেও যুগী আসলে একজন সেবাময়ী নারী। তাই দেখা যায় রাসু যখন

স্ত্রী- পুত্র-কন্যা হারিয়ে ময়নাদ্বীপ থেকে কেতুপুরে এসেছে তখন যুগীই তাকে ঠাই দিয়েছে। তাই রক্ষিতা হিসেবে জীবন যাপন করলেও যুগী একজন দয়াময়ী নারী।

কুবের নেংটি ছেড়ে তিন হাতি ছোট ময়লা কাপড় পরে নদী থেকে তীরে ওঠে। সেখানে চালানবাবু কেদারনাথের মাছ গোনা দেখে এবং তা খাতায় লিখে রাখে। এই জেলেদেরকে তারা ঠকায়। শীতলবাবুর মতো লোকেরা হতদরিদ্র মাঝিদের ঠকাতে এক পাও পিছুপা হয় না। সারা রাত্রি ব্যাপি ঐকান্তিক পরিশ্রম করে মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে যায় বাজারে দুটো পয়সার আশায়। সেই বাজারে গিয়েও তাদের সম্মুখীন হতে হয় সীমাহীন সংগ্রামের। কেননা, সেখানে উপস্থিত শীতল বাবুর মতো ধূর্তবাজ মহাজনেরা। যারা অনায়াসেই হতদরিদ্র কুবেরের মতো সাধারন মানুষকে ঠকাতে পারে। তারা চারশো মাছ নেয় আর দাম দেয় আড়াইশো মাছের। এই ভাবেই দরিদ্র জেলেদের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। শত বঞ্চনার শিকার হয়েও কুবের কোন প্রতিবাদ করতে পারেনা। সে গরীব, ছোটলোক। কুবেরের প্রসঙ্গে উপন্যাসটি বলেছেন— "ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন- পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলের। তাই প্রথার মতো সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে।"[৮] অর্থাৎ দারিদ্রতা কীভাবে জেলেদের সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত করে তারই চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। এভাবেই জীবন অতিবাহিত হয় তাদের। একদিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন ধরে, নদী তীরে মাটিতে ধস নামে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করে চর জেগে ওঠে। অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হয়ে যায়। পেটে ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালায় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুদের কান্না কোনদিনও বন্ধ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র মানুষ জেলেদের দূরে ঠেলে দেয়। কেবল মানুষ নয়, প্রকৃতির কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলা থেকেও তারা কোনো মতেই ছাড় পায় না। তীব্র বর্ষায় জেলেপাড়ায় ঘরে ঘরে জল ঢোকে। এই জলে দীর্ঘ সময় থাকার পর তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের রোগ হয়। শেষে তারা মারা যায়। এই ভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই করে জেলে পাড়ার হতদরিদ্র মানুষরা।

জেলে পাড়ার মাঝিদের জীবনে প্রতিনিয়ত সমাজের শোষণ, বঞ্চনা দারিদ্র আর তারই মধ্যে তাদের ঘরে নবজাতকের জন্মতে তারা খুশি হয় না। প্রচন্ড দারিদ্রের মধ্যে কুবেরের স্ত্রী মালা পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেও কুবের তাতে আনন্দিত না হয়ে বরং বিরক্ত প্রকাশ করে এভাবে — "পোলা দিয়া করুম কী? নিজে গোর খাওন জোটে না, পোলা।"[৯] নতুন সন্তানে কুবেরের যে শুধু বিরক্তি হয় তাও নয়। এই হতদরিদ্র মানুষটিকে এই নিয়েই সমাজের কাছে শিকার হতে হয় ব্যঙ্গ বিদ্রুপের। নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষের যে কেবল খাওয়ার থাকে না তাই নয়, ঔপন্যাসিক তাদের মান সম্মানের বিষয়টিও কত হীন তা উপস্থাপিত করেছেন কুবেরের এই পুত্র সন্তানের জন্মের পর। কারণ কুবের কৃষ্ণ বর্ণের। কিন্তু সন্তান হয়েছে ফর্সা। তাই নকুল শয়তানি হাসে হেসে পরিহাস করে কুবেরকে বলে - " তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইলো কোয়ান থেইকা? ঘরে তো থাকিস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।"[১০] নকুলের এই ধরনের সংলাপে দরিদ্র মানুষের প্রতি সমাজের উঁচুতলার মানুষদের তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়েছে। বাড়ি ফিরে পুত্রের মুখ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ না করলেও পর মুহূর্তেই লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপে জর্জরিত কুবেরের মাথায় চাপে দায়িত্ববোধের ভার। এই জেলে শ্রেণিরা

এতটাই হতদরিদ্র যে, সদ্যপ্রসূতির জন্য একটি ভালো থাকার জায়গাও দিতে পারেনা। তবুও স্বামী হিসেবে সেই কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে ওঠে দরিদ্র কুবের। গরমের জন্য মোটা কিছু কেনার যথেষ্ট সামর্থ তার নেই। তাই বর্ষার দিনে স্যাঁতসেতে আঁতুড় ঘরে স্ত্রী মারা কষ্ট পাবে ভেবে কুবের বারান্দায় বেড়া দেওয়ার যেমন ব্যবস্থা করেছে, তেমনি মালাও নবজাতককে রক্ষার জন্য তার বিছানার নিচে বিছিয়ে দিয়েছে ঘর ছাউনি শন। একটি প্রবাদ রয়েছে যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। চির দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সংগ্রামকারী কুবেরের দারিদ্র্য সঙ্গে লড়াই করতে করতে রহস্যময় মানুষ হসেন মিয়ার ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে। নিজের লোভ সংবরণ করতে না পেরে একসময় দেখা যাচ্ছে কুবের কখনো কয়লা, কখনো হোসেন মিয়ার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছে। তবে সে লোভী নয়। লোভ করে বেশি চুরি করতেও তার দ্বিধা হয়। প্রকৃতপক্ষে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে অভাব অনটনে কুবের চুরি করতে বাধ্য হলেও তার মনে সব সময় একটা পাপবোধ কাজ করতো।

জেলে পাড়ার বাস্তব বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মাঝি কুবেরের থাকার জায়গার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। কুবের যে ঘরে থাকে তার ভিতরটা অন্ধকার। ঘরের কোনের জিনিসপত্র দেখতে হলে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা আছে। আর এই মাচার কিছুটা ছেড়া কাঁথা বিছানা রয়েছে। মাথার বালিশটা তেলে এতটাই কালো হয়েছে যে সেটা ব্যবহার করা যায় না। তবুও কুবেরের পিসি সেটা ব্যবহার করে। মাচার বাকিটা অংশ হাঁড়ি কলসিতে পরিপূর্ণ। এগুলো তিন পুরুষ ধরে জমিয়ে রেখেছে কুবের। আর মাচার নিচের দিকটা পুরনো জীর্ণ তক্তায় বোঝাই করা রয়েছে। ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি ছিল যেটা কুবেরের পিতা হারাধন নিজেই তৈরি করেছে। এভাবেই মাঝি কুবেরের মধ্য দিয়ে সমগ্র জেলে পাড়ার দরিদ্রতার জীবন্ত চিত্র পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে। পদ্মানদীর মাঝিদের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের আনন্দ উৎসবের বিষয়টিও খানিক হলেও নজরে পড়ে। কেতুপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হলো সোনাখালি। সেই গ্রামের মাঝি জমিদাররা রথের মেলার আয়োজন করে অন্নবাবার মাঠে। এই রথের মেলা স্থায়ী হয় উল্টোরথ পর্যন্ত। আগে এই মেলাটি পদ্মানদী থেকে কিছুটা দূরে হলেও এখন কিন্তু নদীর তীর ঘেঁষেই মেলা বসে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে মাঝিদের জীবনে দেখা যায় খানিকটা আনন্দের ঢেউ। রথের দিন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হলে গণেশ আসে কুবেরের বাড়ি নৌকা ঠিক করতে বলার জন্য। এই বৃষ্টি বাতলা দিনেও কুবেরদের ঘরে বসে থাকার উপায় কিংবা মেলা উপভোগ করার সুযোগ তাদের নেই। এইরকম দিনে তাদের ছুটতে হয় জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে। তারই তাগিদ দিতে এসেছে গণেশ কুবেরের কাছে। এই জেলে মাঝিরা যে কতটা দরিদ্র তা বোঝা যায় কুবেরের ঘরের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার মধ্য দিয়ে। আনন্দের রথের মেলা আসলে কুবের মাঝিদের মাথায় 'রথের বাদলা' ভয়টাই যেন বেশি করে চেপে ধরে। জেলেপাড়ার মাঝিদের জীবন দার্শনিকতাও যেন প্রকাশ পায় কুবেরের মাধ্যমে। কুবের তার উলঙ্গ দুই ছেলের মধ্যে সামান্য চিড়া দেওয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দিতে চায় এভাবে - "আরও দুটি চিড়া মুখে দিয়া বাকিগুলি দান করিয়া দিল তাহার বড় ছেলেকে। ... পিতৃদত্ত প্রসাদের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া ঘরের কোণে দু'জনের একটা ছোটখাটো কলহ বাধিয়া গেল। কুবের আর চাহিয়াও দেখিল না। এ যে তাহার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার বুঝি একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের ভাগ্য বুঝিয়া লইতে

শিখুক।"[১১] তারপর গণেশের সঙ্গে দারিদ্রতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাদের রথের মেলার দিন অতিবাহিত হয়।

সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী হোসেন মিয়া সম্পর্কে বলেছেন - "বাস্তব জীবনের বিচিত্র দুঃখ যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা ও বঞ্চনার সঙ্গে গভীরভাবে সংসক্ত এই লোক শ্রমজীবীর দৃষ্টিকোণ তার নিষিদ্ধ প্রেমকে, তার নিজের ও সেই সঙ্গে অন্য মাঝিদের সুদূর অপরিচিত ময়নাদ্বীপের জন্য ভাবমিশ্রিত গূঢ় আকর্ষণকে, হোসেন মিয়ার বিচিত্র রহস্য জটিল ব্যক্তিত্বকে পাঠক চিত্তে বাস্তবতার প্রতীতি সৃষ্টিতে গভীরভাবে সাহায্য করে।"[১২] মাঝি কুবেরের জীবনে আবির্ভাব ঘটে হোসেন মিয়ার। তার বাড়ি নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বছর পূর্বে কেতুপুরে সে বসবাস করছিল। তার আবির্ভাবের শুরুতে ঔপন্যাসিক তাকে 'রহস্যময় লোক' বলে অভিহিত করেছেন। কেতুপুরের মাঝিরা বংশ-পরম্পরাগতভাবেই তারা দারিদ্র। এই জেলে মাঝিদের একমাত্র জীবিকার পথ হল পদ্মা। কিন্তু পদ্মা সর্বদা তাদের প্রতি সদয় থাকে না। বিপুলা পদ্মা যখন কৃপণ হয়ে যায় তখন তাদের জীবন নির্বাহ করা দুঃসহ হয়ে ওঠে। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে সুযোগের থাবা বসায় রহস্যময় লোক হোসেন মিয়া। হোসেন মিয়া সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন - "বয়স তাহার কত হইয়াছে চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না। পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নূরে মেহেদী রং লাগায়, কানে আতর মাখানো তুলা গুজিয়া রাখে।"[১৩] কেতুপুরে প্রথম যখন তার আবির্ভাব হয়েছিল তখন সে ছেড়া লুঙ্গি পরে রুক্ষ চুলে ঘোরাফেরা করতো। তারপর নতুন উপায়ে অর্থ উপার্জন শুরু করে। তার এই অর্থ রোজগারের পথ সম্পর্কে কেউ তেমন জানে না। জেলে পাড়ার মানুষদের যেন হোসেন মিয়া ভালোবাসে। চিরকাল দুঃখ-দারিদ্রতা জর্জরিত জেলেপাড়ার নোংরা মানুষগুলোর জন্য তার বুকে যেন অজস্র ভালোবাসা রয়েছে। তার চরিত্র সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন - "বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সবসময় সে মিষ্টি করিয়া হাসে।"[১৪] তবে জেলে পাড়ার হতদরিদ্র মানুষগুলো হোসেন মিয়াকে যে বোঝেনা তা কিন্তু নয়। কিন্তু অসহায় দারিদ্রতার চাপে কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তির আশায় জেলে পাড়ার নিরুপায় পরিবার গুলো হোসেন মিয়া ফাঁদে পা দেয়। নিরুপায় হয়ে হোসেনমিঞার কাছে ধার করে এক সময় তাদের পাড়ি দিতে হয় জঙ্গলাকীর্ণ উপনিবেশ ময়নাদ্বীপে। কেতুপুরের হতদরিদ্র মানুষগুলো এভাবে সংগ্রাম করে, গহীন জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা বাঁচে। এই বাঁচার তাগিদে রাসু, আমিনুদ্দিন, নছিবন - এরা হোসেন মিয়ার চক্রান্তে পা দিয়ে বাঁচার তাগিদে ময়না দ্বীপের বাসিন্দায় পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, হোসেন মিয়ার উদ্দেশ্য ছিল একটি উপনিবেশ গড়ে তোলা। কোনো উপনিবেশ এই মানুষ ছাড়া স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই সে ভালো মানুষের মুখোশ ধরে পড়ে থাকত কেতুপুরে গিয়ে। আসলে উপন্যাসের মধ্যে এই ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গটি তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষদের সমাজের বুকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করানো। একটি সমাজ গঠন করা - যে সমাজে এই দরিদ্র মানুষগুলো শোষণ পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেতুপুরের মতো হতদরিদ্র জেলেদের যে দুঃখ দারিদ্র্যময় জীবন তা থেকে মুক্তির পথ ময়নাদ্বীপও দিতে পারেনি। বরং হোসেন মিয়ার মতো শঠ চরিত্রের লোক তাদেরকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। উপন্যাসের নায়ক কুবেরও এই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে মুক্তি পায়নি।

কুবেরের স্ত্রী মালা খোঁড়া হলেও তার প্রতি কোনো বিতৃষ্ণা দেখা যায়নি। মালা যে একজন সত্যিকারের রক্ত মাংসের নারী এবং সে কুবেরকে মনে প্রানে ভালোবাসে সেটা বোঝার শক্তি ঈশ্বর কুবেরকে দিয়েছিল। মালা কুবেরের ঘরে স্ত্রী হয়ে এসেছে এটা কুবেরের ভাগ্যের

ব্যাপার। তার একটা পা খোঁড়া না হলে কুবেরের ঘরে পায়ের ধুলো ঝাড়তেও আসতো না মালা। পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে কুবের সুখে-দু:খে সংসার করে। তাদের এই সংসারে ভাঙ্গন ধরিয়েছে তারই শ্যালিকা কোপিলা। স্বামী পরিত্যক্তা কপিলা যৌবনবতী এবং সুঠাম চেহারার অধিকারী। কুবেরও তার উচ্ছ্বল ও বাসনা ব্যাকুল আচরণে সাড়া না দিয়ে পারেনি। হাসপাতালে কুবেরের সন্তান গোপীর পায়ের অপারেশন করাতে নিয়ে গেলে সেখানে একটি হোটেলে কুবের ও কপিলে রাত কাটায়। আর কপিলাও যে কুবেরের প্রতি আসক্ত সেটা তার আচরণে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। কুবের বসন্ত উৎসবে রঙের বদলে কপিলার কর্দমাক্ত শরীর আবেগে জড়িয়ে ধরে। কপিল তার জীবন থেকে সরে যেতে বলে। কারণ তার স্বামী আছে। তবে এটা তার মনের কথা নয়। তার মনের কথা কুবেরকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া। আর এই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধা পড়তে কুবেরের বিন্দুমাত্র বাধা নেই। এই কাহিনির রেস ধরে শেষ পর্যন্ত হোসেন মিয়া সফল হয়েছে। মাঝি পাড়ার জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে এবং জেলে সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে কুবের শেষ পর্যন্ত কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিয়েছে। তাই কুবেরের জীবনে নেমে এসেছে ট্রাজিক পরিণতি।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলের সমাজের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন তার 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। এখানে তিনি মাঝি কুবেরের চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন সমগ্র পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের মাঝিদের প্রতিনিধি হিসেবে। যে মাঝিসমাজ চিরকালই শোষিত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত ও শিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেই সমাজ থেকে কোনোদিন যে মাথা তুলে বাঁচার স্বপ্ন দেখা যায় না। অথবা কোনো শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র হওয়া যায় না। তারই পরিচয় উপন্যাসের প্রতিটি পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়। তাই উপন্যাসের নায়ক কুবের প্রবঞ্চক হোসেনের হোসেন মিয়ার কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে নিজের মাঝি অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত ময়নাদ্বীপের চাষিতে পরিণত হয়েছে। এই ট্রাজিক পরিণতির মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি সমাজের কাছে পদ্মানদীর মাঝিদের পরাজিত জীবন সংগ্রামের রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন - "মাঝিদের দারিদ্র্য জর্জর জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রের সঙ্গে কুবেরের দৃষ্টিকোণ বিধৃত ময়নাদ্বীপ ও হোসেন মিয়ার সুদূর রহস্যময়তা...... সবমিলিয়ে প্রসারিত করে দেয় পাঠকের বাস্তব জীবন বোধের সীমানাকে।"[১৫]

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৩৬, ৪২তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, পৃ:-১৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৯২, পৃ:-৫১৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৩৬, ৪২তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, পৃ:-৭-৮
৪. তদেব, পৃ:-৮
৫. তদেব, পৃ:-৮
৬. তদেব, পৃ:-১০
৭. তদেব, পৃ:-১৯
৮. তদেব, পৃ:-১২
৯. তদেব, পৃ:-১৪
১০. তদেব, পৃ:-১৪

১১. তদেব, পৃ:-১৮
১২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ:-২৬৪
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৩৬, ৪২তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, পৃ:-২০
১৪. তদেব, পৃ:-২১
১৫. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ:-২৬৪।

উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জ জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

মো: শরিফুল ইসলাম
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের শস্যভান্ডার খ্যাত দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলা বরিশাল যার পূর্বনাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ, বাকলা এবং বাকেরগঞ্জ। নদী প্রভাবিত বাকেরগঞ্জের কৃষিজীবী অধ্যুষিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মসমাজের জনগোষ্ঠী পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ায় নতুন সামাজিক মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জ এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বহুমাত্রিক। উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও অর্থকরী পণ্যের মধ্যে ধান, পাট, নারকেল, সুপারি ও লবনের সুখ্যাতি ছিল। লবন শিল্প তখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিশাল স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কারণে লবন শিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। নদী কেন্দ্রিক হওয়ায় বাকেরগঞ্জ এলাকায় নৌকা নির্মাণ শিল্পের যথেষ্ঠে প্রসার হয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের চোখে বাকেরগঞ্জের মানুষ দাঙ্গা ও হাঙ্গামাবাজ হলেও আসলে তারা ছিল পরিশ্রমী ও নিজের অধিকার আদায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আলোচ্য গবেষণা কর্মের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, ডিস্ট্রিস্ট গেজেটিয়ার, সেন্সাস রিপোর্ট, বেঙ্গল গেজিটিয়ারসহ বরিশালের উপর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ।
সূচক শব্দ: বাকলা, আগা বাকের খান, পাইট্রা, দক্ষিণবঙ্গের নবদ্বীপ, ফিরতি খোচ।

মূল আলোচনা:

বাকেরগঞ্জের নামকরণের ইতিহাস:

আজকের বরিশাল অঞ্চল গুপ্তবংশীয় রাজা চন্দ্রবর্মার সময় "চন্দ্রদ্বীপ" নামে পরিচিত ছিল, পরে মুঘল আমলে "বাকলা" নামে পরিচিতি লাভ করে। যার প্রমাণ বহন করে মুঘল সম্রাট মহামতি আকবরের জীবনী আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে "সরকার বাকলা" নামে একটা জায়গার উল্লেখ। বাকেরগঞ্জ জেলার নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা যুক্তি -তর্ক, রূপকথা- উপকথা থাকলেও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার জে.সি. জ্যাক এ নামকরন নিয়ে আমাদের স্বচ্ছ ধারনা দিয়েছেন। জে.সি. জ্যাক এর উদ্বৃতি দিয়ে বলা যায়, বাকেরগঞ্জ জেলার নামকরনের সাথে অষ্টাদশ শতকের ঢাকার মুঘল দরবারের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, বুজুর্গ উমিদপুর ও সেলিমাবাদের জমিদার "আগা বাকের" এর নাম জড়িয়ে আছে।[১] ১৭৪১ সালে আগা বাকের খান নিজ নামে এই অঞ্চলের নাম দেন "বাকেরগঞ্জ"। এভাবে একসময়ের চন্দ্রদ্বীপ অষ্টাদশ শতকে বাকেরগঞ্জ নামে পরিচিত হতে শুরু করে। বর্তমানে এ এলাকাটি বরিশাল নামে পরিচিত, তবে যেহেতু প্রবন্ধটির সময়সীমা উনিশ শতক এ কারনে প্রবন্ধে উক্ত স্থানকে বাকেরগঞ্জ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জের সীমানা:

উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জের সীমানা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা কঠিন হলেও এইচ. বিভারিজ বাকেরগঞ্জের সীমানা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন, বাকেরগঞ্জের উত্তর-পশ্চিম দিকে ফরিদপুর ও বলেশ্বর নদী, যা যশোর থেকে বাকেরগঞ্জকে পৃথক করেছে আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বদিকে মেঘনা নদী ও এর মোহনা।[২] অবশ্য উইলিয়াম উইলসন হান্টার মনে করেন

বাকেরগঞ্জের উত্তরসীমানা পদ্মা ও ময়নাকাতিখাল নদী দ্বারা ঢাকা এবং উত্তর-পশ্চিমে ফরিদপুর জেলা থেকে পৃথক; যেখানে দক্ষিণাংশ বঙ্গোপসাগর দ্বারা পৃথক হয়েছে এবং পূর্বাংশে মেঘনা, শাহবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত।[৩] উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জ উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল ৮৯ মাইল আর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ৬০ মাইল।[৪] বাকেরগঞ্জ ১৮০৩ সালে জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ১৮১৭ সালে প্রথম ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে স্বাধীন জেলা হিসেবে ঘোষিত হয়।[৫] এই নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ বাকেরগঞ্জ জেলার সাথে খুলনা, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং সমগ্র মাদারীপুর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮২২ সালে ভোলা বাকেরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নোয়াখালীর সাথে সংযুক্ত হলেও ১৮৬৯ সালে পুনরায় বাকেরগঞ্জের সাথে যুক্ত হয়।

বাকেরগঞ্জের জনসংখ্যা:

ডিস্ট্রিষ্ট গেজিটিয়ার বাকেরগঞ্জ অনুযায়ী বলা যায়, ১৮০১ সালে বাকেরগঞ্জের সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি ছিল না। ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারি অনুযায়ী বাকেরগঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছলি ২৩,৭৭,৪৩৩ জন, যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১২,০৪,২৩৭ জন, আর মহিলার সংখ্যা ছিল ১১,৭৩,১৯৬ জন এবং সেখানে প্রতি বর্গ মাইলে ৪৮২ জন বসবাস করতো।[৬] এসময় বাকেরগঞ্জে ২৭ জন ইউরোপীয় এবং ১২৭ জন ইউরোশিয়ান নাগরিককের বসবাস ছিল।[৭] নানা রকম প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারির কারনে ১৮৮১ সালে বাকেরগঞ্জের মোট জনসংখ্যা কমে গেলেও ১৮৯১ সালে তা কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

বাকেরগঞ্জের আবহাওয়া:

১৮০১ সালে মি. উইন্টাল নামক ব্রিটিশ কর্মকর্তা বাকেরগঞ্জের আবহাওয়া সর্ম্পকে সরকারকে অবহিত করে বলেছিলেন, "বাকেরগঞ্জ জেলার সদর দফতরের বাজে আবহাওয়া একজন ব্যাক্তিকে নিঃসার করে ফেলতে পারে, যা তাকে মৃত ব্যাক্তিতে পরিনত করে ফেলে"।[৮] নদী ও বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বাকেরগঞ্জ ১৮২২, ১৮৬৭ ও ১৮৬৯ সালে বড় রকমের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়লেও এ এলাকার মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল। তবে পরবর্তীতে ক্যালকাটা রিভিউ এর লেখক ডা.বেনসলি ১৮৭১ সালে নদীবেষ্টিত বাকেরগঞ্জের আবহাওয়া সর্ম্পকে বর্ণনা মতে সমগ্র বাংলার চেয়ে বাকেরগঞ্জের তাপমাত্রা কম ছিল এবং আবহাওয়া ছিল ঠান্ডা, যে কারনে এখানে বসবাস করা আরামদায়ক ছিল।[৯]

বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ:

বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের বাকেরগঞ্জ অঞ্চলটি কৃষি নির্ভর হওয়ায় এখানাকার ৮৫% মানুষের পেশা ছিল কৃষি কাজ, ৫% মানুষ প্রশাসন ও শিল্পকলার সাথে জড়িত ছিল আর বাকি ১০% মানুষ ভাসমান বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত ছিল। ১৮৭২ সালের লোকগণনা রিপোর্টানুসারে বলা যায় বাকেরগঞ্জে ৪,৯৮,৬৯০ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কৃষিকাজের সাথে আর ২,৩৯,৩২৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অকৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল।[১০] মহিলারা সেবিকা পেশায় নিয়োজিত থাকলেও ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে ১১৮৯ জন পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] বাকেরগঞ্জের নিকট হেলন্চা ও রঙ্গশ্রীতে শীতলপাটি তৈরির কারিগর পাইট্রাদের বসতি ছিল। আগা বাকের খান ফরিদপুর থেকে তাঁতিদের খেপুপাড়া আর তালতলীতে নিয়ে এসে বসতি গড়ে তুলে দিয়েছিলেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা:
উনিশ শতকের বাকেরগঞ্জের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই অঞ্চলের কৃষির কথা চলে আসে। বর্ষায় নদীবাহিত পলিমাটির কারনে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাকেরগঞ্জের মাটির উৎপাদন শক্তি বেশি ছিল। তৎকালীন রাজস্ব বিভাগ ও প্রশাসনিক রিপোর্টানুসারে বলা যায় জঙ্গল ও পতিত জমি সেসময় চাষের আওতায় আসে; সুন্দরবনে চাষাবাদ শুরু হয়।[১২] কৃষিনির্ভর বাকেরগঞ্জের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি ছিল এ অঞ্চলে উৎপাদিত ধান, সুপারি, নারকেল, আখ, পাট, কাঠ, পান, গম, যব, তিল, তিসি, বিভিন্ন প্রকার ডাল, ফলমূল, সবজি প্রভৃতি। এখানে উৎপাদিত মোট ধানের মধ্যে তিন-চর্তুথাংশই ছিল আমন ধান আর এক ভাগ ছিলো আউশ ধান। বাকেরগঞ্জে উৎপাদিত আমন ধানের প্রায় ১৫০ রকমের জাত ছিল।[১৩] চড়ামদ্দি ও কাউয়ার চরে বাকেরগঞ্জের সবচেয়ে উৎকৃষ্টমানের ধান উৎপন্ন হতো আর পটুয়াখালীর 'কালমেঘা' এবং 'বাইন চটকি' তে উৎকৃষ্টমানের বালাম ধান চাষ হতো। ১৮৭৫ সালে সেখানকার প্রতি মণ ধানের গড় দাম ছিল ২.৫ টাকা।[১৪] উপকূলবর্তী এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চলে মগারি সুপারি, টাটা সুপারি ও মগ সুপারি নামে তিন প্রকার সুপারি প্রচুর পরিমাণে হতো। ব্রাহ্মণ ও কায়স্ত সম্প্রদায়ের কায়িক শ্রমে অনীহার কারনে কম কষ্টে সুপারি থেকে বেশি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায় এ অঞ্চলে সুপারি চাষ প্রসার লাভ করেছিল। এ অঞ্চলে উৎপাদিত সুপারি ব্যবসার সাথে মগ, বার্মিজ ও চীনা ব্যক্তিরা জড়িত ছিল। ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বাজার থেকে সুপারি ক্রয় করে আরাকানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতো। এই সুপারি ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র নলছিটিতে মগ জাতি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য একটি পাড়া স্থাপন করে ব্যবসা পরিচালনা করতো। উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জবাসীর সাথে চট্টগ্রাম থেকে আগত ব্যবসায়ীরা নারকেলের বদলে মেটে তেল বিনিময় করতো। এ অঞ্চলের বলি গাছের ছাই-এ লবণ ও পটাশিয়াম বেশি থাকায় ধোপারা সাবানের পরিবর্তে এই ছাই ব্যবহার করতো। উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক উৎপাদিত পানের একটি বড় বাজার বসতো "টার্কি" নামক স্থানে। বাকেরগঞ্জে মি. ন্যাথনিয়েল মনেরোর মালিকানায় শুরু হওয়া নীল চাষের চিহ্ন বহন করতো "খাগাশুড়া ও পঞ্চকারণ" নামক দুটি নীলকুঠি।

১৮৪৪ সালে বাকেরগঞ্জ জেলায় আবওয়াব বা বাড়তি খাজনার পরিমান ছিল মোট আদায়কৃত খাজনার ২৫ শতাংশ বেশি।[১৫] এই খাজনা বৃদ্ধির খবরটি ১৮৫০ সালের শ্রাবণ মাসের তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ৮৪ সংখ্যায় উঠে এসেছিল। পুরো বাংলার কৃষকদের এ দূরাবস্থার কথা রামমোহন রায়ের পার্লামেন্টারি কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে এক মন্তব্যে উঠে এসেছিল। রামমোহন রায় মন্তব্য করেন 'বাংলার কৃষকেরা বর্তমান ব্যবস্থায় পুজিঁ সঞ্চয় করতে পারে না। ফসল ওঠার সময় যখন শস্যের দাম সবচেয়ে কম থাকে তখন জমিদারের খাজনা দেওয়ার জন্য সমস্ত শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তারপর মজুরি খেটে জীবিকা নির্বাহ করে। অনটনের বছর কিছুকালের জীবনধারনের উপযোগী মস্য তারা ধরে রাখে ঠিকই তবে সারা বছরের প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। তাদের দুঃখজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করতে হলে আমি বেদনা বোধ করি'।[১৬] খাজনা বাকীর দায়ে যশোরের বরোদাকান্ত রায় বাকেরগঞ্জ জমিদারিতে বেনামী বহু জমি নিলামে কিনেছিলেন।[১৭]

সুন্দরবনের উদ্ধার করা পতিত জমির উপর কর ধার্য করা হয়েছিল। ১৮৩৬ সাল নাগাদ সুন্দরবনের ১৬,৬৮,৩৪০ বিঘা জমি ১৮ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন এদেশীয়কে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল।[১৮] ১৮৭৬ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সত্ত্বেও বাকেরগঞ্জে ১৮৮১-৯১ দশকে

উৎপাদন ২১.৭% বৃদ্ধি পেয়েছিল[১৯] যা এ অঞ্চলের কৃষির সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। বাকেরগঞ্জ শিল্পপণ্য উৎপাদনের এলাকা না হলেও এই অঞ্চলের সাথে লবণ উৎপাদন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। এখানকার নারকেলপাতা, কলাপাতা, বাঁশপাতা পোড়ালেও তা থেকে লবণ পাওয়া যেত। তবে দুঃখজনক হলো এত সম্ভাবনাময় একটি শিল্প আহরনের আধুনিক কলা-কৌশল জানা না থাকার কারণে বাকেরগঞ্জবাসীকে ইংল্যান্ডের লিভারপুল থেকে লবণ আমদানি করতে হয়েছিল। বাকেরগঞ্জে ১৮১৫ পর্যন্ত ন্যামতী ও শিবপুরে এবং ১৮২৫ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ শাহরাজপুরে লবণের কারখানা চালু ছিল।

এখানে লবণ শিল্পের পাশাপাশি পালার্দির থানার অন্দর্গত বিলগাও গ্রামের কিছু মুসলিম পরিবার কাগজ তৈরি করতো, গৌরনদীতে কাপালি বর্ণের লোক চটের ব্যাগ ও ছালা তৈরি করতো, সরিষার তেল তৈরী করতো কালুপাড়ার বাসিন্দারা, দৌলতখানে তৈরি হতো নারিকেল তেল। বাকেরগঞ্জ সুন্দরবন সংলগ্ন হওয়ায় লবণাক্ততা প্রতিরোধকারী সুন্দরী কাঠ নৌকা তৈরিতে ব্যবহার করা হতো। উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জে সবচেয়ে নিপুনভাবে তৈরি করা হতো নৌকা, মেহেদীগঞ্জে ও শ্যামপুরে ভালো মানের কোশা নৌকা আর গান্টেশ্বরে পানশী নৌকা তৈরি করা হতো। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ে লিখেছিল '... এক্ষনে পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশের বাণিজ্যের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। রেলওএ, ইষ্টিমার, খাল, প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি দ্বারা গতিবিধির অনেক সুবিধা ও ব্রিটিস রাজপুরুষদিগের অপেক্ষাকৃত সুশাসনে দস্যু প্রভৃতির ভয় নিবারণ হওয়াতে, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এক্ষণে নিরাপদে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে'।[২০]

বাকেরগঞ্জের সামাজিক অবস্থা:

সারা বাংলার ন্যায় বাকেরগঞ্জের জমিদাররা নিজেদের জমিদারী ছেড়ে ঢাকা, কলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে বসবাস করতেন। বাকেরগঞ্জের প্রধান তিনটি জমিদারশ্রেণী খাজা, ঠাকুর ও ঘোষাল পরিবারের কেউ কখনো এখানে পা রাখেননি। যার ফলে মধ্যস্বত্তভোগী একটি পরগাছাশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে জমিদারদের নিস্ক্রিয়তার সুযোগ এই মধ্যস্বত্তভোগীদের কার্যত জমির মালিকে পরিণত করেছিল। জমিদার সমর্থক পত্রিকা ঢাকা প্রকাশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিখেছিল 'জমিদার "রায়তের রক্ত শোষিয়া লন!"।[২১] আবদোস সোবাহান একজন কট্টোর হিন্দু সমালোচক হয়েও ১৮৮৯ সালে মুসলমান জমিদার সর্ম্পকে লিখেছিলেন, 'এরা কবুতর উড়িয়ে, মোরগবাজি করে, সতরনজ খেলে বা স্রেফ ঘুমিয়ে দিন কাটান। মোসলমান কূলে জন্মগ্রহন না করিলে, মোসলমান মহিলাগণ এই আর্বজনাগুলোকে প্রসব না করিলে, সমাজের অধপতনের আশংকা কিছু কম হইত'।[২২]

বাকেরগঞ্জের প্রথম সেন্সাস রিপোর্টানুসারে সেখানকার মোট জনসংখ্যা ২৩,৭৭,৪৩৩ জনের মধ্যে ১৫,৪০,৯৬৫ জন মুসলিম; ৮,২৭,৩৯৩ জন হিন্দু; ৪০৪৯ জন বৌদ্ধ ও জৈন এবং ১৭৪ জন ব্রাহ্মসহ অন্য ধর্মাবলম্বী বসবাস করতেন।[২৩] এখানে বসবাসরত মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষিতের হার অনেক বেশি ছিল। ১৮৯১ সালের বাংলার সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায় প্রতি ১০,০০০ জনের মধ্যে যেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষিতর সংখ্যা ছিল ২২৭০ জন, সেখানে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষিতর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০৭ জন। শিক্ষাদীক্ষায় বাকেরগঞ্জের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের তুলনায় বেশ এগিয়ে ছিল। উনিশ শতকের শেষ দশকে বাকেরগঞ্জে প্রতি দশ হাজারে মাত্র নয় জন মুসলিম নারী ছিল, সেখানে হিন্দু নারীর

সংখ্যা ছিল ৯৯ জন।[২৪] তাদের সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার জন্য বাকেরগঞ্জের ইদিলপুরকে বলা হতো 'দক্ষিণবঙ্গের নবদ্বীপ'।

উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জের সুন্দরবন অংশে বসবাসরত মগ জাতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা বনে আবাদে পটু ছিল, তবে প্রায় সকলেই অহিফেন সেবন করতো, মগরা আগে জলদস্যুতার সাথে জড়িত থাকলেও বর্তমানে তারা কৃষিজীবী। কাঠের কাজে পটু এই বৌদ্ধরা বিবাহ ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতো। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বেশির ভাগের বসতি ছিল গৌরনদী এলাকায়। উনিশ শতকের ১৮৩০ সালে বাকেরগঞ্জের ম্যাসিস্ট্রট মি. গেরেট সাহেবের সময় প্রথম এখানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা শুরু করা হয়। শুধুমাত্র নিম্ন শ্রেণির কিছু চন্ডাল খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও তারা পরে স্বধর্মে ফিরে এসেছিল, যাদের "ফিরতি খোচ" বলা হতো। এসময় মি. জুশন ও মি. উইলিয়াম কেরীর তত্ত্বাবধানে বাকেরগঞ্জে একটি বাইবেল ক্লাস খুলে কিছু বালককে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গে ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও বাকেরগঞ্জে ১৮৬০ সালে রামতনু লাহিড়ীর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হয়। ঢাকা নর্মাল স্কুলের পাঁচজন ছাত্র বাকেরগঞ্জে ব্রাহ্মোপসনা শুরু করলে লাখুটিয়ার জমিদার নন্দন রাখালচন্দ্র রায় তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশের পিতামহ "সর্বানন্দ দাশগুপ্ত" বাকেরগঞ্জে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক পর্যায়ে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে জীবনানন্দ দাশের পিতা "সত্যানন্দ দাশ" ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং এই সমাজের মুখপত্র "ব্রাহ্মবাদী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হন। আধুনিক বরিশালের রূপকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ "অশ্বিনীকুমার দত্ত" ১৮৮২ সালে বাকেরগঞ্জের ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যপদ গ্রহন করেছিলেন। বাকেরগঞ্জে ব্রাহ্ম আন্দোলনে মহিলাদের মধ্যে কামিনী রায় এবং গিরিশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিনী মনোরমা মজুমদার স্বরণীয় হয়ে থাকবেন ১৮৮১ সালে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও ধর্ম প্রচারক নিযুক্ত হওয়ার জন্য।

বাকেরগঞ্জে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে প্রথম চেষ্টা করেন তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্যারেট। ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এখানে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মি. জন। ১৮৬৫ সালে ব্রাহ্মধর্মের আচার্য গিরীশচন্দ্র মজুমদার একটি নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও তা বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বাকেরগঞ্জের বিশিষ্ট সমাজসেবক অশ্বিনীকুমার দত্ত নিজের পিতার নামে ১৮৮৪ সালে "ব্রজমোহন স্কুল" এবং ১৮৮৯ সালে "ব্রজমোহন কলেজ" স্থাপন করেছিলেন। তিনি সেখানে ১৮৮৭ সালে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য "বাকেরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা" এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নদী ও বনাঞ্চল বেষ্টিত বাকেরগঞ্জে উনিশ শতকে সামাজিক অপরাধের মধ্যে ডাকাত সম্প্রদায় বিশেষ করে নৌ-ডাকাতের উৎপাত বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এসময় নিজেই নৌ-ডাকাতের কবলে পড়েছিলেন বলে তার সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় ১৮৫৪ সালের ৬ ফাল্গুন খবর প্রকাশ করেছিলেন।

মুসলমানরা রমজান, ঈদুল- উল-আজহা, ঈদ-উল-ফিত্র, ঈদ-ই-মিলাদ-উন-নবী গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করতো। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল দূর্গা পূজা। এছাড়া হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৭০ সাল নাগাদ এখানে পাঁচটি বড় মেলা হতো। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে গনেশ পূজা উপলক্ষ্যে "কালাশকাটি" মেলা আর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে "লাখটিয়া" মেলা হতো। বাংলার চারন কবি মুকুন্দ দাস বাকেরগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকা ঘুরেঘুরে যাত্রাগান করে

মানুষকে বিনোদিত করতেন। ১৮৯৭ সালে তিনি একশত গান সমৃদ্ধ "সাধন-সঙ্গীত" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এ সময়ে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়েছিল এবং সেই সাথে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হলেও বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। সমাজে একক বিবাহের প্রচলন বেশি হলেও ধনিক চাষী শ্রেণিকে প্রায়ই বহু বিবাহ করতে দেখা গেছে। বাকেরগঞ্জের বিধবা বিবাহ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় নাড়া দিয়েছিলেন দুর্গামোহন দাস তার বিমাতাকে বিয়ে দিয়ে, তৎকালীন সময়ে যা সবার কল্পনাতীত ছিল। সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের সাথে ধীরে ধীরে বাল্য বিবাহ কমে গিয়েছিল এবং সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

উপসংহার:

উনিশ শতকের বাকেরগঞ্জ উপনিবেশিক আমলে বাংলার ইতিহাসে বারবার আলোচিত হয়েছে তার নিজস্বতার জন্য। বাকেরগঞ্জের নামের সাথে জড়িয়ে আছে নবাবি আমলের প্রভাবশালী জমিদার আগা বাকের খানের নাম। তবে এখানকার প্রতিকূল ও বৈরী অবস্থার জন্য সেখানে জমিদার বা ধনিকশ্রেণীকে কম অবস্থান করতে দেখা যায়। এখানকার কৃষিজ দ্রব্য ও লবণ শিল্পের প্রসারের জন্য এই এলাকার কিছুটা উন্নতি হলেও তার সুফল সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জোটেনি। বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকায় উনিশ শতকে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা গতির সঞ্চার হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়, মহামারী এখানে বারবার আঘাত করলে বাকেরগঞ্জবাসীকে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করতে হয়েছে। তবে এ অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত ভাবে আধুনিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হলেও উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জে ব্রাহ্ম আন্দোলন এখানকার শিক্ষিত কিছু মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। উপনিবেশবাদের সমর্থক খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফলতার মুখ দেখেনি। তবে মিশনারীরা বাকেরগঞ্জে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. Jack, J. C., 1918, *Bengal District Gazetteers Bakarganj*, Calcutta, Bengal Secretariet Book Depot, p.1.
২. Beveridge, H., 1876, *the District of Bakarganj*, London, Trubner & Co, p.1.
৩. Hunter, W. W., 1875, *A Statistical Account Of Bengal* Vol.V, London, Trubner & Co, p.158.
৪. সেন, রোহিনীকুমার, ২০০০, বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের ইতিহাস, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, পৃ. ২৫।
৫. Jack, J. C., 1918, *Bengal District Gazetteers Bakarganj*, Calcutta, Bengal Secretariet Book Depot, p.1.
৬. Beverley, H, 1872, *Census Of Bengal*, Calcutta, The Bengal Secretariet Press, p.7.
৭. রায়, খোসালচন্দ্র, ১৮৯৫, বাকেরগঞ্জের ইতিহাস, বরিশাল, আদর্শ প্রেস, পৃ. ১৩৭।
৮. বিভারিজ, এইচ., ২০১৪, বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস, অনুবাদ গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, প্রকাশনা ও গবেষণা সেল চ.বি., পৃ. ৮।
৯. তদেব, পৃ. ৮।
১০. Beverley, H, 1872, *Census Of Bengal*, Calcutta, The Bengal Secretariet Press, p.13.

১১. Hunter, W. W., 1875, *A Statistical Account Of Bengal* Vol.V, London, Trubner & Co, p187.
১২. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, ১৯৮৭, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, কলকাতা, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ৪০।
১৩. রায়, খোসালচন্দ্র, বাকেরগঞ্জ ইতিহাস, বরিশাল, আদর্শ প্রেস, পৃ. ২৯২।
১৪. Md., Habibur Rashid (Edited), 1981, Bangladesh District Gazetteers Bakerganj, Dacca, Bangladesh Govt. Press, p.111.
১৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, ১৯৮৭, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, কলকাতা, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ৮।
১৬ তদেব, পৃ. ৮।
১৭. তদেব, পৃ. ১০।
১৮. তদেব, পৃ. ১৩।
১৯. Md. Habibur Rashid (Edited), *Bangladesh District Gazetteers Bakerganj*, Dacca: Bangladesh Govt. Press, 1981, p.56.
২০. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, ১৯৮৭, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, কলকাতা, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ১০৭।
২১. মামুন, মুনতাসির, ২০০৬, উনিশশতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, ঢাকা, সাহিত্য বিলাস, পৃ. ৮৪।
২২. তদেব, পৃ. ৮২।
২৩. Beverley, H, 1872, *Census Of Bengal*, Calcutta, The Bengal Secretariet Press, p.13.
২৪. O'donnell, C.j., 1893, *Census Of Bengal*, Calcutta, The Bengal Secretariet Press, p.223.

বাক্য সংযুক্তির স্বাতন্ত্র্য সন্ধান : রাজবংশী ভাষা

মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার

সারসংক্ষেপ (Abstract): বাক্যের গঠন একটি ভাষার নিজস্ব চলন ও ভঙ্গি। যা ঐ ভাষাকে অন্য ভাষা থেকে পৃথক করে তোলে। স্বভাবতই, এলাকা তথা ভৌগোলিক পরিধি ও ব্যবহারকারী পরিসংখ্যান ব্যতিরেকেও একটি আঞ্চলিক ভাষাকে ভাষারূপে স্বীকৃতির দাবীর ক্ষেত্রে ঐ ভাষার হাড়-মজ্জা ও অস্থি স্বরূপের মতো বাক্য গঠনের নিজস্বতা দরকার। রাজবংশী ভাষার নিজস্বতার স্বরূপ অনুসন্ধানে বাক্য সংযুক্তির চর্চা করতে গিয়ে পাওয়া যায়— বাক্য সংযুক্তিতে সর্বনাম, অব্যয়, বিশেষণ এবং ক্রিয়া বিশেষণ ব্যবহারের প্রাণোচ্ছল চমক। কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া-এই বাক্য গঠন রীতিই রাজবংশী ভাষার বাক্য গঠনের ভিত্তি-ভূমি। কিন্তু 'না' বাচক অব্যয় এবং সম্বোধন পদের ব্যবহারে বাংলা ভাষা থেকে রাজবংশী ভাষার ব্যবধান বিস্তর। রাজবংশী ভাষার বাক্য গঠনে শব্দ-বিভক্ত, ক্রিয়া-বিভক্তি, প্রকার বিভক্তি, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়-এর বহু সংযোজন-বিয়োজন এবং অবস্থানগত ভিন্নতা নিয়েই নিজস্ব ছাঁচ ও ভঙ্গির ভিতকে কংক্রিটে শক্ত করে তুলেছে।
সূচক শব্দ (Key Words): বাক্য, সংযুক্তি, ভঙ্গি, ভাষা-সম্প্রদায়, ভিত্তিভূমি, ধ্বনিঝংকার।

মূল আলোচনা (Discussion):

বাক্য হল ভাষার বৃহত্তম একক। প্রতিটি ভাষা সম্প্রদায় বাক্যের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে থাকে। নির্বাচিত উপাদান নিয়েই গঠিত হয় বাক্য। বাক্য সম্পর্কিত আলোচনাকে বলা হয় 'বাক্যতত্ত্ব' (Syntax)। একাল যাবৎ বাক্যের বিন্যাস, গঠন ও সংযুক্তি বিশ্লেষণে তিনটি ধারা তথা মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রচলিত। ঐতিহ্যগত বাক্যতত্ত্ব (Traditional Syntax), সংগঠনমূলক বাক্যতত্ত্ব (Structural Syntax), সঞ্জননী বাক্যতত্ত্ব (Generative Syntax)। বাক্যকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে দিক থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও প্রতিটি ধারাতেই বাক্যের অন্তর্গত উপাদান শব্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপাদানগুলিকে প্রাথমিক ভাবে আমরা বলি 'শব্দ'। ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় 'পদ'। বাক্যের পদ তথা শব্দের রূপবৈচিত্র্য ও বিভক্তি-চিহ্ন (শব্দ-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তি) উপরেই প্রকাশিত হয় বাক্যের অর্থ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যের অন্তর্গত উপাদান ও বিন্যাসক্রম অর্থাৎ গঠনগত সংযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেকারণেই বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় রূপতত্ত্বের উপাদানই হল প্রধান ভিত্তি। 'অবশ্য বাংলা প্রভৃতি ভাষায় রূপতত্ত্ব ও শব্দের বিন্যাসক্রম যেরকম পরস্পর-নির্ভর তাতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদেরও স্বীকার করতে হয় যে, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের মধ্যে ভেদরেখা সুস্পষ্ট নয়, বরং এই দু'টি শাখা অনেকটা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত :'[১] অন্যান্য ভাষার মতো রাজবংশী ভাষা বাক্যের সংযুক্তি তথা গঠনগত আলোচনায় রূপতত্ত্বও বাদ দিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

কামরূপী বা রাজবংশী ভাষাতেও অর্থ ও গঠনগত দিক থেকে বাক্যের বিশ্লেষণে পদ-কে গুরুত্ব দিতে হয়। কেন না শুধু শব্দ দিয়ে বাক্য হয় না। শব্দ-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তির অন্বয় ও অর্থগত সম্পর্কের মাধ্যমেই বাক্য নির্মিত হয়। যেমন : মুই বাড়ি যাং –বাক্যে তিনটি পদ। যথা—

'মুই বাড়ি' নামপদ; 'যাং' ক্রিয়াপদ। কিন্তু তিনটি পদ, শব্দ নয় কেন? এরকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—'মুই' সর্বনাম ও 'বাড়ি' বিশেষ্যপদ আর 'যাং' ক্রিয়াপদ। শব্দের সঙ্গে শব্দের বা শব্দের সঙ্গে ক্রিয়ার সংযোগ সেতু তৈরী করে বিভক্তি(শব্দ-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তি), শব্দকে বাক্যে বসার যোগ্যতা প্রদান করে, এবং শব্দ বা ক্রিয়া পদে পরিণত হয়। 'মুই বাড়ি যাং' বাক্যটিতে অর্থ, কারক-অকারক সম্বন্ধ ও অন্বয় বা পদক্রম বিন্যাস জনিত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার পদক্রম—

ইংরেজি বাক্য : S(কর্তা) + V(ক্রিয়া) + O(কর্ম) (SVO)

I Eating Rice.

He goes to Market.

বাংলা বাক্য : S(কর্তা) + O(কর্ম) + V(ক্রিয়া) (SOV)

আমি ভাত খাচ্ছি।

সে বাজারে যায়।

কামরূপী বা রাজবংশী বাক্য : S(কর্তা) + O(কর্ম) + V(ক্রিয়া) (SOV)

মুই ভাত খাওয়ার ধরছুং। (কোচবিহার)

মুই ভাত খাচো। (জলপাইগুড়ি)

উমায় বাজারত্ যাছে। (আলিপুরদুয়ার

বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট, বাংলা বাক্যের মতো কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার স্বাভাবিক পদক্রম বিন্যাস হল— S(কর্তা) + O(কর্ম) + V(ক্রিয়া) (SOV)। কামরূপীর বাক্যের 'পদ' পাঁচটি। যথা : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদ। ঐতিহ্যগত ভাষাতত্ত্বে বাক্যের দুটি অংশ— উদ্দেশ্য ও বিধেয়। ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে উদ্দেশ্য হল বিশেষ্যগুচ্ছ বা Noun Phrase বা N.P. এবং বিধেয় হল ক্রিয়াগুচ্ছ বা Verb Phrase বা V.P। যেমন—

উদ্দেশ্য	বিধেয়
মুই	ওঠে কাম করির যাম।
মোটা মানষিগিলা	জমিত কাম করির ধইচ্চে।

বাক্য : মুই ওঠে কাম করির যাম।

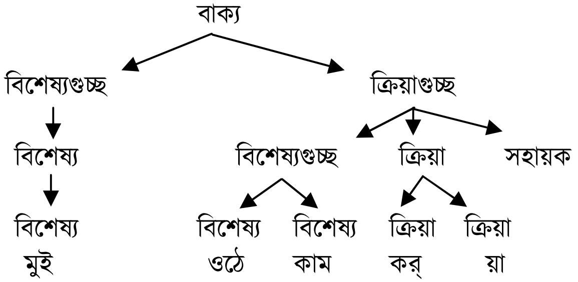

কামরূপী বা রাজবংশী বাক্যে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার পাঁচটি শ্রেণি।

যথা—

অসমাপিকা ক্রিয়া
প্রকার বিভক্তি
কাল বিভক্তি
পুরুষ বিভক্তি
ভাব বিভক্তি

'আ' যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া— দেখা, শুনা, বুঝা, কয়া, হয়া, চলা, বলা প্রভৃতি
ইয়া/ ই যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া— দেখিয়া, শুনিয়া, মারিয়া, ধরিয়া, পিছিলিয়া/ করি, দেখি, শুনি, হাটি প্রভৃতি
এয়া/ এ যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া— ডাকেয়া, দেখেয়া, ভোলেয়া, ড্যাকে, দ্যাখে প্রভৃতি।
ইতে/তে যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া— যাইতে, খাইতে, পড়তে, দেখতে প্রভৃতি।
ইলে যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া— খাইলে, দেখিলে, মরিলে, নিন্দাইলে প্রভৃতি।
কামরূপী বা রাজবংশী ভাষায় সাধু ও চলিত রূপ নেই। বাংলা ভাষার সাধু-রূপের 'ইয়া', 'ইতে' ও 'ইলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা গেলেও চলিত-রূপের 'লে' অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। 'ই', 'এয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার কামরূপীর বাক্যের নিজস্ব রূপ। সমাপিকা ক্রিয়ায় একই সঙ্গে তিন প্রকার বিভক্তি থাকে।

বর্তমান কাল : শূন্যবিভক্তি— মুই দেখং।
১. কাল বিভক্তি : অতীত কাল : 'ল', 'ইল' বিভক্তি— মুই দেখলুং।
ভবিষ্যৎ কাল : 'ম', 'ইম', 'ইমো' বিভক্তি— মুই দেখিম্।
নিত্যবৃত্ত কাল : 'চ' বিভক্তি— মুই গেচিলুং, মুই দেখিচিনুং।
২. প্রকার বিভক্তি : সাধারণ কাল : 'শূন্য' বিভক্তি— মুই দ্যাখং।
ঘটমান কাল : 'চ/ছ' বিভক্তি— মুই খাচুং, মুই কওয়ার ধরছুং।
পুরাঘটিত কাল : 'ইচ/ইছ/ই' বিভক্তি— মুই খাইচু/খাইছু, মুই খাইনু।
৩. পুরুষ বিভক্তি : ঐতিহ্যগত ভাষাতত্ত্বে পুরুষ তিন প্রকার। যথা— উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষ। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে পুরুষ পাঁচ প্রকার। কিন্তু রাজবংশী ভাষায় ভাষাবিজ্ঞান ভিত্তিক পুরুষ চার প্রকার। পুরুষ ভেদে বিভক্তি বদলে যায়। প্রতিটি ক্রিয়াপদে যুক্ত থাকে পুরুষ বিভক্তি। পুরুষ বিভক্তির রূপভেদ তুলে ধরা যাক কয়েকটি নমুনার মাধ্যমে—

পুরুষ	বর্তমান	বর্তমান অনুজ্ঞা	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	অতীত/ নিত্যবৃত্ত	ভবিষ্যৎ
বক্তা (I) (মুই)	-অং	—	—	-উং	-ইম
শ্রোতা সাধারণ (II) (তুই)	-অ	-এক্	-উ/-ইস	-উ	-উ/-ইস
ভিন্ন পুরুষ (III) (তাঁয়)	-এ	-অক্	-এক্	-ও	-এক্
সম্মানবাচক (H) (তোমরা)	-এন	-অন	-এন	-এন	-এন

যে সব বিশেষণ ও সম্বন্ধ পদ উদ্দেশের পূর্বে বসে তার অর্থকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট বা বিশেষিত করে সে পদগুলি হল উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক (Adjuncts toSubject-Word)ঠিক একই রকমভাবে, বিধেয়ের অর্থকে বিশেষভাবে বিশেষিত করার জন্য ক্রিয়ার যে বিশেষণ ইত্যাদি থাকে সেগুলি হল বিধেয়ের সম্প্রসারক (Adjuncts to Predicate-Verb)। কামরূপী

বা রাজবংশী ভাষায় বিশেষণ, বিশেষ্য, বিশেষণের বিশেষণ, অসমাপিকা ক্রিয়া ও সম্বন্ধ পদ উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক হিসেবে বসে। উদাহরণ—

ক. ঢাংগা কালা কুচকুচা চ্যাংরাটা গাড়ী চালের ধরিছে।

খ. এইবার মাধ্যমিকত পথম হওয়া ছাত্রটা ঢেইল্লা নাম্বর পাইছে।

বিধেয়ের সম্প্রসারকের ক্ষেত্রে বিশেষ্য, বিশেষণ, অসমাপিকা ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদ বসে। উদাহরণ—

ক. ভইসটা ফোৎ ফোৎ করিয়া ঘাস খাবার ধইচে।

খ. মোর গালার চন্দ্রমালাখান খসিয়া পড়িল।

তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারক না থাকলেও বাক্যের অর্থ প্রকাশের অসুবিধা হয় না। কিন্তু কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়ার অর্থকে পূর্ণ করার জন্য দুই-একটি পদ একান্তই আবশ্যক। যাকে বাদ দিলে বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন— 'হামাক ঘটক করি পেঠাইল।' এই বাক্যে 'ঘটক করি' কথাটি বাদ দিলে 'পেঠাইল' ক্রিয়ার অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে। ক্রিয়ার অর্থ পরিস্ফুটকারী এই জাতীয় পদকে বলা হয় বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক (Complement to Predicate-Verb)। কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার বাক্যের দুটি রূপ— ক) গঠন বা অন্বয়গত, খ) অর্থগত। ক) গঠন অনুসারে কামরূপী বা রাজবংশী ভাষায় তিন শ্রেণির বাক্য পাওয়া যায়—সরল বাক্য (Simple Sentence), জটিল বাক্য (Complex Sentence) এবং যৌগিক বাক্য (Compound Sentence)।

১. সরল বাক্য (Simple Sentence) : যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন—

মুই ভাত খাওঁ। (জলপাইগুড়ি)

মুই ভাত খাং। (কোচবিহার)

উমায় ভাত খাছোঁ। (উত্তর দিনাজপুর)

কর্তা ছাড়া সরল বাক্য : উদাহরণ—

টক্করি ভাত খা। (কোচবিহার)

পস করি খ্যায়া নে। (জলপাইগুড়ি)

অসমাপিকা যুক্ত সরল বাক্য :

অয় হাটিযায়া হাঠত্ উল্টি পইছে। (কোচবিহার)

জাবুরা-ঘুসুরা দিয়া নোক্টাক ছুবিয়া মারিল। (আলিপুরদুয়ার)

চ্যাংরালা এমন হইচে বুড়া মানষিক্ দামে না দেয়। (জলপাইগুড়ি)

২. জটিল বাক্য (Complex Sentence) : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য (Principal Clause) এবং একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য (Subordinate Clause) থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে। দুই বাক্যের সংযোগ করার ক্ষেত্রে কামরূপী বা রাজবংশী ভাষায়— যেইঠে-সেইঠে/যেইটে-সেইটে, জ্যালায়-স্যালায়, যেইটা-সেইটা, যেই-সেই, যাক্-তাক্, যেমন-ত্যামন প্রভৃতি সংযোগমূলক ও সাপেক্ষবাচক সর্বনামের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। জটিল বাক্যের উদাহরণ :

যেইটে-সেইটে :

১. তমা মোক যেইটে যাবার কইবেন মুই সেইটে যাইম। (কোচবিহার)

২. অয় যেইটে বিয়ার বাড়ি দেখবে সেইটে ওর যাওয়ায় খাইবে। (আলিপুরদুয়ার)

জ্যালায়-স্যালায়/ জ্যালা-স্যালা :
১. জ্যালায় ডাকাবেন, মুই স্যালায় আসিম।
২. জ্যালা তুই যাবু, মুইও স্যালায় যাইম।
যাক্-তাক্ :
১. যাক্ দিয়া কাম হইবে, তাক্ ধরি আয়।
২. যাক্ ধান দিছিলু, তাক্ ক বিচোন ধান দে।
যেমন-ত্যামন :
১. উয়ায় যেমন হামাক ত্যামন বুদ্ধি করি চলা নাগিবে।
২. অয় যেমন করি কয় হামা ত্যামন করি চলির পামো না।

যৌগিক বাক্য : যে বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া (উক্ত বা উহ্য) থাকে এবং একাধিক স্বাধীন বাক্য সমুচ্চয়ী বা সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়, তাকে যৌগিক বাক্য (Compound Sentence) বলে। যৌগিক বাক্যে রাজবংশী ভাষায় সংযোজক অব্যয়— 'আর' প্রভৃতি। বিয়োজক অব্যয়—'না-হইলে' প্রভৃতি। সংকোচক অব্যয়— 'তাও', 'কিন্তুক', 'ফের' প্রভৃতি অব্যয়ের ব্যবহার ঘটে। এছাড়াও রাজবংশী ভাষায় লিখিত সাহিত্যে কমা, ড্যাশ ও সেমিকোলন চিহ্ন দিয়েও যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। উদাহরণ :

আর : মালতি শিমলা ফুলের আভুল হওয়া বাগান দ্যাখছে আর বুকখান ফাটি যাচ্ছে।
তাও : মইষার টেকা-পাইসার কোনোই অভাব নাই তাও হামা গরিব বিলি খোজটায় না নেয়।
কিন্তুক : ভইষ চরাং মুই সাঞ্জে সকালে তিস্তা নদীর ধারে কিন্তুক কইন্যার দেখা না পাং রে।
ফের : যা হবার হইছে ফের ওল্লা কাথা না কন।
না-হইলে : অয় মোক মেল্লা কাথা কোইচে নাহইলে তোক যাওয়ার দেং।

খ) অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ : মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে, চিন্তা-চেতনায়, জিজ্ঞাসা-কৌতূহলে, আনন্দ-বিষাদে, সম্মতিজ্ঞাপন কিংবা অনিচ্ছা প্রকাশে কামরূপী বা রাজবংশী ভাষা জীবন্ত ও প্রাণময়। পরস্পর ভাব বিনিময়ে অর্থগত বা ভাবানুসারে রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। বৈচিত্র্যময় শ্রেণিগুলি হল—১) নির্দেশক বাক্য (Assertive Sentence), ২) প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentence), ৩) আদেশ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (Imperative Sentence), ৪) ইচ্ছাবোধক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য (Optative Sentence) ৫) বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory Sentence), প্রভৃতি। বাক্যগুলির আলোচনা করা যাক—

১) নির্দেশক বাক্য (Assertive Sentence) : যে বাক্যের মধ্য দিয়ে কোনো বক্তব্য বা বিষয়কে সাধারণ ভাবে নির্দেশ বা বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে নির্দেশক বাক্য বলে। যেমন— বাঘারু কাম করছে। ধুনিয়া বিচোন তোলে। জলঢাকার চড়খানত খোরমুজা হয় প্রভৃতি। নির্দেশক বাক্য দুই প্রকার। যথা—

অ) সদর্থক নির্দেশক বাক্য : বাঘারু ভাত খায়। ছাওয়াটা ধুম ধুম করি নাচির ধরছে। খকরা ভাতলার গোন্দ বেড়াইছে। ফুলতি দেবী মেলা বিষহরী গান করিছে প্রভৃতি।

আ) নঞর্থক নির্দেশক বাক্য : রাজবংশী ভাষায় 'না' বাচক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়া পূর্বে বসে। যেমন— মুই আজি ইস্কুল না যাইম। হামারলার কাজোত তমাক্ না নাগে। মুই না খাইম। নাই ফাউকসালি কথা প্রভৃতি। তবে ব্যতিক্রমও ঘটে নই/নঙ/নাই-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে। যেমন—

মুই কাম করিবার যাবার নঙ। হামরা কাজিয়া-কেচালত যাবার নই। ডেকাহাকা করিবার তো কাহ নাই প্রভৃতি।

২) প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentence) : কোনো কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় যে বাক্যের দ্বারা তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। রাজবংশী ভাষায় প্রশ্নসূচক অব্যয় ও সর্বনাম হিসেবে কি, কী, ক্যানে, কায়, কোঠে/কোষ্ঠে, কোন্-ব্যালা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুই কি যাবু?

তোম্‌হা কী কবার চান?

তুই ক্যানে বই পড়ির না যাইস?

বাংলা ভাষার মতো হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন ও বিষয়গত প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রশ্নবোধক বাক্য দু-রকমের হয়। যথা— ক) হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন : তুই কি ভাত খাবু?

খ) বিষয়গত প্রশ্ন : তুই কী খাবু?

এই দু-রকমের বাক্য আবার সদর্থক ও নঞর্থক হয়। যথা—

ক) সদর্থক প্রশ্নবাক্য : তুই কি যাবু?

খ) নঞর্থক প্রশ্ন বাক্য : তুই কি না যাবু?

৩) আদেশ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (Imperative Sentence) : যে বাক্যে অনুজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায় তাকে আদেশ বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। রাজবংশী ভাষায় অনুজ্ঞাবাচক বাক্য—

এলায় ইসকুল যা। (আদেশ), ভাল করি কামাই কর। (উপদেশ), দ্যাওয়ানী ধান দিয়া হামার ঠ্যাকা সারেন! (অনুরোধ), ঝগড়া নাগে দিয়ার জন্যি হামার বাড়িত না আইসেন। (নিষেধ) প্রভৃতি। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য মূলত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের হয়ে থাকে। এই শ্রেণির বাক্য ইতিবাচক ও নেতিবাচকও হয়ে থাকে।

৪) ইচ্ছাবোধক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য (Optative Sentence) : যে বাক্যে মধ্য দিয়ে প্রার্থনা বা ইচ্ছার মনোভাব ব্যক্ত হয় তাকে ইচ্ছাবোধক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। গঠনগত দিক থেকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের মতো হলেও ভাবের সুরটি ভিন্ন। উদাহরণ : ভগবান যেন তোর ভাল করে। তমরালা সগায় ভাল থাকেন। মনটা কয় বাঁচি না থাকং প্রভৃতি।

৫) বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory Sentence) :

যে বাক্যে বিস্ময়, আনন্দ, বেদনা-দুঃখ, ঘৃণা ও ক্রোধ প্রভৃতি মনের আবেগ প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। তবে এই শ্রেণির বাক্যের নামকরণ 'আবেগসূচক' বেশি যুক্তিযুক্তি। কেন না শুধু বিস্ময় নয়, মনন-চিন্তনের বহুবিধ আবেগ প্রকাশিত হয় এই শ্রেণির বাক্যে। যেমন—

ঘটকের কাথা শুনিয়া চ্যাংরার মন উথুলি উঠছে।(আনন্দ)

বাপরে বাপ! কী ধান হইছে। (বিস্ময়)

হ্যায়রে হ্যায়! মোর সব শ্যাস। (দুঃখ)

ছি ছি! ওই ঢক মানষি মোর না নাগে। (ঘৃণা)

হারাম জাদা! আলসামি করলে সংসার চলবে। (ক্রোধ)

সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ (Transformational-GenerativeGrammar)-এ বলা হয় প্রত্যেক গতিশীল ও প্রাণবন্ত ভাষার ক্ষেত্রে সংবর্তন (Transformation) ঘটে। ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী সংবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন— 'ধারণার মধ্যে যে নিয়ম-কানুন আছে কথা বলার সময় সেই নিয়ম-

কানুন অনুসরণ করেই কথা বলে থাকি বটে, কিন্তু হুবহু তাই বলি না। বলার সময় একটু অদল-বদল ঘটে। সেই পরিবর্তনকেই সঞ্জননী ব্যাকরণের পরিভাষায় বলে সংবর্তন (Transformation)।'[২] কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রেও বাক্য গঠনে সংবর্তন ক্রিয়াশীল। সংবর্তনের মাধ্যমে বাক্য অধোগঠন থেকে অধিগঠনে উপনীত হয়। অধোগঠন হল বাক্যের প্রাথমিক গঠন, আর অধিগঠন হল বাক্যের চূড়ান্ত গঠন। সংবর্তনের মধ্য দিয়ে অধোগঠন থেকে অধিগঠনে উপনীত হবার গতি পথে বাক্যের ধ্বনিগত, আন্বয়িক ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটে। রাজবংশী ভাষার বাক্যে গঠনে সংবর্তন কীভাবে ক্রিয়াশীল তা বিশ্লেষণ করা যাক। সংবর্তনের প্রক্রিয়া দুই ভাবে সম্পন্ন হয়। ক) আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক সংবর্তন (Obligatory), খ) ইচ্ছামূলক বা স্বাধীন সংবর্তন (Optional)।আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক সংবর্তনের মাধ্যমে ভাষার বাক্য গঠনের প্রাথমিক আন্বয়িক গঠনের শর্ত পাওয়া যায়।রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে বাক্যের আন্বয়িক গঠন বাংলা ভাষার মতো কর্তা (S) + কর্ম (O) + ক্রিয়া (V) রীতির অনুসারী। এই গঠনরীতি অনুসারে রাজবংশী ভাষার আবশ্যিক সংবর্তন নির্দিষ্ট। যেমন—'মুই বই পড়ং'।

খ) ইচ্ছামূলক বা স্বাধীন সংবর্তন : বক্তার ইচ্ছা অনুসারে বাক্যগঠনের হের-ফের ঘটে। বক্তা তার প্রয়োজন অনুযায়ী বাক্যের মধ্যে পদ বা শব্দ বা শব্দ-সমষ্টির সংযোজন, বিলোপন, রূপান্তর ও বিপর্যাস ঘটিয়ে নতুন বাক্য গঠন করতে পারে। রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে না। সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুযায়ী ইচ্ছামূলক সংবর্তন ঘটে থাকে চার ভাবে। যথা—সংযোজন, বিলোপন, রূপান্তর, বিপর্যাস। রাজবংশী ভাষার বাক্যে নানা প্রকার আন্বয়িক সংবর্তন ঘটে থাকে। বিশেষ কয়েকটি সংবর্তন আলোচনা করা যাক—

১) সংযোজন : আমরা প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে দেখিয়েছি রাজবংশী ভাষায় সংযোজক হিসেবে 'আর'-এর ব্যবহার। বাংলা বাক্যের সংযোজক 'এবং'-এর ব্যবহার রাজবংশী বাক্যে ঘটে না। তবে আশ্রয়ধর্মী বাক্যে 'যে' 'না', সম্বোধনবাচক 'বাহে', 'রে' প্রভৃতি সংযোজক হিসেবে ব্যবহার হয়। যেমন—

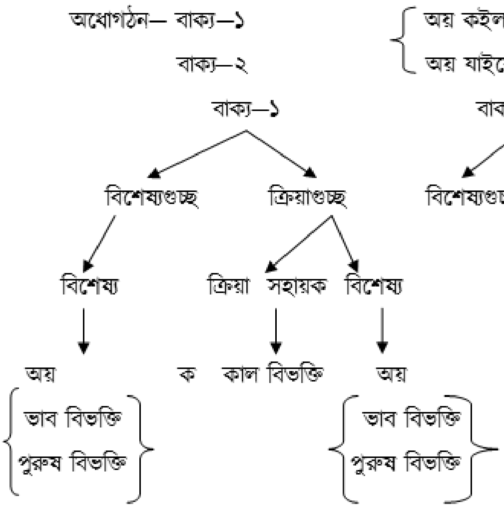

‘যে’ সংযোজক ⟶ বাক্য-১ + যে + বাক্য-২
অধিগঠন ⟶ অয় কইল যে অয় যাইবে।
‘না’ সংযোজক ⟶ দেখি আয় না।
‘বাহে’ সংযোজক ⟶ কোঠে যান বাহে?
‘রে’ সংযোজক ⟶ ক্যামন আছিস রে?

বিশেষ্যগুচ্ছের পূর্বে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অসমাপিকা ক্রিয়ার সংযোজন লক্ষ করা যায়। যেমন— ঢুপ্‌পুস করি গছ থাকি পোইল। মাট্‌টাউ করি কমরটা ভাঙিল। টনটন করি উঠিল মোর মনটা। ঝলঝল করি খ্যাত বাড়িখান পড়ি আছে। প্রভৃতি। এভাবেই বাক্য সংযোগ, আশ্রয়ধর্মী বাক্য ও প্রতিনির্দেশক সংযোজন ঘটে রাজবংশী বাক্যে।

২) বিলোপন : রাজবংশী ভাষায় বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তনে সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ, সমধর্মী ক্রিয়াগুচ্ছ, স্থিতিক্রিয়া ও অন্‌-আলোকিত উপাদানের বিলোপন ঘটে। যেমন—

সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছের বিলোপন : বাক্য—১ { অয় হাঠত যাইবে }
বাক্য—২ { অয় ধান নিবে }

সংবর্তন : সমাপিকা ক্রিয়া > অসমাপিকা ক্রিয়া
সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছের বিলোপন

বাক্য ⟶ অয় হাঠত যায়া ধান নিবে।

সমধর্মী ক্রিয়াগুচ্ছের বিলোপন : বাক্য—১ রাম ধান কাঠে
বাক্য—২ রহিম ধান কাঠে

সংবর্তন : সমধর্মী ক্রিয়াগুচ্ছের বিলোপন, সংযোগমূলক অব্যয়, সমাপিকা ক্রিয়া > অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর এবং সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ঘটে।

বাক্য ⟶ রাম আর রহিম ধান কাঠির নাগিছে।

৩) স্থিতিক্রিয়ার বিলোপন : যেমন— তার আগত সাপ আছে > আগত সাপ।

৪) অন্‌-আলোকিত উপাদানের বিলোপন : যেমন— প্রশ্ন : কোঠে যাস?
উত্তর : বাড়িত (মুই বাড়িত যাং)

অন্‌-আলোকিত উপাদান ‘মুই’, ‘যাং’ এর বিলোপন ঘটে।

৩) বিশেষ্যীভবন : যে সংবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বাক্য বিশেষ্যগুচ্ছে পরিণত হয় তাকে বলা হয় বিশেষ্যীভবন। এই জাতীয় সংবর্তনে ক্রিয়া পরিণত হয় ক্রিয়াবিশেষ্যে। বিশেষ্যগুচ্ছ ও ক্রিয়াগুচ্ছের বিশেষ্যীভবনে রাজবংশী ভাষায় বাক্যে সর্বনামের পরিবর্তন ঘটে এবং ক্রিয়াগুচ্ছে আ/ওয়া যুক্ত হয়। তখন তাতে বিশেষ্য পদের বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। লোপ পায় বিভক্তিগুলি। বিভিন্ন প্রকার বিশেষ্যীভবন হয়। যথা—

বাক্য—১ অয় কয় নাই
বাক্য—২ হামরা যামো না } ⟶ উয়ায় না কওয়ায় হামরা যামো না।

বাক্য—১ মুই বাড়িত যাং
বাক্য—২ আর হইল না } ⟶ বাড়িত যাওয়া মোর আর হইল না।

বাক্য—১ অয় কান্দির ধরিল
বাক্য—২ সগায় বসি বসি দ্যাখে
} উয়ার কান্দন ধরা সগায় বসি বসি দ্যাখে।
→

বিশেষ্যীভবনের সংযোজন, বিলোপন ও রূপান্তরের মাধ্যমে রাজবংশী ভাষায় বাক্যের গঠন ও রূপান্তর ঘটে থাকে।

সর্বনামীভবন : দুটি বাক্যে বিশেষ্য বা বিশেষ্যগুচ্ছ একটি বাক্য সংবর্তনের সময় দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ্যটি সর্বনামে রূপান্তর হয়। সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সর্বনামীভবন। রাজবংশী ভাষার বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও সর্বনামীভবন ঘটে থাকে। যেমন—

অধোগঠন অধিগঠন

বাক্য—১ মংলু ধান কাঠিছেসংবর্তন সর্বনামীভবন

মংলু ধান কাঠিছে আর উয়ায় মাছও মারিছে।
→

বাক্য—২ মংলুমাছও মারছে সংযোগধর্মী বাক্য

বাক্য—১ মন্টু মাটত আসবে সর্বনামীভবন

মন্টু মাটত আসিয়া খ্যালাইবে।
→

বাক্য—২ মন্টু খ্যালাইবে আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংবর্তন, সংযোগমূলক বাক্য

সর্বনামের বিলোপন

বাক্য সংযুক্তির আলোচনা থেকে স্পষ্ট, ক্রমবিন্যাসে বাংলা ও কামরূপী বা রাজবংশীর বাক্য গঠন এক। কিন্তু রাজবংশী ভাষায় বহু শব্দ ও শব্দ-সমষ্টি বাংলা ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। যে পদ-সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় বাক্য। সংখ্যার দিক থেকে বাংলা বাক্যের সেই পদের সংখ্যার সঙ্গে কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার বিশেষ তফাৎ না থাকলেও রয়েছে শব্দ-বিভক্ত, ক্রিয়া-বিভক্তি ও প্রকার বিভক্তি ব্যবহারে বিস্তর ব্যবধান। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়-এর বহু সংযোজন-বিয়োজন এবং অবস্থানগত ভিন্নতাও নির্দিষ্ট। একাধিক স্বাতন্ত্র্যসূচক সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার বাক্যকে করে তুলেছে নিজস্ব ধ্বনিঝংকার সমন্বিত ও অর্থবহ।

তথ্যসূত্র:

১. শ, ড. রামেশ্বর, ১৯৯৬, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৮০৫।
২. চক্রাবর্তী, ড. উদয়কুমার, ২০১৬, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', কলকাতা, দে'জ, পৃ. ১৯ ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার, ২০০৩, 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', কলকাতা, রূপা।
২. দাশ, ড. নির্মল দাশ, ২০২০, 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ', কলকাতা, সাহিত্যবিহার।
৩. বর্মা, দেবেন্দ্রনাথ, ২০১২, 'রাজবংশী ভাষার ইতিহাস', কলকাতা, সোপান।
৪. বর্মা, ধর্মনারায়ণ, ১৪০৭, 'কামতাপুরী ভাষা-সাহিত্যের রূপরেখা', তুফানগঞ্জ, রায়ডাক প্রকাশন।
৫. বর্মণ, উপেন্দ্রনাথ, ১৩৮৮, 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস', জলপাইগুড়ি।
৬. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র, ২০০৯, 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়', কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী।
৭. রায়, গিরিজাশঙ্কর, 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য', প্রথমপর্ব, আলিপুরদুয়ার, উত্তরবঙ্গ প্রকাশন।
৮. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ১৯৬৫, ' বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
৯. সিদ্দিকী, ড. আবদুর রহমান, ২০০৯, 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড', ঢাকা।
১০. সান্যাল, চারুচন্দ্র, ২০১৭, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী' (অনুবাদ, তৃপ্তি সান্ত্রা), কলকাতা, আনন্দ।

প্রেমের এক আকুন্ঠ জিজ্ঞাসায় ‘গঙ্গা’ উপন্যাস

মিঠুন পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: প্রেম হল মানুষের এক আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি। জীবের সৃষ্টির শুরুর প্রাক্কালে এর সূচনা হয়েছিল। আজও মানুষ এই বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সাহিত্য চর্চাতেও এর প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। সমরেশ বসু তাঁর গঙ্গা উপন্যাসে এই জৈবিক রীতি তথা প্রণয় রীতির নানা প্রসঙ্গ ব্যাক্ষা করেছেন। তিনি গঙ্গা উপন্যাসে প্রেমের নানা দৃশ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাস ও হিমির অখণ্ড প্রেম পরিনতি দেখিয়েছেন। নানান ঘাত প্রতিঘাত এর মধ্য দিয়ে তাদের প্রেম সার্থক হলেও শেষ পরিণতি অবশ্য করুনাদায়ক তথা বিরহে পরিণত হতে দেখা গেছে। তাই গঙ্গা উপন্যাসে প্রেমের এক আকুন্ঠ জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে।

সূচক শব্দ: প্রণয়, মনোহর, কাহিল, পেত্থম, সোমসার, আমন্ত্রন, জোয়ান কোটাল, ভরা কোটাল।

মূল আলোচনা:

নর নারীর প্রেম হল জৈবিক প্রবৃত্তির একটা আদীম রূপ। একটা চীরন্তন প্রথা। যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ফ্রয়েডিও মনস্তত্ত্বে ও আমরা এই জৈবিক প্রবৃতি সম্পর্কে জানতে পারি। আড়াই অক্ষরের শব্দ ‘প্রেম’। এই প্রেম হল জীবদেহের হৃদয়ের এক অনুভূতি। আর এই অনুভূতি ও অনুভবের দ্বারাই গোটা বিশ্ব ছন্দময়। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এক সুত্রে গ্রথিত এই প্রেমের অবান্তর কারণেই। এই আড়াই অক্ষরের জাদুতেই সারা ব্রক্ষান্ড চলতে। মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস, একে অপরের প্রতি আস্থা রেখে আজও দুনিয়াতে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। মানুষের কথা ছাড়ো দেবতারাও এই প্রেমের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এর প্রমান আমরা পেয়ে থাকি বৈদিক যুগ, প্রাচীন যুগের সাহিত্য গুলি থেকে। ‘সমরেশ বসু’ তাঁর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের সাজাভাটা ও গঙ্গা পূজা উৎসবে অনুষ্ঠিত যাত্রাপালা গান ‘শান্তনু ও গঙ্গা’-তে এক দৃশ্যে দেখিয়েছেন রাজা শান্তনু ও দেবী গঙ্গার প্রনয় নিবেদনের দৃশ্য -

> **“এলানো চুল সুন্দরী যুবতীকে নদীর পাড়ে দেখে, পদ্মগন্ধে পাগল রাজা শান্তনু তার পিছনে পিছনে যায়। বলে কে তুমি পদ্মগন্ধা, সুলোচনা, অতি মনোহরা দেবী প্রতিমা হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু তোমার পানি ভিক্ষা করে”।**

- (গঙ্গা -৩১৯)

এই রকম অনেক প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্র মিলবে রামায়ণ, মহাভারতের মতো মহাকাব্যের মধ্যে। যার তুলনা জগতে মেলা ভার। সত্যই তুমি যদি ভাবুক হৃদয়ে ঊষা কালের সূর্য উদয় দেখো তাহলে তৎক্ষনাৎ তোমার হৃদয়-মন এক নব উৎফুল্লে ভরে উঠবে। তখন সূর্য আর সূর্য থাকবে না। হয়ে উঠবে এক লাল টুকটুকে সদ্য ফোটা তাজা গোলাপ। যা ভোরের শিশিরে সিক্ত। তখন তুমি ওটা রেখে দেবে যত্ন করে, তোমার প্রেমিকাকে ভেলেনটাইন ডে জানানোর জন্য। যদি তুমি প্রকৃতি প্রেমি হও তাহলে তো কোনো কথাই নেই। ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের বিলাল মাঝি তার প্রেমিকা

হিমিকে পেয়েছিল এই প্রকৃতির অন্তরালেই। লেখক তাই প্রকৃতির সঙ্গে বিলাসের অনুরাগের ভাবকে মিলিয়ে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন-

"শরীর খানি আকুল হয়নি কুলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলেই ভাসবে অকুল পাথারে"।

- (গঙ্গা-২৫২)

বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই প্রনয় ভাব ধরা পড়েছে বিশ্বজনীন রূপে। আর তাইতো বর্ষার কালো মেঘ দেখে রাধার মনে পড়া শ্যামের রূপ। সমুদ্রের নীল জল জেল শ্যামেরই তনু খানি। এই ভাবেই ভাবিত হয়ে আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিকরা সৃষ্টি করেন প্রেমের এক অব্যাক্ত মায়া জাল। আর তাইতো এই প্রেম নামক অডুবরের বসে পড়ে আমরা দেখেছি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে আর পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ। এর কারন হল আড়াই অক্ষরের 'প্রেম' নামক অনুভব ও অনুভূতি। তুমি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই সাহিত্যের থিয়রি তোমার বোধগম্যের বাইরে। তুমি বলবে এটা একটা মহাজাগতিক সিস্টেম, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, মধ্যাকর্ষন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলবো- এরই নাম প্রেম। তোমার ঐ মহাজাগতিক সিস্টেম-ই হল আমার হৃদয়ে বসবাস কারি অদৃশ্য অপার প্রেম, মা তোমার ল্যাব্রোটারিতে নেই। রাত ও দিন পরস্পর গভীর প্রণয়াসক্ত। তাই রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাত আসে। এটা একটা প্রনয়ের আত্মিক টান। আর এই টানেই জন্ম হয় প্রেম। যা তুমি তোমার থিয়রিতে খুঁজে পাবে না। একজন গনিত্বভোর সুত্র অনুসারী দুই আর দুই যোগ করে চার হয়। কিন্তু সাহিত্যিক দুই আর দুই মিলিয়ে সারা জগৎ সৃষ্টি করে, তখন দুই ছাড়িয়ে হয়ে গেল অসংখ্য। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সাহিত্যের প্রতি আস্থা রেখে প্রেমকে গ্রহন করতে হয়। যদিও আধুনিক দিনে বিজ্ঞান ছাড়া আমরা এক পা ও নড়তে পাড়ি না। তবুও প্রনয় ভাবে ভাবিত হয়ে বলা যায় যে, আকাশ ধরতি কে ভালোবাসে তাই বৃষ্টির ধারা সিক্ত করে সবুজ ধরতীকে। ফুল ফোটে প্রকৃতির টানে, বসন্তকে ভালোবেসে কোকিলের কণ্ঠে নব সুরের আগমন, আবার সমুদ্রের টানে ছুটে চলে পাহাড়ি নদী, মাঝ সাগরের পর্বত প্রমান তোলপাড় করা ঢেউ সমুদ্র সৈকতে এসে শান্ত ভাবে আলিশ ছাড়ে। শুধু এতেই ক্ষান্ত নয় প্রেম। মনের মানুষকে কাছে না পেলে অশান্ত মনে বলে ওঠে-

"মনডায় অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা, ভাইবা কাহিল হইছি"।

(পদ্মানদীর মাঝি -১০২)

একটা ফুল গাছের ডালে মৃদু হাওয়ায় দুলছে আর তার সৌরভ ও রঙের ছটায় পাগল করছে মানুষের মনকে প্রজাপতি তার যৌলুসের সাথি। প্রকৃতির সোভা ও প্রেম দুটোই বাড়ে। সাহিত্যিক তার মায়াজালে বন্দি করে খাতার পাতায়, কালো কালো অক্ষরে। সৃষ্টি হয় এক প্রনয় কাব্য। কিন্তু বিজ্ঞানের গবেষনাগারে। এর পরিনতি হয় ভয়ানক। ধারালো অস্ত্রের কোপে তার প্রান যায়। তারপর অনুবিক্ষন যন্ত্রের ফলকে আলাদা হয় -বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশর চক্র গর্ভকেশর চক্র। শেষ হয় রূপ-রস-গন্ধ। প্রজাপতিটা এর কোনো হদিস পায় না। তবে এরও প্রয়োজন আছে, নয়তো মানুষ আজও আদিম ও বন্য থাকতো। তবুও একথা চীর সত্য যে-সত্য মেব জয়তে। প্রেম হল সবার উপরে। এর মান কোনোদিন ও ক্ষুন্য হবে না। আমরা যদি প্রেমকে বুঝতে সক্ষম হই তবে মানুষের গন্ডি পেরিয়ে ভগবান রূপে গন্য হবো, এতে কোনো শঙ্কা বা সন্দেহ নেই। ভালোবেসে কানাই কে কানা বললেও তা প্রেমেরই বহিঃ প্রকাশ।

"সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের নায়িকা হিমি বিলাসকে ঢপ বলে ডাকতো, আর বিলাস তাকে মহারানী বলতো।

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, কাব্য কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রভৃতি বিভাগে নানা স্বাদের প্রনয় ভাব ধরা পড়েছে। কোথাও বৈধ ও কোথাও অবৈধ। তবে একজন সাহিত্যিকের কাছে প্রেম কোনো দিনই, কোনো প্রেম অবৈধ নয়। প্রেম-প্রেমই, তা বৈধ হোক আর অবৈধ-ই হোক। দুটি মনের নিশ্ছল মিলনই হল এখানে সর্বেসর্বা। তোমার মনের মনি কোঠরে কাউকে তুমি স্থান দিয়েছ অথবা কেউ তোমাকে গ্রহণ করেছে মনে প্রানে এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। ঠিক একই ভাবে 'সমরেশ বসুর'- 'গঙ্গা' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে প্রেমের এক অব্যাক্ত ভাবনা রূপে। যা পাঠকের মনকে ভারিয়ে তোলে। গঙ্গা উপন্যাসের মূল চরিত্রের আঙিনায় দেখা গেছে বিলাস ও হিমিকে। এছাড়াও আছে অন্যান্ন পার্শ্বচরিত্র। বিলাস নিবারন মাঝির ছেলে আর হিমি হল পদ্মার ছোটো মাছ ব্যবসায়ী দামিনী বুড়ির নাতনি। পিতৃ-মাতৃ হীনা হিমি এখন নিজে 'গঙ্গা' মাছ-মারাদের সঙ্গে সওদা করে। তার স্বচ্ছল জীবন। এই স্বচ্ছল, বাধাহীন জীবনে হঠাৎ-ই বিলাস এসে পড়ে। এদিকে পিতার মৃত্যুর পর বিলাস নিজে নৌকার হাল ধরেছে। সে এখন পাকা মেছেল। কাকা পাঁচুর সঙ্গে গঙ্গায় মাছ ধরতে যায়। একদিন দুর গাঙে মাছ ধরতে এসে বিলাসের মন খুঁজে পেয়েছিল তার মনের মানুষকে। হিমি ও বিলাসের প্রেম ছিল মুক্ত মনের বৃহৎ প্রয়ন চিত্র। যা উপন্যাসের কাহিনীর মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে এবং উপন্যাসের কায়াকে স্বজীব করে তুলেছে।

এতোদিন বিলাসের জীবন ছিল উদ্ধত, লাগামহীন ঘোড়ার মতো। তাই তার এই উত্তাল যৌবনের তরীর হাল ধরতে এগিয়ে এসেছিল দামিনীর নাতনি হিমি। দামিনীর সঙ্গে হিমি প্রথম দিনে মাছ কিনতে এসেছিল বিলাসের নৌকায়। বিলাসকে। দেখে হিমি সেই দিনই তার হৃদয় মন্দিরে স্থান পাকা করে নিয়েছিল। গঙ্গার ঘাটে মা গঙ্গাকে সাক্ষি রেখে পতি রূপে বরন করেছিল হিমি। সেই সঙ্গে প্রেমের ক্ষীন প্রদীপ শিখা উসকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বিলাসের মনে। পরবর্তী কালে এই ক্ষীন শিখা আতম বাজী হয়ে চারিদিক আলোকিত করেছিল।

বাইশ চব্বিশ বছরের ভরা যুবতী হিমি খোলা চুলে সাদা রঙের ফুলের ছাপ দেওয়া একটা শাড়ি পড়ে হিমি নেমে এল পাহাড়ের উপর থেকে, ঠিক দেখে মনে হয় গাঢ় নীল পাহাড়ি ঝরনা। শাড়ির বাহার দেখে মনে হয় সোনার মতো সোনার ঘড়কে মাছ চিটিয়ে এসেছে। গায়ের রং শ্যাম বর্ণ। চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির। ছিপছিপে গড়নে সারা শরীরে সোনার গহনায় ভরা। মাথায় সিঁদুর নেই। মাতৃত্ব অর্জন এখন ও হয়নি। ঠোঁট দুটি রসালো ফাটা ফাটা। হাসলে সারা শরীরে ঢেউ খেলে ওঠে। হিমির এই উচ্ছ্বলতা, বিলাস হাবাগোবা ছেলের মতো এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এটা ছিল বিলাসের প্রথম দেখার অনুরাগ। বিলাসের এই নিরস মনে প্রেমের শিতল ধরা বর্ষন করে সিক্ত করে দিয়েছিল হিমি। খানিক পরে হিমি শরীর দুলিয়ে চোখে মুখে হাসির ঝলক তুলে বিলাসের মনকে অনুরাগে ভরিয়ে তুলে চলে গেছে এবং যাবার সময় বিলাসের মনটাকেও সে চুবড়িতে ভরে নিয়ে যায় মাছের সঙ্গে। শুধু তাই নয় অনুরাগ বসত প্রথম দিনের বোগনির মাছের দাম একটু বেশি দিতে চেয়েছে।

> **"পেন্থম দিনকার দিন কম দিবি কেন দিমা। এগারো সিকে করে দে। টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি"।**

- (গঙ্গা-২৫৩)

হিমির এই উদারতা বিলাসের প্রেমের অনুরাগের এক বহিঃ প্রকাশ মাত্র। এই অনুরাগের ছোঁয়াই দিদিমার আড়াই টাকার সঙ্গে আরও পঁচিশ পয়সা যোগ করিয়েছে। আর এই দিনের অপেক্ষায় ছিল বিলাস। সে এখন প্রায়সই উদাস মনে নৌকায় বসে গঙ্গাতীরের উঁচু পাড়ে হিমির বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। কাজে তার মন নেই। থেকে থেকে ঘুড়া পাঁচুর বকুনি খায়। তাই তার বুক ফাটে তবু মুক ফোটে না। শিরায় শিরায় পাক ধরে আর কেবলই মনটা আনমনা হয়ে ওঠে। ওদিকে হিমিরও ঠিক একই অবস্থা। তাই ঘরে থাকতে না পেরে নানা বাহানা করে দিদিমার সঙ্গে বারবার এসেছে বিলাসের নৌকায়। নির্লজ্জের মতো শুধু তাকিয়ে, থাকে দুজনে। হিমির চোখ মুখের ভাব যেন সাপুড়ের মন্ত্রের মতো। প্রথম দিনের আলাপে হিমি পাঁচুকে বলেছিল –

> **"খুড়ো তোমার ভাইপো যেন এক ঢপ বাপু"।**

- (গঙ্গা-২৬৭)

বিলাস তার কাকার ভয়ে ভীত। তাই হিমি বিলাসকে গঙ্গার পাড়ে একলা নিয়ে যাওয়ার আছিলায় ঢং করে বলেছে -

> **"কাঁকালে ভার উঠতে পারছিনে। চুপরিটা একটু দিয়ে আসবে ওপরে"?**

- (গঙ্গা-২৫৮)

বিলাসও এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায় না। বিকালের পড়ন্ত সোনালী রোদ আর হিমির মুখের আধো আধো লাজুক হাসি মিলে মিশে একাকার হয়ে উঠেছে। নেংটির মতো এক টুকরো কাপড় হাঁটুর ওপর জড়িয়ে বিলাস কালো পাথরের মতো নিস্তব্ধ নিশ্চুপ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। হিমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুকটা এক হাত চওড়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দেখতে বন মানুষের মতো লাগে। হিমির যাওয়ার পথের দিকে সে চেয়েই থাকে, যতক্ষন তাকে নজর করা যায়। এই ভাবে ধীরে ধীরে তারা মন দেওয়া নেওয়ার সওদা করতে থাকে। বড়ো বিবাগী মন হিমির। সর্বক্ষন যেন সে বিলাসকেই খোঁজে। নাতনির এই কান্ড দেখে দামিনি সাবধান করে বলেছে –

> **"বড় যে সর্বনাশের নেশা। ওলো মরনী সোনার পালঙ্কের চেয়ে, রাজভোগের চেয়ে ও টান যে অনেকবেশি। করেছিস কি রাক্ষুসী"।**

- (গঙ্গা-২৭৬)

অপর দিকে বিলাসের কাজে অমনোযোগী দেখে খুড়া পাঁচু তাকে গালিগালাজ করে বলেছে –

> **"শহরের ফোড়েনির সঙ্গে তুই পিরিত করতে এয়েচিস, শোরের লাতি। শুনি মনে তোমার সুখ নেই বড় জ্বালা মেয়ে মাগছিস রাঁড়ের?"**

- (গঙ্গা-২৬৮)

তারা দুজনে এখন বর্ষার ভয়া নদী। কে কার বারন শোনে। মিলনের নেশায় তারা ছুটে চলেছে মোহনার দিকে। ভরা জোয়ারে ভাটা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এখন তাদের দুজনকে প্রায়সই গঙ্গার বুকে নৌকা বিহারে দেখা যায়। আর শোনা যায় প্রনয় মিশ্রিত বার্তালাপ।

> **"হিমি: নোঙর না করলে কি হয় ঢপ?**
> **বিলাস: ভেসে যাবে । . . . হ্যাঁ বড় আকুল। ডাঙার মানুষের প্রান কাঁদবে সেই আকুলে"।**

- (গঙ্গা-২৭৬)

হিমির যেন কলঙ্ক কিনবার স্বাদ ষোলো আনা। সে লোক লজ্জার ভয়কে তুচ্ছ করে বিলাসের সঙ্গে প্রেমে মন মজিয়েছে। তাই হিমি নির্ভয়ে বিলাসকে তার বাড়িতে আমন্ত্রন জানিয়েছে –

> **"আমার ঘরের তলায় যদি নোঙর করেছ,**
> **দাওয়ায় উঠে সে বসো একদিন"।**

- (গঙ্গা-২৭৭)

মাছমারা বিলাসের গায়ের আঁসটে গন্ধ তার উপর হাতে হাজা ঘা বিড়বিড় করছে পোকা। এসবের কাছে হিমিকে মানায় না। তবুও হিমির বিলাসকে ভালোবাসে। হিমির অবুজ মন তাকে সম্পূর্ণ সমর্পন করেছে। হিমি তার মনের কথা খুলে বলেছে যে –

> **"আমার একলা থাকার সাহস হারিয়ে গেছে। ঢপ তুমি মাছ মেরে খাও, আমি খাব বেচে। কিন্তু একি করলে তুমি আমার। আমি যে থাকতে পারি নে।"**

- (গঙ্গা - ২৯৬)

উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় জানা যায় সে হিমির জন্মের ঠিক ঠিকানা নেই। সে সেখানে জন্মগ্রহন করেছে। সেই পরিবেশ ছিল সমাজের নিন্দনীয় দিক। আসলে হিমির মা ছিল দেহব্যবসায়ী। হিমি ছোটো থেকেই দেখেছে ঐ পতিতালয়ের নোংরা দৃশ্য। হিমি স্বচোক্ষে দেখেছে তার মাকে। প্রতিদিন নতুন নতুন পুরুষের আনাগোনা। তার মায়ের মৃত্যুর পর সেও তার জীবনকে করে তুলে ছিল বেপরোয়া। শত বাধা নিষেধের সত্ত্বেও সে তার চঞ্চল মনকে বাঁধতে পারেনি সংসারের বন্ধনে। প্রথম যৌবনে হিমি চুচুড়ার এক বাবুর সঙ্গে চলে গিয়েছিল। ফেরত আসে এক বছর পর। এরপর তার মন বিলাসকে পেতে চেয়েছে। তাই সে নিজমুখে স্বীকার করে বলেছে তার জীবনের চরম সত্যটি

> **"সোমসারে আমি তো পাপ পুন্যি বুঝিনে।**
> **তাহলে আমার পাপের যে ভরাডুবি হবে।"**

- (গঙ্গা-৩১৭)

হিমি এখন বিলাসের সব খবরই রাখে। ভালো-মন্দ বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে দেখা গেছে। হিমি ধৈর্মের বাঁধ অতিক্রম করে বিলাসকে তার ঘরে এনে বসিয়েছে। অন্ধকারে বিলাসের বুকে মাথা রেখে প্রনয় মিত্রিত বাক্যে বলেছে –

> **"আমার যেখানে মন টানে সেখানে যেতে পারিনে, পা বেঁধে দিয়েছ তুমি, বলেছ সময় হলে আসবে। নিজে আর যেতে পারিনে ঘাটে। রাত হলে রোজ বসে থাকি এমনি।"**

- (গঙ্গা-৩০৪)

তাদের প্রেমের এই চরম আনন্দকে প্রকৃতির মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বজনীন করে তুলেছে, তার বর্ণনা ছিল এরূপ -

> **"জোয়ান কোটাল উথলে উঠলো কুলে কুলে। পাড় ভাসল। বিলাসের বুকের অন্ধকারে হারিয়ে গেল হিমি। অন্ধকার আদিগন্ত সমুদ্রের মতো নীলাম্বুধি বিলাস। উজানি মাছের মতো ভেসে বেড়াল হিমি সেই সমুদ্রে।"**

- (গঙ্গা-৩০৪)

পরবর্তী পর্যায়ে বিলাসের কাকা পাঁচুর মৃত্যুর পর হিমি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিলাস ও কাকার মৃত্যু শোক ভুলবার জন্য হিমিকে কাছে টেনে নিয়েছে দ্বিগুন ভাবে। এত দিন

এই খুড়া-ই যেন তার মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে পথও পরিস্কার। বিলাস দেশে ফিরে যেতে চাইলে হিমি বাধা দিয়ে বলেছে –

> **“ভাদুরে পুন্নিমে যদি কাটাচ্ছই, সাঁজার কাটিয়ে যাও ঢপ এখানে। গঙ্গার পুজো হোক তাপরে যাও।... কাতিকে চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রাও ছেঁকে নে যাও”।**

- (গঙ্গা-৩১২)

হিমি-বিলাস এখন এক দেহ এক প্রান হয়ে উঠেছে। বিলাস সমুদ্রে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুললে হিমি ও তার সঙ্গিনী হতে চেয়েছে। সে বিলাসের মহাজন হতে চেয়েছে।

> **“সেই বুকে ভেসে পড়ে বলে হিমি, সমুদ্রের টান লেগেছে আমারও। আমি এখানে থাকবো কেমন করে। . . . ঢপ সমুদ্রের মহাজন হতে মন করে আমার।”**

- (গঙ্গা-৩১২)

সমুদ্র অর্থাৎ অসীম। প্রেম মানুষকে মুক্তিদেয়। এখানে হিমি বিলাসকে পেয়ে সীমা ছাড়িয়ে অসীমে ভাসতে চেয়েছে। বিলাস এই প্রস্তাবের প্রতিউত্তরে বলেছে –

> **“তা তোমার কাছে আমার সব কিছু বন্দক রেখেই তো সাগরে যাব। তুমি আমার সবচেয়ে বড়ো মহাজন।”**

- (গঙ্গা-৩১২)

যাই হোক অবশেষে দীর্ঘ্য প্রতীক্ষার পর তাদের এই প্রনয় বন্ধন বিবাহ বন্ধনে পরিনত হতে চলেছে। বিলাস দামিনীর কাছে তার মনের গোপন কথা ব্যক্ত করেছে। বিলাস রসিকতা করে বলেছে –

> **“মাছ মারার বউ দুধেভাতে থাকবে না। মাছে ভাতে রাখবো।”**

- (গঙ্গা-৩১৫)

বিলাসের মনে আজ বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। চুল, দাড়ি কেটে, ক্ষারে কাছা জামা-ধুটি পড়ে নব সাজে সজ্জিত হয়ে চলেছে হিমির বাড়ি। অপর দিকে হিমি ও মোহিনী বেশ ধারন করেছে। তেল চুকচুকে খোঁপা, পরনে লাল শাড়ি, গলায় চিকচিক করছে সোনার হার। পায়ে আলতা মেখে, কপালে টিপ পরে পথ চেয়ে বসে আছে মনের মানুষের। মিলনের আনন্দের উচ্ছ্বাস বইতে দেখা গেছে তাদের কথপোকথনে।

> **“হিমি: আমার বুকের রক্ত যে সব চলকে চলকে পড়েছে বাইরে সেটা কে দেখবে। বিলাস: রাগ কোরো না। তোমার বুকের রক্ত নয়। তেঁতুলে বিলাসের মনের রং ওটা মহারানী”।**

- (গঙ্গা-৩১৭)

হিমি বিলাসকে জায়িয়েছে যে বিলাস-ই হল তার আকুল সমুদ্র। সেই সমুদ্রে হিমি নিজের ইচ্ছায় ডুব দিয়ে প্রেস রতন ধন খুঁজে নিতে চেয়েছে। তাই সে সুখ দুঃখের খবর রাখে না। হিমি তার অতীত জীবন ভুলে বিলাসকে তার জীবন- সাথি হিসাবে বেছে নিয়েছে। আজ সে ছলনাহীন শুদ্ধ প্রনয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মনের ময়লা ধুয়ে নিতে চেয়েছে। জীবনকে অভিসিক্ত করেছে নতুনের পথে। হিমি তার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ ও গহনা বিলাসকে নির্দিধায় দান করে দিয়েছে। যাতে সে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে। এখানে হিমি প্রেমের পরাকাষ্ঠার প্রমান দিতে চেয়েছে। প্রেমের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলাস হিমিকে বলেছে –

"তোমাকে না হলে আর চলে না। আর আমার সয়না।
কবে নে পালাকে তাই ভাবি।"

- (গঙ্গা-৩১৯)

অবসরে হিমি বিলাসকে সারা কোলকাতা শহর ঘুরিয়েছে। যা একদিন ছিল বিলাসের স্বপ্ন মাত্র। বিলাসও হিমিকে অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। পরবর্তী কালে বিলাস ধর্ম মতে হিমিকে বিবাহ করে দেশে ফিরে যেতে চেয়েছে। বিদায় কালে হিমি নিলাম্বরী শাড়ি পরে সারা গায়ে গহনা জড়িয়ে নব বধু সাজে বিলাসের হাত ধরে এক নতুন জগতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে চলেছে। সেখানে সে বিলাসকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না। এই নতুন পরিবেশ তাকে বরন করে নেবে কিনা এ নিয়ে হিমির মনে কতই না চিন্তা ভাবনা। বুকে ভরসা বেঁধে জলপথে নৌকায় ভাসতে ভাসতে চলেছে হিমি। বিলাসের মন আজ আনন্দে আত্মহারা। নতুন জীবন সঙ্গিনীকে পেয়ে সে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছে।

"সজনী আমারে না ডাক পিছে।
আমাকে ডাক দিয়েছে-মহাসাগরে।"

- (গঙ্গা-৩২৪)

জীবন সাথীকে পেয়ে সীমা ছাড়িয়ে অসীমে বিচরন করতে চেয়েছে। হিমির সব সন্দেহের অবসান করতে বিলাস হিমিকে কথা দিয়েছে যে, সে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তাকে ধর্ম সাক্ষী করে বিবাহ করবে। বিলাস ও হিমির প্রেমের কাহিনী এতদূর পর্যন্ত বেশ সুখের ছিল। হঠাৎ-ই কোথা যেন দুঃখের ঝোড়ো বাতাস হিমির মনকে সন্দেহ ও সংশয়ে ভরিয়ে তুলল। বিলাসের স্বপ্নের ঘরে ভাঙন দেখা দিল। এতক্ষন পর্যন্ত ছিল মিলনান্তক। হঠাৎই হিমির মতের পরিবর্তন দেখা দিল। শুরু হল বিয়গান্তক কাহিনী। তার চঞ্চল হৃদয় বিলাসের সঙ্গে যেতে সায় দিল না। আসলে চলতি সমাজ জীবনের বন্ধন এদের সমাজে নেই। আবার যৌবন থাকতে এদের বৈধব্য নেই। এদের সমাজে মেয়েরা এক পুরুষে সন্তুষ্ট নয়। হিমিদের সমাজের মেয়েরা বিবাহ করে সংসারের সাত পাকের বন্ধনে বাঁধা পড়ে এক ঘেয়েমি জীবন কাটাতে চায় না। তাই অবশেষে প্রেম প্রেম খেলা শেষ করে হিমি বিলাসকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে। এই মর্মান্তিক করুন দৃশ্য দেখে আমাদের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যা সহ্যের বাইরে।
হিমি নিষ্ঠুর ভাবে জানিয়েছে যে –

"এসব রইল। ট্যাকা পয়সা, সোনা-গহনা। তুমি রাখ। .... নীলাম্বুধি বিশাল বিলাসের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল হিমি, ওগো ঢপ আমি যেতে পারবো না তোমার সঙ্গে।"

- (গঙ্গা-৩২৫)

হিমির এই নির্দয় কঠোর বাক্য বিলাসের বুকে যেন শক্তিশেল বিঁধেছে। সে যেন পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে। সরল গঙ্গার মাঝিকে পেয়ে হিমি এতদিন ছলনা করে এসেছে। হিমি বিলাসের কাছে থেকেও খেন বহু যোজন দূরে ছিল, তা বিলাস বুঝতে পারেনি। সারারাত ধরে বিলাসের সঙ্গে একই নৌকায় প্রেম পূর্বক বার্তালাপের পর যে মেয়ে নতুন সংসার পাতার স্বপ্ন দেখিয়েছে বিলাসকে, সেই মেয়েই আবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই মতিভ্রম দেখা গেছে। বিলাস যেন সারারাত স্বপ্ন দেখছিল। হিমি তার সমস্ত টাকা পয়সা, গহনা বিলাসকে দান করে বিদায় নিতে চেয়েছে। কিন্তু নির্লোভ বিলাস হিমির ঐ ধন সম্পত্তি না নিয়ে হিমিকে ফেরত দিয়ে তাকে বিদায় জানিয়েছে। কারন সে ভালোবেসেছিল হিমিকে, তার সম্পত্তিকে নয়। তাই বিলাস দুঃখ-

কে গোপন করে হাসি মুখে হিমিকে বিদায় জানিয়েছে চার দিনের মতো। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি মনে পড়ে তা হল -

> **"যারে আমি ভালো বাসি,**
> **সে কি কভু দূরে যেতে পারে আমা হতে!"**

- (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অর্থাৎ বিলাসের নিষ্পাপ, নিশ্ছল প্রেম ঠিক এইরকমই ইঙ্গিত বহন করে। কারন প্রেম মানুষকে মুক্তি দেয় আর মোহ বেঁধে রাখে। হিমি তাদের সমাজের রীতি অনুসারে প্রেমকে প্রত্যাক্ষান করলেও বিলাস তা করেনি। হিমিদের সমাজে এই প্রনয় রীতি দেখে লেখক এর এক অমূল্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল -

> **"এ পাড়া থেকে এমন অনেক মেয়ে গেছে, কত নতুন মেয়ে এসেছে। কখনো ফেরত এসেছে পুরানো মেয়েরা ও চলটি সমাজ জীবনের বন্ধন এদের সমাজে নেই। মানুষ। এখানে। প্রানের দায়ে ছোটে যত্রতত্র। পিরিত এখানে জীবনেরই রীতি। কখনোও ঘরে না রইতে দেয়, অনলেই পোড়ে কখনোও। রংলেগে তাকে ঢাকতে পারে না, চাপতে যাওয়ার সূক্ষ মুনশিআনা অন্যায় ও এদের। সেজন্য পিরিতের রশিটা সোনার শিকল নয়, লোহার শিকলও নয়, নেহাতই প্রানের দায়ে তন্তুতে পাক খাওয়া সূত্র। মনে না মানলে মিথ্যা আর লুকোচুরি নেই, তাই হাসে ও চেঁচিয়ে অভিষাপও দেয় সবরে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় সবটাই বড় দুরন্ত, ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খল ও আদিম।"**

- (গঙ্গা-৩২৩)

হিমি ও বিলাসের সার্বিক প্রনয় চিত্র বিচার বিশ্লেষন করে একথা আমরা জেনেছি যে বিলাসের কাছে প্রেম এক সুদ্ধ আত্মার অভিপ্রায়। প্রেম ভাব জেগে ওঠে দুটি ভিন্ন মনের পরিসুদ্ধ চাওয়া পাওয়ার আদলে, কামনা বাসনায় নয়। যা নিষ্পাপ ও নিশ্ছল। তাই বিলাস শুধু হিমির মনকে ভালোবেসেছিল, তার শরীরকে নয়। সারা জীবনের পথচলার সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চেয়েছিল হিমিকে। অপর দিকে হিমি প্রেমকে প্রত্যাক্ষান করে কামনা বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তার কাছে প্রেম এক খেলা মাত্র। হিমির প্রেম ছিল দৈহিক ও শারীরিক প্রেম। তাই বিলাস তখন মাসের পর মাস নদী সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়াবে, তখন হিমি তার একাকীত্ব জীবন কাটাতে রাজী নয়। হিমির হৃদয় ছিল পাপ ও সংশয় যুক্ত, তাই তার হৃদয়ে প্রেম বাসা বেঁধে উঠতে পারেনি। অপরদিকে বিলাস চলছিল নিস্পাপ ও সংশয় বর্জিত। আসলে হিমি এক পুরুষে সন্তুষ্ট নয়। তাই সে বিবাহ করে স্বামী-সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি নয়। সে তার স্বার্থের কথা চিন্তা করে তৎক্ষনাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে এবং সে নিজ বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছে। বিলাস আজ প্রকৃত প্রেমের স্বাদ অনুভব করেছে। হিমি বিলাসকে ত্যাগ করলেও, বিলাস কিন্তু হিমিকে ত্যাগ করেনি। সে মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছে। বিলাস হিমির প্রেমকে আরও গভীর ভাবে আস্বাদন করেছে।

বিদায় বেলায় সে মিমিকে কথা দিয়ে যায় -

> **"মহারানী জোয়ারের আগনায় আসব তোমার কাছে,**
> **চলন্তায় যাব আকুলে। তখন যেন তোমার দেখা পাই।"**

- (গঙ্গা-৩২৬)

বিলাসের এই হৃদয় বিদীর্ণ করা শোক কথা পাঠকের হৃদয়কে আজও দুঃখে ভরিয়ে তোলে। এই উক্তিতে লুকিয়ে রয়েছে একজন ব্যার্থ প্রেমিকের আর্তনাদ। নিরাসা ও হতাসার সুর। যা সহ্যের বহিরে। বেঁচে থাকার শেষ সম্বল টুকুও নিঃশ্বেস করে দিয়েছে হিমি। বিলাস এখন অকুলেও ভাসতে পারছেনা, আবার কুলেও বাস করা তার দায় হয়ে উঠেছে। এই ভাবে দুঃখ আর শোকের বিয়গান্তক ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে বিলাস ও হিমির প্রেম কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদের কথা স্মরন করে 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের' 'কবি' উপন্যাসের একটি উক্তি স্মরণে আসে, তা হল-

> **"ভালোবেসে মিটল না স্বাদ**
> **কুলাল না এ জীবনে।**
> **হায়! জীবন এত ছটো কেনে!**
> **এ ভূবনে ?"**

- (কবি – ১৯৯)

তথ্যসূত্র:

১. 'গঙ্গা'- সমরেশ বসু' – সম্পাদনা -সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু রচনাবলী-২ আনন্দ পাবলিসার্স, কোল-৭০০০০৯।

২. "মনকায় অসুখ ...... কাহিল হইছি।"-(১০২ পৃ) "পদ্মা নদীর মাঝি"- 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল পাবলিসার্স, প্রকাশক-মনীষ বসু, কোল-৭০০০৭৩

৩. "মারে আমি ...... আমা হতে।" - (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪. "ভালো বেসে . . . . . এ ভূবনে।" (১৯৯ পৃ) "কবি"- 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। ১০ শ্যামচরন দে স্ট্রীট, কোল-৭৩।

সাম্প্রতিক লেখিকা পারমিতা ঘোষ মজুমদারের উপন্যাসে আধুনিক পৃথিবীর দাম্পত্য

সহেলি চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
স্কটিশ চার্চ কলেজ

সারসংক্ষেপ: আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে সাম্প্রতিককালের বিখ্যাত উপন্যাসিক পারমিতা ঘোষ মজুমদারের দুটি উপন্যাসে নষ্ট দাম্পত্যের চেহারা কেমন ভাবে চিত্রিতে হয়েছে তা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিবাহ এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাঙালি সমাজে নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাত ধরে দাম্পত্য সম্পর্কের যে বিবর্তন আমরা দেখে এসেছি তা একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে, বা কতখানি বহুস্তরীয় হয়ে উঠেছে তা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বায়নের হাত ধরে ভোগবাদ মানুষের সম্পর্ককে গ্রাস করছে। বিবাহিত জীবনে থেকেও নারী পুরুষের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব কেমন করে ভেঙে দিচ্ছে একের পর এক পরিবার তা নিখুঁত বয়ানে তুলে ধরেছেন লেখিকা। নষ্ট দাম্পত্যের ভার বহন করে যে সব শিশুরা বড় হয়ে উঠছে এই পৃথিবীতে তাদের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন উপন্যাসগুলোকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। নাগরিক জীবনের দলিল হিসেবে এইসব উপন্যাস পাঠকের কাছে কতখানি দাবি রাখতে পারে? এই গবেষণাপত্রে খুঁজতে চাওয়া হয়েছে সেই উত্তর।

সূচক শব্দ: নষ্ট দাম্পত্য, বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, নাগরিক বিচ্ছিন্নতা।

মূল আলোচনা:

বিবাহ একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বিবর্তনের ইতিহাসও জড়িত। আপাত অর্থে বিবাহকে নারী পুরুষের প্রেমের চরম পরিণতি হিসাবে দেখা হলেও দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা বিবাহকে দেখছেন একটু অন্যভাবে। নারীকে বৈবাহিক বিধানের মাধ্যমে পাঠানো হয় পুরুষের সংসারে সুগৃহিনীর ভুমিকা পালন করতে। ক্রমশ সে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে যায়। ১৮৮৪ তেই এঙ্গেলস্ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠানকে বলেছেন স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। তিনি এ কথাও মনে করেন পরিবারে পুরুষ যেহেতু নারীর ভরণপোষণের কর্তা তাই নারীর উপর সে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আধিপত্যকামিতার নিরিখে পুরুষ হয়ে ওঠে ‘বুর্জোয়া’ আর নারী 'প্রলেতারিয়েত'। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে “Marriage is a social contract”[১] সামাজিক এই চুক্তিকে বহন করতে হয় নারী পুরুষ উভয়কেই। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে আছে কিছু সামাজিক রীতিনীতি ও দায়বদ্ধতার উপর। বার্নার্ডশ মনে করতেন বিবাহ মানে হল বদ্ধতা যেখানে “Man who can't sleep with the window shut, and woman who can't sleep with the window open”।[২] বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে বলেছিলেন বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির যুপকাষ্ঠে বহু নারী তার সত্তা বলি দিয়ে দাসী পর্যায়ভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ সমাজে আমরা দেখেছি বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি নানা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। আধুনিকতা ও প্রযুক্তির উন্নতি ব্যক্তিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়েছে যার প্রভাব পড়েছে বিবাহিত সম্পর্কেও। বিশ শতকে এসেও আমরা দেখেছি বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি বারবার বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছে। কাউন্ট কাইজারলিং এর 'Book of Marriage' বইতে তিনি লিখেছিলেন "The ruin of marriage signifies general ruin, where as improvement and perfection in it denotes general progress"[৩] এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধ যেখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু বিবাহ ও রক্ষণশীলতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন হিন্দু বিবাহের এই চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতিতে নারী বা পুরুষের আত্মিক সংযোগ ঘটে না। বিবাহ এখানে যান্ত্রিক, মুক্ত প্রেমের সেখানে যায়গা নেই। রবীন্দ্র পরবর্তী উপন্যাসিকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো', 'প্রচ্ছদপট' প্রভৃতি উপন্যাসে বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দেহমন' উপন্যাসে নারীর চোখ দিয়ে বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসে নারী পুরুষের ভাঙনের ছবিকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। বিবাহ নিরপেক্ষ কোনো পরিচয় নিয়ে মেয়েরা কি বাঁচে না? এই প্রশ্ন ছিল সে যুগের সাহিত্যিকদের। বানী বসু বা সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উপন্যাসে আমরা দেখেছি দাম্পত্যের মধ্যে থেকেও মেয়েদের একাকীত্ব কতখানি বেশি। সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিক পরিমিতা ঘোষ মজুমদারের উপন্যাসে এই বিবর্তনের ধারা ধরেই একেবারে আধুনিক পৃথিবীর দাম্পত্যকে আমরা খুঁজে পাই। উনবিংশ শতাব্দীর নষ্ট দাম্পত্যের সরলরৈখিক কারণকে অতিক্রম করে, দাম্পত্যের চেহারা এখানে অনেক জটিল। বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি দাম্পত্যকে কেমনভাবে প্রভাবিত করছে, কেমনভাবে বদলে যাচ্ছে পারিবারিক সম্পর্ক তা তিনি নানা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর 'গণবন্ধন', 'কবি ও কাহিনি' এই দুটি উপন্যাসে আধুনিক পৃথিবীর দাম্পত্যের চেহারা পাঠকে বিস্মৃত করে।

পারমিতা ঘোষ মজুমদারের দুটি উপন্যাসে আমরা আধুনিক পৃথিবীর নষ্ট দাম্পত্যের চেহারাটা পরিষ্কার ভাবে খুঁজে পাই। এই দাম্পত্যে লেগেছে কর্পোরেট কালচারের খোঁচা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নারীর চোখ দিয়ে দাম্পত্যের সংকটকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার প্রথা কেমনভাবে ভেঙে পড়ছে, বা বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে ঠিক কী ধরনের প্রশ্ন উঠছে তা বিচার কার যায় তার উপন্যাস পড়লেই।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'গণবন্ধন', গণবন্ধন নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালে প্রতিটি মানুষের যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার নিয়ত প্রবনতা তার বিপরীতে তিনি বন্ধনের কথা বলছেন। এ বন্ধন নারীতে-পুরুষে, মানুষে-মানুষে। গণবন্ধনের কেন্দ্রেও রয়েছে একাধিক নষ্ট দাম্পত্যের কাহিনী। রোহিণী আর অনীকের সেই আঠারো আর তেইশের ভালোবাসার গল্প কেমনভাবে সময়ের সাথে সাথে বদলে গেল তা আমরা বিশ্লেষন করতে পারি এই উপন্যাস থেকে। রোহিণী আর অনীক যৌবনে যে একমুখী ভালোবাসার ভরা দাম্পত্যের স্বপ্ন দেখেছেন তা সফল হয়নি। কলকাতার লাল দোতালা বাস ছিল তাদের প্রেমের সাথী। সেই প্রেম ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এসেছিল। মানসিকতায় তৈরী হচ্ছিল বিস্তর দূরত্ব। রাস্তার দুটি যুবক যখন রোহিণীকে শারীরিক নিগ্রহের মাধ্যমে বিশ্রীভাবে অপমান করে, তখন প্রতিবাদের বদলে অনীক দিতে চেয়েছিল টাকা। চিৎকার করে রোহিণী তার প্রতিবাদ করেছিল "টাকা দিলে কেন তুমি"?[৪] এই প্রশ্নের কোনো উত্তর অনীক দিতে পারেনি। সে চেয়েছিল ঝামেলার থেকে সহজ মুক্তি।

অনীকের কাছে এ যেন শুধুই 'সিনক্রিয়েট' করা। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় তাদের মানসিক দূরত্ব কতখানি বেড়ে গিয়েছিল। লেখিকার ভাষায় "তলে তলে দূরত্ব তো বাড়ছিলই। যে রোহিণী আর অনীক বেধেছিল ঘর তারা হারিয়ে গেছে কবেই। দিন প্রতিদিন পাল্টাচ্ছিল। নিজের অজান্তেই তারা দূরে সরে যাচ্ছিল ক্রমশ। এই পাল্টানোর নামই স্বাভাবিকতা।"[৫] দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হচ্ছিল সন্দেহ। অনীক তার এক বান্ধবীর সঙ্গে কথা বললেই রোহিণী মনে করত সে প্রেম করছে। রোহিণী বুঝতে পারতো তার স্বামী তার সাথে সুখী নয়। এই বোধ তাদের দুজনের মধ্যেই বাড়িয়ে তুলছিল হতাশা। স্বামীর তির্যক উক্তির প্রত্যুত্তরে রোহিণী বলে "বেশ্যা তো খেটেই খায় অনীক... যাদের মায়েরা সারাজীবন স্বামীদের ঘাড়ে চেপে বৈঠকখানায় বিপ্লব করে।"[৬] অনীক উত্তরে তাকে চড় মেরেছিল। প্রত্যুত্তরে রোহিণী মেরেছিল লাথি। দাম্পত্যের এই ছকটা আমাদের একেবারে অচেনা, চিরাচরিত দাম্পত্যের সংকটে আমরা দেখেছি পুরুষরাই নারীকে অত্যাচার করেছে, নিগ্রহ করেছে কিন্তু এখানে নারীকেও প্রতিবাদী হতে দেখলাম আমরা। অনীক রোহিণীকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে সে আর অর্পিতা শুধুই বন্ধু কিন্তু রোহিণী মানেনি। অনীকের সাথে তার সম্পর্ক শেষ হয়েই গেছিল। ভেঙেই যেত আগে বা পরে। অর্পিতা হয়তো সহজ সরল ছুতো হয়ে রোহিনীর কাছে এসেছিল তখন। অনীকের অতিরিক্ত মদ্যপান, বদমেজাজী রোহিণীকে বিরক্ত করে তুলেছিল। পচন ধরছিল সম্পর্কে। লেখিকার ভাষায় "সিস্টেম তো পচাই, কিন্তু রোহিণী সে পচনের একটা নিরুপায় অংশ।"[৭] বিবাহ এই প্রতিষ্ঠানটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচনের ছায়া যে পড়েছে লেখিকা সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক দৈহিক সম্পর্ক সেখানেও পৌঁছে গেছিল দূরত্ব। রোহিনীকে বার বার বলতে শুনি "আমার ভাল লাগছে না অনীক... উই আর টুগেদার অনলি ফর পুনপুন।"[৮] হ্যাঁ পুনপন তাদের ভালোবাসার সন্তান। ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলেও ভালোবাসার সেতু স্বরূপ পুনপুন রয়ে গেছে তাদের চোখের সামনে।

কর্পোরেট চাকরিরত অনীক পরিবারকে ঠিক সময় দিতে পারতো না। পরিবারের সাথে যাকে বলে 'কোয়ালিটি টাইম' সে তেমন ভাবে দিতে পারেনি সেই নিয়ে রোহিনীর মনে একাধিক বার ক্ষোভ তৈরী হয়েছে। স্কুলের স্পোর্টসে ছোট্ট ছেলে পুনপুন চেয়েছিল তার বাবা আসুক কিন্তু অনীক শেষ পর্যন্ত আসতে পারেনি। ভেঙে পড়েছিল ছোট্ট ছেলেটি। আসলে পেশাগত জীবন আর পারিবারিক জীবনের সঠিক ভারসাম্য রাখতে পারছিল না অনীক। এই সমস্যা তো আমাদের বর্তমান সময়ের সামাজিক সমস্যা। যেখানে সময়ের অভাবে পরিবারের মানুষদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে দূরত্ব আর শীতলতা। রোহিণী, পুনপুন আর অনীকের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল সেই শীতলতা। পুনপুন খুঁজে বেড়াতো তার সেই রোমান্টিক বাবাকে যে হাসি হাসি মুখে তাকে কোলকাতার প্রাচীন বাসস্ট্যান্ড দেখাতে নিয়ে যেত।

শেষ পর্যন্ত বিবাহটি টেকানো যায়নি রোহিণী আর অনীকের। "স্বাধীন নারী তার জীবনের কাঁকররূপী বিবাহ বিসর্জন করেছে কোর্ট চত্বরে।"[৯] নিজেকে সে আর 'বৌদি' পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি। বিয়েটা ভাঙতে চায়নি অনীক। পুনপুনের কথা মনে করিয়ে অনীক যখন রোহিনীকে ডিভোর্সের মত সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে বলেছিল তখন রোহিনী প্রশ্ন করেছিল – "পুনপুনের কথা ভেবে আমরা বিয়ে করেছিলাম? কী নিষ্ঠুর তুমি অনীক। এর থেকে স্পষ্ট করে বোধহয় বলা যায় দেয়ার ইজ নাথিং লেফট বিটুইন আস।"[১০] বোঝাই যাচ্ছে এখানে আমরা একেবারে একজন স্বাধীন নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি যে সমাজের ভয়ে বা সন্তানের অজুহাতে নিজের অসফল বিবাহকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে না। সে নামকে ওয়াস্তে সম্পর্কে

বিশ্বাসী নয়। "আমার মনটা আর তোমার সঙ্গে নেই। শুধু এটাই কি যথেষ্ট কারণ নয় ডিভোর্সের?"[১১] অনীক নিজে খুব স্পষ্ট জানত বলেই রোহিনীকে আলাদা ভাবে বোঝানোর চেষ্ট করেনি কোনও দিন। কেমন অপমানিত লাগত ওর সাফাই গাইতে। রোহিণীর সঙ্গে সম্পর্কটা ক্রমশই নিভে আসছিল, তারপর প্রতিরাতে বাড়ি ফিরে ওইরকম তিক্ততা, রক্তক্ষরণ তবু অনীক চেয়েছিল বিয়েটা রাখতে। তাই বা থাকল কই। অনীক এও ভেবেছিল যে খাতায়-কলমে বিয়েটা রেখে হায়দ্রাবাদ বা বেঙ্গালুরুতে চলে যায়। হয়তো দূরত্ব আবার কাছে এনে দেবে তাদের। কিন্তু এইরকম কাগজের বৌ হয়ে থাকতে রাজী নয় রোহিণী।

অনীকের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর রোহিণীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে শুভর সঙ্গে। সেও একটা কর্পোরেটে চাকরি করে এবং ডিভোর্সি। সুদেষ্ণা আর শুভর সম্পর্কটাও কোন এক অজানা কারণে ভেঙে যায়। সুদেষ্ণা ছিল কবি, রোমান্টিক আর শুভ ভীষন বাস্তববাদী। মনের মিল হয়নি। শুভ আবার নতুন করে রোহিণীকে বিয়ে করে সংসার পাততে চায় কিন্তু রোহিণী তাতে রাজী নয়। রোহিনীর মতে "ম্যারেজ কিলস অল রোমান্স........ আই ওয়ান্ট টু বি ইন লাভ উইথ ইউ শুভ.. আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ ইউ।"[১২] বিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিই আস্থা নেই আর রোহিণীর। সে একজন স্বাধীন নারীর মত বাঁচতে চায়। পঞ্চাশ বছর আগে হলে লোকে বলত "এ তো ব্যাটাছেলে"। আজ লোকে বলে 'স্বেচ্ছাচারী', তবে কিছুতেই কিছু এসে যায় না রোহিণীর।

অনীক, রোহিণী, শুভ আর সুদেষ্ণার ভেঙে যাওয়া দাম্পত্যের বিপ্রতীপে লেখিকা একটি আজব যৌথ খামারের স্বপ্ন দেখেছেন ছোট্ট পুনপুনের চোখ দিয়ে। সে কম্পিউটারের একটা যৌথ খামার গেম বানায় যেখানে তার মামি আর শুভআঙ্কেল, বাবি আর অর্পিতা আন্টি সবাই বন্ধু। এই ভেঙে যাওয়া পরিবার প্রথার বিপরীতে সে স্বপ্ন দেখে এক যৌথ খামারের যেখানে সবাই সবার বন্ধু, কেউ কারো শত্রু নয়। হাতে হাত মিলে তৈরী হচ্ছে 'গণবন্ধন'। একটা শিশুর চোখ দিয়ে আশ্চর্য ভাবে জটিল বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে সহজ সমাধান যেন খুজে দিয়েছেন লেখিকা যেখানে নেই আর কোন শিশুর একা হয়ে যাওয়ার হতাশা বা নষ্ট দাম্পত্যের গল্প।

পারমিতার পরবর্তী উপন্যাস 'কবি ও কাহিনিতে' একইভাবে নষ্ট দাম্পত্যের আখ্যানকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুটি সমান্তরাল দাম্পত্যকে একই সঙ্গে লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন। ঋষিকার বিয়ে সে অর্থে যথার্থ ভাল বিয়ে। ঋষিকার স্বামী সমুদ্র একাধারে হ্যান্ডসাম ও সফল। ঋষিকার নিজেকে বেমানান লাগে সমুদ্রের পাশে কারন সে কালো, রোগা আর বেঁটে। ঋষিকার মনে হয় এত ভালো বিয়ে বোধ হয় তার না হলেই ভাল হত। "আরও সাধারণ কোনও ছেলেকে বিয়ে করলে সে হয়তো আরও বেশি সুখী হত।"[১৩] ঋষিকার বর সমুদ্র ব্যস্ত পুরুষ মানুষ। ব্যস্ত পুরুষ হবার সুবাদে সে সবকিছু ভুলে থাকতে পারে। কাহিণীর কেন্দ্রে রয়েছে বিতান নামে একজন মৃত কবি, যার সঙ্গে ঋষিকার ভাল সখ্যতা ছিল। বিতনাদার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক কথাই শুনেছে ঋষিকা "তিনটে বিয়ে, সারি সারি মৃত প্রেমের স্তূপ পেরিয়ে বিতানদার বোহিসেবি বেঁচে থাকা।"[১৪] বিতানের বর্তমান বউ ইস্তাম্বুলে থাকে, সেখানকার কৃষকসভার সে অ্যাক্টিভমেম্বার। মাথা মুড়িয়ে হেমাঙ্গিনীর পায়ের তলায় বসে থাকায় নাকি বিতানের শেষ জীবনের ধর্ম ছিল। বিতান আর হেমাঙ্গিনী বিয়ে করলেও তারা তথাকথিত স্বামী স্ত্রীর মত না থেকে থাকত 'ওপেন রিলেশনসিপে'। ঋষিকা আর সমুদ্রের আপাত অর্থে ভালো সম্পর্ক থাকলেও সমুদ্র তাদের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে যৌন উদ্বেগে ভুগতো। সমুদ্রজানে বদ ও

খারাপের প্রতি তার আকর্ষণ আছে। আর সেই আকর্ষণেই সে ঋষিকার সঙ্গে বাসা বেঁধেছে। অসম বিয়ের কমপ্লেক্সটা ঋষিকা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। সমুদ্র আর ঋষিকার মধ্যে একটা দুরত্ব আছে সেটা ঋষিকার ভালো লাগে। "এই দূরত্ব রচনা করে সে সমুদ্রকে ভালোবাসতে চায়।"[১৫] সমুদ্রের কোলিক বোধিরূপ রোজ রাতে নিয়ম করে ফোন করে তখন সমুদ্র হাতে ফোন নিয়ে বাইরে চলে যায়। সমুদ্র রোজই বোধির ফোন ধরার আগে কেন জানি না ঋষিকার পারমিশন নেয়। ঋষিকা এ সব নিয়ে গভীরভাবে কখনো তেমন ভাবেনি। "সময় বরং তাকে ধীরে ধীরে শেখাল অনেক। শেখাল নারীবাদী হও বা না-ই হও, অসুন্দর মেয়ে আর সুন্দর মেয়ের অধিকারে প্রভেদ জটিল। নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে বা সমুদ্রের কাছে সম্মান হানি হচ্ছে বলে নয়, খানিক কমপ্লেক্স কাটাতেই ঋষিকা শুরু করেছিল স্বাধীন রোজগার।"[১৬] তবে সেখানেও সে সুখী নয়, আপাত অর্থে সব কিছু স্বাভাবিক সহজ মনে হলেও ঋষিকার মনের কোনায় কোথাও একটা দ্বন্দ্ব রয়ে যাচ্ছে। ঋষিকার স্বপ্নটপ্নও দিন দিন কমে যাচ্ছে। এটাই কি অভ্যেস?

ঋষিকা মনে মনে একটা 'ক্রাইসিস' অনুভব করে। সেটা কিসের? উপন্যাসের শেষ লগ্নে অপ্রত্যাশিত ভাবে সমুদ্রের মৃত্যু হচ্ছে আর সমুদ্রের মৃত্যুর পর ঋষিকা একদিন হঠাৎ আবিস্কার করে একটা ব্যাগ "তার ভেতর থেকে উকি মারছে একটা পরচুলা, মেয়েদের বেশ কয়েকটা অন্তর্বাস, লিপস্টিক, নকল স্তন, রঙবঙে ফ্রেমওয়ালা সানগ্লাস, লেস দেওয়া নাইটি, প্যান্টি।"[১৭] ঋষিকার স্বামী সমুদ্র আসলে ছিল বাই- সেক্সুয়াল। বোধরুপ আর সে একটা নোংরা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। যেদিন অফিসে সব জানাজানি হয়ে যায় সেই রাতেই সমুদ্র হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। ঋষিকার প্রথমে খুবই অপমানিত হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল এতদিন ধরে সমুদ্র তাকে ঠকিয়েছে। পরে সে ধীরাদিকে বলে "আমার খুব মুক্ত আর স্বাধীন লাগছে ধীরাদি। তুমি জানো কি না জানি না, আমি ভীষণ কমপ্লেক্সে থাকতাম সমুদ্রকে নিয়ে।"[১৮] লেখিকা 'কবি ও কাহিনি' উপন্যাসে যে কাহিনির অবতারনা করেছেন তার একটা সামাজিক আবেদন আছে। উনবিংশ, বিংশ শতাব্দিতে এই সমস্যা ছিল না কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে নারী পুরুষের স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক নানা বিকৃতির মধ্যে পড়ছে। যৌন জীবনের ক্লান্তি কাটাতে নারী বা পুরুষ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনকে জটিল করে তুলছে। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিতে আক্রমন করছে ভোগবাদ, বীভৎস কাম।

এই উপন্যাসে আর একটি দাম্পত্যের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে যা একাধারে ভীষন সময় উপযোগী ও জটিল মনস্তাত্বিক। বিশাখা ও রোহিতাশ্বের দাম্পত্য খুব বিচিত্র। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে বিশাখা একেবারেই ব্যতিক্রমী চরিত্র। সে একান্তভাবেই নারীবাদী। "এই ধরনের মেয়েকে ছোট্ট টিপ, শাঁখা-পলা, সোনার চুড়ি, সোনার পাতলা হার, মাথায় ঘোমটা আর ছাপা শাড়ি পরিয়ে রাখতে চায় বাঙালি। সে প্রসঙ্গ অবশ্য এখানে অবান্তর। কারন বিশাখা কখনই এর কোনওটা পরেনি। সে পরে ঢোলা সালোয়ার আর পাঞ্জাবি, কপালে আধুলি সাজোর মেরুন টিপ আর আঙ্গুলে একটা মাত্র হিরে।"[১৯] রোহিতাশের পরিবার একেবারেই নিম্নবিত্ত স্তরের। বিয়ের দিন শাঁখা সিঁদুর কোনটাই বিপাশা পরেনি, কোনো লোকাচার মানেনি কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারে এমন শিক্ষিত বউ পেয়ে তারা সবাই তাকে একই সঙ্গে ভয় ও সমীহ করে চলত। সামাজিক সংস্কৃতি, অভ্যেস তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করে।

সংস্কৃতিগত দিক থেকে মানসিকতায় রোহিতাশ্বের পরিবারের সঙ্গে বিপাশার খুব স্বাভাবিক ভাবেই দূরত্ব তৈরি হয়। রোহিতাশ্ব কোনো পক্ষ না নিয়ে তা মোকাবিলা করার চেষ্টা

করার ফলে তার আর বিপাশার মানসিক দূরত্ব বারতে শুরু করে। "বিপাশা সারাদিন আজকাল কী করে, রোহিত জানে না। বিবাহিত নারীপুরুষ কি এভাবেই অভ্যাসের সম্পর্কে নিজেদের হারিয়ে ফেলে? এভাবেই কি সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়? ছুটির দিনেও তারা আজকাল আলাদা আলাদা সময় কাটায়।"[২০] মাঝে মাঝেই এ জন্য তারা পরস্পরকে দোষারোপ করে, বিশাখার অধ্যাপনার জীবনের নানা সমস্যা রোহিত কখনও শুনতে চায়নি বা রোহিতের সংবাদিক জীবনের সমস্যা নিয়ে বিশাখা ভাবে নি একদিনও। এই পারস্পরিক দূরত্ব তাদের ঠেলে দিয়েছে নিজের নিজের গর্তে যেখানে তারা খুব অসহায় ও একা। লেখিকার ভাষায় "আসলে রোহিত- বিশাখার বিয়ের বয়স বাড়ছিল, তারা নিজেরাও ছড়িয়ে পড়ছিল আরও অন্যান্য সমীকরণে। ধীরে ধীরে তাদের দেখার মন পাল্টাছিল। পাল্টাছিল বোঝার চোখ,"[২১] এমনি করে অপ্রত্যাশিত ভাবেই বয়সে অনেক ছোটো নালকের সঙ্গে একদিন বিশাখার একটা ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। রোহিতকে মিথ্যে বলে সে নালকের সঙ্গে যায় শান্তিনিকেতন একটু ভালোবাসার খোঁজে, এই ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক আর সরল, বিশাখার দিক থেকে চির আকাঙ্খিত। "বিবাহিত নারীর পরপুরুষের সঙ্গে এইভাবে খোলা আকাশের নীচে সব ভুলে ভেসে যাওয়ার নাম কী? প্রকৃত সঙ্গম?"[২২] অনেক দিনের জমে থাকা বিশাখার ভালোবাসা নালককে আশ্রয় করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। বিয়ে ভেঙে বারবার বিয়ে করে মানুষ কিন্তু কিসের আশায়? নালক আর বিশাখা বছর দেড়েক স্বামী স্ত্রী ছিল কিন্তু বিপাশা পরে জেনেছিল নালক একটি নাবালিকাকে অন্তঃসত্তা করে পালিয়ে গেছিল। "মায়েদের কাছে প্যাশনের কারণে বিয়ের মতন পবিত্র বন্ধন ভাঙা মানে ছ্যাবলামি।"[২৩] কিন্তু বিশাখা ঘর ভেঙেছিল ঘর করার আশায়। সে আসা তার মেটেনি। একের পর এক নষ্ট দাম্পত্যের রক্ত লেগে আছে তার কষ্টে যেখান থেকে সে মুক্তি পায়নি।

লেখিকা বার বার প্রশ্নটা করেছেন এই যে এত ভেঙে যাওয়া জীবন, দোষটা ঠিক কার? নারীর? পুরুষের? না বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির? বিবাহ অর্থে যাকে বিশেষভাবে বহন করা হয় লোক দেখানো বিয়ে না করেও কোনো নারী পুরুষ সারা জীবন বিবাহিত থাকতে পারে আবার উল্টো দিকে দাম্পত্যের মধ্যে থেকেও পরস্পরকে ঠকিয়ে, আক্রমন করে নিঃশেষিত হতে পারে দুটি নারী পুরুষ। আসলে এবার সত্যি ভাববার সময় এসেছে। একবিংশ শতাব্দীর এই একাধিক প্রলোভনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেমন ভাবে দাম্পত্য নষ্ট হচ্ছে? কেমনভাবে ভেঙে যাচ্ছে পরিবার? তা আমরা যেন বুঝেও বুঝতে পারছি না। পারমিতা ঘোষ মজুমদারের এই দুটি উপন্যাস এভাবেই তুলে এনেছে নষ্ট্য দাম্পত্যের জটিল অমীমাংসা।

তথ্যসূত্র:

১। Lee, Alfred Mc Clung, 'Readings in Sociology', London, 1963, P-164.
২। Edmund Leach, 'Marriage A story', London 1973, P-57.
৩। Count Hermann Keyserling, 'The Book of Marriage', London. 1927, P-iii-iv.
৪। পারমিতা ঘোষ মজুমদার, 'গণবন্ধন', আনন্দ, জানু ২০১১, পৃ. ১৯
৫। তদেব, পৃ. ৩১
৬। তদেব, পৃ. ৩৮
৭। তদেব, পৃ. ৪৩
৮। তদেব, পৃ. ৪৭
৯। তদেব, পৃ. ৩৫

১০। তদেব, পৃ. ৫০
১১। তদেব, পৃ. ৫৫
১২। তদেব, পৃ. ৫৭
১৩। পারমিতা ঘোষ মজুমদার, কবি ও কাহিনি, আনন্দ, জানু ২০১৪, পৃ. ৯
১৪। তদেব, পৃ. ১২
১৫। তদেব, পৃ. ১৭
১৬। তদেব, পৃ. ৩৫
১৭। তদেব, পৃ. ৫১
১৮। তদেব, পৃ. ৬৫
১৯। তদেব, পৃ. ৬৭
২০। তদেব, পৃ. ৬৯
২১। তদেব, পৃ. ৭৩
২২। তদেব, পৃ. ৯৯
২৩। তদেব, পৃ. ১০৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘আমি রাইকিশোরী’ : বিবাহবিছিন্ন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা

প্রলয় মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আমাদের এই প্রবন্ধে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘আমি রাইকিশোরী’ উপন্যাস অবলম্বনে বিবাহবিছিন্ন নারীদের জীবন সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে নারীরা নিজেদের বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত হতে দেখতে দেখতে তাকেই তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ, নিয়তি ধরে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এই যাত্রা পথে রয়ে যায় কিছু ব্যতিক্রমী নারী, যারা স্বাধীন জীবনের অন্বেষণ করে। তার ফলে হয়তো তাদের বৈবাহিক জীবন ভেঙে যায়, অনেক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কিন্তু সমস্ত কিছুকে বরণ করে নিয়ে তারা জীবনের পথে এগিয়ে চলে এবং একদিন নিজেকে নিজের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। এই প্রবন্ধে রাইকিশোরী নামক এমনই এক বিবাহবিছিন্ন নারীর কথা বলা হয়েছে, যে নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখলেও শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তবে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে আপন কয়েকজনের সহযোগিতায় নিজেকে এক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।
সূচক শব্দ: বিবাহ, দাম্পত্য, প্রতিকূলতা, পদবি, আত্মপ্রতিষ্ঠা।

মূল আলোচনা:

দীর্ঘকাল থেকে বহমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা ক্রমাগত বঞ্চিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয়ে আসছে। এর মূলে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায় নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব। প্রথমে নারীকে পিতৃগৃহে পিতার অনুগ্রহে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, পরে স্বামীর সংসারে তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়। সমস্ত অর্থ উপার্জনের পথ থেকে বঞ্চিত নারী হয়ে ওঠে কেবল পুরুষের যৌনতৃষ্ণা নিবারণ ও সন্তান উৎপাদনের কারিগর। জন্মের পর থেকে তাদের মানসিকতাকেও সেইভাবে তৈরির প্রচেষ্টা চলে। কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে জীবন অতিবাহিত করার যে স্বাদ, তা আস্বাদনের সুযোগ নারীদের হয়ে ওঠে না। পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকাই তাদের নিয়তি ধরে নিয়ে তারা জীবনের পালা সাঙ্গ করে। নারীদের এই অসহায়তার সুযোগ দিনের পর দিন পুরুষেরা নিয়ে চলে। যে রঙিন জীবনের কল্পনা নিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা ঘটে, অচিরেই তার রঙ নিশ্চিত আশ্রয় ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কাছে মিলিয়ে যায়। সমস্ত রকমের নির্যাতনের শিকার হয়েও নারী আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য হয় শ্বশুরের ভিটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্রের অনেক পরিবর্তন হলেও আজও তার ধারা বহমান। তবে এরই মাঝে থাকা কিছু ব্যতিক্রমী নারী সমস্ত চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রয়োজনে তারা সম্পর্কের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। আর দৃষ্টান্ত রেখে যায় আগামীর কোনও নারীদের কাছে, যারা মেনে নিয়ে বা মানিয়ে নিয়ে নয়, নিজের জীবনকে

নিজের মতো করে চালিত করতে চায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০-২০১৫) 'আমি রাইকিশোরী' (১৯৯৭) উপন্যাস তেমনই এক নারীর কথা বলে যায়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য এমন একজন ঔপন্যাসিক যিনি তাঁর উপন্যাসের শরীর জুড়ে মূলত নারীদের জীবন সমস্যা, জটিলতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তাদের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, সংগ্রামের কথা বলে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে— 'কাচের দেওয়াল' (১৯৯৩), 'ভাঙনকাল' (১৯৯৬), 'হেমন্তের পাখি' (১৯৯৭), 'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে' (১৯৯৭), 'ধূসর বিষাদ' (১৯৯৭), 'ঢেউ আসে ঢেউ যায়' (১৪০৫) 'দহন' (১৯৯৮), 'পালাবার পথ নেই' (২০০০), 'নীলঘূর্ণি' (২০০১), 'উড়ো মেঘ' (২০০২), 'অলীক সুখ' (২০০২), 'আলো ছায়া' (২০০৩), 'জলছবি' (২০০৪), 'ছেঁড়া তার' (২০০৫), 'রঙিন পৃথিবী' (২০০৬), 'আয়নামহল' (২০০৬), 'চার দেওয়াল' (২০০৮), 'রূপকথা নয়' (২০০৯), 'রঙ বদলায়' (২০০৯), 'আঁধার বেলা' (২০১০), 'গহিন হৃদয়' (২০১০), 'অর্ধেক আকাশ' (২০১২), 'একা' (২০১৩), 'বিষাদ পেরিয়ে' (২০১৪), 'দমকা হাওয়া' (২০১৫) প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলির দিকে তাকালে দেখা যাবে কত বিচিত্র দাম্পত্য জীবনের চিত্র পাঠকের সামনে সুচিত্রা ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পুরনো মানসিকতাকে আঁকড়ে ধরে পুরুষেরা তাদের স্ত্রীকে বাড়ির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাদের ওপর নিজেদের ইচ্ছা কায়েক করতে চায়, নিজেদের আজ্ঞাবাহী করে রাখতে চায়। কিন্তু শিক্ষার আলোর স্পর্শে আলোকিত নারীরা নিজেদের অধিকার, আত্মমর্যাদা রক্ষার তাগিদে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শামিল হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে তারা সফল হবে কিনা জানে না, কিন্তু কখনই তারা ভয়ে পিছপা হয় না। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে অদিতির গল্প লেখার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা, 'ধূসর বিষাদ' উপন্যাসে ভাস্বতীর স্বামীর কবল থেকে বেরিয়ে এসে সন্তানের হাত ধরে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সেই উদাহরণই বহন করে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য কখনই হতাশা বা ব্যর্থতাকে প্রশ্রয় দেননি। সমাজের সেই সকল নারী যারা সমস্ত কিছুকে মেনে নিয়ে স্রোতের মুখে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়— তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেননি সুচিত্রা ভট্টাচার্য। প্রতিবাদী, আত্মসচেতন নারীরাই তাঁর উপন্যাস আলো করে রয়েছে। জীবনে সমস্যা আসবে, তার সঙ্গে লড়াই করে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একদিন অবশ্যই নারী স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। 'কাচের দেওয়াল' উপন্যাসের জয়া রায়ের, 'দমকা হাওয়া' উপন্যাসের অহনার স্বামীকে বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনির মাধ্যমে নারীদের সাফল্যের জয়গাথা রচিত হয়। আমাদের আলোচ্য 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসে উঠে এসেছে এমনই এক বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কথা।

সর্ব প্রথমে 'আমি রাইকিশোরী' (১৯৯৭) উপন্যাসের নামকরণের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে একজন নারী তার আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করছে। কিন্তু সেই পরিচয়ে কোনও পদবি নেই। আসলে ইচ্ছে করেই এখানে পদবির ব্যবহার করেননি ঔপন্যাসিক। পিতা কিংবা স্বামীর পদবি অনুসারে নির্দিষ্ট পদবি থেকে নারীকে বের করে এনে নিজস্ব পরিচয়ের মাধ্যমে পরিচিতি প্রদান করতে চেয়েছেন তিনি। যেখানে নারী নিজেকে কারও কন্যা কিংবা স্ত্রী হিসেবে তুলে ধরবে না। 'আমি রাইকিশোরী' নামকরণ নারীর আপন স্পর্ধার প্রকাশ, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। উপন্যাসের সূচনাও হয় সেই অভিব্যক্তি পরিস্ফুটনের মাধ্যমে।

> "আমি রাইকিশোরী মিত্র।..... মিত্র! নাকি চৌধুরী? উঁহু, কোনটাই নয়। আমি রাই, শুধুই রাই......রাইকিশোর।"[১]

আত্মকথন রীতিতে বর্ণিত এই উপন্যাসের প্রথমেই একজন নারীর এই বলিষ্ঠ উচ্চারণ আমাদের সচকিত করে। বুঝিয়ে দেয় উপন্যাসের গতি ঠিক কোন পথে ধাবিত হবে। আমরা অনুমান করে নিতে পারি স্বামী কিংবা পিতার পরিচয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, এক মুক্তকামী আত্মনির্ভর নারীরই হয়ে উঠছে এই উপন্যাসের মূল আধার। যে নিজেকে সকলের সামনে স্বনামেই পরিচয় করানোর সাহস রাখে।

রাইকিশোরী চৌধুরীর কিংবা মিত্রের রাইকিশোরী হয়ে ওঠার যাত্রা পথকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই উপন্যাস। আর তারই পরিচয় জ্ঞাপনার্থে আমাদের ফিরে যেতে হয় রাইকিশোরীরই শৈশবে। বড়ো দাদা ও ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে অতিবাহিত আনন্দমুখর শৈশবে রাইকিশোরী দাদা-ভাইদের মতো সমান ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সমতালে সময়কে কাটিয়ে নিয়ে যায়। কাল্পনিক চতুর্দোলায় চরে সবাই আনন্দের সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে যেতে চায়। কিন্তু ধীরে ধীরে লিঙ্গ বৈষম্য তাদের জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত করে।

> "ছেলেবেলায় ভাইবোনেরা তো এরকমই থাকে। দুজনেই সমান সমান। তারপর একটু একটু করে দুজনের জগৎ একেবারে আলাদা হয়ে যায়। ছেলেদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াতে যে কি আকাশ পাতাল তফাৎ দাদা বুঝত না। আমিও না। কেন যে বুঝতে শিখতে হল! শৈশবের মত নির্ভার নিশ্চিন্ত জীবনটা যদি..."[২]

এই আক্ষেপ, বেদনা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বর্তমান। লিঙ্গভেদে জীবনের পার্থক্যও সমতালে বিরাজমান। রাইকিশোরী এই পার্থক্য দূরীকরণে জীবনের প্রথম থেকেই যে সচেষ্ট, তা নয়। বরং সে আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতোই সহজ-সরল জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। দাদার বন্ধু নীলাঞ্জন তার কাঙ্খিত যুবক, হৃদয়ের গোপন ভালোবাসার মানুষ হলেও তার কাছে কখনও নিজেকে নিয়ে যেতে পারেনি। পরিবারের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গেই নবদাম্পত্য জীবনের স্বপ দেখেছে।

> "কত কি নতুন নতুন কল্পনা ... চন্দনা বলেছিল, তোর বরের ছবিটা কিন্তু বেশ। একটু মোটাসোটা, মন্দ নয় তবু .... অনিমেষ তো সুপুরুষই, সুদর্শন, বিরাট ব্যবসার মালিক। আমার আর কিসের অভাব? ... ফুলের রথে করে সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দূরে, অনেক দূরে।"[৩]

হায়ার সেকেন্ডারিতে সেকেণ্ড ডিভিশন, পাসে বিএ পাশ রাইকিশোরী সুদর্শন পাত্র ও বিরাট ব্যবসা দেখেই নিজের সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু বাসর রাতেই তার কল্পনার ফানুস উড়ে যায়। মানুষরূপী অনিমেষের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা পশুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। যে পশু কেবল রক্ত-মাংসের টাটকা শরীর চায়, ভালোবাসা কিংবা রোমান্টিক অনুভূতির কোনও খবর রাখে না। নেই কোনও মধুর সম্ভাষণ, নেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান। ব্যবসায়িকের মতো কয়েকটি জরুরি কথা বলে অনিমেষ হামলে পড়ে রাইকিশোরীর নতুন প্রস্ফুটিত শরীরের ওপর।

> "... ব্যস, আলো নিভে গেল। টিউবটা। নাইট বাল্‌ব জ্বলছে। এই আলোতে প্রথম পুরুষ খুঁড়ছে আমাকে ... খুঁড়ছে, খুঁড়ছে, শুধুই খুঁড়ছে ... মন নয়, শরীর চাই। শরীর দাও ... এই তো দিলাম। নাও, যেভাবে তোমার খুশি। তবে প্রথম রাতেই সব খুলে নিও না, দোহাই। কিছু থাকুক। কিছু লজ্জা, কিছু আবেশ — ভাললাগার। — না, আমি দেখব। আজই সব ... মনটা দেখবে না? ... প্লীজ, শোন, ওসব ভাষায় নয়, অন্য ভাষা বলো ... সব সময় শুধুই?"[৪]

যে মানুষ কেবল শরীরের সন্ধান করে তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা বৃথা। রাইকিশোরীও ব্যর্থ হয় অনিমেষের সঙ্গে ভালোবাসার সংসার গড়তে। অনিমেষের নির্যাতন কেবল রাইকিশোরীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অচিরেই সে রাইকিশোরীর শরীরকে ব্যবসায়িক ফায়দা তোলার কাজে নিমজ্জিত করতে চায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় শাশুড়ির ক্রমাগত খোটা, লাঞ্ছনা। এই সমস্ত কিছু রাইকিশোরীর মাত্র ছয় মাসের দাম্পত্য জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিষাদপূর্ণ করে তোলে।

> “শাশুড়ি বলে, তোমার বাবা এই দেয়নি, ওই দেয়নি। — স্বামী বলে, রঙ্গনাথনের পার্টিতে একটু ড্রিংক করলে কী ক্ষতি হত? জানো রিফিউজ করা অভদ্রতা। ... শাশুড়ি বলে, ঘন ঘন অত বাপের বাড়ি যেতে চাও কেন? এ বাড়িতে যখন এসেছ ...। স্বামী বলে, তুমি বড় ন্যাকা। চ্যাটার্জির পাশে কিছুক্ষণ বসলে সতীত্ব নষ্ট হত? অত বড় অর্ডারটা ...”[৫]

রাইকিশোরী সেই নারীদের মতো নয়, যারা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা পেলেই নিজেদের ধন্য মনে করে। ‘স্বামীর হুকুমে আমরা মুখে জুতো বইতাম’— এই মানসিকতা রাইকিশোরী নিজের মধ্যে পোষণ করে না। স্বামীর ঘরবাড়িকে নিজের মনে করে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তার সমস্ত ইচ্ছা, নির্দেশকে মুখ বুজে মেনে নিতে পারে না। এক চিলতে জমি বিক্রি করে যে বাবা-দাদা তার বিয়ে দিয়েছে তাদের প্রতি শাশুড়ির ক্রমাগত অবজ্ঞা, অসম্মান প্রদর্শনকে সহ্য করতে পারে না। ফলে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের অন্যান্য নায়িকাদের মতো সেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাত্র অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু তার ফল হয় ভয়ানক। প্রাচীনপন্থী শ্বশুর বাড়ির লোকেদের রাইকিশোরীর প্রতিবাদ হিংস্র করে তোলে। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে তারা রাইকিশোরীকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করে। এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা আমাদের সামনে শ্বশুর বাড়িতে বধূদের প্রকৃত অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে।

রাইকিশোরী হার মানা নারী নয়। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে চলার মানসিকতা দিয়ে গড়া রাইকিশোরী। তাই ছয় মাসের হৃদয়হীন, যৌনতা নির্ভর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে স্বামী অনিমেষকে ডিভোর্স দেয় ও আদালতে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। তবে রাইকিশোরীর জীবনের পথ এখানেই থেমে থাকেনি। এরপরই শুরু হয় তার অন্য এক লড়াই। আর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে তোলা, আপন খেয়ালে নিজের জীবনকে চালিত করা। সেই লক্ষ্যে রাইকিশোরী কৃষ্ণনগরের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মহানগর কলকাতার উদ্দেশ্যে। তার এই নতুন পথ চলার প্রধান পথপ্রদর্শক, সহায়ক হয় তার বড়ো দাদা ব্রত। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে বাড়িতে ফিরে এলে রাইকিশোরীর বাবা-মা কেউই তাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। তারা চায় সে তাদের সঙ্গে থেকে নিশ্চিন্ততার মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে দিন অতিবাহিত করুক। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্রত তা মানতে পারে না। সে অনুভব করতে পারে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল হওয়াই নারীদের মুক্তির একমাত্র পথ। আর তাই সে তার ছোটো বোনকে সেই দিকেই ঠেলে দেয়। কলকাতায় চাকরীর সন্ধান পেলে রাইকিশোরীকে সেখানে পাঠাতে দ্বিধা করে না। এমনকি কলকাতায় মাসির বাড়িতে থাকার সুযোগ থাকলেও রাইকিশোরীকে সেখানে রাখে না। বাবা-মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তার জন্য মেয়েদের হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে। আসলে ব্রত বুঝেছিল, যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে রাইকিশোরীর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তার মনজগতে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রশমিত হওয়ার, তা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় নিজেকে নিজের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা।

"দাদা প্রবল আপত্তি জানাল, — 'না রাই এখন মোটেই ঘরে বসে থাকবে না। আমার মত চাকরি বাকরি করতে হবে ওকে।'...

আসলে দাদারা চাইছিল আমার নিজের ওপর কন্‌ফিডেন্স্ আসুক। সব সময় ধাক্কা দিচ্ছে, —'শক্ত হ রাই। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। কারুর ওপর ভরসা না করে—।"[৬]

কলকাতার বুকে একাকী যে নতুন জীবন রাইকিশোরী শুরু করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। সম্পূর্ণ অচেনা শহরের অপরিচিত মানুষের ভিড়ে চলতে গিয়ে তাকে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। একটি ছোটো কোম্পানি মালহোত্রা ব্রাদার্সের রিশেপশনিষ্টের চাকরি পায় সে। কিন্তু সেখানকার অন্যান্য সহকর্মী বিশেষত বিদেশী বংশোদ্ভূত সহকর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথা বলা তার পক্ষে মোটেই সহজ হয় না। তাই বলে রাইকিশোরী পরাজয় স্বীকার করে না। স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে ভর্তি হয়ে নিজেকে তৈরি করে নেয়।

"বাবা রে মা, ছেলে মেয়ে দুটো কি তুফানগতিতে ইংরিজি বলে চলেছে। মনে হয় ভার্ব-টার্বগুলোকে টকাটক উড়িয়ে দিচ্ছে। আগে ওদের কথা এক বর্ণ বুঝতে পারতাম না। মনে হত গ্রীক্ কি হীব্রু বলছে বুঝি। মাসখানেক স্পোকেন্ ইংলিশ ক্লাশ করে অনেকটা আয়ত্ত করেছি।"[৭]

কলকাতার অচেনা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে রাইকিশোরীর মধ্যে সবসময় হারিয়ে যাওয়ার ভীতি কাজ করত। এরকম পরিস্থিতিতে তার সহায়ক হয়ে ওঠে মীরাদির ভাই সিদ্ধার্থ। তারই চোখ দিয়ে রাইকিশোরী একে একে কলকাতাকে দেখে, পরিচিত হয় তার অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে। শুধু তাই নয়, সিদ্ধার্থের মধ্যে সে খুঁজে পায় এমন এক পুরুষকে, যে পুরুষ নারীর শরীরকে ছাপিয়ে গিয়ে মনের অনুসন্ধান করে, খবর রাখে তার ভালোলাগা-মন্দলাগার। যে সহজেই বীভৎস অতীতকে ভুলিয়ে দিয়ে হৃদয় মন্দিরে বরণ করে নিতে চায়। আর তাই শর্তসাপেক্ষে নয়, সমস্ত কিছুকে মানিয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থ রাইকিশোরীকে নতুন করে ভালোবাসার যে পবিত্র পথে আহ্বান জানায়, তা রাইকিশোরী ফিরিয়ে দিতে পারে না। স্বপ্নের পুরুষ নীলাঞ্জনের ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে পারস্পরিক প্রেমানুভূতিকে স্বীকৃতি দেয় রাইকিশোরী।

"নতুন করে কাঁপছি আমি। ওই তো সবুজ বনভূমির পারে সরোবরের জল টলটল। জংলী মাদলের শব্দ কাছে, আরও কাছে। টুকরো টুকরো ভালোবাসা হয়ে সিদ্ধার্থ ছড়িয়ে গেল পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে। চোখ বন্ধ করলাম,— তবে সিদ্ধার্থই সত্যি হোক। তুমি স্বপ্নে এসো নীলাঞ্জন।"[৮]

উপন্যাসের সমাপ্তিতে রাইকিশোরী ও সিদ্ধার্থকে মিলিয়ে দিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্য ভিন্ন এক বার্তা দিয়ে গেলেন। আমরা অনুমান করতে পারি এরপর তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বুঝিয়ে দিলেন, ভালোবাসা কিংবা বিবাহ যে কেবল নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা আত্মপরিচয়কে খর্ব করে তা নয়। উপযুক্ত মানুষের সংস্পর্শে নারী নিজেকে আরও পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে।

হোস্টেল শান্তিনীড়ের অচেনা বিচিত্র মানুষের ভিড়ে যখন রাইকিশোরী প্রথম দিকে আড়ষ্ঠ হয়ে থাকে, তখন হোস্টেলেরই একজন বিবাহবিচ্ছিন্ন নারী কাঁকন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে তোলে। কাঁকন সাহিত্যিক মনীশকে ভালোবেসে দাম্পত্য জীবনের সূচনা করলেও অচিরেরই তা ভেঙে যায়। নপুংসক মনীশ কাঁকনকে বিয়ে

করার মাধ্যমে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে চেয়ে ছিল। কিন্তু তা না হলে কাঁকনের ওপর মানসিক ও শারীরিকভাবে চড়াও হতে থাকে। ফলে একসময় তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কাঁকন সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নাট্যপ্রতিভার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এমনকি আবীরের সঙ্গে নতুন করে বিবাহের মাধ্যমে ঘর বাঁধার আয়োজন করে। কিন্তু মনীশের আকস্মিক আত্মহত্যা তাকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে তার স্থান হয় মেন্টাল হাসপাতালে। সম্ভবনায় পূর্ণ থাকলেও কাঁকনের জীবন শেষ পর্যন্ত সংশয়ের মুখে পড়ে যায়। তবে কাঁকন রাইকিশোরীর মধ্যে যে মানসিক শক্তি চালিত করে গেছে, তা পরবর্তীকালে আরও অনেক রাইকিশোরী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর তাই উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায়, কাঁকনের হোস্টেলের জায়গায় জঙ্গীপুরের কোনও এক গ্রাম থেকে আসা স্বামী পরিত্যাক্তা মণিকাকে রাইকিশোরী মানসিকভাবে মজবুত করার চেষ্টায় রত।

> "শ্বশুরবাড়িতে কি সব ঝামেলা, ওর বর ওকে নেয় না। মাঝে মাঝে মেয়েটার পাশে গিয়ে বসি, কিছু বলার চেষ্টা করি, যেভাবে কাঁকন বোঝাত আমাকে। ঠিক ঠিক ভাষা খুঁজে পাই না সবসময়। কিন্তু আমি ও পারবে....
>
> মণিকার মধ্যে এক বছর আগের রাইকিশোরীকে দেখতে পাচ্ছি আমি।"[৯]

আর এখানেই রাইকিশোরী কেবল একজন নারীর নয়, হয়ে ওঠে সমস্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বিবাহবিছিন্ন নারীদের প্রতীক। যারা সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গিয়ে একদিন নিজেদের আত্মনির্ভরশীল, প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাস নারীর 'আমিত্ব' প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের গল্প বলে যায়। আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়, তা বজায় রেখে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় ঘোষণা এই উপন্যাস। রাইকিশোরী তারই প্রতিনিধি। যে নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অন্যান্য শুভাকাঙ্খী মানুষের সহায়তায় একবছরের মধ্যেই নিজেকে 'রাইকিশোরী' হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কৃষ্ণনগর কিংবা শিবপুরের শিকলবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে কলকাতার মুক্ত আকাশে নিজেকে উড়িয়ে দিতে পারে। তারই পথে এই আকাশে একে একে ডানা মেলবে মণিকার মতো পরবর্তীকালে আসা আরও বিবাহবিছিন্ন নারীরা।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৯৯, আমি রাইকিশোরী, কলকাতা, অঞ্জলী প্রকাশনী, পৃ. ৫।
২. তদেব, পৃ. ৭৩।
৩. তদেব, পৃ. ২৬।
৪. তদেব, পৃ. ২৭।
৫. তদেব, পৃ. ২৭।
৬. তদেব, পৃ. ৩১।
৭. তদেব, পৃ. ১৪।
৮. তদেব, পৃ. ১১২।
৯. তদেব, পৃ. ১১২।

মুনতাসীর মামুনের গল্প : দ্বন্দ্ব সংকটের সময়কাল ও মানসিক টানাপোড়েন

পুনম মুখার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: মুনতাসির মামুন বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তিনি অনুবাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। মামুন কয়েকটি ছোটগল্পও রচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে তাঁর গল্পগুলোতে মানুষ ও প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
সূচক শব্দ: ছোটগল্প, মুক্তিযুদ্ধ, প্রকৃতি, সম্পর্ক, মানসিক সংকট, বিরুদ্ধতা, জীবনবোধ, প্রেম ও বন্ধুত্ব।

মূল আলোচনা:
মুনতাসীর মামুন লিখছেন প্রায় পাঁচ দশক। তিনি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ইতিহাসবিদ। রাজনৈতিক ভাষ্যকার, গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। মুনতাসীর মানুষ প্রচুর লিখেছেন সারা জীবন। তাঁর ৭০তম জন্মদিনে, বাংলাদেশ চর্চা প্রকাশ করেছিল মুর্শিদা বিনতে রহমান রচিত *মুনতাসীর মামুন গ্রন্থপঞ্জি*। গ্রন্থটির ভূমিকাতে রহমান মুনতাসীর লেখালিখি প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশে ইতিহাসবিদ বললে মুনতাসীর মামুনকেই বোঝায়। সেখানে তাঁর নামের আগে অধ্যাপক ড. কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। তবে একথা বললে ভুল হবে যে, বাঙালির জীবনে তিনি জীবিতকালে সম্মানিত হচ্ছেন শুধু তাঁর লেখার কারণে তা নয়, গণতান্ত্রিক–সাংস্কৃতিক আন্দোলন, মৌল–জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে অ্যাক্টিভিজম, জেল গমন সব কিছু মিলিয়েই তাঁর পরিচয়। তিনি মুনতসীর মামুন।'[১] তবে এতসব কিছুর পাশাপাশি মুনতাসীর মামুন একজন গল্পকারও। তিনি গল্প লিখেছেন বড় অশান্ত সময়ে। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের কিছু আগে থেকে তারপরের কয়েকটি বছর।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে আসা এই স্বাধীনতা, নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। গণহত্যা, বাঙালির উপর চলা নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।[২] *সকাল সন্ধ্যা* পত্রিকাতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুনতাসীর মামুন নিজেই বলেছেন, '১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ খুব ঝঞ্ঝাময় একটি সময় ছিল আমাদের জীবনে। একেবারে শূন্য থেকে যাত্রা। মানে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন একটা অবস্থা। খাদ্যাভাব, অর্থাভাব। সেই পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত যে কাজগুলি হচ্ছে, সেগুলোই যে বাংলাদেশের ভিত্তিস্থাপন করেছে এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। কারণ আমরা তখন প্রতিদিনের সমস্যায় জর্জরিত।'[৩] প্রচণ্ড এক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা। চরম খাদ্যাভাব। মামুনের গল্পগুলি এই সময় থেকেই উঠে এসেছে। শুধু তৎকালীন সমাজ নয়, প্রেম, প্রকৃতি, সম্পর্ক, বহুগামিতা, দাম্পত্য সম্পর্ক সবকিছুর এক নবতম আবিষ্কার তাঁর গল্প। ১৯৮৫ সালে সাতটি গল্প নিয়ে প্রকাশ পায় *কড়ানাড়ার শব্দ* গল্পগ্রন্থ। *কড়া নাড়ার শব্দ* গল্পগ্রন্থের শিরোনাম গল্পটি হাসান আর তার স্ত্রী রেবার। ১৯৭৪-এ প্রকাশিত হয় গল্পটি। শুতে যাওয়ার আগে হাসান আর রেবা শুনতে পায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে তারা দেখতে পায় পেট পিঠ এক হয়ে যাওয়া এক যুবক এবং সাত

হাতি শাড়ি পরা এক যুবতী দাঁড়িয়ে। যুবতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, লজ্জায়। যুবকটি চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'দুইডা রুডি দিবেন?' হাসান তার সকালের জলখাবারের জন্য বরাদ্দ রুটি থেকে দুটো রুটি তাকে দিয়ে দেয়। হাসান-রেবা ঢাকা শহরের আরও অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো একটা পরিবার। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির খেলায় ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রের বাসা বাড়ি ছেড়ে হাসানদের চলে আসতে হয় শহরতলীতে। রেবা বি.এ পাস। শহরতলীতে আসা তার পছন্দ না। হাসান অবশ্য অপারগ। তাকে খরচ কমাতে হবে। হাসান বোঝে রেবা তার এই 'কান্ট্রিসাইড'-এর বাড়িতে এসে খুশি নয়। একটা চাপা আক্রোশ রেবার মধ্যে লক্ষ্য করে হাসান। হাসান নিজেও লজ্জিত হয়। অফিসের কেরানির সঙ্গে এক বাসে যাতায়াত করতে। হাসানের ছোটখাটো অফিসার-মন এতে সংকুচিত হয়। পুরনো বন্ধু কামাল অফিসে দেখা করতে এলে হাসান তাকে তার জীর্ণ পোশাক এবং শীর্ণ চেহারা দিয়ে মাপে। কামাল হাসানকে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি, তিনশো টাকা মণ চাল, পরিবারের চার সদস্য নিয়ে বেঁচে থাকার গল্প শোনায়। মুনতাসীর মামুন আসলে অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড পাজেল দিয়ে একটা গোটা ছবি তৈরি করেছেন। যে ছবি পারিপার্শ্বিকতার চাপে ক্লান্ত মানুষের গল্প। সময় অবস্থার পরিবর্তন যেখানে মানুষকে বদলে দেয়। আর তাই হয়তো হাসান, পুরনো বন্ধু কামাল কে দেখে ভয় পায়। ভাবে কামাল টাকা ধার চাইবে না তো? হাসান প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার উপরে পড়ে থাকা অগণিত মানুষের দুঃসহ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা দেখে। সে আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে। এই গতানুগতিক জীবনে রেবা হাসানকে মা হওয়ার সংবাদ দেয়। হাসান বুঝতে পারে মা হওয়ার অনুভূতি, রেবাকে মাতৃত্বের আনন্দের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে ফেলছে না। ভীত রেবা, বিরক্ত রেবা হাসানকে বলে, 'বেতন পাও কত? এক টিন দুধের দাম জানো?'[৪] অভাব হাসানকে, তার স্বপ্নের সংসারের কাছাকাছি পৌঁছতে দেয় না। এক তারিখের মাইনে পাওয়ার দিনও হাসানের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। দৈনিক বাংলা পত্রিকার পাতায় একটা হাড়-সর্বস্ব লোকের ছবি দেখতে পায় হাসান। আনমনে পথ চলতে চলতে তার মনে পড়ে বন্ধু সালামের কথা। সালামের বলা 'উইন্ডো শপিং' করা মেয়েটির কথা। সালাম মেয়েটিকে উইন্ডো শপিং করতে দেখে একটা দামি শাড়ি কিনে দিয়েছে। সেই শাড়ির বদলে তারা এক বন্ধুর নির্জন বাড়িতে সময় কাটিয়েছে। ফুটপাত জুড়ে পড়ে থাকা অনাহার ক্লিষ্ট শিশুদের মুখ দেখে হাসান ভয় পায়। তার 'ঘেন্না জাগে এ ভেবে যে, এখন সে বাবা হতে চলেছে, রেবার দিকে আরেকবার তাকিয়ে সে মনে মনে প্রার্থনা করে, আমি বাবা হতে চাই না।'[৫]

হাসান ও রেবার সংসার, তাদের ভালবাসা সবকিছুকে বিপন্ন করে তুলেছে সময়। বাবা হওয়ার খুশির বদলে এক ধরনের ক্রোধে হাসান জর্জরিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেবর্ষি সারোগী *মানবজনম* নামে তাঁর একটি উপন্যাসে এক দম্পতির গল্প লিখেছিলেন। একসাথে পথ চলা শুরু করার সময় তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সন্তান আসবে না তাদের জীবনে। পুরুষটির মনে হয়েছিল মানুষের বেঁচে থাকা যেখানে প্রতি মুহূর্তে ক্লান্তিকময় জীবন কাটানো, সেখানে নতুন প্রাণকে পৃথিবীতে এনে লাভ কী?[৬] আলাদা আলাদা সময় রচিত কাহিনিগুলিতে এই পুরুষ চরিত্র দুটি নিজেদের আত্মজকে পৃথিবীতে আনার মতো উপযুক্ত কারণ খুঁজে পায়নি। হাসান কামালের মতো সবকিছুকে মানিয়ে নিতে পারেনি। তার সংবেদনশীল মন, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, সালামের মতো অর্থের জোরে সুযোগ-সন্ধানী হওয়ার সামর্থ্য তাকে দেয়নি। তার মূল্যবোধের তাড়নায় হাসান চেয়েছে অসহায় মানুষগুলো মৃদুভাবে কড়া নেড়ে খাবার না চেয়ে, প্রতিটি দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়াক। তাদের কড়া নাড়া শব্দে ঘুম ভেঙে যাক সমাজের। রাজনৈতিক প্রভু,

বিত্তবান, মধ্যবিত্তদের চোখে চোখ রেখে তারা তাদের খাদ্য ছিনিয়ে নিক। হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশু যেখানে অনাহারে মৃত্যুর পথে পাড়ি দিচ্ছে, সেখানে একটা নতুন প্রাণকে পৃথিবীতে আনতে হাসানের মন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই শঙ্কিত মন আদতে সামাজিক হতাশার স্বীকার। যেখানে সমাজ নতুন মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা দেয়নি। হাসানের প্রতিবাদ আসলে একজন সাধারণ মানুষের নিজের মত প্রকাশ করতে চাওয়ার প্রতিবাদ।

এই গল্পগ্রন্থের আরেকটি গল্প 'সায়গনের পতন এবং'। ভালবাসা যখন বিবাহবন্ধনে রূপ পায়, সম্পর্কের রীতির পরিবর্তন হয়। গতানুগতিক জীবনযাত্রায় প্রেমের রূপের শুধু পার্থক্য ঘটে। শাহানা ও মাহমুদের ভালবাসার বিয়ে। মাহমুদ পেপারে ভিয়েতনামের পতনের খবর দেখে উৎসাহিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভিয়েতনামের যুদ্ধ নিয়ে এক ধরনের উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পতন, সদ্য যুদ্ধ উত্তীর্ণ একটি দেশের যুবসমাজকে উৎসাহিত করবে সেটাই স্বাভাবিক। মাহমুদও এর ব্যতিক্রম নয়। মাহমুদ-শাহানা পথ চলা শুরু করেছিল সম মানসিকতাকে অবলম্বন করে। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই সেই শাবানা কেন পালটে যাচ্ছে মাহমুদ বুঝতে পারে না। বাংলাদেশ ন'মাসের যুদ্ধের পর স্বাধীনতা পেয়েছে। ভিয়েতনামের মতো একটা দেশ বহু বছর যুদ্ধের পর স্বাধীন হচ্ছে, এই আনন্দ মাহমুদ শাহানার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই ছাত্র রাজনীতির সব অভিজ্ঞতা যদিও সুখকর হয়নি। সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের ছাত্ররা যখন ভিয়েতনামের শুভকামনায় মিছিল করছিল, সেই মিছিলে গুলি চলে। দুটি ছেলে গুলি খেয়ে মারা যায়। মাহমুদ ভয় পেয়েছিল। তেমনই ভয় পেয়েছিল শাহানা। মাহমুদ সেই দিনই প্রথম দেখেছিল শাহানাকে। 'সে দেখেছিল একটি মেয়ে অর্থাৎ শাহানা ও সেখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপছে।'[৭] মাহমুদ প্রেমে পড়ার সময় ভেবেছিল শাহানা দেশগড়ার আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে থাকবে। স্বাধীন দেশ, সবকিছু বদলে গিয়ে স্বাধীন হওয়ার আনন্দ চারিদিকে। যুবক মাহমুদের মনেও বাংলাদেশের অনেক যুবকের মতো নতুন দেশটাকে গড়ে নেওয়া ইচ্ছা। বিয়ের আগে যে সম্পর্কটাকে মানসিকভাবে এক মনে হয়েছিল, বিয়ের এক বছর যেতে না যেতেই শাহানাকে অন্যরকম মনে হয়। শাহানা মাহমুদের রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ক্ষুব্ধ শাহানা স্বামীকে বলে 'থাক থাক কি যে পলিটিক্স করো তা তো বুঝি। একমাত্র সফল কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া তোমরা লোকজনের কাছ থেকে আর কোন বিষয়ে বাহবা পেয়েছ?'[৮] যে আদর্শে দুটো আলাদা মানুষ একসাথে পথ চলা শুরু করেছিল সেই আদর্শে ফাটল ধরে। রান্নাঘরে শাহানার টুংটাং চুরির আওয়াজ আসলে মতানৈক্যের গল্প শোনায়। শাহানা সন্তানসম্ভবা হওয়ার সংবাদ মাহমুদকে খুশি করতে পারে না। ভিয়েতনামের যুদ্ধের খবরে মাহমুদ যত উল্লাসিত হয় শাহানার বিরক্তি তত বারে। শাহানা মুখ ঝামটা দেয়। তার মনে হয় এসব আদিখ্যেতা। ধীরে ধীরে সায়গনের পতনের সময় এগিয়ে আসে। দু'দিনের মধ্যেই যখন সায়গানের পতন আসন্ন তখন মাহমুদ শাহানার সঙ্গে এই উত্তেজনা ভাগ করে নিতে চায়। সাহানা কিছু বলে না। দু'দিন পর মাহমুদ যখন ঘুমিয়ে, শাহানা উত্তেজিত স্বরে মাহমুদের ঘুম ভাঙায়। শাহানার হাতে সকালের কাগজ, মৃদু হেসে বলে, 'জানো সায়গন ফল করেছে' এবং তারপর চুম্বন।

১৯৭১-এর স্বাধীনতার পরবর্তী সময় পর্ব স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সুখকর ছিল না। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু নিহত হন। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে চালিত মাহমুদ পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক জীবনে অদ্ভুত দোটানার সম্মুখীন হয়। তার জীবন আসলে বহু বাংলাদেশি যুবকের জীবনের এক মিলিত স্বর। শহরের রাস্তায় কঙ্কালসার মানুষের ভিড়। শহরে এলে অন্ন জোগাড় হওয়ার আশায়, গ্রাম থেকে আসা মানুষেরা ভিক্ষা করে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার সাহস তাদের হয় না। বুদ্ধিজীবীরা নিরুদ্দেক জীবন কাটাচ্ছে গ্লানিময় সমাজের তটস্থ দিনগুলিতে। সায়গনের পতনের খবর সেখানে দুর্যোগের রাত্রির অবসরের মতো। মুনতাসীর মামুন আসলে চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে সমাজ নয়, সম্পর্কের জটিলতার ও সমাধান করতে চান। তাঁর বিশেষত্ব এখানেই। রাজনৈতিক অস্থিরতাকে, দম্পতির শোবার ঘরে নিয়ে আসতে পারেন তিনি। প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে তিনি ভয় পান না। আর তাইতো মাহমুদ শাহানাকে বলেছে, 'আমরা যুদ্ধ করেছিলাম কতদিন? ন'মাস। তারপরে হঠাৎ করে স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। তাই এর মূল্য ঠিক দিতে পারছি না। স্বাধীনতার মূল সত্তাটা অনুধাবন করতে পারিনি। ভিয়েতনামের কথা ভাবো। এতটুকুন ছোট্ট দেশ। ছোট্টখাটো সব মানুষের দল। গত ত্রিশ বছর ধরে ক্রমাগত লড়ে আসছে। কার সঙ্গে? পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সঙ্গে।'[৯] রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে তার প্রমাণ মাহমুদ-শাহানা। সায়গনের পতনের মতো একটি আদ্যপ্রান্ত রাজনৈতিক ঘটনা তাই মাহমুদ আর শাহানার মতানৈক্যের অবসান ঘটায়। মামুন আসলে সম্পর্কের চিরন্তন এক সত্তাকে এখানে তুলে ধরেছেন। চিরস্থায়ী সম্পর্কে সাময়িক ভাটার টান চললেও সময় সেই ক্ষততে মলম লাগিয়েছে।

তবে শুধু সময়, সমাজ নয় প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে সম্পর্কের সমীকরণের বদলে যাওয়ার কারণ। সবুজ প্রকৃতি মামুনের কাছে যেন জীবন্ত। *বৃষ্টিভেজা স্মৃতির গান* গ্রন্থের তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ অংশে তিনি লিখেছিলেন–'মনে কি পড়ে আপনাদের সেই ছায়াচ্ছন্ন ঢাকা শহরের কথা? সারা রমনা ঘিরে বৃক্ষ, ছায়াচ্ছন্ন সরু পথ। আর্ট কলেজের সামনে পঞ্চাশ দশকের শেষ স্মৃতি হিসেবে তখনও ছিল দুটো কি তিনটি কৃষ্ণচূড়া। মেঘলা দিনে, কালো আকাশের পটভূমিকায় রক্তিম ফুলের সমারোহ দেখে দেখে আশ মিটতো না। বা মনে কি পড়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে যাবার পথে শালবৃক্ষের সারি বা শেরাটন/ রমনার মোড়ে চৌরাস্তায় সেই নাগলিঙ্গম? বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে সেই বর্ণাঢ্য বোগেনভিলিয়ার কথা? প্রতি বসন্তে ঐ বোগেনভিলিয়া আলো করে রাখতো পুরো এলাকা। এগুলি ছিল ঢাকা শহরের ল্যান্ডমার্ক, নিসর্গের বৈশিষ্ট্য।'[১০] প্রকৃতি আর মানুষ একাকার হয়ে গেছে তাঁর *কড়া নাড়ার শব্দ* গল্পগ্রন্থের 'গাছ-গাছালির কাছাকাছি' আর *নিছক প্রেমের গল্প* গ্রন্থের 'যে কোন অঘ্রাণে' গল্প দুটি। প্রাত্যহিক জীবন অনুভূতি যদি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তবে জীবনবোধ সম্পর্কে নতুন অনুভূতি হবে তা স্বাভাবিক। বৃহৎ প্রকৃতির আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মানদণ্ড হারিয়ে যায়। 'গাছ-গাছালির কাছাকাছি' গল্পের ছোট্ট আনন্দ বাবার সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে চলেছে। পাহাড়টা তার বাবার। আনন্দের মনে খুশির চঞ্চলতার পাশাপাশি কিছুটা বিষাদও আছে। তার বাবা-মায়ের ঝামেলা হয়েছে। মা পাহাড়ে বেড়াতে আসেনি। পাহাড়ের মাঝামাঝি সমতল জায়গাটায় সাদা লিলি ফুল দেখে আনন্দের মনে পড়ে 'মা লিলি ফুল ভালবাসেন' চারিদিকে ঘুঘুরডাকের নীরবতা। আনন্দ খেতের লাল চালের ভাত আর টকটকে লাল মুরগির মাংসের ঝোল খেতে খেতে বাবার কথা শোনে। তার বাবা পাহাড়ে তার দাদির নামে একটা কাঠের বাড়ি বানাতে চায়। ছোট্ট আনন্দের মনে হয় সেও বড় হলে তার মায়ের নামে একটা বাড়ি বানাবে। সারাদিন

কাটিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আনন্দের বাবা তাকে কয়েকটা ফুল নিয়ে আসতে বলে। আনন্দ তার বাবার কথায়, মায়ের জন্য পাহাড় থেকে তার পছন্দের ফুল নিয়ে বাড়ি ফেরে।

সবুজ প্রকৃতি, পাহাড় আসলে এই গল্পের অনুঘটক। ছোট্ট আনন্দ তার ক্ষুদ্র অনুভূতি দিয়ে জীবনের অনেক জটিলতাকে স্পর্শ করেছে। মা'র বেড়াতে না আসার বিষাদকে সে খুঁজতে থেকেছে বাবার চোখে। পাহাড়ের ঠান্ডা বাতাসের আদরে, পাশের বাড়ির হলুদ ফ্রকপরা মেয়েটির কথা মনে পড়ে আনন্দের। মামুনের কৃতিত্ব এখানে। খুব সহজে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করতে পারেন। আর তাই হয়তো আনন্দের তার দাদির কথা মনে পড়ে। দাদির অভিমানী মুখের কথা। দাদা হুটহাট বাড়ি না থাকলে দাদি একা বারান্দায় বসে থাকত। দাদির কালো রঙের গায়ের রং আর তীব্র অভিমানের রং লেখকের এই উপমায়, এক হয়ে ওঠে পাঠকের চোখে। আনন্দে বাবা তার দাদির জন্য বাড়ি বানাতে চায়। আনন্দ চায় তার মায়ের জন্য বাড়ি বানাতে। তীব্র সংসারের বাসনায় একজন নারী ঘর বাঁধে। স্বামীর বাড়ি তার কাছে নিরাপত্তার আশ্রয়। কিন্তু সেই বাড়ি কি শেষ পর্যন্ত তার নিজের হতে পারে? নাকি তাকে অপেক্ষা করতে হয়, সন্তানের মাধ্যমে সেই স্বপ্নের পূর্ণতা পাওয়ার! অতীতের ঋণ মিটিয়ে চলে বর্তমান। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। মামুন এই গল্পে এইসব জটিল প্রশ্ন তুলেছেন ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠককে দিয়েছেন পরিচিত কাঙ্ক্ষিত উত্তর। বৃহৎ প্রকৃতির পাদদেশে দাঁড়িয়, সামান্য মানসিক প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। আনন্দের বাবা, স্ত্রী এর জন্য লিলিফুল নিয়ে যেতে চেয়েছে। আনন্দ হয়েছে তার বাহক। বর্তমানে সুন্দর হয়ে উঠেছে অতীতকে মুছে, ভবিষ্যতের অঙ্গীকারকে পিছনে ফেলে। মামুন প্রকৃতিকে এখানে সর্বক্ষণের সঙ্গী, ঘরের লোক করে তুলেছেন এই গল্পে।

'যে কোন অঘ্রাণে' গল্পের হাসানের হাটহাজারির কাছে একটা ছোট পাহাড় আছে। রীতাকে নিয়ে হাসান বেড়াতে এসেছে সেই পাহাড়ে। একটা উজ্জ্বল দিন কাটাবে তারা। চারিদিকে ঝরা পাতা ছড়ানো। হাসান এদিক সেদিক দেখে তারপর হঠাৎ আড়ামোড়া ভেঙে রীতার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। রীতা বলে, 'এই একি হচ্ছে, ওঠো ওঠো' হাসান ওঠে না। রীতা ও আর কিছু বলে না। বরং হাসানের চুলে বিলি কাটে হাসান আর রীতাও এই গল্পে আছে চরম বর্তমানে কারণ হাসান বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাদের বিয়ে হয়নি এখনও। হাসান জানে, 'আগামী কয়েক মাস নয়তো বছরখানেকের মধ্যে রীতা অন্যের ঘরনি হয়ে যাবে। এটা নিশ্চিত এবং তা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা যেন দুমড়ে গেল।'[১১] মামুনের গল্পের সত্যি বর্তমানের এই বিষাদটা। ভালবাসা থেকে বিচ্ছেদ যেমন সত্যি, ভালবাসার মুহূর্তটাও সত্যি। ছেড়ে চলে যাওয়াটা সেখানে শেষ নয়, বৃহৎ প্রকৃতি, পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র মুহূর্ত। ছেলেটি এবং মেয়েটি জানে বিচ্ছেদ হবে তারপরেও রীতার ঠান্ডা লাগলে হাসান 'সালটা ঠিক করে জড়িয়ে' নেওয়ার পরামর্শ দেয়। তারা জানে এই শীত, অঘ্রান শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও থেকে যাবে বর্তমানের এই অঘ্রানের মুহূর্ত। মামুনের লেখায় মুহূর্তটায় বর্তমানের বাস্তব, যেখানে মনখারাপ আছে যন্ত্রণা নেই।

মুনতাসীর মামুন সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে লিখতে ভালবাসেন। সম্পর্কের সমীকরণে বৈধ-অবৈধের বেড়াজাল টপকে যান সহজেই। *নিছক প্রেমের গল্প* গ্রন্থের নাম গল্পটি অথবা 'বন্দরে ফেরা' গল্পটি যেন তেমনি।

'নিছক প্রেমের গল্প'টিতে কিছু গবেষক জমা হয়েছে একটি কনফারেন্সে। এক একজন এর এক রকমের বিষয় নিয়ে বলবে। বাংলাদেশ থেকে মাহমুদ এসেছে। সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে নেলী। অনেকের এই ভিড়ের মধ্যে মাহমুদ আলাদা করে চিনে নিতে চেষ্টা করে

নেলীকে। মাহমুদের স্ত্রী আছে। নেলী বিবাহিত। তার সন্তান আছে। দুটি আলাদা দেশের মানুষ, ভাষা বর্ণগত চেতনাকে ভুলে একে অপরের কাছে এসে পড়ে। কনফারেন্স শেষ হওয়ার আগের এক নির্জন দুপুরে, মেঘলা আবহাওয়াতে মাহমুদ নেলীর কেনা 'গীতাঞ্জলি' থেকে আবৃত্তি করে। কিছুটা ঘনিষ্ট সময় কাটায় তারা। দু-একটা গভীর চুম্বন করে একে অপরকে। তারপর সেই দুপুরের সমাপ্তি হয়। কনফারেন্সের শেষে হয়তো আবার দেখা হতে পারে তাদের অন্য কোনও দেশে। একে অপরের কাছে অঙ্গীকার নয় এই বিশ্বাস থেকে, নিজেদের আস্তানার দিকে যাত্রা করে।

বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারে। মুনতাসীর মামুন স্বাভাবিক ঘটনাকে নতুন করে মনে করিয়ে দেন। নেলী-মাহমুদ জানে জীবনে নোঙর প্রয়োজন। তবে মাঝে-মাঝে নৌকা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। সম্পর্ক যদি ঘর হয় তবে মানুষের কখনও কখনও বারান্দার প্রয়োজন হয় দু'দণ্ড নিশ্বাস নেওয়ার জন্য। তারপর আবার ঘরের মধ্যে চলে যাওয়ার প্রয়োজন পরে। মাহমুদ আর লেনী তাদের সম্পর্কের সীমাবদ্ধতার কথা জানে। মামুন ও পাঠককে সামাজিক ট্যাবুর বাইরে বেড়িয়ে বিবাহের পরবর্তী প্রেমকে দিতে চান, নিরাপত্তা আর বন্ধুত্বের মোরক। দু'জন মানুষ শুধুমাত্র জানবে তারা কাছাকাছি আছে। না ছুঁয়েও একে অপরকে ছুঁয়ে আছে। বাইরের পৃথিবীর কাছে গোপনীয়তা উন্মোচন এর ভয় নেই। আর তাই তো মামুন নেলীকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'প্রেম ও বন্ধুত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবটাই বড়। যেমন ধরো আমাদের কথা। কেউ জানলো না, জানবেও না। কিন্তু ভিড়ের মাঝেও আমরা পরস্পরকে ছুঁতে পারবো।'[১২]

মামুন সামাজিক বন্ধনকে অস্বীকার করেন না। পরিচিত বৃত্তের বাইরে বেড়িয়ে, বিদ্রোহী প্রেমের গাঁথা রচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সীমা অতিক্রান্ত প্রেম আসলে স্থিতবস্থাকে নাড়িয়ে দেয়। যেমন 'বন্দরে ফেরা' গল্পটিতে ষোল বছরের শামুর মা আত্মহত্যা করে। এক চমৎকার নদীর ধারে শামুদের বাড়ি। শামু দেখেছে তার মা-বাবা বিকালে বেড়াতে যেত। শামু'র তেরো বছর বয়সে লিলি চাচিরা থাকতে আসে শামুদের বাড়ির কাছে। শামু আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, তার পরিচিত বাড়ির পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। তার মা-বাবা আর নদীর ধারে বেড়াতে যায় না। লিলি চাচিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অশান্তিতে বাড়ির পরিবেশ বদলে যায়। লিলি চাচির মেয়ে জয়া শামুর বন্ধু। শামু রুবীদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে জয়া রাগ করে। শামু শিউলি ফুল ভালবাসে বলে, জয়া তার বাড়িতে শিউলি গাছের চারা রোপণ করে। শামুর মা মারা যাওয়ার পর থেকে লিলি চাচি আর তার বাবার সাথে কথা বলে না। 'ড্রইং রুমে বাবা আর নঈম সাহেব কথা বলেন। লিলি চাচিও একবার ড্রইং রুমে এসে নিজের ঘরে ফিরে যান।'[১৩] শামু শহরে চলে যাওয়ার আগে জয়ার সঙ্গে দেখা করতে এলে, জয়া তাকে শিউলি গাছের তলায় নিয়ে যায়। শিউলি গাছটা বড়ো হয়ে উঠেছে। শামুর হাত ধরে জয়া জানতে চায়, 'তুমি আবার ফিরবে কবে?'[১৪]

শামুর মায়ের আত্মহত্যা বারান্দা-ঘরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। সামাজিক স্বীকৃতির বাইরের সম্পর্ক সীমাবদ্ধতার সীমানা অতিক্রম করলে, সাংসারিক নিরাপত্তার ব্যবধান সরে যায়। মুনতাসীর মামুন যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহবস্থানে বিশ্বাসী তাতে নিরাপত্তাহীনতার কোনো জায়গা নেই। শামুর মায়ের মৃত্যু, সম্পর্কের আড়াল ভেঙে দেয় আর তাই শামুর বাবা আর লিলি চাচির মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব। কিন্তু মামুনের জীবনবোধের ক্যানভাসে চিরন্তন দুঃখের কোনো জায়গা নেই, তাই শিউলি গাছ বেড়ে ওঠে। জয়া শামুর কাছে আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার চায়।

মুনতাসীর মামুন গল্প লিখেছেন কয়েক যুগ আগে। কিন্তু তাঁর প্রতিটি গল্পের চরিত্ররা আজও জীবন্ত। এর কারণ হয়তো মামুনের জীবনবোধ। তিনি জানেন সম্পর্কে জটিলতা থাকবে। সমাজ পরিস্থিতি সব সময় অনুকূলে থাকবে না। কিন্তু জীবন থেমে থাকবে না। আসা-যাওয়ার মাঝে মানুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠবে তারপর নিজের মতো নৌকা ভাসাবে জোয়ারের টানে।

তথ্যসূত্র:

১. রহমান বিনতে মুর্শিদা, মুনতাসীর মামুন গ্রন্থপঞ্জি, ঢাকা, বাংলাদেশ চর্চা, মে ২০২৪, পৃ-১১
২. মামুন মুনতাসীর, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, ঢাকা, অনন্যা
৩. মাছরাঙা টিভির ইন্টারভিউর ইউটিউব লিঙ্ক-https://youtu.be/9-3y-cXuuzI?si=feK4RK3W3v6tVh5e
৪. মামুন মুনতাসীর, কড়ানাড়ার শব্দ, মুনতাসীর মামুনের গল্প, ঢাকা, সুবর্ণা, মে ২০১২, পৃ-২৩
৫. ঐ, পৃ-২৫
৬. সারগী দেবর্ষি, মানবজনম, উপন্যাস সমগ্র ২, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর-২০১৯
৭. মামুন মুনতাসীর, সায়গনের পতন এবং, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯
৮. ঐ, পৃ-৩০
৯. মামুন মুনতাসীর, বৃষ্টিভেজা স্মৃতির গান, ঢাকা, জার্নিম্যান বুকস, ফেব্রুয়ারি, পৃ-৫৯
১০. মামুন মুনতাসীর, সে কোন অঘ্রাণে, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪
১১. নিছক প্রেমের গল্প, প্রাগুক্ত, পৃ-৭২
১২. বন্দরে ফেরা, প্রাগুক্ত, পৃ-১১০
১৩. ঐ, পৃ-১১২।
১৪. ঐ, পৃ-১১৩।

বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্পে হাস্যরস

পার্থ সারথি চক্রবর্তী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
জামালপুর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটোগল্পের এক উজ্জ্বল নাম হল বনফুল। সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ। তবে ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে তিনি বেশি জনপ্রিয়। পেশায় ডাক্তার হওয়ায় তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। এরফলে তাঁর ছোটোগল্পের বৈচিত্র্যও দেখা যায়। তবে তিনি কল্লোলের যুগে অবস্থান করেও নিজের মতো করে গল্প লিখছিলেন। তাঁর বিভিন্ন শ্রেনির গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক শ্রেনি হল হাস্যরসের গল্প। তবে তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছিলেন এবং সেই অসঙ্গতির সমাধান করার চেষ্টাও করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ৮টি গল্পের নিরিখে হাস্যরসকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলি হল 'শ্রীপতী সামন্ত', 'ছোটলোক', 'ক্যানভাসার', 'বৈষ্ণব-শাক্ত', 'অদ্বিতীয়া', 'ছেলে-মেয়ে', 'উত্তরাধিকারী', 'দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা''। যেমন 'শ্রীপতী সামন্ত' গল্পে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে লেখক বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেছেন। আবার মানুষের পোশাক দিয়ে প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়না - তাও বুঝিয়েছেন। 'ছোটলোক' গল্পটিতে Satire এর মধ্য দিয়ে আদর্শবাদী মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। 'ক্যানভাসার' গল্পটিতে হাস্যরস ও করুণরসের মিশ্রণ এবং 'অদ্বিতীয়া' গল্পটিত হিউমারধর্মী হয়ে উঠেছে। বনফুলের ব্যঙ্গপ্রধান গল্প হল 'শ্রীধরের উত্তরাধিকারী'। আবার কৃত্রিম দেশভাবনা হাস্যরসের মোড়কে ফুটে উঠেছে 'দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা' গল্পে। এইভাবে বনফুলের প্রায় সব হাস্যরসাত্মক গল্পই কোনটা কৌতুক প্রধান, কোনটা বুদ্ধিদীপ্ত, কোনটা হালকা চালের। অর্থাৎ বনফুলের হাস্যরসের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিষয় বৈচিত্র্য। সেদিক থেকে তিনি বাংলা ছোটোগল্পের জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
সূচক শব্দ: বিষয়বৈচিত্র্য, হাস্যরস, স্যাটায়ার, ভণ্ড মানুষ, হিউমারধর্মী, জীবনসত্য।

মূল আলোচনা:
রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটগল্পের এক উজ্জ্বল নাম হল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল। পেশায় ডাক্তার বনফুল তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের বিচিত্র রূপকে তুলে ধরেছেন। ছোটগল্পে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল গল্পের রূপ সৃষ্টিতে। গল্প আকারে খুব ছোট হয়েও জীবনের অনেক বৃহৎ ও গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারে—তা তিনি দেখিয়েছেন। বনফুলের এমন অনেক গল্প আছে যা পড়তে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না। এই সব গল্পগুলিকে বুদ্ধদেব বসু ঠাট্টা করে 'চুমুকের গল্প' বলেছেন। তবে শুধু ছোটগল্প নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ৮টি কাব্য, ৫টি প্রবন্ধগ্রন্থ, ৬০টি উপন্যাস, ১২টি ছোটগল্প সংকলন এবং বেশ কিছু নাটক ও স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা প্রায় ৫৮৬টি এবং এই ছোটগল্পগুলিতে বিষয়ের ভিন্নতাও দেখা যায়। যেমন- প্রেমের বিচিত্র ধারা, মফঃস্বলের গ্রামীন জীবনের পাশাপাশি কলকাতার ব্যস্ততম জীবন, পৃথিবীর স্বার্থপর মানুষের পাশাপাশি স্বার্থহীন মানুষের অবস্থান, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা প্রভৃতি। তাঁর ছোটগল্পে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল,

ভীল, ভিখারী, জমিদার, নায়েব, ডাক্তার, মোক্তার প্রমুখ চরিত্রের সমাবেশ রয়েছে। আসলে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই বনফুলের ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

বনফুল হুগলী জেলার শিয়াখানা গ্রামের বিখ্যাত কাঁটাবুনের মুখুজ্যে বংশে জন্মগ্রহণ করলেও পিতার কর্মসূত্রে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা মৃণালিনী দেবী। বনফুল পূর্ণিয়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাহেবগঞ্জ স্কুল থেকে ১৯১৮ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং পরে হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজে আই.এস.সি পড়ার জন্য ভর্তি হন। বনফুলের পিতা একজন সংস্কৃতমনস্ক মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের বাড়িতে অনেক পত্র-পত্রিকাও ছিল। এই পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠা বনফুলের 'মালঞ্চ' পত্রিকাতে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতা প্রকাশের পর বন-জঙ্গলকে ভালোবাসার কারণে বলাইচাঁদ এই 'বনফুল' ছদ্মনামটি ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁর সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাঁর কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ডাক্তার অধ্যাপক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এছাড়া দুই বন্ধু পরিমল গোস্বামী ও সজনীকান্ত দাসও তাঁর পাশে ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং এখানে পড়ার সময় নির্জন ক্লাসরুমে বসে তিনি গদ্য রচনা শুরু করেন। এখান থেকেই তাঁর ছোটগল্পের যাত্রা শুরু।

বনফুলের জন্ম হয় ১৮৯৯ খ্রিঃ ১৯শে জুলাই এবং মৃত্যু ১৯৭৯ খ্রিঃ ৯ই ফ্রেব্রুয়ারী। এই দীর্ঘ আশি বছরের বেশিরভাগ সময়ই তিনি সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সাতটি দশকে বাংলা তথা ভারতের নানা রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ করা যায় যার প্রভাব মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও পড়েছিল। এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ৪৩ এর বাংলায় ভয়াবহ বন্যা, মন্বন্তর, ৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতা এবং এরপর উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল। আর এই সমস্ত বিষয়ের প্রভাব তৎকালীন লেখকদের রচনায় ফুটে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অনেক লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আবার অনেকে গোষ্ঠীবদ্ধ না থেকে স্বমহিমায় বিরাজিত ছিলেন। এই সময় প্রবাসী (১৯০১-১৯৬৬), ভারতবর্ষ (১৯১৩-১৯৫৬), সবুজপত্র (১৯১৪-১৯২৮), কল্লোল (১৯২৩-১৯৩০), শনিবারের চিঠি (১৯২৪-১৯৬৩), কালিকলম (১৯২৬-১৯৩০), বিচিত্রা (১৯২৭-১৯৩৯) প্রভৃতি পত্রিকায় লেখকেরা নিজস্ব ভঙ্গিতে ছোটগল্প লিখতেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতে কল্লোলীয় সাহিত্য ছিল 'রিয়ালিটির কারি পাউডার'। কারণ তাঁরা পাশ্চাত্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা আনতে গিয়ে জীবনের পঙ্কিল, ঘৃণ্য দিকটিকে তুলে ধরেছিলেন। এই কল্লোলের যুগে অবস্থান করেও বনফুল এই ধরনের লেখা লেখেননি। তিনি কোন গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন না—তিনি নিজেই নিজের জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর লেখায় সাধারণ মানুষের জীবনকথাও আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন। বনফুল তাঁর রচনায় তৎকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রিক সময়ের কথা যতটা না বলেছেন, তার চেয়ে বেশী বলেছেন সাধারণ তুচ্ছ মানুষের জীবন সমস্যার কথা। জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি যা দেখেছেন তাই তিনি সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার বিজ্ঞানমনস্ক মনোভঙ্গির জন্য তাঁর সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে চরিত্রগুলির বৈপরীত্যজনিত দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বে বনফুলের আবেগের জয় ঘোষিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের হাস্যরস কখনো শ্লেষাত্মক, কখনো তির্যক বা কখনো ব্যঞ্জনাধর্মী—

> "কিন্তু বনফুলের ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ ধারালো হলেও বনফুল হৃদয়হীন নন। মানুষকে নিয়ে পরিহাস করেছেন, তার ত্রুটি দুর্বলতা কিংবা হীনতা, নীচতা ও

কৃত্রিমতা নিয়ে কঠিন ব্যঙ্গও করেছেন। কিন্তু সেই ব্যঙ্গের অন্তরালে মানুষের অসহায়তার প্রতি তাঁর সহৃদয় করুণামিশ্রিত মমত্ববোধ আশ্চর্য রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।”[১]

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়ে ভিন্নতা আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল—১) হাস্যরসের গল্প ২) সুষ্ঠু জীবনবোধের গল্প ৩) বিষয়কেন্দ্রিক গল্প ৪) চরিত্রপ্রধান গল্প ৫) অলৌকিক গল্প ৬) রূপকধর্মী গল্প ৭) শিশু কিশোর গল্প ৮) পশুকেন্দ্রিক গল্প ৯) আঙ্গিকপ্রধান গল্প ১০) জৈব প্রবৃত্তিমূলক গল্প প্রভৃতি। আমার প্রবন্ধের বিষয় বনফুলের হাস্যরসাত্মক গল্প। তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন শিল্পী। সমাজের যেখানেই তিনি অসঙ্গতি দেখেছেন, সেখানেই তিনি ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, হাস্যরসের মধ্য দিয়ে তা সংশোধন করার চেষ্টাও করেছেন। বনফুল এই শ্রেণির অজস্র হাস্যরসের গল্প লিখেছিলেন। সেগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ কৌতুকরসের গল্প, হালকা চালের হাস্যরসের গল্প, ব্যঙ্গপ্রধান গল্প, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের গল্প প্রমুখ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমেই বনফুলের ‘শ্রীপতী সামন্ত’ গল্পটি নিয়ে আলোচনা করবো। গল্পটি একটি জনপ্রিয় গল্প। এই গল্পে লেখক Satire এর সুন্দর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আমাদের দেশে ইংরেজদের দ্বারা লালিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এক শ্রেণির মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল, যারা বাবু সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেই আলোচ্য গল্পটি রচিত হয়েছিল। গল্পে দেখা যায় দীন চেহারার শ্রীপতী সামন্ত তৃতীয় শ্রেণির টিকিট কেটে রাত্রি আটটায় স্টেশনে এসে দেখেন তৃতীয় শ্রেণিতে এতো লোক যে তিল ধারণের জায়গা নেই। এই শ্রীপতী সামন্তের “পরণে একটা আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহার ডানদিকের ডাণ্ডাটি নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা”[২]। এই বর্ণনায় প্রথমত মনে হবে লোকটি গরীব। এহেন মানুষটি একটু ঘুমাবে বলে তুলনামূলকভাবে ফাঁকা প্রথম শ্রেণীতে উঠতে চায়। কিন্তু সেখানে সাহেবী পোষাক পরিহিত এক ভদ্রলোক যার মুখে ধুমায়মান পাইপ ঝুলছিল, সে আপত্তি জানায়। শেষে কোন উপায় না পেয়ে সামন্ত মহাশয় ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে প্রথম শ্রেণিতে উঠে পরে। এরপরই ঘটল আসল ঘটনা যা লেখক হাস্যরসের মোড়কে তুলে ধরেছেন। ট্রেন ছাড়ার পর ক্রু এলে সামন্ত মহাশয় তার যাবতীয় জিনিসপত্র সহ নিজের ভাড়া মিটিয়ে দেয়। পরে বাঙালীবাবুর কাছে গেলে সে জানায়- “মাই টিকিট ইজ ইন মাই সুটকেস, প্লিজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।”[৩] কিন্তু শেষে দেখা গেল তার সুটকেসে দেশলাই, পাইপ আর সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়া কিছুই নেই। শেষে শ্রীপতী সামন্তের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় সে তার ভাড়া মিটিয়ে দেয়। বনফুল আলোচ্য গল্পে Satire এর মধ্য দিয়ে বাবু সম্প্রদায়ের ভণ্ডামিকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তার পোষাকে নয় তাও দেখিয়েছেন। আবার বনফুলের ‘ছোটলোক’ গল্পে Satire এ আরো তীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অনমনীয় স্বভাবের রাঘব সরকারের মস্তক সর্বদা উন্নত। তিনি যথাসাধ্য লোককে উপকার করেন, কিন্তু নিজে কারোর দ্বারা উপকৃত হন না। এহেন রাঘব সরকার একদিন দ্বিপ্রহরে রোদকে উপেক্ষা করে দ্রুতপদে হাঁটছিলেন। সেই সময় এক রিক্সাওয়ালার আকুতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। কিন্তু সমস্যা হল তিনি রিক্সা বা পালকি এই জাতীয় যানে চড়েন না- তাতে তার আদর্শে বাধে। অথচ রিক্সাওয়ালার প্রতি তাঁর করুণা হয়। তাই তিনি রিক্সায় না চড়ে, তাকে শিবতলা পর্যন্ত নিয়ে এসে ভাড়া বাবদ ৬ পয়সা দেন। এতে রিক্সাওয়ালা অপমানিত হয় এবং

জানায় সে কারোর কাছে ভিক্ষা নেয় না। এই উক্তির মধ্য দিয়ে আদর্শবাদী ভদ্রলোক রাঘব সরকারের অর্ন্তদৃষ্টি উন্মোচন হল। গল্পটিতে লেখক হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সমাজের এক শ্রেণির ভণ্ড মানুষের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন।

'ক্যানভাসার' গল্পে বনফুল হাস্যরস ও করুণ রসকে একাত্ম করেছেন। গল্পে বেকার ভৈরবের স্ত্রী হল কাত্যায়নী। অর্থাভাবের জন্য কাত্যায়নীর জীবনে কোন শখ মেটে নি। এই ভৈরবের গ্রামে হঠাৎ একদিন ক্যানভাসার হীরালাল এসে উপস্থিত হয় এবং দাঁতের মাজন বিক্রি করতে থাকে। কিন্তু ভৈরব মনে করে এইগুলো বুজরুকি ছাড়া কিছু নয় এবং তাদের মত লোকেরা দেশের শত্রু। সে হীরালালকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে বলে এবং উভয়ের বচসার মধ্যে ভৈরব হীরালালের মুখে আঘাত করে। এই আঘাতে হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলি খুলে যায়। অর্থাৎ সে ফোক্‌লা ছিল। এখানে পাঠকের মনে হাসির উদ্রেক সৃষ্ট হয়। তবে এখানেই বনফুল থামেননি। গল্পে দেখি স্তম্ভিত ভৈরব তার কালো কুচ্‌কুচে গোঁফের দিকে দেখলে হীরালাল হেসে বলে- "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা ও! ভালো কলপও আমি রাখি, নেবেন! কেন মার ধোর করেছেন মশাই? গরীব মানুষ এই করেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।"[৪] এই উক্তির মধ্য দিয়ে গল্পটির হাস্যরস থেকে করুণ রসের দিকে উত্তীর্ণ হল। এখানেই বনফুলের হাস্যরস সাহিত্যে অন্য মাত্রা এনেছে। আবার পরিহাস রসের গল্প হিসাবে 'বৈষ্ণব-শাক্ত' গল্পটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির কামড়ায় অসংখ্য ভিড়। এই ভিড়ের মাঝে পরম শাক্ত কালীকিঙ্কর বর্মা এবং পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামী ধর্ম বিষয়ে তর্ক করছিলেন, দুজনেই দুজনের বিশ্বাসের জায়গায় অনড়। কিন্তু একটি বিষয়ে তারা সহমত পোষণ করেছেন- তা হল অর্থ না থাকলে ধর্ম টেকে না। গল্পে প্রত্যক্ষ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল যখন বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামী, যিনি কিনা রক্তপাত পছন্দ করেন না, তাঁরই আবার মাদলের আঘাতে নাক দিয়ে রক্তপাত হয়। আবার কালীকিঙ্করের মত শাক্তকেও অর্থের অভাবে ছুরি কেটে শশা খেতে হচ্ছে। কিন্তু হাসির মধ্য দিয়ে লেখক গল্পটির রহস্য উন্মোচন করলেন-"সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শসা খাইয়া নামিয়া গেলেন, তখন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারলেন না যে, গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বক্রধর মিত্র, অপর কেহ নন।"[৫]

বনফুলের 'অদ্বিতীয়া' হাস্যরসে ভরপুর একটি গল্প। গল্পটিতে পুরুষদের বারবার বিবাহ করার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পে দেখা যায় স্ত্রী প্রভাবতীর ধারণা ছিল যে তার স্বামীর জীবনে সে অদ্বিতীয়া। গল্পে প্রভাবতীর চার বছরে ৬টি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন এবং আরেকটি সন্তানের জন্ম দিতে বাপের বাড়িতে আসেন। তার ধারণা ছিল স্বামী তাকে খুব ভালোবাসে। তার যদি কোন কারণে মৃত্যু ঘটে তাহলে সে আর বিয়ে করবে না- এই বিষয়ে তার দিদির সাথে বাজিও রাখে। তাই তার মৃত্যু সংবাদ বাপের বাড়ি থেকে তার দিদি পাঠায়। কিন্তু এই সংবাদের তিন মাসের মধ্যেই পত্নীব্রত স্বামীটি আবার বিবাহে রাজি হয় এবং বিবাহ করার জন্য গোঁফও কেটে ফেলে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কথকের আবার বিবাহ করার যুক্তিটি হাস্যরস। সে সেজদিকে পত্র লিখে জানালেন - "বিয়ে করতে আর ইচ্ছা হয়না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখো সেজদি, আমার ইচ্ছে- অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে তো সংসার বসে না। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবন হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়- এটা ঠিক। তাছাড়া দেখো, আমরা 'মা ফলেষু কদাচন' দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ, তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টা করাই উচিত বোধহয়।

দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ-অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে তো?..”[৬] তবে হাস্যরস আরো তীব্র হয় যখন কথক ফুলশয্যার রাত্রে বুকে অনেক আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে নববধূর কাছে গিয়ে দেখে সাতটি সন্তান পরিবৃত করে তাঁরই প্রথমা স্ত্রী পালঙ্কে বসে আছে। কথকের আশাহত রূপ দেখে পাঠক হাস্যরসে সামিল হয়। কিন্তু বনফুলের হাস্যরসের যে সংযম দেখা যায় তা এই গল্পেও আছে। প্রভাবতী তাঁর স্বামীর কাছে নিজেকে অদ্বিতীয়া ভাবতো। সে ভাবনা দূর হল এবং গল্পটি হয়ে উঠল হিউমারধর্মী। আবার বনফুলের ‘ছেলেমেয়ে’ গল্পটি কৌতুকের আবহে তৈরী হলেও শেষে করুণরসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষজাতি সম্বন্ধে নারীর মনের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে আন্নাকালী ও নমিতা চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়ে। দুজনেই আসন্ন প্রসবা মহিলা। আন্নাকালীর বয়স চল্লিশ এবং নমিতা সপ্তদশী। দুজনে হসপিটালের বেডে শুয়ে স্বাভাবিক আলাপচারিতার পর নিজেদের স্বামী তথা পুরুষজাতির প্রতি নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। এই দুজনের পতিনিন্দা পাঠকের মনে হাসির উদ্রেক সৃষ্টি করে। কিন্তু এই হাস্যরস গল্পের শেষে করুণরসে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। পরপর সাতটি কন্যা সন্তান জন্ম দেবার পর আন্নাকালীর অষ্টম সন্তানটি ও কন্যা হয়। অপরদিকে নমিতা জন্ম দেয় পুত্রসন্তানের। আন্নাকালী কন্যা দেখে রেগে যায় এবং চিৎকার করতে থাকে যে তার সন্তানটিকে নমিতার সাথে পাল্টানো হয়েছে। তার এই চিৎকারে হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে ওঠে। গল্পটিতে একদিকে যেমন নারীমনস্তত্ব ফুটে উঠেছে অন্যদিকে তেমনি নিয়তির অসহায়তায়ও প্রকাশ পেয়েছে।

বনফুলের হাস্যরসাত্মক আরো দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘শ্রীধরের উত্তরাধিকারী’ ও ‘দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা’। ‘শ্রীধরের উত্তরাধিকারী’ গল্পটি ব্যঙ্গপ্রধান গল্প। গল্পে দেখা যায় শ্রীধর অত্যন্ত কৃপণ প্রকৃতির লোক। তার এই কৃপণতার জন্য লোকে তাকে ‘মক্ষিচুস’ আখ্যা দিয়েছেল। শ্রীধর এতই কৃপণ ছিল যে সকালে কেউ তার নাম উচ্চারণ করতো না। এই শ্রীধর ভৃত্য নকুলের সাথে থাকতো। তার প্রচুর অর্থ, কিন্তু তিনি খুব একটা ব্যয় করতেন না। তিনি নাকি টাকা ব্যাঙ্কে না রেখে মাটির তলায় রাখতেন। তাঁর কৃপণতার কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেন – “নকুড় অবশ্য শুধু ভৃত্য নয়। সে একাধারে পাচক, ভৃত্য, বন্ধু, পরামর্শদাতা-সব। দিনে নকুড় ভাতে ভাত ফুটাইয়া দেয়। রাত্রে হরিগোয়ালা সুদ পরিশোধকল্পে যে দুধটুকু দিয়া যায় তাহাই উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। জলখাবারের পাট নাই। পোশাক-পরিচ্ছদের খরচও নাই বললেই চলে। আইন বাঁচাইবার জন্য যতটুকু আবরণ প্রয়োজন ততটুকুই শ্রীধর মিত্র অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। দিনে সূর্য এবং রাত্রে রেড়ির তেলের ক্ষুদ্র একটি মৃতপ্রদীপ তাঁহার অন্ধকার মোচন করিয়া থাকে”[৭]। তাঁর এত টাকা থাকা সত্ত্বেও কোন জনহিতকর কাজে কোন অর্থ সাহায্য তিনি করতেন না। গল্পে দেখা যায় জলধর নামে এক উকিল একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং শ্রীধরের কাছে সাহায্যের জন্য গেলে শ্রীধর স্ত্রীশিক্ষাকে খাল কেটে কুমির আনার সাথে তুলনা করেছেন। শুধু তাই নয়, অর্থ না দেবার জন্য স্ত্রীশিক্ষাকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীধরের বয়স ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং মৃত্যু চিন্তা তাকে গ্রাস করলো। তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না যে মৃত্যুর পর তার অর্থের কী হবে?- অবশেষে তিনি একদিন মৃত্যুর ভান করলেন এবং তার সৎকার্যের জন্য একজন ছাড়া কেউই এগিয়ে এলেন না। ভৃত্য নকুলের কাছে সব জানার পর সিগারেটখোর ঐ আগত ভদ্রলোকটিকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন এবং নকুলের জন্য কিছু রেখে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী উক্ত লোকটিকে করলেন। গল্পটি ব্যঙ্গপ্রধান গল্প, তবে গল্পের শেষে শ্রীধরের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন

গল্পটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। আবার 'দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা' গল্পে এক অলস, আরামপ্রিয় ব্যক্তির অন্যের প্রতি কৃত্রিম সহানুভূতি দেখানোর চিত্র হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। কেনারাম নামক ব্যক্তির চরিত্রের পরস্পর বিরোধী আচরণ দেখে পাঠক না হেসে পারে না। তিনি প্রত্যহ তিনটি সংবাদপত্র পাঠ করেন এবং দেশের দুঃখ-দুর্দশায় বিহ্বল হন। দেশের দুঃখের কথা সংবাদপত্রে পড়তে পড়তে তিনি কাপের পর কাপ চা শেষ করেন। এহেন কেনারাম সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাবার সময় এক অনাথিনী বালিকাকে দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাকে সাহায্যের কথা ভাবলে তার মনে হয়—"ইচ্ছা হইল কিছু অর্থ সাহায্য করি। পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি এমন সময়ে বিবেক বলিল —পয়সা দিয়া কি তুমি উহার দুঃখ দূর করিতে পার? ভিক্ষা দিলে উহাকে অপমানই করা হইবে।"[৮] আর এই ভাবনা আর কাজের মধ্যে যে অসঙ্গতি তা হাস্যরসের উদ্রেক সৃষ্টি করে। ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে এসে মাংসের কোর্মা সহযোগে লুচি আহার করতে করতে তাঁর দেশের অনাহার মানুষের কথা মনে পড়লো। এরপর তাঁর মানুষের গৃহহীন ভাবনার কথা মনে পড়লো। কত মানুষ ফুটপাতে শুয়ে আছে। এটা ভাবতে ভাবতে তিনি দেখলেন তাঁর বালিশের উপর রোমশ তোয়ালাখানি নেই। স্ত্রীর প্রতি ক্ষুন্ন হলেন - "গৃহিনী সেকেন্ড শোয়ের সিনেমায় গিয়াছেন, আমার বালিশের উপর তোয়ালে দেওয়া হইয়াছে কিনা দেখিবার অবসর পান নাই। এই দেশেই কি সীতা সাবিত্রী ছিল? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া যে চাকরটিকে নিযুক্ত করিয়াছি সেও আমার বালিশের উপর তোয়ালেটিকে বিছাইয়া দিবার অবসর পায় নাই। খাদ্যমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকিবাজ। এ দেশের কি কোনওদিন উদ্ধার হইবে? মনের কষ্ট মনে চাপাইয়া স্বহস্তেই বালিশের উপর রোমশ তোয়ালেটি বিছাইয়া লইলাম।"[৯] এইভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে বনফুল দেশদরদী কেনারামের কৃত্রিম দেশভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার কাজ ও ভাবনার যে অসঙ্গতি সমগ্র গল্পতে আছে তা হাস্যরসাত্মক।

উপরিউক্ত গল্পগুলি ছাড়াও অজস্র গল্পে বনফুল হাস্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তবে তাঁর গল্পের হাস্যরসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিষয়বৈচিত্র্য। তাঁর গল্প আকারে ছোট ও হালকা হয়েও হাস্যরসের মধ্য দিয়ে জীবনের নানা বৃহৎ ও গভীর সত্য প্রকাশ পেয়েছে। তাই তিনি শুধু লোক হাসাবার জন্য এই হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি লেখেননি, নিজে নিসারক্ত থেকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গল্পগুলি স্যাটায়ার, হিউমার প্রভৃতি হাস্যরসের ধারাগুলি ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে আইরোনিক্যাল। তাই বলা যায়—"বঙ্কিমচন্দ্র একদা কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত ও নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের স্যাটায়ারের আলোচনা করতে গিয়ে ডাক্তারের যে সরু ল্যানসেটখানির তুলনা দিয়েছিলেন, বনফুলের ক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য। তিনি যে কখন সে সূক্ষ্ম অস্ত্রখানি কুচ করে ব্যথার স্থানে বসিয়ে দেন তা অনেক সময় ধরাই যায় না, কিন্তু ক্ষত মুখে হৃদয়ের শোনিত অনিবার্য বেগেই বেরিয়ে আসতে থাকে। সমাজবৃক্ষে কোথায় কোন বাঁদর বসে আছে, তাঁর সর্বদর্শী দৃষ্টিতে তাও এড়িয়ে যাবার যো নেই, এবং ল্যাজ শুদ্ধু তার অবিকল ছবিটি দুচারটি মাত্র আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। অবশ্য যে অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বা দীনবন্ধু 'রিয়ালিস্ট' ও 'স্যাটায়ারিস্ট' সেই একই অর্থে বনফুলকেও সমগোত্রভুক্ত করলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না"। ১০ বাংলা ছোটগল্পে এক ভিন্ন ধারার হাস্যরস তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি:
১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৮।
২। চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', 'মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রঃ লিঃ', পুণর্মুদ্রণ-২০০৬-২০০৭।
৩। ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদিত, 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প', বানীশিল্প সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৬।
৪। নন্দী, ড.উর্মি, 'বনফুলঃ জীবন, মন ও সাহিত্য', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পুস্তকমেলা ১৯৯৭।

তথ্যসূত্র:
১। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দ্বিতীয় সংস্করন, আষাঢ় ১৪০৭, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা -৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.৩১০
২। ভট্টাচার্য্য, জগদীশ, সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ন ১৪১৩, বনফুলের শ্রেষ্টগল্প, ১৪ এটেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, বানীশিল্প, পৃ. ৫৮
৩। তদেবঃ পৃ.৫৯
৪। তদেবঃ পৃ.৫৫
৫। তদেবঃ পৃ.৫৬
৬। তদেবঃ পৃ.৪১
৭। তদেবঃ পৃ.১১১
৮। তদেবঃ পৃ.২০৮
৯। তদেবঃ পৃ.২০৯
১০। তদেবঃ পৃ.৯।

‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ : জাদু বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা

দেবদীপ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ

সারসংক্ষেপ: ‘জাদু বাস্তবতা’ কাকে বলে? কোন নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞার দ্বারা ‘জাদু বাস্তব’কে কি ব্যাখ্যা করা যায়? ‘জাদু বাস্তব’-কে নিয়ে এত বিতর্ক কেন? এর উৎপত্তিই বা কোথায়? এইসব বিষয়ের উত্তর খোঁজার সঙ্গে J.A.Cuddon-এর গ্রন্থের সহযোগিতায় জাদু বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছি। শুধুমাত্র বৈশিষ্ট্য নির্মাণই নয়, প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ তুলে এনেছি বিশ্ব সাহিত্য থেকে। ‘বাংলাদেশের মার্কেজ’ বলা হয় শহীদুল জহিরকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ কি জাদু বাস্তবধর্মী প্রয়াস ছিল? এই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা এই প্রবন্ধে। দেখিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পাকিস্তানি আর্মি ও কিছু রাজাকার মিলে কিভাবে নৃশংস অত্যাচার করেছিল নির্দিষ্ট একটি মহল্লার উপরে এবং সেই অত্যাচারের দলিল কীভাবে ‘জাদু বাস্তব’-এর মোড়কে আমাদের সামনে শহীদুল হাজির করলেন। আসলে ওই নির্দিষ্ট একটি মহল্লার মধ্যেই ওই কাহিনি আঁটকে থাকেনি, ওই ‘লক্ষ্মীবাজার মহল্লা’ হয়ে উঠেছে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের, অধুনা বাংলাদেশের আত্মার প্রতীক, যাকে কেন্দ্র করে জাদু বাস্তবধর্মী সাহিত্যে নিজের জাত চিনিয়েছেন নিয়েছেন শহীদুল জহির।
সূচক শব্দ: জাদু বাস্তবতা, পূর্ব পাকিস্তান, মুক্তিযুদ্ধ, শহীদুল জহির, গোলকধাঁধাময় প্লট, সময়ের আবর্তন।

মূল আলোচনা:

মেক্সিকান সাহিত্য সমালোচক লুইস লিয়েল ‘জাদু বাস্তব’ সম্বন্ধে লঘু চালে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন-

> ‘If you can explain it then it is not magic realism’[১]

তবে জাদু বাস্তবের বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামনে রেখে লুইস লিয়েল নিজের মত সংজ্ঞা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন--

> ‘without thinking of the concept of Magical realism each writer gives expression to a reality in the people to me magical realism is an attitude on the part of the characters in the novel toward the world’[২]

‘জাদু বাস্তবতা’ বিষয়টা কী, তা জানবার আগে Magic Realism নামটির বা আখ্যাটির পূর্ব ইতিহাসটা জেনে নেওয়ার প্রয়াস করি।

সম্ভবত জার্মান শব্দ ‘Magicher Realismus’ থেকে এই শব্দটির উৎস। তারপর স্পেনীয় ভাষায় ‘Realismo Magico’ এবং তারও পরে ইংরেজি ‘Magic Realism’ শব্দটি শিল্প আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। অন্যমতে ‘Lo real maravilloso’ থেকে অনুদিত

হয়ে গড়ে ওঠে ইংরেজি শব্দ ‘Marvellous Realismo’ এবং ‘Marvellous Reality’. পরে স্পেনীয় ‘Realismo Magico’ থেকে গড়ে ওঠে ইংরেজি ‘Magical Realism’ শব্দটি।

‘জাদু বাস্তব’ বহু আলোচিত, নিন্দিত ও নন্দিত একটি তত্ত্ব। ‘ম্যাজিক রিয়ালিজম’ শব্দটি ১৯২৫ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ফ্রাঞ্চ রো। জাদু বাস্তবের ব্যবহার দেখা গিয়েছে সাহিত্যে, শিল্পকলায়, চলচ্চিত্রে। ফ্রাঞ্চ রো জার্মানিতে ভ্যানগগের একটি চিত্র প্রদর্শনী দেখে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। সেই চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবন রহস্যকে ধরবার প্রয়াস ছিল। ‘জাদু বাস্তব’ কী তা এক কথায় বলা শক্ত। কোন লেখক হয়তো জাদু বাস্তবের কোন এক প্রবণতা ব্যবহার করলেন প্লটের বিশেষ প্রয়োজনে কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা অন্য প্লটে জাদু বাস্তব হিসাবে গ্রহণ নাও হতে পারে। এই প্রয়োগগত ভিন্নতা ‘জাদু বাস্তব’ নামক শিল্প আন্দোলনের বোধকে জটিল করে তুলেছে। ‘জাদু বাস্তব’ এই আখ্যাটিতে আছে দুটি বিপরীত শব্দের সমাবেশ—‘জাদু’ ও ‘বাস্তব।

শুধুমাত্র ভ্যান গগ নয় সেই সময় অন্যান্য জার্মান চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও বাস্তবের সঙ্গে কুহক মেশানো চিত্র অঙ্কনের প্রবণতা দেখা যায়। সেই সময় বলতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। জার্মানিতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, হিটলার ও অন্যান্য বাম-ডানপন্থী দলগুলির মধ্যে তীব্র লড়াই, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সংকট, জোট সরকার এই অরাজকতা দমনে ব্যর্থ; এই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সুভদ্র বস্তুগত বিচার ও প্রকাশবাদী মানবিকতা এবং যুক্তিবিচারে আস্থা না রাখতে পেরে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। ফ্রাঞ্চ রো এই সময় উল্লিখিত চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যে পরা বাস্তববাদী চিত্র তথা শিল্পের থেকে ভিন্ন তা প্রকাশ করতে গিয়ে ‘Magic Realism’ বা ‘জাদু বাস্তব’ শব্দটি ব্যবহার করেন।

জে.এ.কোডন তাঁর ‘Dictionary of literary terms and literary theory’ জাদু বাস্তবের যে লক্ষণ তুলে ধরেছেন তার বাংলা তর্জমা করার চেষ্টা করছি, সঙ্গে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ পেশ করার করছি--

১. বাস্তব, রূপকথা, উদ্ভটের মিশ্রণ বা সহাবস্থান। যেমন- গার্সিয়া মার্কেজের ‘বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো’ গল্পে একটি গ্রামের সাদামাটা জীবনে হঠাৎ একজন ডানাওয়ালা বৃদ্ধ এসে পড়লে সাধারণ গ্রাম্য জীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

২. চকিতে সময়ের পরিবর্তন হবে-- এমন নৈপুণ্য। যেমন-শহীদুল জহিরের ‘কাঁটা’ গল্পে ভূতের গলির বাসিন্দারা প্রত্যেক দশকে একবার করে একটি নির্দিষ্ট হিন্দু দম্পতিকে খুন হতে দেখে। প্রত্যেকবার খুনের কারণ বদলায় কিন্তু প্রত্যেকবারই খুনের আদলটা এক থাকে। তখন তাদের মনে হয় তারা সময়ের একটি আবর্তে পড়ে গেছে এবং ঘটনাগুলো এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে পাঠককে সময় সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকতে হয়।

৩. কাহিনীর বিভিন্ন অংশ একত্র পাকানো থাকবে অর্থাৎ গোলকধাঁধাময় প্লট। যেমন- গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ‘শত বছরের নিঃসঙ্গতা’ উপন্যাসে অনেকগুলি প্রজন্মের কাহিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে একটির সঙ্গে আরেকটির সূত্র পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৪. স্বপ্নের সঙ্গে রূপকথা ও মিথের ব্যবহারও চলে আসবে। যেমন-আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস ‘খোয়াবনামা’য় মুনসির শ্লোকে শ্লোকে লোকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বেড়ায় চেরাগ আলি। এই মুনসি মৃত, কিন্তু গ্রামের সবাই জানে কাৎলাহার বিল শাসন করে মুনসি বয়তুল্লা শাহ।

৫. প্রকাশবাদী বর্ণনা ও সুররিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তববাদী ধারণা স্থান পাবে। যেমন- মার্কেজের ‘আলো, সে তো জলের মত’ গল্পের দুই চরিত্র তোতো ও হোয়েলের আচরণকে পরা বাস্তববাদের কোঠায় রাখা যায়।
৬. রহস্যময় বা মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্য। যেমন- ‘কর্নেলকে কেউ লেখে না’ গল্পে সর্বদা একটা রহস্যঘন পরিবেশে যেন সৃষ্টি হয়ে আছে। উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র গল্পকে দেখলে লেখকের এই মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়।
৭. সহসা বা অতর্কিত চমকের আগমন। যেমন- মিলন কুন্দেরার ‘শাশ্বত কামনার সোনালী আপেল’ গল্পে যুবকদ্বয়ের বারবার স্থান পরিবর্তনের দ্বারা চমক সৃষ্টি।
৮. ব্যাখ্যাতীত ও আতঙ্কময় উপস্থিতি। যেমন-শহীদুল জহিরের ‘সে রাতে পূর্ণিমা ছিল’ উপন্যাসে একাধিক অতিলৌকিক বর্ণনা ব্যাখ্যাতীত ও আতঙ্কময় পরিবেশ রচনা করে।[৩]

এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে Joan mellen কতৃক চিহ্নিত আরো কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করা যেতে পারে--
১. জাদু বাস্তব পরিপার্শ্বের বাস্তবকে সর্বদা অনুসরণ করবে এমনটা নয়, বাস্তবের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা বাস্তবকে সে ধরতে চায়।
২. অনেক সময় এখানে আশ্রয় পায় কাল্পনিক নগর, সমাজ, আর মানুষের ভাগ্য তারই প্রেক্ষিতে পায় চূড়ান্ত রূপ।
৩. জাদু বাস্তববাদ পরাবাস্তববাদী বা ফ্যান্টাসি মুখ্য সাহিত্য নয়, এর প্রবণতা পৃথক।
৪. বাস্তব এখানে আংশিক বা ভাঙা, তার মধ্য দিয়েই প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে পৌঁছে যেতে হয় পাঠককে।[৪]

জাদু বাস্তবের বিভিন্ন দিক আলোচনার পর আমরা শহীদুল জহিরের সাহিত্যিক - মানসিকতা ও লেখার ধরণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নিতে সচেষ্ট হব। জহিরকে ‘বাংলাদেশের মার্কেজ’ বলা হয়ে থাকে। শহীদুল জহির এক সাক্ষাৎকারে শামীম রেজাকে জানিয়েছেন তাঁর লেখায় ‘দুটো জিনিস’ নেই-
ক. ভক্তিরস।
খ. সাংস্কৃতিক আভিজাত্য অর্জনের স্পৃহা।

তিনি তাঁর প্রিয় লেখকদের সারিতে রেখেছেন মহাশ্বেতা দেবী, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-প্রমুখদের। একটা স্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তিনি সমাজের গভীরতম সমস্যা গুলোকে নিজের সাহিত্য রচনার উপাদান হিসেবে নির্বাচন করবেন- এমনটা মনস্থির করে রেখেছিলেন। সেই একই সাক্ষাৎকারে একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এমনভাবে দিয়েছেন যে মনে হয় কথা বলার ভঙ্গিমাও বুঝিবা কুহক মিশানো--
প্রশ্ন- আপনি কি সেই লেখাটি লিখতে পারছেন যেটা লেখার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন?
উত্তর- পারছি না। সে রকম কিছু লেখার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি কিনা তাও আমার জানা নাই![৫]

ওই সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে পাঠকের ওপর কোন কিছু তিনি চাপিয়ে দিতে চান না, পাঠকের সামনে অনেক ‘অপশন’ তুলে ধরতে চান, আর এটাই তাঁর ‘ফার্স্ট ফিলোসফি’।

২০০৮ সালে শহীদুলের আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে জাদু বাস্তব চর্চার বিপুল ক্ষতি হয়েছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লেখার ভাষা ও শব্দের প্রয়োগে, বাক্যের বিন্যাসে বা লেখনশৈলীর মধ্যে সচেতনভাবে কুহক মিশিয়ে দেওয়া আর কোনদিন কোন বাংলা লেখকের কলমে দেখা যায়নি, শহীদুল জহির এখানে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। লেখক নিজেই জানিয়েছেন নির্দিষ্ট একটি সমস্যা বা সমাধান তাঁর কাহিনি থেকে বেরিয়ে আসুক তা তিনি চান না, তিনি পাঠকের সামনে 'অনেক অপশন' রাখতে চান। এই যে সচেতন ভাবে জটিলতা সৃষ্টি বা রহস্যময়তার আস্তরণ গড়ে তোলা, তা প্লটের কুহককে আরো বাড়িয়ে তোলে।

'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে যুবক আব্দুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে। উপন্যাসের সময়কাল ১৯৮৫ সাল, রচনাকাল ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় হাক্কানি পাবলিশার্স থেকে। লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের যুবক এই আব্দুল মজিদ হল উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসটিতে অনেকগুলি ঘটনা একসাথে সমান্তরাল ভাবে চলেছে। কখনো তারা একসাথে মিশেছে আবার পরম মুহূর্তেই আলাদা হয়ে গেছে। ঠিক যেন রেললাইন, জংশন স্টেশনের আগে বা পরে দুটি ভিন্ন রুটের রেললাইন যেমন একসাথে মিলিত হয়ে যায় এবং কিছু পরেই আবার বিভাজন স্পষ্ট হয়ে যায়, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'র কাহিনিগুলো ঠিক সেরকম। লক্ষ্মীবাজার মহল্লার সব মানুষেরাই আজানের ধ্বনি শুনতে পায় কিন্তু একই জায়গায় একই সময়ে উপস্থিত থেকেও উপন্যাসের খল চরিত্ররা আজান ধ্বনি শুনতে পায় না- এই ধরনের 'জাদু'র আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে। মূলত চারটি ঘটনা বা কাহিনি একসাথে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে চলেছে--

ক. আব্দুল মজিদ ও তার দিদি মোমেনার করুণ কাহিনি।

খ. মায়ারানী ও তুলসী গাছের কাহিনি।

গ. বদু মওলানা, অন্যান্য রাজাকার, পাকিস্তানি মিলিটারি নৃশংসতা।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধের পর রাজাকারদের পরিণতি ও তার পরবর্তী সময়ে জীবিত রাজাকারদের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি।

একাত্তরের যুদ্ধের সময় কুখ্যাত রাজাকার বদু মওলানা বিকেলে নিয়মিত লক্ষ্মীবাজারের মহল্লায় কাকেদের মাংস খাওয়াতো। বিকেলের নরম আলোর মত করে হাসতো বদু মওলানা আর মহল্লাতে কাকেদের আনাগোনা শুরু হতো। ছাদের ওপর উঠে যেত এক থালা মাংস নিয়ে, সঙ্গে থাকতো তার ছেলেরা, তারপর মাংসের টুকরোগুলো আকাশের দিকে ছুড়ে দিত। মহল্লার লোকেরা ক্রমে জানতে পেরেছিল মাংসের টুকরোগুলো নিহত মানবদেহের। মহল্লার অন্তত তিনজন মানুষ নিশ্চিত করেছিল মাংস বা তরুণাস্থিগুলো মানবশরীরেরই বিভিন্ন অংশ-

ক. খাজা আহমেদ আলি- ছুঁড়ে দেওয়া এক টুকরো মাংস কাকেরা ধরতে ব্যর্থ হলে আহমদ আলীর ছাদের ওপর এসে পড়ে। তিনি টুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে দেখেন সেটার গায়ে ছোট মসুর ডাল এর মত একটি পাথরের ফুল। তিনি হাহাকার করে ওঠেন। বড় ছেলে খাজা শফিকের সহায়তায় সেটা দাফন করেন নিজের বাড়ির আঙিনায়। তারপর মাগরিবের নামাজের সময় তিনি ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকেন; একটি অদেখা মেয়ের মৃত্যু যন্ত্রণায় বৃদ্ধের হৃদয় সেদিন ভেঙে পড়ে।

খ. আব্দুল করিমের বড় ছেলে- এই ব্যক্তি যে টুকরোটি দেখেছিলেন সেটা ছিল পায়ের বুড়ো আঙুল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক দেখে সবাই ভেবেছিল সেটা একটা মেয়ের আঙুল, তারপর দেখা গেল নখের গোড়ার দিকে ঘন এবং মোটা লোম। তখন মানুষজন আঙুলটির লিঙ্গ নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

গ. জমির ব্যাপারী- এই ব্যক্তির কুয়োতলায় যে টুকরোটি কাকেদের নাগাল এড়িয়ে পড়েছিল সেটি হল একটি পুরুষ যৌনাঙ্গ, যাতে খতনা করা ছিল। জমির ব্যাপারী সেটা বদু মওলনার ঘরে দিয়ে আসে।

এই তিন ব্যক্তিরই পরবর্তীকালে মর্মান্তিক পরিণতি হয়। প্রথম দুজনে মারা যায় এবং তৃতীয় জন পরিবার সমেত নিখোঁজ হয়। প্রকৃতপক্ষে বদু মওলনা একজন হিমশীতল মস্তিষ্কের খুনী এবং একই সঙ্গে ধূর্ত, মনুষ্যত্ব বিহীন এক অত্যাচারী খল চরিত্র। যে বা যারা তার মতের বিরুদ্ধে গেছে, তার বিরুদ্ধে সামান্য মাথা তুলেছে তারই জীবন সে নরক করে দিয়েছে।

সমগ্র প্লটে আব্দুল মজিদের দিদির কাহিনিটিই সবচেয়ে করুণ। আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের সমস্ত সদস্যের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তান আর্মি ও বদু মওলানার লালসা থেকে মোমেনা বাঁচতে পারেনি। পাকিস্তান আর্মির হাতে অপহরণ হওয়ার দুদিন পর তার মৃতদেহ নগ্ন, স্তনচ্যুত অবস্থায় পাওয়া যায়—

'তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে ঊরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডানঊরু থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মত হাঁ করে রাখা, সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল... মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত।'[৬]

এই দৃশ্যের অভিঘাত থেকে আব্দুল মজিদ আজীবন বেরিয়ে আসতে পারেনি।

মায়ারানী একজন হিন্দু মহিলা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের দিদিমণি এবং তার চেহারার বর্ণনার দ্বারা লেখক জানিয়েছেন তাকে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না। বয়ঃসন্ধিকালে তার প্রেমে পড়ে মোহাম্মদ সেলিম, পরবর্তীকালে সে মুক্তিযুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে। মহল্লায় যেদিন পাকিস্তান আর্মি এসেছিল সেদিন তুলসী গাছ থাকার অপরাধে মায়ারাণীদের বাড়ি তারা তছনছ করে দিয়েছিল, কারণ বদু মওলানার মতে তুলসী গাছ একটা 'হিন্দু গাছ'। কোনরকম বিধর্মী জিনিস মহল্লায় থাকা চলবে না, তাই পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকারেরা মিলে সেই গাছ মহল্লা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মোহাম্মদ সেলিম মুক্তিযোদ্ধা, সে শহীদ হয়ে যায়। মায়ারানীকে সেলিম মোট ২১ টি চিঠি দিয়েছিল; মায়ারানীদের বাড়িতে যে স্থানে তুলসী গাছগুলো ছিল সযত্নে রাখা সেলিমের সেই ২১টি চিঠি সেখানে জ্বালিয়ে দেয়। এক প্রবল অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে এ কি নীরব প্রতিবাদ?

প্রথমবার মিলিটারি অভিযানের পর লক্ষীবাজার মহল্লায় পাঁচটি পরিবারের একজন করে কমে যায় এবং খাজা আহমেদ আলীর পরিবারে কম পড়ে দুজন। মহল্লার লোকজন দেখে যে মিলিটারি খাজা আহমেদ আলীর বাসায় প্রবেশ করেই তার বড় ছেলে খাজা শফিককে গুলি করে মারে, সে সময় বাড়ির প্রাঙ্গণে পিতা এবং পুত্র দুজনে দন্ডায়মান ছিলেন। পিতার চোখের সামনে বিনা কারণে খাজা শফিকের প্রাণ বিযুক্ত দেহের পতন হলে পিতা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গিয়ে আজান দিয়েছিলেন--

> 'সেই ঝঞ্ঝাকালে যখন দিনের আলো ছিল কৃষ্ণবর্ণ তরলের মত এবং শব্দের জগৎ পাহাড় ভেঙে পড়ার মতো সহস্য খণ্ডিত, সে সময় তারা শুনেছিল লক্ষীবাজারের পলেস্তরা খাসা বাড়ি গুলোর ছাদ ছুঁয়ে আজানের ধ্বনি গড়িয়ে যেতে।'[৭]

মহল্লার লোকেরা আরো জানায় যে এমন মধুর আজান ধ্বনি তারা কখনো শোনেনি এবং বেলালের কণ্ঠই কেবলমাত্র এমন হতে পারে। কিন্তু এই মতবাদকে তীব্র ভৎর্সনার সঙ্গে নাকচ করে ধর্মভীরু বদু মওলানা, সে বলে আজানের পূর্বেই খাজা আলিকে গুলি করা হয়েছিল। মহাল্লার লোকেরা খাজা আহমেদ আলীকে 'ঝঞ্ঝাকালের মোয়াজ্জিন' তকমা দিলে তা অসহ্য মনে হয় বদু মওলনার। তার মতে ইসলামের অনুকূলে, ইসলাম সমর্থিত কাজ একমাত্র সে-ই করে থাকে, তাই অন্য কেউ সাচ্চা মুসলিমের তকমা পেয়ে গেলে তার কাছে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। বদু তাদের এই বিশ্বাসে আঘাত হানবার জন্য তার চাকরদের দিয়ে তার পোষা কুকুর ভুলুর মৃতদেহ আনায় এবং --

> 'বদু মওলানার লোকেরা ধপাধপ করে মাটি খুঁড়ে খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির উঠানে তার আর তার ছেলের কবরের পাশে কুকুরের মৃতদেহটি কবর দেয় এবং সে বলে এই কবরে কোন পীর নাই, কুত্তা আছে।'[৮]

একাত্তরের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়োল্লাসের দিনে সমগ্র মহল্লার মানুষ বদু মওলানার পোশাক লেলিহান আগুনে নিক্ষেপ করে, তার দু'বছর পর সাধারণ ক্ষমা হলে বদু মওলানা আবার ফিরে আসে মহল্লায়, কিন্তু সেই উন্নাসিক হাসিটা আর থাকে না; অবশ্য এই অবস্থা তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। রাজনীতির চোরাস্রোতের সুযোগ নিয়ে রাজাকার বদু মওলানা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং তার ধূর্ততাকে সে এক নতুন রূপ দেয়। এই বদু মওলানার মত রাজাকাররা স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শুধুমাত্র একটি ভালো মানুষের মুখোশ পরে নিয়েছিল, নিজেদের প্রবৃত্তি তারা ত্যাগ করতে পারেনি, কেবলমাত্র তাদের অনুকূলে একটি মাত্র সুযোগ বা সুযোগ সমষ্টির অপেক্ষায় নিজেদের ভয়ংকর থাবাকে, তার অগ্রভাগে অবস্থিত প্রখর শিকারী নখরকে আড়াল করে রেখেছিল, সময় ও সুযোগ উপস্থিত হলেই পুরাতন মনুষ্যতের ক্রিয়াকর্মে তারা স্বমহিমায় ফিরে আসবে, এই বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে আব্দুল মজিদ, লক্ষ্মীবাজার এবং সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এক জটিল আবর্তে পড়ে গেছিল। বারবার সময়ের চক্রাকার আবর্তনে ঘটনার পুনর্মিলন ঘটছে, শুধুমাত্র আদলটা বারবার সামান্য বদলে যাচ্ছে। এই জটিল সময়ের আবর্তনে পড়ে যায় পাঠক সমাজও। অনুচ্ছেদহীন গল্প কাঠামোর জটিল আবরণ ভেদ করে পাঠক যখন উপন্যাসের কাহিনিগুলোকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করবে পাঠক তখনই সময়ের এই খেলাটা টের পাবে। জাদুর স্বাদ এখানেও কম আস্বাদন হবে না; পাঠক বুঝতেই পারবে না যে সে সময়ের জালে জড়িয়ে পড়ছে, যখন উপন্যাস শেষ হবে তখনই পাঠক এই বিষয়টা উপলব্ধি করবে। এর সঙ্গে রয়েছে প্লটের জটিলতা এবং এক কাহিনির মধ্যে অন্য কাহিনির বারে বারে প্রবিষ্ট হওয়া। এই জট ছাড়ানোর কাজ গভীর মনোযোগের সাহায্যে করতে হয়। বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে জাদু বাস্তবতার এক পূর্ণাঙ্গ ও সফল দৃষ্টান্ত 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' পাঠকের যুক্তিবোধ ও মননকেও যে সর্বদা ব্যস্ত রাখে তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র:

১. Mario T Garcia, 'Luis Leal : An Auto/ Biography', 2nd Edition (Kindle Verson), University of Texas Press, USA, 2000, P. 126

২. Ibid, P. 127

৩. J.A.Cuddon (Reviced by C.E.PRESTON): 'Dictionary of Literary Terms & Literary Theory', 4th edition, Penguin Books, USA, 1999, P. 487

৪. Joan Mellen, 'Litrary Topics : Magic Realism (vol.5)', 1st edition, Gale/Canage Learning, Michigan, USA, 1999, P. 23
৫. শামীম রেজা (সাক্ষাৎকার) : "যে নিঃসঙ্গ নয়, সে হতভাগ্য", 'লোক', সম্পা. অনিকেত শামীম, নবম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, লোক প্রকাশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৩৮
৬. শহীদুল জহির, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা', 'শহীদুল জহির উপন্যাস সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৯, পৃ. ৫৪
৭. তদেব, পৃ. ২০
৮. তদেব, পৃ. ৩৬।

বিশ শতকের নির্বাচিত মুসলিম বাঙালি নারীর কলমে অবরোধ বিষয়ক বোঝাপড়া

দিশা দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উনিশ ও বিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের আলোকে নির্মিত শিক্ষিত সমাজমনে নারীশিক্ষা, নারীর আধুনিকায়নের প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। তবে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবক আধুনিক নারীকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সুরুচিসম্পন্না, সুগৃহিণীরূপে। আধুনিক নারীর স্বাধীনতার গণ্ডি তারা বেঁধে দিতে চেয়েছে বারবার। পুরুষতন্ত্র নারীকে প্রশ্নহীন আনুগত্যের পাঠ পড়াতে অনেক সময় হাত ধরেছে ধর্মের। কখনো সংহিতার কড়া নিয়মে কখনো বা অবরোধের অন্ধকারে বন্দি করে নারীচৈতন্যকে হরণ করার নিপুণ কৌশল রপ্ত করেছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। মুসলিম বাঙালি নারীদের ক্ষেত্রে অবরোধের বাঁধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠতে দেখা যায়। রোকেয়া, নূরন্নেসার বয়ানেই উঠে আসে তাদের অবরোধে বন্দি মেয়েবেলার ভয়াবহ দৃশ্য। যে অবরোধ প্রথা মুসলিম বাঙালি নারীর যাপনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, সেই প্রথার সঙ্গে কীভাবে বোঝাপড়া গড়ে উঠছে তাঁদের? আদৌ কি তাঁরা অবরোধকে নারীমুক্তির পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজব আমরা। এই গবেষণা প্রবন্ধে বিশ শতকের নির্বাচিত মুসলিম বাঙালি নারীদের কলমে অবরোধ প্রসঙ্গ কীভাবে উঠে এসেছে সেই বিষয়টিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।
সূচক শব্দ: পুরুষতন্ত্র, নারীপ্রশ্ন, বাঙালি মুসলিম নারী, অবরোধ ও পর্দা, অবরোধ বিরোধিতা।

মূল আলোচনা:

উনিশ ও বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নতুন পরিবর্তিত সমাজকাঠামোয় 'নারীপ্রশ্ন' ছিল সর্বাধিক চর্চিত বিষয়। চিরাচরিত 'প্রথা'কে বাতিল করে আধুনিকায়নের চেষ্টায় শিক্ষিত সমাজমন নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতার মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। তবে আধুনিকতার ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে ছিল স্ববিরোধিতার স্বরও। আকাঁড়া পিতৃতান্ত্রিকরা মনে করত, নারী ও পুরুষকে বিধাতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁদে সৃজন করেছেন, তাই উভয়কে একই শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তা হবে বিধি-বিরোধী। কিন্তু তথাকথিত নবজাগরণের যুগে দাঁড়িয়ে 'আধুনিক' নারীনির্মাণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহকেরা তাই 'আধুনিকা' নির্মাণের ছলে সুরুচিসম্পন্না সুগৃহিনী গড়ে তোলার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, স্বাধীন, নিজের অধিকারের বিষয়ে সচেতন নারীর রূপকল্প তৈরিতে কখনোই উৎসাহী ছিল না ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ। শুধু বাঙালি সমাজ কেন ইউরোপীয়রাও এমন নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে বারংবার। ফরাসি বিপ্লবের সময়ই নতুন যুগের নতুন মানুষ তৈরির প্রক্রিয়া থেকে নারীকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। রুশোর 'এমিল' নামক গ্রন্থে নতুন 'মানুষ' হল শুধুমাত্র পুরুষ। নতুন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোই অক্ষুণ্ণ থেকে গেল, ফলে নারীর সামাজিক অবস্থানের কোনো বদল ঘটল না। বাহির ও অন্দরের টানাপোড়েনে পুরুষ লাভ করে 'বাহির'-এর দায়িত্ব, সে তার শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে

এবং অন্তঃপুরবাসিনী নারী তার জীবনধারণের জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। নারী পুরুষতন্ত্রের অনুগত ভৃত্যতে পরিণত হয়। ঠিক যেমনটি ১৮১৯ সালে প্রকাশিত সতীদাহ সম্পর্কিত পুস্তিকায় রামমোহন রায় বলেছিলেন, একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু হিসেবেই নারীকে দেখতে চায় পুরুষতন্ত্র। এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় এম. রহমানের 'বাড়বানল' প্রবন্ধে-

> "ধর্ম্মদ্রোহী মাতৃদ্রোহী সমাজ বিধান দিয়েছে, মেয়েমানুষ শুধু রসনা তৃপ্ত-কর খাদ্য রান্না করবে, কুক্কুরীর মত বছর বছর বাচ্চা দেবে, নতমস্তকে তাদের স্বার্থ-কলুষ ভরা বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, অন্ধভাবে তাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দেবে!!"[১]

একটি শিশু মেয়ে হিসেবে বড়ো হয়ে ওঠে সামাজিক অনুশাসনের ঘেরাটোপে। বালিকা বয়স থেকেই তাকে দেওয়া হয় প্রশ্নহীন আনুগত্যের পাঠ আর এই পাঠদানের সময় পুরুষতন্ত্র হাত ধরে ধর্মের। কখনো সংহিতার কড়া নিয়মের শাসনে কখনো বা অবরোধের অন্ধকারে বন্দি করা হয় নারীকে। নারীর মনুষ্যত্ব অপহরণের চেষ্টায় পিতৃতন্ত্র একের পর এক প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল তৈরি করে যায়। অবরোধ প্রথা নারীর অধিকার হরণেরই নিপুণ কৌশলমাত্র। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিদেশি সংস্কৃতির আঁচ যাতে অন্দরমহলের অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারে, সেইজন্য নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারকস্বরূপ এক সনাতনী নকশা কায়েম রাখার চেষ্টাতেই অবরোধপ্রথাকে অক্ষুন্ন রেখেছিল অভিজাত বাঙালি সমাজ। এই অবরোধের কঠোরতা আরও খানিক বৃদ্ধি পায় মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে। মুসলিম সমাজে পর্দার ধর্মীয় সমর্থন থাকায় তা শুধু প্রশ্নহীনভাবে মান্য করা হয় এমনটাই নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে খানিক গৌরবও। পর্দা হয়ে ওঠে আভিজাত্যের প্রতীক। মুসলিম সমাজে অবরোধের বাড়াবাড়ি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে শুধুমাত্র পুরুষ নয়, অপরিচিতা বা স্বল্পপরিচিতা নারীর সামনেও পর্দারক্ষার ফরমান জারি করা হয়। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কলমে উঠে এসেছে তাঁর অবরোধে বন্দি মেয়েবেলার ভয়াবহ স্মৃতি-

> "সবেমাত্র পাঁচ বছর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা রক্ষা করিতে হইত। তাই কিছুই বুঝিলাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত।...পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াতে আসিত, অমনি বাড়ির কোনো লোক চক্ষের ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্র তত্র কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোনো চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।"[২]

নূরন্নেসার বয়ানেও এই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়-

> "পিত্রালয়ে অবস্থানকালে অষ্টমবর্ষ পূর্ণ হইবার পর, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্দর ও মস্তকোপরি চন্দ্রতারকাখচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন, কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই।"[৩]

রোকেয়ার নিজের ছোটোবেলা এবং তার আশেপাশের অন্যান্য নারীদের অবরোধ রক্ষার করুণ দলিল তাঁর 'অবরোধবাসিনী'। এই অবরোধবাসিনীদের কাছে পর্দা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে ঘরে চোর ঢুকলেও তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে পর্দা রক্ষা করাই শ্রেয় বলে

মনে করত। ভ্রমণের সময় তাদের পালকিগুলি তিন-চার রকমের মোটা পর্দা দিয়ে এমনভাবে আবৃত করা হত যে ভ্রমণ শেষে তাদের অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করতে হত। এই অন্তঃপুরচারিণীদের কাছে প্রাণরক্ষার চাইতেও পর্দা রক্ষার দায় ছিল বেশি।

এই প্রবন্ধে আমরা মুসলিম বাঙালি নারীর বয়ানে অবরোধ প্রসঙ্গ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। পর্দা যাদের যাপনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল, তারা কি আদৌ অবরোধকে নারীমুক্তির প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারল নাকি পুরুষতন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার অবরোধপ্রথার সঙ্গে আপস করেই শেষপর্যন্ত খুঁজে নিল আধুনিকায়নের রাস্তাকে-

> এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের দারস্থ হতে হবে অবরোধ বন্দিনীদের প্রবন্ধের কাছেই।

অবরোধপ্রথা মুসলিম বাঙালি নারীর যাপনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল যে তাঁদের লেখা প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে এই প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। বালিকা বয়স থেকেই কঠোর অবরোধে বন্দি থাকার দরুন এই প্রথার বিরুদ্ধে কোনো জোরালো প্রতিবাদ কলমবন্দি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকলেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী অবরোধের কঠোরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশ শতকের শুরুতে রচিত খায়রন্নেসার প্রবন্ধে অবশ্য অবরোধকে মান্যতা দিয়েই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। খায়রন্নেসার বলছেন-

> “হিন্দুর মেয়ে ছেলেদের ন্যায় আমাদের গ্রামান্তরে যাইবার অবাধ অধিকার নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ত অবরোধপ্রথার মর্যাদা রক্ষা না করিয়া অন্য বাড়ীতে যাওয়াই নিষিদ্ধ। সুতরাং উপযুক্ত স্থানে আমাদের উপযোগী বিদ্যালয়ের অভাবই আমাদের শিক্ষাবিস্তার না হওয়ার প্রধান ও প্রথম কারণ বটে।”[৪]

তাই তিনি অবরোধের মর্যাদা বজায় রেখেই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের জন্য প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, পাড়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের কথা বলেছেন, সেই সঙ্গে বলেছেন যে স্কুলগুলি এমন স্থানে ও এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মেয়েরা অবরোধ রক্ষা করেই শিক্ষালাভ করতে পারে। 'বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘ'-এর সভানেত্রী নূরন্নেসাও তাঁর অভিভাষণে জানিয়েছেন যে মেয়েরা “সংসারের কাজকর্ম্মের ও পর্দ্দার ভিতর থেকে যতটুকু শিক্ষা ক'রতে পারেন, সেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট'।”[৫]

এইরকম আপসের স্বরকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মাসুদা রহমান শুধু অবরোধপ্রথার বিরোধিতাই করেননি একইসঙ্গে এই প্রথার প্রবর্তকদের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন। পর্দাপ্রসঙ্গে মিসেস এম. রহমান বলেছেন-

> “পর্দার দোহাই দিয়ে নারীকে বঞ্চিত করায় কেবল নারী নয়, সমগ্র মুসলমান জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।”[৬]

তিনি আরও বলেন-

> “নারীর হিতজনক বাণীকে কেতাব চাপা দিয়ে নিজেদের অস্ত্রগুলোকে শানিয়ে ঠিক করেছে নারী হত্যা করবার জন্য। সব অস্ত্রের সেরা অস্ত্র পর্দার কুলিশ-কঠোর মারণ যন্ত্র।”[৭]

অবরোধপ্রথা যে অন্তঃপুরকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের হাতিয়ারস্বরূপ, তা রোকেয়ার মতোই এম. রহমানও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রক্তলোলুপ বাঘিনীর মতো পুরুষতন্ত্রের বুকে আঘাত করে নারীকে তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন।

ধর্মীয় সংযোগের কারণেই মূলত অবরোধপ্রথা মুসলমান সমাজে প্রশ্নহীনভাবে মান্যতা পেয়ে এসেছে, তাই এই প্রথাকে নাকচ করতে গেলে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তুলতে হবে সেটা রোকেয়া, এম রহমান, ফাতেমা খানম প্রমুখেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"[৮]

তাই পুরুষ ও তার রচিত ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিতে বলেছেন 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

"... এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে।... যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।"[৯]

ফাতেমা খানমের 'তরুণের দায়িত্ব' প্রবন্ধে এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়-

> "নারী জানে এ পর্দার মধ্যে হজরত মোহাম্মদের আদেশের সত্যতা যতটুকু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আমিরী চাল এবং স্বার্থপর পুরুষের সদাসন্দিগ্ধ মনের অনাবশ্যক সতর্ক-বন্ধনের জটিলতা এঁটে মিশে গেছে।"[১০]

নারীকে চেপে পিষে ছোট করে রাখতে গিয়ে সমস্ত পুরুষ সমাজেরই মেরুদণ্ড একদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, এই সাবধানবাণীটাই পুরুষশাসিত সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে সজোরে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন ফাতেমা খানম। পুরুষতন্ত্রের চোখে নারী যে শুধুই 'ভোগের বস্তু, সেবাদাসী, সন্তানের ধাত্রী', এই সারকথাটুকু বুঝতে অন্তঃপুরবাসিনীদের খুব বেশি সময় লাগেনি। মানুষ হিসেবে বাঁচার সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পিতৃতন্ত্র নারীকে অবরোধের অন্ধকারে বন্দি করে, একই সঙ্গে বন্দি করে নারীর চেতনাকেও। এই সুচতুর কৌশলের পর্দাফাঁস করে ফজিলতুন নেসা বলেছেন-

> "যে-বন্দীখানায় মেয়েদিগকে জগতের আলো-বাতাসের সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত করে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে- যা মুসলিম নারীর মনের দ্বারে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেটা একবার পুরুষের উপর চাপিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।"[১১]

নারীকে নিজের শর্তে বাঁচার আহ্বান জানিয়ে ফজিলতুন নেসা আরও বলেছেন-

"আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে চূর্ন বিচূর্ণ করব।"[১২]

এই 'অহেতুকী পর্দার' কারণেই যে মুসলিম নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে সরব হয়েছিলেন মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাও। অবরোধ প্রসঙ্গে সওগাত পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় প্রকাশিত কুমারী রওশন আকতারের 'ইসলামে নারীর স্থান' প্রবন্ধটিও নজর কাড়ে। রওশন আকতার কঠোর পর্দাপ্রথাকে ইসলামের বিধিবিরুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

> "পরদা সম্বন্ধে ইসলামের বিধানের মানে হইতেছে এই: তোমরা শরীরের সেই সমস্ত স্থানগুলি মুক্ত রাখ যাহা মুক্ত রাখা প্রয়োজন। চোখ, মুখ, হাত, পা ঢাকিয়া দম বন্ধ করিয়া রাখিবার মানে পরদা নয় এবং ইহা ইসলামেরও

বিধান নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরদার নামে ভারতবর্ষে যে মেয়েদেরকে আলো, বাতাস, জ্ঞান, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করিয়া চারখানা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা- তাহা কস্মিনকালেও ইসলামের বিধান নয়।"[১৩]

তবে অবরোধ ও পর্দা প্রসঙ্গে রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণীর প্রবন্ধে খানিক ভিন্ন সুর শোনা যায়। অবরোধ ও পর্দা এই দুটি বিষয়কে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী, তিনি কঠোর অবরোধে থাকা নারীকে 'চোখ বাঁধা ঘানির বলদে'র সঙ্গে তুলনা করলেও পর্দার বিরোধিতা করেননি। অবরোধ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত খানিক আপসমূলক বলেই মনে হয়।

"অবগুন্ঠন উন্মুক্ত করিয়া পথে ঘাটে বেড়ানো পছন্দ করি না, কারন তাহাতে নারীর সম্ভ্রম, সৌকুমার্য, কোমলতা নষ্ট হয়। শরিয়তে যতটা পর্দা আছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া আমরা স্বাধীনতা চাই।"[১৪]

'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে রোকেয়া অবরোধের তীব্র বিরোধিতা করলেও 'বোরকা' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যে মিশেছে আপসের সুর-

"আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের 'জঘন্য অবরোধ প্রথা'ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়।... বলি, উন্নতি জিনিষটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে?"[১৫]

রোকেয়া এও বলছেন-

"আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নেই।"[১৬]

তবে এই দুই প্রবন্ধে স্ববিরোধী স্বর প্রকট হয়ে উঠলেও রোকেয়া যে আমৃত্যু অবরোধপ্রথাকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন তার প্রমাণ মেলে শামসুননাহারের 'রোকেয়া জীবনী'তে। শামসুননাহার 'রোকেয়া-জীবনী'তে উল্লেখ করেছেন-

"মুসলিম নারী সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায় অবরোধপ্রথা একথা তিনি (রোকেয়া) মর্ম্মে সর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 'প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত অবরোধপ্রথার তুলনা হয়। বিনাযন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবকাশ পায় না'।"[১৭]

অর্থাৎ রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন যে অবরোধের অন্ধকার স্ত্রীজাতির চৈতন্যকেই একটু একটু করে আছন্ন করে দিচ্ছে, তাই তারা এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার মতো জোরটুকুও সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না।

রোকেয়ার দুই প্রবন্ধে স্ববিরোধী মত নিয়ে পাঠকের মনে যেটুকু দ্বিধা তৈরি হয় তা মুছে যায় শামসুননাহারের 'রোকেয়া-জীবনী'র একটি মন্তব্যে। সেখানে শামসুননাহার বলছেন, পর্দা অর্থে রোকেয়া শুধু বুঝতেন 'সবল ব্যক্তিত্ব, কোন প্রকার বাহ্য আড়ম্বর নয়'। তিনি আরও বলেন যে-

"পর্দ্দা ও অবরোধ ভিন্ন জিনিষ- পর্দ্দা ঐসলামিক। কিন্তু অবরোধ অনৈসলামিক' এই বুলি আজকাল অনেককেই আওড়াইতে শুনি। কিন্তু একদিকে নারীর আচরণের সুন্দর সংযম ও শালীনতা অর্থাৎ পর্দা এবং অন্যদিকে অর্থহীন, প্রাণঘাতী অবরোধ-এই দুইয়ের মধ্যে এক যুক্তিসঙ্গত

> পার্থক্য সেই সুদূর অতীতে রোকেয়াই সকলের আগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।"[১৮]

এখানেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর সমসাময়িক অন্য নারীদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাঁর কাছে পর্দা কোনো বাহ্যিক আবরণ ছিল না, তা ছিল শুধুমাত্র দৃঢ় ও সংযমী ব্যক্তিত্ব।

পুরুষতন্ত্র আদতে চায় নারী চৈতন্যের দখল নিতে, তাই বারংবার ধর্মের বিধিনিষেধ আরোপ করে নিজেদের শাসনের কণ্ঠকে আরও জোরালো করে। দীর্ঘদিন ধরে অবরোধের আড়ালে থাকা নারীমনকে যে অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জানে। বোরখাপরিহিতা মুসলিম নারী বা একহাত ঘোমটা দেওয়া হিন্দু নারীর দৃষ্টি সর্বদাই অবনত। নারীর ভয়, অসহায়তা পুরষতন্ত্রের কাছে চিরকালই উপাদেয় বস্তু। এই নত দৃষ্টি, নতমস্তক, অসহায়, ভীত নারীমন কখনোই নিজের অধিকারের প্রশ্নে সরব হয়ে উঠতে পারবে না, এই আশাতেই সম্ভবত অবরোধকে আরও দৃঢ়, আরও মজবুত করা হয়। অবরোধপ্রথা আদতে নারীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করার নিখুঁত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে পুরুষতন্ত্রেরই মনমত ছাঁচে গড়া রাসসুন্দরীর প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ শোনা যায় তাঁর আত্মজীবনীতে। রাসসুন্দরী লিখছেন-

> "তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল।"[১৯]

রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী থেকে পাঠক জানতে পারে যে, বুক পর্যন্ত মোটা কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে 'কলুর বলদের মত' দুই চোখ ঢেকে রেখেই বাড়ির সমস্ত কাজ করতে হত মেয়েদের। রাসসুন্দরীর মতো পুরুষতন্ত্রের আজ্ঞাবহ নারীও এই অবরোধে ঘেরা জীবনকে 'পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গী'র সঙ্গে তুলনা করেছেন, নিজেকে পরাধীনা বা বন্দিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি।

এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতেই রোকেয়া তাঁর 'Sultana's Dream'-এ এক নারীকেন্দ্রিক কাল্পনিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে পুরুষ থাকবে অবরোধে বন্দি আর নারী পাবে মুক্তিত্বের আস্বাদ। নারীর মনুষ্যত্ব অপহরণের চেষ্টার পরিকল্পনাকে বানচাল করতে বাঙালি মুসলিম নারীর কলমে ধরা পড়েছে কখনো খানিক আপস কখনো বা সরাসরি বিরোধী স্বর।

তথ্যসূত্র:

১. রহমান, এম., আগস্ট ২০২১, "বাড়বানল", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ৬১

২. হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, ডিসেম্বর ১৯৭১, "অবরোধবাসিনী", *রোকেয়া রচনাবলী,* আবদুল কাদির (সম্পাদনা), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯

৩. খাতুন, নূরন্নেসা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, "স্বপ্নদৃষ্টা" (নিবেদন), *নূরন্নেসা খাতুন রচনাসমগ্র,* মীর রেজাউল করিম (সম্পাদনা), কলকাতা, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

৪. খাতুন, খায়রন্নেসা, আগস্ট ২০২১, "আমাদের শিক্ষার অন্তরায়", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ৪৮

৫. খাতুন, নূরন্নেসা, আগস্ট ২০২১, "বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘ: সভানেত্রীর অভিভাষণ", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ১২৪

৬. সিদ্দিকা, মোবাররা, জুন ২০০৭, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫৬

৭. সিদ্দিকা, মোবাররা, জুন ২০০৭, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫৬

৮. হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, আগস্ট ২০১৮, "স্ত্রীজাতির অবনতি", *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া,* মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদনা), ঢাকা, কথাপ্রকাশ, পৃ. ৩৭

৯. হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, আগস্ট ২০১৮, "স্ত্রীজাতির অবনতি", *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া,* মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদনা), ঢাকা, কথাপ্রকাশ, পৃ. ৩৮

১০. খানম, ফাতেমা, জুন ২০০৩, "তরুণের দায়িত্ব", *শিখা সমগ্র [১৯২৭-১৯৩১],* মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সংকলন ও সম্পাদনা), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪৯৩

১১. ফজিলতুন নেসা, আগস্ট ২০২১, "মুসলিম নারীর মুক্তি", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ১৮৮

১২. মিস ফজিলতুন নেসা এম.এ., জুন ২০০৩, "নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ", *শিখা সমগ্র [১৯২৭-১৯৩১],* মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সংকলন ও সম্পাদনা), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৬৬

১৩. আকতার, রওশন, কার্তিক ১৩৪২, "ইসলামে নারীর স্থান", *সওগাত মহিলা সংখ্যা,* ৯ম সংখ্যা, ১১শ বর্ষ, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, কলকাতা, ১১ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট, পৃ. ৪৯০

১৪. চৌধুরাণী, রাজিয়া খাতুন, আগস্ট ২০২১, "সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২১০

১৫. হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, আগস্ট ২০১৮, "বোরকা", *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া,* মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদনা), ঢাকা, কথাপ্রকাশ, পৃ. ৬৬

১৬. হোসেন, রোকেয়া সাখাওয়াত, আগস্ট ২০১৮, "বোরকা", *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া,* মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদনা), ঢাকা, কথাপ্রকাশ, পৃ. ৬৯

১৭. মাহমুদ, শামসুননাহার, আগস্ট ২০২১, "রোকেয়া-জীবনী", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২৪৮

১৮. মাহমুদ, শামসুননাহার, আগস্ট ২০২১, "রোকেয়া-জীবনী", *জানানা মহফিল,* শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদনা), ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ২৪৮

১৯. রাসসুন্দরী দাসী, ২০১৫, *আমার জীবন* (২য় সংস্করণ), কলকাতা, দেজ পাবলিকেশন, পৃ. ৩৮।

মধুসূদন - দীনবন্ধু

তপন কুমার বালা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ, হুগলি

সারসংক্ষেপ: মধুসূদন দত্ত ও দিনবন্ধু মিত্র, উভয়েই ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাট্যসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মধুসূদন ছিলেন আধুনিক বাংলা নাটকের প্রবক্তা, যিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। অন্যদিকে, দীনবন্ধু বাস্তব জীবনের সামাজিক সমস্যা এবং মানুষের জীবন নিয়ে নাটক লিখেছেন। তবে বাংলা সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধনের কাজটি করেন মাইকেলই। একথা সত্য—মধুসূদন বাংলা নাটকের যে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেছিলেন সেই পথকে অবলম্বন করেই দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যজগতকে আরো সমৃদ্ধশালী ও গৌরান্বিত করে তুলেছিলেন। সমকালীন সমাজের গঠন-কাঠামো, চিন্তন, বিকাশের প্রেক্ষিতে উভয় নাট্যকারের সমাজভাবনা আধুনিক চিন্তন প্রোথিত। মধুসূদন ও দীনবন্ধু উভয় নাট্যকারের নাটক তাই যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে উঠার চেয়ে বর্তমান ক্লেদাক্ত সমাজ, সংকট আর তার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে দীনবন্ধুর সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্য এখানেই যে স্বশ্রেণিকে আক্রমণের জন্য দীনবন্ধু যেখানে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামের আড়াল নিয়েছিলেন, মধুসূদন সেখানে স্বনামে ব্যঙ্গের চাবুক চালিয়েছিলেন।
সূচক শব্দ: আধুনিক নাট্যকার, বিকাশ পর্ব, বাস্তবতার অগ্রদূত, পৌরাণিক ও সামাজিক, প্রহসন, ঐতিহাসিক ট্রাজেডি ও সমাজ-দর্পণ।

মূল আলোচনা:

মধুসূদন ছিলেন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। নাটকের সূত্রধরেই বাংলা সাহিত্যে মহাকবি মধুসূদনের প্রথম আবির্ভাব। মধুসূদন থেকেই বাংলা নাটকের বিকাশ পর্ব শুরু হয়। একদিকে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা রক্ষার দাবি, অন্যদিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র এই দুয়ের সংঘাতে বাংলা নাটকের বিকাশ পর্ব শুরু হয়। যথার্থ বাংলা নাটকের মুক্তি মধুসূদনের হাতে পৌরাণিক নাটক শর্মিষ্ঠা প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

পক্ষান্তরে বাংলা নাট্য সাহিত্যে মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব। প্রত্যক্ষ স্বজন প্রেম ও বিদেশী শাসকের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ এবং সর্বব্যাপী সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সর্বব্যাপী সামাজিক সহানুভূতি নিয়ে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই নাট্যসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। বলা ভাল দীনবন্ধু মিত্রের অমর সৃষ্টি 'নীলদর্পণ' নাটকের বিবৃতিধর্মিতার পরিবর্তে চরিত্র কেন্দ্রিকতার প্রবর্তনও মধুসূদনেরই অবদান। তিনি চরিত্রের উপরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছেন এবং চরিত্র সম্বন্ধে অন্যের বিবরণকে প্রায়ই পরিহার করেছেন। নাট্যকারের দুটি বিশেষ গুণ নৈব্যক্তিকতা এবং প্রতিটি চরিত্রের প্রতি মহানুভব মমত্ব। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব বিশেষ কম ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -

> "সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও রামনারায়ণের কৃতিত্ব বিশেষ কম ছিল না। পুরুষ চরিত্রের সংলাপ রচনায় তিনি সাধু এবং কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করলেও স্ত্রী-

> চরিত্রের সংলাপ রচনায় তিনি সাহসিকতার সঙ্গে কথ্য ভাষা ও স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই জাতীয় সংলাপ রচনা করে তিনি 'নীলদর্পণ' রচনার পথ প্রশস্ত করেছেন, এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না। বিশেষত, আমরা লক্ষ্য করি দীনবন্ধুও ভদ্র চরিত্রের সংলাপে আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম কিন্তু সাধারণ রায়ত বা নিম্ন অবস্থার স্ত্রীলোকের ভাষা ব্যবহারে প্রাণবন্ত।"[১]

বলা ভাল মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্র দুজনেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসনের শেকস্‌পীয়রের নাটক পড়াবার অসাধারণ খ্যাতির কথা সকলেই জানেন। সম্ভবত তাঁরই প্রভাবে অন্যান্য ছাত্রদের মত মধুসূদনও রঙ্গালয় ও শেকস্‌পীয়রের নাটকের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। নাটক লেখার সময় সে কারণেই তিনি শেকস্‌পীয়রের নাট্যরীতি, চরিত্র সৃষ্টি কৌশল ও ট্রাজেডি তত্ত্বভাবনা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। লক্ষ করার বিষয় হল দীনবন্ধু মিত্রও মধুসূদনের পথকে অনুসরণ করে শেকস্‌পীরীয় নাট্যরীতি প্রবর্তন করলেন। প্রসঙ্গত ড. অজিতকুমার ঘোষ-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> "মধুসূদন (১৮২৪-৭৩) শেকস্‌পীরীয় পঞ্চাঙ্ক ও অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্য বিভাগের গঠনরীতি অনুসরণ করে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখলেন। কাহিনীর ঐক্যবদ্ধরূপ, ঘটনার বিস্তার ও বৈচিত্র্য, চরিত্রের বিস্তারিত আয়তন, জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংলাপে বিশুদ্ধ চালিত ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি দিক দিয়ে তিনি আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সূচনা করলেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ট্রাজেডির অনিবার্য শোকাবহ পরিণতি, গভীরতা ও গাম্ভীর্য সজীব বেগময় রূপে প্রকাশ করলেন। মলিয়েরের কমেডির আদর্শে প্রহসন রচনা করে ওই ধরনের কৌতুক-রসাত্মক রচনার ধারা প্রবর্তন করলেন। দীনবন্ধু (১৮৩০-৭৩) নাটকগুলিতে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগে শেকস্‌পীরীয় রীতি অনুসরণ করেছিলেন, অবশ্য প্রহসনের ক্ষেত্রে কাহিনীর আকার সংক্ষিপ্ত এবং অঙ্ক সংখ্যাও কম। 'নীলদর্পণ' নাটকটি যে প্রথম বাস্তব গণপ্রতিরোধের নাটক শুধু তাই নয়, একটি সমবেত সংগ্রামের সংকল্প ও প্রচেষ্টা কীভাবে একটি প্রবলতর নিষ্ঠুর শক্তির সন্ত্রাস ও পীড়নে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে অতি শোকাবহ পরিণতি লাভ করল তা স্তরে স্তরে প্রচন্ড উদ্‌বেগ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত হয়েছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়ে অনবদ্য এই যুগের নাট্যকার মনোমোহন বসু সামাজিক সমস্যা মূলক নাটক লিখলেও ভক্তিমূলক গীতপ্রধান পৌরাণিক ধারা প্রবর্তন করেন, যার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল গিরিশযুগে।"[২]

নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি মূলত 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্যই। সমসাময়িক সামাজিক জীবনের উজ্জ্বল আলেখ্য হিসাবে তাঁর নাটকগুলি স্বতন্ত্র মর্যাদায় রয়েছে। দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতার অগ্রদূত এবং তিনি বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাস্তববাদী নাট্যকার।

বলা ভাল দীনবন্ধু বাংলা নাটকের দু'-একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের অন্যতম, কারও কারও মতে দুর্বল বাংলা নাটকের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা করেন, তেমনি দীনবন্ধু বাস্তব জীবনচিত্র – সংবলিত সমসাময়িক সমাজজীবনের অতি উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হয়ে রঙ্গরসের কবিতা লিখেছিলেন; পরে সামান্য কিছু কাব্য-কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু তার প্রধান খ্যাতি নাটকের জন্য।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন - "মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রকৃতি ও জীবনচর্চা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন জীবনকে দেখিয়েছেন কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে এক অদম্য উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণিবায়ুর ভিতর দিয়া এবং পরবর্তীকালে এক মহাকাব্যোচিত মহিমা ও পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গের অন্তরাল হইতে। আর একজন জীবনকে দেখিয়েছেন তাহার অলিতে-গলিতে, তাহার পল্লী ও মফস্বল শহরের সহজ বিকীর্ণতায় ও ব্যাপ্তিতে, ইতর জনতার ভাঙা-চোরা মুখের কথায় ও মনোভঙ্গীতে, হাস্যরসিকের সমস্ত আবরণ-সরানো, অন্তর্ভেদী, তির্যক দৃষ্টিক্ষেপে। তাই মধুসূদন মিলনান্ত নাটকে সংযত গম্ভীর, বিয়োগান্ত নাটকে অভিজাত রুচিতে আতিশয্য বিরোধী। তিনি দীনবন্ধুর মতো প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ও আশা মিটাইয়া কাঁদিতে জানিতেন না। বাংলার জীবনযাত্রা তাঁহাকে উহার এই নিজস্ব অমার্জিত ভাবাতিশয্যের শিক্ষা দেয় নাই। দীনবন্ধুর নাটকে প্রথম বাংলা জীবনের উচ্চতর বায়ুমন্ডলের পরিবর্তে মাটির স্পর্শ পাওয়া গেল। কোন ধার করা কৃত্রিম উপাদান নহে, বাংলার জীবনসম্ভূত রসধারাই এখানে নাটকের দেহ ও মন গড়িয়াছে।"

মধুসূদনের নাটককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং প্রহসন।

১) পৌরাণিক নাটক – শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০)।

২) ঐতিহাসিক নাটক – কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

৩) প্রহসন – একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।

পক্ষান্তরে আমরা দীনবন্ধুর নাটককেও তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। ভাগগুলি হল – সামাজিক, কমেডি ও প্রহসনধর্মী নাটক।

১) সামাজিক নাটক – নীলদর্পণ (১৮৬০)

২) কমেডি – লীলাবতী (১৮৬৭), নবীন তপস্বিনী (১৮৬০), কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

৩) প্রহসন – সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)।

দীনবন্ধুর শিল্পী মানসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর বস্তুচেতনা। এই বস্তুচেতনার উৎস তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনি বাংলার মাটির মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে মিশেছেন এবং তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। দীনবন্ধুর নাট্য- রচনায় প্রেরণা দান করেছেন বাঙালির শাশ্বত জীবনবোধ ও সমকালের বিক্ষুব্ধ গণজীবন। মধুসূদনের নাট্যরচনায় প্রেরণা দান করেছে বাংলা নাটকের করুণ দুর্দশা এবং ইংরেজি নাটকের অভিনয়। অর্থাৎ যথার্থ বাংলা নাটকের অভাববোধ থেকেই মাইকেলের নাটক রচনার সূত্রপাত। তাই মধুসূদনের মানসপ্রবৃত্তি মূলত রোমান্সধর্মী। কিন্তু দীনবন্ধুর সৃষ্টিচেতনা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব ভিত্তিক। বাস্তবিকপক্ষে—

> "দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' যদিও 'কৃষ্ণকুমারী'র এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তবু নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধু মধুসূদনের পূর্ববর্তী নন। মধুসূদনের নাট্যসাধনার সূচনা হয় রামনারায়ণের একটি নাটককে কেন্দ্র করেই। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালার মঞ্চস্থ করবার জন্য মধুসূদন ইংরেজীতে তার অনুবাদ করে দেন। এই অনুবাদ পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়কে এবং আরো অনেককে মুগ্ধ করে। নাটকের প্রতি এই প্রথম মধুসূদন সচেতনভাবে চিন্তা করেন এবং এযাবৎ লিখিত বাংলা নাটকের

দুর্বলতা তাঁকে ব্যথিত করে এবং তিনি আরো ব্যথা পান এই দেখে যে এইসব নাটকই দর্শক অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করে।"[৩]

দীনবন্ধুর প্রতিভা মূলত শ্রেষ্ঠ কমেডি-লেখকের প্রতিভা। উচ্চশ্রেণির নাট্যধর্মোময় কৌতুক ও পরিহাস জীবনের ক্ষয়ক্ষতির প্রতি নিঃস্পৃহতা, নানা অসঙ্গতির প্রথম শ্রেণির হাস্যরসিকের মতো সকৌতুক সহনশীলতা-এর দ্বারা তিনি বাংলা নাটকে স্পৃহনীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু যেখানে রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার চরিত্র নিয়ে প্রেমের গল্প ফেঁদেছেন সেখানে তা প্রাণহীন কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। 'নবীন তপস্বিনী' এবং 'কমলে কামিনী' এই ধরনের বা মিলনে সমাপ্ত নাটক।

ঐতিহাসিক ট্রাজেডি নির্মাণে মধূসূদনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' ঐতিহাসিক ট্রাজেডি হিসাবে এটি প্রথম নাটক। এই নাটকেই নাট্যকার সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যরীতি অনুসরণ করেছেন। রাণা ভীমসিংহের কুমারী কন্যা কৃষ্ণা রাজ্যের কল্যাণে এবং পিতাকে দারুণ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ ও তারই পরিণামী ঘটনা এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। মধুসূদন টডের ইতিহাস থেকে মেবারের এমন এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায় নির্বাচন করেছেন যা তার চরম দুভার্গ্যের কাহিনিকেই তুলে ধরে কৃষ্ণার অকাল মৃত্যু শোকাবহ ও নিষ্ঠুর ঘটনা সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ব্যঞ্জনা ব্যাপকতর, এর মধ্য দিয়ে মেবারের নির্বাপিত প্রায় শেষ ম্লান রশ্মিটুকু মিলিয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

"কৃষ্ণকুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু করুণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে মৃত্যু যদি পরিবেশের ও পরিস্থিতির জটিলতায় কোনো এক অসহায় অবলুপ্তি হিসাবে দেখানো হত তবে তা করুণতর হতে পারতো। নাট্যকার কিন্তু এই মৃত্যুকে মহিমময় করবার প্রচেষ্টায় এর সঙ্গে দেশাত্মবোধের এক অনুভূতি জড়িত করেছেন এবং মৃত্যুর মধ্যে অমর এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের কথা শুনিয়েছেন। রানী পদ্মিনী যেমন তাঁর আত্মোৎসর্গের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, কৃষ্ণকুমারীও তেমনি কুলের সম্মান রাখার জন্যে মৃত্যুবরণ করে সুরপুরে ও মর্ত্যধামে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।"[৪]

এই নাটকে মধুসূদন সর্বপ্রথম দৈবশাসিত বাতাবরণের উপর নির্ভর করেছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি নাট্য কাহিনির মধ্যে একটা ট্যাজিক রস ঘনীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত এই নাটকটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজিক নাটকের মর্যাদা লাভ করে। পাশাপাশি একথা বলা যায়—

"কৃষ্ণকুমারী নাটকে নিয়তির এই অলজ্ঘ্য নির্দেশই আমরা কার্যকর হতে দেখি। মধুসূদনের কালজয়ী কাব্য 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' যেমন দেখি রাবণ তাঁর বলিষ্ঠ সংগ্রাম সত্ত্বেও বুঝতে পারেন তাঁর নির্মম নিয়তি, উচ্চারণ করেন অনিবার্য বিধিলিপি— 'একে একে নিবিছে দেউটি', তেমনি এই নাটকের ভীমসিংহও যেন সর্বনাশের আশঙ্কায় বসে আছেন। ঐতিহ্যসম্পন্ন এক দেশনায়ক আজ অসহায়ভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, ফলে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ নিয়ে যখন দুই রাজার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় তখন তাঁর নিজের কিছুই করার থাকে না। কার আবেদন তিনি ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন সে

> কথা তিনি জানেন, কিন্তু তা স্বীকার করে নিলে দেশের যে সর্বনাশ হবে তা স্বীকার করে নেবার সামর্থ্য তাঁর নেই। রাজপুত রাজারা অল্পশক্তিসম্পন্ন হয়েও ক্ষমতাশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত রাজপুত রাজপরিবারে নিতান্ত কম নেই, কিন্তু সেই মানসিক সামর্থ্যও ভীমসিংহ কখনো দেখাতে পারেননি। নিয়তির কালো ছায়া তাঁর সমস্ত অস্তিত্বকে প্রথম থেকেই আচ্ছন্ন করে আছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই নিয়তিই সমগ্র নাটককে নিয়ন্ত্রিত করেছে—কৃষ্ণার অসহায় আত্মবিলোপের অসহায় সাক্ষী হয়ে থেকেছেন ভীমসিংহ। নিয়তির এই প্রকট ভূমিকায় গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য থাকলেও ট্র্যাজেডির নায়ক হিসাবে ভীমসিংহ এতই দুর্বল যে তাঁর দুর্দশার চিত্র সঠিকভাবে আমাদের মধ্য ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। পরাজিত নায়ক ট্র্যাজিক নাটক বা কাব্যের নায়ক হতে পারে—মধুসূদনের রাবণই সেই ধরনের নায়কের দৃষ্টান্ত। কিন্তু যার চিন্তাশক্তি পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, মানসিক উদ্যোগ যার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে—কোনরকম উৎসাহের ভাব যাঁকে উদ্দীপিত করতে পারে না, তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের দুঃখী করলেও ট্র্যাজেডির ঈপ্সিত 'Pity and fear' জাগাতে পারে না। তাই, কৃষ্ণকুমারী নাটকে ট্র্যাজেডির মোটামুটি সার্থক পরিকল্পনা থাকলেও চরিত্র চিত্রণে আংশিক ব্যর্থতার জন্য এটি রূপায়ণে সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে পারেনি বলেই চিন্তাশীল সমালোচকের মনে হবে।"[৫]

সুতরাং বলা ভাল দীনবন্ধু যেখানে কমেডি এবং সামাজিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব লাভ করেছেন, মধুসূদন সেখানে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনায় প্রথম শ্রেণির নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে—

> "কৃষ্ণকুমারী নাটকের আর একটি নিরুচ্চার অথচ স্পষ্ট প্রেরণা যা আমরা অনুভব করি, সেটি হল ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের পরিচয়। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যে সব কবি কৃত্রিম মহাকাব্য যুগের প্রবর্তনা ঘটিয়েছিলেন, সেই রঙ্গলাল - মধুসূদন - হেমচন্দ্র - নবীনচন্দ্র প্রত্যেকেরই স্বাদেশিকতার এক বোধ আমরা লক্ষ্য করি। এখানে কৃষ্ণকুমারী নাটকে কিছু জীবন্ত চরিত্রের মাধ্যমে সেই বোধ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, চরিত্রসৃষ্টিতে নবলব্ধ ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ও উল্লেখের দাবি রাখে। প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যও কৃষ্ণকুমারীর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এইসব কারণে আমরা মনে করি, মধুসূদন দত্তের সৃষ্ট নাটকগুলির মধ্যে কৃষ্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই।"[৬]

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) তাঁর প্রথম নাটক, সর্বাধিক পরিচিত নাটক এবং বাংলা সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট নাটক। এর সঙ্গে নাট্যসাহিত্য, নাট্যমঞ্চ, স্বাদেশিকতা, নীল আন্দোলন, সমাজ-দর্পণ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই নাটকে বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোকের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। 'নীলদর্পণ' বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম বাস্তব প্রতিবাদী নাটক। বাংলাদেশে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি সর্বপ্রথম সার্বজনীন ঘৃণা বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয় এই নাটকাভিনয়ের দ্বারা। স্বাদেশিক গণ- আন্দোলনেরও ভিত্তিভূমি এই নাটক। দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকের মধ্যে 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তবতাবাদ যথাযথভাবে এবং শিল্প-

সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'নীলদর্পণ' বাস্তবনিষ্ঠ সামাজিক নাটক এবং গণনাট্যের অগ্রদূত। এখানে দরিদ্র কৃষক প্রজারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন। নাট্যকার তা বলিষ্ঠ ভাষায় নাটকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত সেই কারণেই বলেছেন, দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকের মধ্যে 'নীলদর্পণ' অধিক শক্তিশালী।

নীলকর সাহেবদের কোপে পড়ে গোলক বসুর সম্পন্ন নিরীহ পরিবার এবং সাধুচরণ নামে এক বিশিষ্ট ভদ্র রায়তের বংশ কিভাবে ধ্বংস হল, উক্ত শ্বতাঙ্গ বর্বরেরা নিরীহ গ্রামবাসীর অসহায়তা এবং বিচার বিভাগের প্রচ্ছন্ন সহযোগীতার সুযোগে কিভাবে পশুবৎ আচরণ করত, এমন কি গর্ভিনী রমনীরাও তাদের পশুদৃষ্টির ঘৃণ্য ক্ষুধা থেকে বাঁচতে পারত না- তারই অতি কঠোর ও বাস্তব চিত্র একে দীনবন্ধু বাংলা নাটকে নতুন পথ খুলে দেন, বাংলা স্বাদেশিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, জাতীয়ভাবকে ত্বরান্বিত করেন। 'নীলদর্পণ' নাটক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন -

> "নীলদর্পণের অনেক চিত্র বা চরিত্র যেন দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ বাস্তব জগত থেকে আহরণ করে দর্পনবৎ নাটকে উপস্থিত করেছেন, এতে দীনবন্ধুর বাস্ততাবোধের একটা দিকে পরিচয় মেলে ধরে। কিন্তু ওই ছবিগুলি কাব্যের উপযোগী হইয়া চিত্রিত হইয়াছে কিনা তাহা দ্রষ্টব্য।"

বলা বাহুল্য এক মৃত্যুর মিছিলের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য নাটকটি মেলোড্রামায় পরিণত হয়েছে, তবুও এই নাটকের মধ্যে সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক জীবন সংকট চিত্রণে দীনবন্ধু অসামান্য নাটকীয়তা বোধের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটি গঠনগত দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হলেও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে দীনবন্ধু এখানে শেক্সপীয়রের সমতুল্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অবশ্য 'নীলদর্পণ' নাটক ট্রাজেডি হিসাবে খুব সার্থক হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, "নীলদর্পণ' একটি সমাজের বিপর্যয়ের আখ্যান। ব্যাক্তিক ট্রাজেডি অপেক্ষা গোষ্ঠীর ট্রাজেডি এই নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'নীলদর্পণে'র চরিত্রগুলি নাটকীয় চরিত্র এবং একান্তভাবেই বাস্তব। এই নাটক এখনও সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে। গোলক-নবীন-সাবিত্রীর মিলিত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এক অখন্ড সত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।"

মধুসূদনের মধ্যেও ছিল স্বদেশ প্রেম। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি গোপনে গোপনে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ করেন 'The Indigo Planting Mirror'। তাতেও তাঁর নাম ছিল না, শুধু প্রকাশক হিসাবে লঙ সাহেবের নাম ছিল। ফলে লঙ সাহেবের জরিমানা ও কারাবাস হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ইতিহাসের আড়ালে মধুসূদনের জাতীয়তাবাদের সুর উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে। জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "দেশের অতীত গৌরবময় কাহিনী নাটকের মধ্যে রূপ নিয়া আমাদের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে অনেকখানি জাগ্রত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।"[৭]

মধুসূদন ইতিহাসকে পটভূমিকায় রেখে রাণা ভীমসিংহ ও তাঁর পরিবারের কাহিনী অংকন করেছেন, নাট্যকারের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি এই কাহিনীকে সমগ্র রাজ্যের আসন্ন বিপর্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যক্তিজীবন ও জাতীয়জীবনের বাস্তব পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। কুমারী কৃষ্ণার জীবনকে কেন্দ্র করে এই নাটকে ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে।

মধুসূদনের বিচিত্রধর্মী প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন হল তাঁর প্রহসন দুটি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের আলোচ্য বিষয় ইয়ং বেঙ্গলে সমাজের পদস্খলন। মধুসূদন সমকালীন সমাজজীবনের যে সুসংহত জীবনাদর্শের অভাব লক্ষ করেছিলেন তাকেই এই প্রহসনে

উপস্থাপিত করেছেন। শিক্ষিত যুবকদের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত নবকুমার, কালীনাথ প্রমুখ মদ খেয়ে মাতলামি করে, নষ্টপাড়ার নষ্ট মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে নিজেদের প্রগতিশীল বলে পরিচয় দেয়, এদের কোন মূল্যবোধ নেই, লঘুগুরু জ্ঞান নেই। এদের সম্পর্কে হরকামিনীর মূল্যায়নই যর্থার্থ --

> "বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতো সভ্য হয়েছি।....মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? –একেই কি বলে সভ্যতা?"[৮]

উনিশ শতকের নারীজাগরণ, তাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের পরিচায়ক এই উক্তি। মধুসূদন এই প্রহসনের ক্ষুদ্র পরিসরের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটি যুগের সমাজের সমস্যাকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করেছেন। নাগরিক সমাজের এই বেপোরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার ঠিক বিপরীত মেরুতে আসীন উনিশ শতকীয় সমাজের অপর আর একটি সমস্যা নিয়ে রচিত মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এবার তাঁর লক্ষ্যস্থল আর কলকাতার নব্য শিক্ষিত সমাজ নয়। পরিবর্তে গ্রামজীবনের এক গভীর ক্ষতকে সামনে তুলে ধরলেন তিনি।

ভণ্ড প্রতারক কামনালিপ্সু জমিদারের অর্থনৈতিক শোষণ ও লাম্পট্যই 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র বিষয়। দীন দরিদ্র খাজনা দানে অপারগ প্রজার কাছ থেকে জোর করে প্রাপ্য আদায়ের জন্য একদিকে যেমন ভক্তপ্রসাদের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ অন্যদিকে নিজ কামনা ও ভোগ চরিতার্থের জন্য নিঃসংকোচে এবং নির্দ্বিধায় মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয়।

প্রহসনটি দুটি অংকে বিন্যস্ত। কাহিনী স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হলেও তৎকালীন সমাজের একটা দিক এখানে অত্যন্ত সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। খন্ড চিত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে এক অখন্ড নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। চরিত্রগুলি টাইপ হলেও স্বতন্ত্র ধারায় পূর্ণ বিকশিত। সব মিলিয়ে প্রহসনটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রয়াস। বলাবাহুল্য এখানে যেমন ইয়ং বেঙ্গলদের শ্রেণি চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে প্রাচীন ধর্মধ্বজী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ধ্বজাধারীদের শ্রেণিরূপকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> "একেই কি বলে সভ্যতা তাৎকালিক সমাজের একাংশ মাত্র চিত্রিত করিয়াছিল; অপরাংশ চিত্রণেরও প্রয়োজন ছিল। কেবল ইংরেজী শিক্ষিত, নব্য সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দু-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; চরিত্রহীন বকধর্ম্মী, প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। মধুসূদনের সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায়ও তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ, কিন্তু গোপনে পরস্বাপফরণ, সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, কিন্তু গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন, তাঁহাদিগের অনেকের নিত্য ব্রত ছিল। বাহিরে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও ইহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্র সমূহকে উপহাস মাত্র করিত। 'ইয়ং বেঙ্গল'দিগের উপর ইহাদিগের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ছিল; কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'গণ যে সব পাপ কল্পনাও করিতে পারিতেন না, ইঁহারা তাহাতে লপ্ত থাকিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন, 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'য় এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"[৯]

এই প্রহসনে এমনি এক বকধার্মিক চরিত্র ভক্তপ্রসাদ। ভক্তপ্রসাদের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ধর্মের ধ্বজাবাহী সমাজপতি, তথা জমিদার শ্রেণির লোকের তথাকথিত 'ভদ্র' মুখোশটি খুলে দিয়েছেন মধুসূদন। এই মুখোশধারী লম্পট জমিদারের লালসার খোরাক জোগাতে নিয়োজিত থাকে গদাদের মতো অনুচর, পুঁটির মতো দূতীরা— যারা রাতের আঁধারে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভাঙ্গা শিব মন্দিরে মুসলমান নারী ফতেমাকে জোগান দিতে দ্বিধা করে না বকশিসের লোভে, অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে।

বহু ঘাটের জল খেয়েও জমিদার ভক্তপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত ফতেমার স্বামী হানিফ এবং ব্রাহ্মণ বাচস্পতির কৌশলের কাছে হেরে যায়। ফতেমাকে পুঁটি নিয়ে যায় ভাঙ্গা শিব মন্দিরে, পূর্বপরিকল্পনামতো হানিফ ও বাচস্পতি হাতেনাতে ধরে ফেলে সুগন্ধি-আতর রঞ্জিত বৃদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রসাদকে। শেষ পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম প্রাপ্তি ও অর্থদণ্ডের পরও জমিদারকে সাধারণ প্রজার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে বলতে হয়েছেঃ

> "আমি যেমন কর্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাঁ দেখ ভাই, তোমার হাত ধরে বলচি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়বে। তুমি ভাই, আমার পরম-আত্মীয়।"[১০] (দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক- 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ')

এইভাবে মাইকেল ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তৎকালীন জমিদারতন্ত্রের নারীলালসার ও সর্ব্বে
নীতিহীনতার স্বরূপ উন্মোচন করে তাঁর প্রখর সমাজসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রহসনটি দুই অংক ও দুই গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। এই প্রহসনের পীতাম্বর তেলীর মেয়ে পাঁচীর চরিত্রে প্রভাব দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণি চরিত্রটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এখানে প্রহসনকার মধুসূদন ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের বাইরে ও অন্তরের সামঞ্জস্যের অভাবকে উদ্ঘাটিত করে ব্যঙ্গ করেছেন। বাইরে সে ভক্ত, ঈশ্বর বিশ্বাসী ও হিন্দুর ঐতিহ্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর কিন্তু অন্তরে সে অর্থলোলুপ ও ইন্দ্রিয়সত্তা। মুসলমানের হাতে অন্নগ্রহণে ভক্তপ্রসাদে ঘোর আপত্তি কিন্তু তাদের মেয়েকে ভোগ করার বেলায় তার মন অতি উদার। সেই সঙ্গে প্রজা শোষণ - তার অর্থ উপার্জনের উৎস। তথাকথিত ধার্মিকদের ভণ্ডামির এই মুখোশ প্রহসনের শেষে খুলে দিয়েছেন নাট্যকার—

"বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামির চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় পুড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম ফল্‌লো ধর্ম,
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।"[১১]

মোট কথা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলার যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল মধুসূদন তার বাস্তবচিত্র এঁকেছেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে। যদিও একথা সত্য –

> "মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ন্যায় 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' ও তাঁহার কোন-কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এবং হানিফগাজী, পাঁচীতেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন-কোন স্ত্রী-পুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশের স্থানে-স্থানে, এইরূপ ভক্তপ্রসাদগণ এখনও বিরাজমান আছেন। উপধর্ম্মের আক্রমণে হিন্দুধর্ম্মের যে ক্ষতি হইয়াছে, হিন্দুনামধারী এইরূপ ভক্ত প্রসাদগণের দ্বারা তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতি হইতেছে। ইহারা হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে কীটরূপে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে দিন-দিন অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। নব্যসম্প্রদায়ের শাসনের জন্য যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ন্যায় গ্রন্থের আবশ্যক, তেমনই এইরূপ ভক্ত প্রসাদগণেরও দণ্ডের জন্য 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'র ন্যায় প্রহসনের প্রয়োজন। নাটকাংশে বিচার করিলে 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' 'একেই কি বলে সভ্যতা' হইতে নিকৃষ্ট।"[১২]

আবার পাশাপাশি সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'মধুসূদন কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে বলেছেন - "নাট্যসাহিত্যেও তাঁহার দান উপেক্ষনীয় নয়, তিনিই আধুনিক বাংলা নাটকের জনক এবং তাঁর পরে নাট্যসাহিত্যে খুব বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। শুধু সাহিত্যিক মানদন্ড দিয়া বিচার করলে বলা যাইতে পারে যে কৃষ্ণকুমারী বা বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ- এখনও বাংলা নাটকের ইতিহাসে উচ্চস্থান পাইবে।" দীনবন্ধুর মতো সত্যকারের নাট্যপ্রতিভাশালী ব্যক্তিও মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র আদর্শে 'সধবার একাদশী' লিখেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হল মাইকেলের প্রহসনটি যথার্থ প্রহসন, চরিত্র বা ঘটনার বিশেষ কোন বিকাশ নেই।কিন্তু দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসন হলেও পুরোপুরি নাটকের রীতিতে রচিত।ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ অনুকারী নব্য বাঙালী যুব সম্প্রদায়ের কদর্মতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং মদ্যপানের কুপ্রভাব এখানে চিত্রিত হয়েছে। নিমচাঁদ দত্ত প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রটি সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-- "তাহার চরিত্রে নব্যবঙ্গের ক্ষুরধার মনীষা ও অভাবনীয় নৈতিক অধঃপতন, আকাশস্পর্শী কল্পনা ও তাহার শোচনীয় বাস্তব পরিণতি, নির্লজ্জ মোসাহেবি ও মর্মভেদী অনুশোচনা এক অপূর্ব সমন্বয় দেখানো হয়েছে।" বস্তুত 'সধবার একাদশী' নিছক প্রহসন নয়, এ হল উচ্চাঙ্গের কমেডি। সুতরাং তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় – মধুসূদন যেমন প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু থেকে এক ধাপ এগিয়ে, তেমনি কমেডি নির্মাণে দীনবন্ধু মধুসূদন থেকে এগিয়ে।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির ছাপ রয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে রাজীবলোচনের বিয়ে করার সাধ জাগে। তৎকালীন সমাজে এমন এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। যাই হোক, রাজীবলোচনের কৌতুককর ট্রাজেক পরিণতি এই প্রহসনে দেখানো হয়েছে। প্রহসনটির সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন--"হাস্যরসে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় কল্পনা"।

বহুবিবাহ এবং কৌলিন্য প্রথার কুফল দেখানো হয়েছে 'জামাই বারিক'-এ। সমাজের দুটি বাস্তব এবং করুণ বষয় নিয়ে লেখা এই প্রহসনে নাট্যকার যথেষ্ট কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কলকাতার কোন ধনাঢ্য পরিবার এই প্রহসনের লক্ষস্থল। এই প্রহসনটিতে জামাতাদের মর্কট লীলার পাশেপাশে দুটি উপকাহিনির ধারা বহমান। একটি-দুই সতীনের জ্বালায় বিড়ম্বিত

পদ্মলোচনের সকরুণ জীবন। দ্বিতীয়টি – ঘরজামাই অভয়ের লাঞ্ছিত জীবন। বাংলা সাহিত্যে বগী ও বিন্দী –দুই সতীনের কোন্দল প্রায় ক্লাসিক রসিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের নাট্যরসের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে ড. অজিত কুমার ঘোষ জানিয়েছেন-

> "দীনবন্ধুর হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু তাঁহার হাস্যরূপ শুধু ফেনিল, কালোচ্ছ্বাসে শেষ হইয়া যায় না; তাহার গভীরতর স্তরে স্তরে জীবনের একটি সত্যোপলব্ধি একটি ক্ষমাসুন্দর, মমতা-করুণ দৃষ্টি বিরাজ করে।"

তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় উভয় নাট্যকারের নাটক ও প্রহসনে গ্রাম্য ও কথ্য ভাষার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উভয় নাট্যকারের সংলাপের ভাষা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভক্তপ্রসাদঃ "ও পুঁটি, এটি তো বড়ো লাজুক দেখছি রে। আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরী, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ)

আদুরীর উক্তিঃ "আহা! হা, হা কনে যাব, পরাণ ফ্যাটেবার হল, এমন কর্‍্যেও ম্যারেচে কেবল ধুক-ধুক কত্তি নেগেচে,মাঠাকরুণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। ক্যুটি ধর্‍্যে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা গাচ্‌তলায় আঁচড়া পিচ্‌ড়ি করে কান্তি নেগেচেন, কোলে কর্‍্যে মোদের বাড়ী পানে আন্‌লে তা দেখতে পালেন না।" (নীলদর্পণ)

পক্ষান্তরে উল্লেখ্য, সংস্কৃত নাটকের রীতি মেনে মধুসূদনের ভাষার আদর্শকে দীনবন্ধু তাঁর নাটকের সংলাপ যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। 'নীলদর্পণ'-এর গোলক বসুর পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে ভদ্র চরিত্রদের সংলাপে সংস্কৃত ঘেঁষা পণ্ডিতী সাধুরীতির গদ্যকে, বিশেষ করে বিদ্যাসাগর সৃষ্ট সাধু-গদ্যকে স্থান দিয়েছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ সৈরিন্ধ্রীকে বল নবীনমাধবের উক্তি এখানে উল্লেখ করছি—

> "প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই।কামিনীকে অলঙ্কার বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে ব্যাঘ্রের মুখে গমন, পতি এত ক্লেষে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজ নয়নে, অপেক্ষা কর।" (নীলদর্পণ)

লক্ষ্য করার বিষয় হল সংস্কৃত নাটকের মতো মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক মিলনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পুরাণে নারদের যে ভূমিকা দেখা যায়, এই নাটকেও নারদের সেই একই ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এখানে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের উপস্থিতি দেখা যায়। এই নাটকের ভাষা নাটকীয়। লক্ষণীয় বিষয় হল এই নাটকের বিভিন্ন স্থানে মধুসূদন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেছেন—

"বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিল কমল, লোকে তারে

তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,
কুসুম কানন সুরভিতে হরি
দেশ-দেশান্তরে চলি যান কুতূহলে।" (২/২)

পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক বাংলা নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মধুসূদনের হাতে। সার্থক প্রহসনের স্রষ্টাও তিনি। তাঁরপরে দীনবন্ধু বাংলা প্রহসনকে আরো উচ্চাঙ্গের নাট্যসাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা দেন। মধুসূদনের দুটি প্রহসনই দু'অংকে বিন্যস্ত। কিন্তু দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'-কে পঞ্চসন্ধি পর্যন্ত বিন্যস্ত করে পূর্ণ নাটকের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দীনবন্ধু সামাজিক নাটকের পথ প্রদর্শক। সমাজ সচেতনতা তাঁর সবচাইতে বড় গুণ। ভদ্র সম্প্রদায়ের চরিত্র সৃষ্টিতে সফল না হলেও, ভদ্রেতর চরিত্র সৃষ্টিতেও তাঁর সাফল্য অপরিসীম। তোরাপ, আদুরী প্রমুখ তার দৃষ্টান্ত। দীনবন্ধুকে আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রদূত বলা যায়। বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গির দ্বারা তিনি বাংলা নাটকের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু সম্পর্কে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন— "জীবনের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতি গোচর তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে আপনারই নিয়মে, একটি সুসামঞ্জস্য রসমূর্তি পরিগ্রহ করে— যাহা আছে তাহাই তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয় – এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যভিমান – বর্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথে দেখাইয়া বাস্তুসকলের সুগভীর রহস্য-নিকেতনে লইয়া যায় এবং এই যথাপ্রাপ্ত জগৎই অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যে রসের আস্বাদন করায়, নাট্যকার সেই রসের রসিক। কল্পনার এই objectivity উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

বলা ভাল মধুসূদনের নাটক যেমন কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়েছে, দীনবন্ধুর নাটকও তেমন অপ্রাকৃত ও প্রাণহীন হয়েছে। মধুসূদনের নাটকের কথোপকথন একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন। এর কারণ অনাবশ্যক ও আত্যন্তিক দীর্ঘতা। এই দীর্ঘ কথোপকথন নাটকে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তিনি যেহেতু একাধারে কবি ও নাট্যকার তাই নাটকের মধ্যে নিসর্গ বর্ণনা ও উপমা অলংকারের প্রয়োগ করে কবিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। দীনবন্ধু নাট্যরচনায় মধুসূদনকে অনুসরণ করেছেন। মধুসূদনের নাটক যে কারণে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হয়েছে, দীনবন্ধুর নাটকও সেই কারণে অপ্রাকৃত ও প্রাণহীন হয়েছে। দীনবন্ধুর কোমল ভাবমূলক নাটকগুলিতে সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান। মাইকেলের ন্যায় তিনিও সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নাটকের মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার কথোপকথন নিবন্ধ করেছেন। কারণ নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও প্রথম দিকে তিনি ছিলেন কবি। দীনবন্ধুর কবি প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল, সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাব পুষ্ট শিষ্য যখন পয়ার ও ত্রিপদীর তরল ছন্দে বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা করতে গিয়েছেন তখন তা নিতান্ত এক ঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে। তথাপিও একথা সত্য —

> "জগৎ ও জীবনের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা এবং 'ট্যাজেডির অশ্রু' ও 'কমেডির হাস্যরস' নিয়ে দীনবন্ধু নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।"

তবুও একথা বলা যায়- মধুসূদন বাংলা নাটকের যে প্রশান্ত পথ নির্মাণ করেছিলেন সেই পথকে আঁকড়ে ধরেই দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যজগতকে আরো সমৃদ্ধশালী ও গৌরবান্বিত করে তুলেছিল। প্রসঙ্গত অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্যটি উল্লেখ করে উভয় নাট্যকারের তুলনামূলক আলোচনা শেষ করছি—

> "শেকস্‌পিয়র তাঁহার পূর্বতন নাট্যকার ক্রিস্টোফার মারলোর বহু নাটক হইতে ভাবগ্রহণ করিয়াও যেমন এলিজাবেথীয় সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হইয়া আছেন। দীনবন্ধুর নাটকে বিশেষত তাঁহার প্রহসনে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু কাব্যধর্মী মাইকেলের নাটকে যে সৃষ্টি প্রভাতী অরুণছটায় আভাসময় হইয়া উঠিয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকে তাহাই সুদূরপ্রসারী প্রদীপ্ত আলোকে পরিণতি লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধু বাংলা নাট্যসাহিত্যেকে যে উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠায় উন্নীত করিয়া দেন, তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারবৃন্দ তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই।"[১৩]

তথ্যসূত্র:

১। হীরেন চট্টোপাধ্যায়- নাটকে আধুনিকতাঃ কৃষ্ণকুমারী নাটক, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, পৃঃ ৩।
২। ড. অজিতকুমার ঘোষ – বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃঃ ১০৬।
৩। হীরেন চট্টোপাধ্যায়— নাটকে আধুনিকতাঃ কৃষ্ণকুমারী নাটকে, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৩।
৪। তদেব, পৃঃ ১৬।
৫। তদেব, পৃঃ ১৭।
৬। তদেব, পৃঃ ৪৭।
৭। ড. অজিতকুমার ঘোষ – বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃঃ ৭৮।
৮। মধুসূদন দত্ত – একেই কি বলে সভ্যতা?, মধুসূদন রচনাবলী, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯, পৃঃ ২৫১।
৯। যোগীন্দ্রনাথ বসু — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২৩, পৃঃ ২১১-২১২।
১০। ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) –মধুসূদন রচনাবলী, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, জুলাই ২০১৭, পৃঃ ২৬১।
১১। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদক) – মধুসূদনের প্রহসন একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃঃ ১১২।
১২। যোগীন্দ্রনাথ বসু — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, প্রাগুক্ত; পৃঃ ২১৩-১৪।
১৩। ড. অজিতকুমার ঘোষ— বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, দে'জ পাবলেশিং, জানুয়ারি ২০০৫, পৃঃ ৮৮।

সহায়কগ্রন্থ:

১। ক্ষেত্রগুপ্তঃ বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস। কলকাতা, ২০০২।
২। সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড) কলকাতা, ১৪১৭।
৩। অনিরুদ্ধ আলি আক্তার – নাটকের দর্পণে, প্রতিবিম্বিত জীবনও কিছু ভাবনা। কলকাতা, ২০১৪।
৪। ড. অজিতকুমার ঘোষ – বাংলা নাটকের ইতিহাস। কলকাতা, ২০০৫।
৫। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় – বাংলা সাহিত্য পরিচয়। কলকাতা, ২০১৪।
৬। তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় – আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা, ২০১৪।
৭। ড. অজিতকুমার ঘোষ - নাটক ও নাট্যকার। কলকাতা, ২০০০।
৮। ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় – বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস। কলকাতা, ২০০২-২০০৩।
৯। দেবেশ কুমার আচার্য্য – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০৭।

ইতিহাসের আলোকে ছোট আস্তানা এবং শাহ ইসমাইল গাজীর সমাধি প্রসঙ্গ

ডালিয়া খাতুন
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ (Abstract): হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত গড় মান্দারণ দূর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়ার পূর্বে তার অতীত ইতিহাস জানা থাকলে বর্তমানের ধ্বংসপ্রায় দূর্গ দেখামাত্র কল্পনার ক্যানভাসে অতীতের রাজ্য ও রাজার দরবারে হাজির হওয়া যায়। শূর বংশীয় রাজন্যবর্গের সৃষ্ট সাধের রাজ্য ও রাজধানী অপারমন্দার ওরফে গড় মান্দারণ ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক দিক থেকে যে গৌরব অর্জন করেছিল, বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তা একেবারে বিলীন হয়ে যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ মান্দারণ পরগনাকে সপ্তগ্রাম চাকলায় রূপান্তরিত করে মান্দারণের সদর কার্যালয় হুগলীর আদিসপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। তখন থেকেই মান্দারণ দূর্গ অবহেলিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে থাকে। আদিমধ্যযুগে সামন্তশাসক অনুশূর দক্ষিণরাঢ় ত্যাগ করে মান্দারণে আসেন ও প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করেন। পরবর্তীকালে কালানুক্রমে উড়িষ্যার গঙ্গোবংশ, সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ ও তাঁর সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজী,মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ এই অঞ্চলের উপর একের পর এক আধিপত্য বিস্তার করেন। যার বিবরণ বিভিন্ন তথ্যসূত্র সহযোগে আমরা জানতে পারি। আদিমধ্যযুগ ও মধ্যযুগের এই রাজ্য ও রাজধানী বিলীন হয়ে গেলেও উক্ত অঞ্চলটি তারই মাঝে একটি পরিচয় আজও বয়ে নিয়ে চলেছে সেটি হল সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহের সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজীর সমাধি ও জনমানসে তার অলৌকিক ক্ষমতার ধারনা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসমাইল গাজীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কিংবদন্তী মিশ্রিত ঘটনার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা ও বর্তমান গুরুত্ব আলোচ্য গবেষণাপত্রটির মূল বিষয়।

সূচক শব্দ (Key Words): হুগলী, অপারমন্দার, রুকনউদ্দিন বারবক শাহ, শাহ ইসমাইল গাজী, ছোট আস্তানা।

মূল আলোচনা (Discussion):

সৃষ্টির সূচনা থেকে বিভিন্ন সভ্যতা যেমন গড়ে উঠেছে সেই সাথে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজ্য ও রাজধানী যা কালের নিয়মে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। ঠিক এরকমই এক রাজধানী বাংলাই গড়ে উঠেছিল আদি মধ্যযুগে। আনুমানিক নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ রাঢ়ের শূরবংশীয় হিন্দু রাজারা বাংলার পাল রাজাদের প্রাধান্য এড়িয়ে নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন ও অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন জায়গার খোঁজে বাহির হন। অবশেষে তাদের রাজ্য ও রাজধানী স্থাপনের নতুন স্থান নির্বাচন করলেন তৎকালীন বর্ধমান বিভাগের জাহানাবাদ পরগনার রাঙ্গামাটি গ্রামের পূর্বদিকে ও মান্দারণ গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আমোদর নদীর তীরে মন্দার বৃক্ষ পরিশোভিত এই মনোরম জায়গাটি। নাম ছিল অপার মন্দার। পরবর্তীকালে যা অযত্নে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঠিকই কিন্তু নতুন এক পরিচিতি লাভ করে আজও প্রাসঙ্গিকতা বয়ে নিয়ে চলেছে জনমানসে, সেই নতুন পরিচিতিটা হল এই রূপ ইসমাইল

গাজীর জাগ্রত দরগাহ যেখানে মানুষ মনস্কামনা পূরণের আশায় আজও মানত করতে আসে। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা জানতে হয় তা হল এর অবস্থান- পূর্ব ভারতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ২ নম্বর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের একটি গ্রাম হল গড় মান্দারণ।[1] সেখানে অপারমন্দার রাজ্য ও রাজধানীর দুর্গ ও ভিতরগড় অবস্থিত। তবে বর্তমানে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও পূর্বে তা ছিল বর্ধমান বিভাগের একটি অংশ। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যপক বিস্তার ও কার্যভারের কারণে বর্ধমান বিভাগ থেকে হুগলি জেলাকে পৃথক করা হয়।[2] অপারমন্দার ওরফে গড় মান্দারনের উত্থান, তার রাজধানী হয়ে ওঠা ও কালানুক্রমিকভাবে শূর, পাঠান, মুঘল, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি শক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করে স্থানটিকে ঐতিহাসিক মর্যাদা এনে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু কালের নিয়মে সব কিছু আজ ধংসস্তুপে পরিনত। দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, প্রাচীন হিন্দু রাজাদের ইতিহাস জানার মতো বিশেষ কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি যেটুকু পাওয়া গেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য ও বিক্ষিপ্ত। মুসলমান শাসকের আমলের বেশ কিছু লিখিত উপাদান থেকে যে তথ্য মিলেছে তার সত্যতাও একটা বড়ো প্রশ্ন। যথার্থ তথ্যপ্রমানের অভাবে সেইসমস্ত মুখরোচক কল্পনামিশ্রিত গল্প পৃথক করা যায়নি। তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাদের গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক স্থলটির ব্যাখা দিয়েছেন। গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে সাবধানতা অবলম্বনে কালানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন সময়ে গড় মান্দারণকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী,তার বিস্তৃতি তুলে ধরেছেন। যদিও এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। আলোচ্য গবেষণাপত্রে ধ্বংসপ্রায় ঐতিহাসিক স্থলটির বর্তমানে ধার্মিক প্রাসঙ্গিকতা বয়ে নিয়ে চলা ইসমাইল গাজী সম্পর্কিত পরিচিতি, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ, কিংবদন্তী, ঐতিহাসিক অবদান ও বর্তমান গুরুত্ব আলোচ্য বিষয়।

ভারতবর্ষ সূচনা থেকেই এক প্রকার সাধু সন্ন্যাসীর দেশ বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ভারতের মাটিতে বহুসাধক পরমাত্মার সন্ধানে যেমন জন্মলাভ করেছে সেই সঙ্গে পরমাত্মার আস্বাদ পেয়ে এই মাটিতেই বিলীন হয়েছেন। কোথাও কোথাও দেখা গেছে এই সমস্ত সাধক উপাসকদের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। কেউ হয়তো কোনো দুঃসাহসী রাজা, কেউ বা দাস, কেউ বা কসাই প্রভৃতি। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আমরা এমনই এক সাধকের খোঁজ পাই যিনি ছিলেন একাধারে সুদক্ষ সেনাপতি ও যোদ্ধা, যার নাম শাহ ইসমাইল গাজী। আদি মধ্যযুগের বাংলাতে গড়ে ওঠা অন্যতম রাজধানী অপারমন্দারের কোলে যার সমাধি আজও সযত্নে রক্ষিত এবং যা ছোট আস্তানা নামেই সমাধিক পরিচিত। ইসমাইল গাজী ছিলেন সুলতান রুকন উদ্দিন বারবাক শাহের সেনাপতি। যিনি মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ এর বংশধর ছিলেন ও অল্প বয়স থেকেই তিনি ধর্মের প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত ছিলেন ফলে ধর্ম প্রচারে কালাতিপাত করতেন। একশকুড়ি জন জ্ঞানী ব্যক্তি ও তাহাদের গুরু আরব দেশের অধিবাসী মৌলানা হাসানউদ্দিন এর সহবাসে তিনি সর্বদা কাল অতিবাহিত করতেন।[3]
Stewarts History Of Bengal এ উল্লেখ আছে – "It happened at this period that both the Vizir Khan Jahan and Mulk Andial the commander in chief, were detached from the capital to wage wax against some refractory Rajas and there were no troops left in the city but the plake."[4]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*বাঙ্গালার ইতিহাস*' গন্থ থেকে জানতে পারি, আবিসিনিয় দাসদের দ্বারা গৌড়ের নবাব ফতে শাহর হত্যাকালে তার উজির খান জাহান এবং প্রধান

সেনাপতি আন্দিয়েল কয়েকজন বিদ্রোহী হিন্দুরাজাকে বশীভূত করার জন্য গৌড় থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। শাহ ইসমাইল গাজি তাদেরই সঙ্গে এসে মান্দারন অধিকার করে থাকেন। ইসমাইল শাহ গড় মান্দারণসহ অনেকগুলি দুর্গ ধ্বংস করেন পরে আবার গড়মান্দারন দুর্গ নতুনভাবে তৈরি করলে হোসেন শাহ ইসমাইলকে বিদ্রোহী ভেবে মুন্ডচ্ছেদ করেন।[5] এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইসমাইল গাজী তিনি কোন শাসকের সেনাপতি ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ নাকি হোসেন শাহ এই নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান। অম্বিকাচরন গুপ্ত তার '*দক্ষিন রাঢ়*' নামক গ্রন্থে বলেছেন, কোন অজ্ঞাত কারনে শাহ ইসমাইল গাজি নামক এক মুসলমান হিন্দু রাজাদের পরাভূত করে এদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন।

ইসমাইল গাজী সম্পর্কে যে সমস্ত গল্পগাথা, কিংবদন্তী মিলিছে তার মধ্যে ব্লকমানের বিবরণ থেকে শাহ ইসমাইল গাজি সম্পর্কে যে কিংবদন্তী কাহিনী উদ্ধৃত করা গেছে তা এই রূপ- প্রাচীনকালে গৌড়ের হোসেন শাহের সেনাপতি বা সিপাহশালার ইসমাইল গাজীকে উড়িষ্যার বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়। একটি বড় রকম যুদ্ধ জয়ের পর ইসমাইল কটক হতে বাংলায় ফিরে এসে বর্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দারণ নামক একটি ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থান করেন। এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি কিছুকাল এখানে বাস করেন। একদিন রাত্রিতে যখন উন্মুক্ত স্থানে উপাসনা করতে ব্যস্ত তখন তিনি তার মাথার ওপর গোলযোগ হওয়ায় বিচলিত হন। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, দেবতাদের একটি দীর্ঘশ্রেণী পূর্ব দিকে গঙ্গা বা ভাগীরথি স্নানে যাচ্ছেন। ইসমাইল দেবতাদের বললেন, "আপনারা আমার প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছেন। নীচে নেমে এসে শাস্তিস্বরূপ আমি যে কার্যের দায়িত্ব দেব তা সম্পূর্ণ করুন।" দেবতারা উত্তর দিলেন "আমাদের নদী যাত্রা স্থগিত করতে পারি না। আমাদের ফেরার সময় যা আদেশ করবেন তা পালন করব।" কিছুক্ষণ পরে দেবতারা ফিরলেন এবং ইসমাইলের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ইসমাইল আদেশ করলেন যে- "যে স্থানে তিনি আছেন সেই স্থানে লঙ্কার দুর্গের অনুরূপ একটি দুর্গ নির্মাণ করবার জন্য। দেবতারা প্রথমত আপত্তি করলেন কারণ তারা কখনো লঙ্কায় যাননি কিন্তু ইসমাইলের দৃঢ়তায় তারা তাদের মধ্যে একজনকে অতিসত্বর লঙ্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং রাত্রিপ্রভাতের পূর্বে মান্দারণ দুর্গ প্রস্তুত হল। কিন্তু এক রাত্রিতে প্রস্তুত এই দুর্গের চৌহদ্দি এত বড় হল যে হিন্দুদের বহু জমি এর মধ্যে পড়ল। ভিতরগড় থেকে অর্ধ মাইল দূরে ব্রাহ্মণ গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওনার হোসেন শাহের উপর কিছু প্রতিপত্তি ছিল। ওনার একটি পুষ্করিনী দুর্গের ভিতর পড়ায় তিনি সোজা গৌড়ে হোসেন শাহকে বললেন যে ইসমাইল বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি কি উড়িষ্যার সীমানায় রাজাকে কিছু না জানিয়ে বিনানুমতিতে একটি বিরাট দুর্গ নির্মাণ করেননি? যা যুক্তিযুক্ত বোধ হল এবং ইসমাইলকে ফিরিয়ে আনার জন্য হোসেনশাহ একজন দূত পাঠালেন। ইসমাইল তখন মান্দারণ থেকে প্রায় চার মাইল পূর্বে গোঘাটের নিকট একটি পুষ্করিণী খননের তত্ত্বাবধান করছিলেন সেই সময় এই আদেশ বা ফরমান পৌঁছিল। সেই জন্য এই দীঘিকে এখনো ফরমান দিঘী বলা হয়। ইসমাইল রাজার আদেশ পালন করিলেন কিন্তু গৌড়ে পৌঁছিনো মাত্রই তার শিরচ্ছেদ করা হল।

লোকে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, তাঁর মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করা হলে মস্তকহীন দেহ পাশে দণ্ডায়মান অশ্বে আরোহন করে মান্দারণের দিকে চলল। মাথাটি শরীরের উপর ঠিক খাড়া উচ্চাকাশে অশ্বারোহীর পশ্চাতে মান্দারনের দিকে উড়ে চলল, রাত্রিতে মস্তকহীন অশ্বারোহী ভিতরগড় দুর্গ তোরণে উপস্থিত হয়। তখন সেখানে তাঁর দুইজন দেহরক্ষী পাহারা দিচ্ছিল।

তিনি তাদের ভীত না হতে বললেন এবং গৌড়ে যা ঘটেছিল এবং তিনি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে রাজা কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি তাদের পান দিতে বললেন কিন্তু লোক দুটি এটা দিল না এবং বলল যে তার মস্তক আকাশে রয়েছে। ইসমাইল তখন বললেন- তাহলে আল্লাহর ইচ্ছা যে আমার মস্তক শরীরের সঙ্গে যুক্ত হবে না। অতএব, হে আমার মস্তক গৌড়ের কবরে পতিত হবার জন্য ফিরে যাও। এনারা তাকে খেতে দিলে পুনরায় তিনি জীবন পেতেন। এরপর মস্তক যে পথে এসেছিল সেই পথে গৌড়ে ফিরিয়ে গেল। যে কবরে প্রোথিত হয়েছিল তাহা অদ্যাবধি দেখা যায়। মস্তক চলে গেলে ইসমাইল প্রহরীদের তোরণ খুলতে বলিলেন। নগরে প্রবেশ করে তিনি দুর্গের কোন এক স্থানে এসে পৃথিবীকে বিভক্ত হতে বললেন, তখন হঠাৎ সকলের সম্মুখে অশ্ব ও অশ্বারোহী সেই উন্মুক্ত গহবরের মধ্যে অদৃশ্য হল। মৃত্তিকা আবার বন্ধ হয়ে গেল। এইসব ঘটনা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল এবং বহু সংখ্যক দর্শক যে পবিত্র স্থানে গাজী অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তা দেখতে আসল। প্রায় এই সময় বর্ধমান রাজার সহিত বারদাহর রাজার যুদ্ধ চলিতেছিল এবং শেষোক্ত রাজা মানত করিলেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তিনি হযরত ইসমাইলের জন্য একটি একটি দরগা বা আস্তানা প্রস্তুত করিবেন।”[6] এই অলৌকিক কাহিনির সত্যতা আজও একটি প্রশ্ন।

রুকনুদ্দিন বারবক শাহের রাজত্বকালে ইসমাইল গাজী নামক তার একজন সেনাপতি উড়িষ্যা কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে ইসমাইল গাজীর সমাধিস্থানে, একজন ফকিরের নিকট *রিসালাত উস সোহাদা* নামক একখানি পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থ অনুসারে ইসমাইল গাজীপুরের জাতীয় আরব ছিলেন এবং মক্কায় তার জন্ম হয়েছিল। তিনি বারবক শাহের সময় লক্ষ্মণাবতীতে এসেছিলেন। গৌড় নগরের উপর ছুটিয়া-পুটিয়া নামে একটি নদী বা জলাভূমি ছিল। এটা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হলে গৌড় প্রদেশের অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। বারবক শাহের রাজত্বকালে এই নদী বা জলাভূমির চারিদিকে বহুবার আলীবন্ধন এর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কোন বার উদ্যম সফল হয়নি। ইসমাইল ছুটিয়া-পুটিয়ার উপর সেতুবন্ধন করে ছিলেন। *রিসালাত- উস-সোহাদা* অনুসারে মান্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হলে, ইসমাইল তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং গজপতিকে পরাজিত ও বন্দি করেছিলেন। এই সময় সম্ভবত মন্দার উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ইসমাইল কামরূপরাজ কামেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন কিন্তু কামেশ্বর ইসমাইলের গুনে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ও মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন।[7] আসামের অহম বংশের ইতিহাসে কামেশ্বর নামক কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। অহম বংশীয় সুফাককার পুত্র সুষেনকা ইংরেজি ১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজি ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কামরুপের অধিশ্বর ছিলেন।[8] ইসমাইল কর্তৃক পরাজিত কামেশ্বর সম্ভবত কামতাপুরের রাজা। কামেশ্বর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত সন্তোষের নিকট ইসমাইল কে পরাজিত করেছিলেন। *রিসালাত-উস-সোহাদা* অনুসারে ইসমাইল ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসি রায়ের চক্রান্তে বারবক শাহের আদেশে ৮৭৮ হিজরায় শাবান মাসের চতুর্দশ দিবসে নিহত হয়েছিলেন।[9] তার দেহ হুগলি জেলার মান্দারণ ও তার মস্তক রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ার গ্রামে সমাহিত আছে।[10]

সরকারি বিবরণে ইসমাইল গাজীর সমাধি সম্বন্ধে লিখিত আছে- “Tomb of Shah Ismail Ghaji Laskar Garh Mandaran,in this place which is the site of a mud fortress of bygone times there is a brick built tomb. Supposed to contain

the relies of Shah Ismail Ghaji Lashkar,a Muhameddan saint held in great veneration by the Muhammedan resident of the place. There is likewise a stone, lined entrance leading into the fortress."[11]

সিপাহশালার শাহ ইসমাইল গাজী আজ এক অলৌকিক ক্ষমতাধারী ভগবানের দূত বা মিত্ররূপে গণ্য হয়েছেন। যার কবরটি বর্তমানে শাহ ইসমাইল গাজীর দরগা বা ছোট আস্তানা নামে পরিচিত। কবরটির বামপাশে দেওয়ালের গায়ে একটি শিলালিপি আছে। পারস্য ভাষায় খোদিত শিলালিপিতে ৯০০ হিজরি (১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) লেখা আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে ইসমাইলের দরগাহ, বর্ধমান জয়ের চিহ্ন স্বরুপ শোভা সিংহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো।[12]

এখন ছোট আস্তানা বা গাজী ইসমাইলের দরগায় প্রতিদিনই কিছু সংখ্যক যাত্রী পীর সাহেবের কৃপালাভের আশায় আসেন। তবে সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার বহু দূর দেশ আগত ভক্ত যাত্রী নানা রকমের ব্যাধি মুক্তি, বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভের আশায় পীরের দরগায় আসেন।[13] দরগার পাশে পুকুরে পরপর চার সপ্তাহ বৃহস্পতিবার সকালে পূন্যস্নান করেন,মাজারে শিন্নি দেন, মানত করেন ও মনস্কামনা পূর্ণ হলে সেই মানত শোধ করেন বিভিন্ন ভাবে।[14] কেউ মোরগ দিয়ে, কেউ বা ছাগল দান করে, নতুবা ডাব দিয়ে অথবা মাটির ঘোড়া দিয়ে ব্যাক্তি ভেদে মানত শোধের বৈচিত্র্য দেখা যাই যা এই ঐতিহাসিক স্থলটির বর্তমান বিশেষত্ব।[15] আদি মধ্যযুগের সৃষ্ট রাজ্য ও রাজধানী বইয়ের পাতায় হারিয়ে গেলেও ইসমাইল গাজীর আধ্যাত্মিক সাধনা তাকে আজও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। পবিত্র পীরের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে গড় মান্দারণ যার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে আরো বেশ কয়েকটি পীর দরগা বা পীর আস্তানা যেমন - দেওয়ান পীরের আস্তানা, বড় আস্তানা, মাদার পীরের আস্তানা, পাঁচ পীরের আস্তানা, ঢিলা পীরের আস্তানা প্রভৃতি। আর শুর শাসকদের নির্মিত সেই প্রাকার আজও একইভাবে ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র (References):

1."Admin Reports of NPP", *Details of West Bengal till Village Panchayat Tier. Ministry of Panchayati Raj, Government of India.* 2007-09-12

2. Chakrabarty, Monmohan, 1999. *A Summary of the changes in the jurisdiction of districts in Bengal 1751-1916*, Calcutta:pp.41

3. Journal of the Asiatic Society of Bengal,Old series, vol.xliii, 1874 pt.I, p.221

4. Stewart, Charles, 1904. *History of Bengal*, pp-140

5. বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস, 1917.*বাঙালার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ সং, পৃ.144-145

6. Banerji, Amiyakumar, 1972.*West Bengal District Gazetters*, Hooghly:Oct, pp.677

7. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol.xliii, pp.215-220

8. Gait's History of Assam, P. 82

9. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol.xliii, 1874, pt.I, P.221

10. বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস, 1917.*বাঙালার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ সং, পৃ.145

11. List of Ancient Monument in Bengal; p. 48

12. Medinipur District Gazetteers; p.167

ব্যাক্তিগত সাক্ষাৎকার:

13. কাজী ওসমান (ছোট আস্তানার ঝাঁড়ুকর, গড় মান্দারনের বাসিন্দা, ১৫.০২.২০২৫)

14. বাবলু মল্লিক (প্রবীণ নাগরিক, গড় মান্দারনের বাসিন্দা, ২১.০৩.২০২৫)

15. মনিরা বেগম (প্রবীণ নাগরিক, গড় মান্দারনের বাসিন্দা, ২২.০৩.২০২৫)।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যচেতনা : হাইডেগার থেকে দ্যলুজ

দীপঙ্কর দেবনাথ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম

সারসংক্ষেপ (abstract): পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগার (Martin Heidegger) মনে করতেন সত্তা (Being) ও সময় মানব অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের মধ্যে সত্তার স্থাপন। আর সত্তা নিজেকেই প্রশ্নচিহ্নে ফেলে অস্তিত্বের অনুভব। মৃত্যুর চেতনা মানব অস্তিত্বকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। আবার উত্তর-আধুনিক, উত্তর-গঠনবাদী দার্শনিক জিল দ্যলুজ (Giles Deleuze) মনে করতেন মানব অস্তিত্বের মূল দিকগুলি ছড়ানো, বহুমুখী- গাছের শিকড়ের (Rhizome) মতো। জগতের সবকিছুকে পরিবর্তন আর চলমানতায় দেখেছেন। অস্তিত্বের চেয়ে অস্তিত্বময়তাকে গুরুত্ব দিয়েছে। হয়ে ওঠা, ইচ্ছেশক্তির মধ্য দিয়ে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির পরিসরে ব্যক্তি নিজেকে জানতে পারে। এই দুই ভিন্ন ধারার দার্শনিকের তত্ত্ব-দর্শনের মূল দিকগুলিকে আধার করে জীবনানন্দের কাব্য-দর্শনের অভিমুখকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় সময়, ইতিহাস-ঐতিহ্যের পাশাপাশি প্রকৃতি বড়ো জায়গা জুড়ে রয়েছে। নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, বস্তু-জগতকে অবলম্বন করেছেন। চেতনা অপরতার মধ্য দিয়েই অর্থময় হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের কাব্যকবিতার মূল ভাবকে এই দুই দার্শনিকের তত্ত্ব-দর্শনের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
সূচক শব্দ (key word): সার্ত্রে, দ্যলুজ, হাইডেগার, বিয়িং, অতিবর্তিতা, বিকামিং, কূটাভাস, মৃত্যু, সত্তা।

মূল আলোচনা (Discussion):

সার্ত্রের 'existence preceds essence'[১] মাটির বুকে ফুঁড়ে ওঠা অঙ্কুরের মতো। একে মেনে নিলে মনে হয় এক একটি ব্যক্তি-চৈতন্যই সার্বিক চেতনাকে দৃঢ়তা দেয়। জীবনের সারসত্তাকরণবাদী অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সমূহ সময়ের বুকে জীবনের চালচিত্র- জীবন কীভাবে বয়ে যায়। আধুনিক যুগের সমস্যা, অভিঘাত কাব্যকবিতার সংবেদনে উঠে এসেছে বারবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বাংলা কবিতায় তীব্রতর হয়েছে সংকটের মুহূর্তে অস্তিত্ব- অনস্তিত্ব বোধ। মহাকালের শ্রামণ কবি জীবনানন্দকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে এক শূন্যতা। সে শূন্যতা সভ্যতা, সমাজের ভার, ক্লান্তি, গ্লানি থেকে নির্ভাবনাময় চেতনায় পর্যবসিত হওয়া। তাঁর চৈতন্যে জাগরিত সময়ের বুকে সভ্যতার নাভিশ্বাস।

আলো- অন্ধকারে যাই- মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়- কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়– শান্তি নয়- ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
(কাব্যসমগ্র: বোধ: ৯৬)

জীবনানন্দের সমস্ত কাব্যভুবনে এরকম আত্মপ্রত্যয়, সমাজবাস্তবতায় ব্যক্তিসত্তার টানাপোড়েনে নৈরাশ্য, বিষাদ কিংবা ক্লান্তি প্রত্যক্ষিত। ধূসর জগতের খোঁজ, লোকচেতনা, মিথ-

পুরাণের দিকে যাত্রা আত্মিক বিনাশকে ঠেকাতে। অস্তিত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফলকগুলোকে আঁকড়ে ধরতেই। তাঁর বিপন্ন বিস্ময় বুঝেছিলো সহজ হওয়া কঠিন। এই না পারার ক্ষেদ, আক্ষেপ ঝরে পড়েছে কবিতায়। সময়ের মূল্যায়নে তিনি প্রকৃত আধুনিক। আধুনিকতার যে সংজ্ঞায় তিনি বলেছিলেন-

> “যে- কোনো যুগের প্রাণবস্তু বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে-কাব্যে লাভ করেছে সে কবিতা আধুনিক।”[২]

তিনি সময়ের বুকে জীবনের সারবত্তা তুলে ধরেছেন। হাইডেগার বলেছিলেন- “The essence of Dasein lies in its existence.”[৩]। সময়, মৃত্যু, অনস্তিত্বের বোধই অস্তিত্বকে নিবিড় করে তুলেছে। কবিও জীবন, মুহূর্ত আর মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করেছেন খণ্ডিত সত্তায়। তাঁর কাব্যে রয়েছে জীবনের নির্যাস। জীবনানন্দ আধুনিকতার মর্মার্থকে নিজস্ব কাব্যচিন্তায় বিস্তৃতি দিয়েছেন। সাধারণ জ্ঞানেও জীবনানন্দ বড়ো প্রিয় বাস্তবিক উদ্ধৃতি হিসেবেও সময়ের মানুষের কাছে। সময়কে অখণ্ড সত্তায় কল্পনা করে প্রতি কালের মানুষের অবিরাম ধারায় চেতনার সংশ্লেষ করেছেন। অনন্ত পথ-পরিক্রমায় ব্যক্তি মানুষ তার সৎ অস্তিত্বকে রেখে যেতে চায় সভ্যতার কাছে। ব্যক্তি মানুষের কৃতকর্মই পরিচয় হয়ে ওঠে তবুও নিজের বলে এক ধ্রুব চেতনালোক থাকে, তাকে কতটা শান্তি দিয়ে যেতে পারে মানুষ! এই চিন্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যে। কিয়ের্কেগার্দ-কৃত অস্তিত্বের তিনটি স্তর (Three stages of existence)- পরম্পরায় ভোগ (Aesthetic stage), নৈতিকতা (Ethical stage), ধর্ম (Religious stage) এর মধ্যে নৈতিকতাকে বিশেষভাবে খুঁজে পাওয়া যায় জীবনানন্দের কাব্যবিশ্বে। ‘মানুষের মৃত্যু হ’লে’ কবিতায় বলেছেন–

> সূর্য যদি কেবলই দিনের জন্ম দিয়ে যায়,
> রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের,
> মানুষ কেবলই যদি সমাজের জন্ম দেয়,
> সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের, বিপ্লব নির্মম আবেশের,
> তাহ’লে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিল?

(কাব্যসমগ্র: মানুষের মৃত্যু হ’লে: ২৮৮)

সাধারণ মৈথুনের জীবন, চলমান বাস্তবতার চেয়েও বড়ো কিছু চায় হৃদয়। ভগবান বুদ্ধ যেভাবে সিদ্ধার্থরূপে ঘর ছেড়েছিলেন তেমনই কোনো গভীর চেতনা পেয়ে বসে ক্লান্ত করছে। বিশ্বের অনেক মণীষীদের নাম উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, শ্রীজ্ঞান সবাই নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, মানবতাকে ধর্ম ভেবেছেন। অথচ আজকে সমাজ রক্ত, ব্যর্থ বিপ্লবের নামে মৃত্যু, হিংসায় লিপ্ত। চারিদিকে হিংসা, লোভ। কবির অস্তিত্বচেতনা কিয়ের্কেগার্দ কিংবা পাশ্চাত্য অস্তিবাদী দর্শনজাত নয়। অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, অস্থিরতা, হৃদয়ের জটিলতা, বিষামদময়তা, টিকে থাকবার দুর্বার বাসনা যে-কোনো কালেই মানুষের অন্তরঙ্গস্রোতে চির বহমান। জীবনানন্দ সে-কথা নিজেই জানিয়েছেন-

> “কিয়ের্কেগার্ড প্রভৃতি দার্শনিকের অস্তিত্ববাদ যা প্রমাণ করছে সেটা মানুষের প্রাণধর্মে টিকে থাকার- মনকে চোখঠার দিয়ে বা না দিয়ে- প্রাথমিক উপায় হিসেবে (নিজের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই) হাজার বছর ধরে গ্রহণ করে আসছে মানুষ। কিয়ের্কেগার্ড প্রথম দার্শনিক তথ্য হিসেবে মানুষকে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বুঝি;”[৪]

জীবনানন্দের কবিকল্প কিয়েৰ্কেগার্দ প্রণীত তিন চেতনা-স্তরকে ইতিহাস এবং কালজ্ঞানে অতিক্রম করে গেছে বারবার। সেইসঙ্গে হাইডেগার প্রণীত ঐতিহাসিকতা (Historicity), অতিবর্তিতা (Transcendence) মানব জীবনের মূল্যচেতনায় এক বিরাট পরিসরে লক্ষ করা যায়-

১। হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, (কাব্যসমগ্র:বনলতা সেন:১৪১)
২। শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে! (কাব্যসমগ্র:পিরামিড:৪৯)
৩। আমি ঝ'রে যাবো- তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে, (কাব্যসমগ্র:নির্জন স্বাক্ষর:৬৯)

ইত্যাদি অসংখ্য কবিতাতেই উঠে এসে দূর অতীত হতে অনুভব। ইন্দ্রিয়চেতনায় বারবার গভীর সংলগ্নতায় অতীত-বর্তমানকে ভেঙ্গেচুরে ভবিষ্যতের বুকে স্বাক্ষর রেখে যেতে চেয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতার দর্শন জানায়- মানুষ, জাগতিক জীবন তুচ্ছ; ক্ষুদ্র। জ্ঞানের বিহনে প্রেম, আসা-যাওয়া। হাইডেগারের দর্শনে এই তিনকালের ভেতর মানুষের অসহায় আত্মসমর্পন সুন্দরভাবে ধরা আছে। জীবনানন্দ 'কবিতার কথা' গ্রন্থে বলেছিলেন-
"মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো;"[৫]

এই সময়চেতনা, কালজ্ঞান ও জীবনানন্দ স্বীকৃত ইতিহাসচেতনা তাঁর কাব্যভাবনার ভেতরে নিরন্তর বজায় থেকেছে। দিন-রাত, আলো-অন্ধকার, জন্ম-মৃত্যু সমস্ত ক্রমের ভেতর দিয়ে তিনকালের বয়ে যাওয়া অনুভব করা যায়। এর মধ্যে থেকেই মানুষের জীবন, চিন্তা, মনন, ব্যক্তি অস্তিত্ববোধ। উল্লেখ্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগারের দর্শনেও এই ইতিহাস ঘনিষ্টতা স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের ধারণার সঙ্গে অনিত্যতার ধারণা, মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ -এর ক্রম পরম্পরার ধারণা অনেকটাই মিলে যায়। হাইডেগারের দর্শনে মানুষ অতীতকে বুঝে, বর্তমানে প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে পা বাড়ায়। মৃত্যুর দিকে ক্রমেই অগ্রসরতায় মানুষ তার জীবনকালে অতীতকে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করে। এই তিনকালের একই জীবনে উত্তরণকেই তিনি 'অতিবর্তিতা' (Transcendence) বলে বুঝিয়েছেন। মহাসত্য কিংবা পরমে প্রতিস্থাপনই অতিবর্তিতা। জীবনানন্দ প্রথম জীবনে তাই হয়তো কামনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' অন্য কথা বলে। নিজ অস্তিত্বের বাইরের এক স্বাধীন কালচক্রের অনুভব। মানুষ কেবল সেই কালচক্রে নিজ নিজ সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এই চলমানতায় মানুষ বস্তুপৃথিবীতে আপন অস্তিত্বের স্বাদ পায়। জীবনানন্দের কাব্যে এই অতীতচারিতা অধিকাংশ সময়েই বর্তমানকে ছুঁয়ে ভবিষ্যতের, পরা-পৃথিবীর কথা বলেছে। সর্ববস্তুময়তার বাইরে এক সত্তাজনিত অস্তিত্বে মিলে যাওয়ার অনুভব দিয়েছে। তাঁর হাজার বছরের ভ্রমণ শেষে জীবনের সব লেনদেন ফুরিয়ে গেলে অন্ধকার থাকে। এ আসলে থেভেনাজ বর্ণিত হাইডেগারের 'বিমূর্ত-তত্র-অস্তি' (To be there)। 'বিয়িং এন্ড টাইম' গ্রন্থে হাইডেগার সত্তাকে যেভাবে দেখেছেন তাতে মানব জগতের স্বাভাবিকতা থেকে উদ্বেগচেতনায় বিশ্বসত্তা, ঐতিহাসিকতাতে বিশ্বের বিশ্বস্থতা (Worldhood of the World) শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। এই শূন্যতার অন্তর্লীন চেতনা জীবনানন্দের কাব্যবিশ্বের অন্তর্গত। বারবার দেখা যায় পৃথিবীর জাগতিক ঐশ্বর্যকে অনুভবে নিয়ে মহাজাগতিকতায় পর্যবসিত হন কবি। সৃষ্টির আদিমূলে গিয়ে পৌঁছোয় তাঁর মন। মানুষের যাবতীয় অস্তিত্বের জীবন নৈকট্য হতে স্বাধীনতা, মুক্তি পায়। সূর্য, নক্ষত্র, নারী সমাকীর্ণ চৈতন্যে এক পরমতার সাক্ষাৎ চায়।

হাইডেগার বর্ণিত সত্তার গঠনের তিন বিশেষ অংশ হল- নিজের মুখোমুখি হওয়া (Self in Countering), নিক্ষিপ্ত হওয়া (Thrownness), পতন (Fallenness)। হাইডেগারের অস্তিত্ববাদে এক অস্থির বিন্যাস লক্ষ করা যায়। বস্তু পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের কেবল ছুটে চলা রূপ চলে। পরমসত্তার মাধ্যমে আপন অস্তিত্ব অনুভব করে বস্তু জগতে চলমানতাকে স্বীকার। এই পরমতার ধারণা কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যেও খুঁজে পাওয়া যায় শুধুমাত্র ইচ্ছে, সংকল্পকে রূপ দিতে। পরম সত্তার বোধ রবীন্দ্র-চেতনায় যেভাবে রয়েছে জীবনানন্দে তা একেবারেই নেই। যা আছে তা হল- উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, অস্বাভাবিকতা, আকাঙ্খার জন্য ভ্রমণ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিরোধ, স্ব-বিরোধ। একপ্রকারের প্রবহমানতা (flux), চলমানততা। অস্তিত্বের জন্য বোধের জগতে নিবিড়তা তাকে জাগতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য জীবনানন্দের বোধ এবং সত্তা তাড়িত পরমতার জন্য উদ্বেগ উপনিষদীয় পরাবিদ্যার প্রভাবজাত চিন্তাও কিছুটা। আমরা সকলেই জানি, জীবনানন্দের ওপর উপনিষদের প্রভাব কতটা প্রবল। বস্তু পৃথিবীর সব কাজ, সংসার, আহার, নিদ্রা, মৈথুন তাঁর অন্তরাত্মার কাছে তুচ্ছ। এক পরা-পৃথিবীর ডাক সবসময় অনুভূত হয়। হাইডেগার তাঁর 'Being and Time' গ্রন্থে বলেছেন-

> "First it has been maintain that 'Being' is the 'most universal' concept;'... but the 'universality of 'Being' is not that of a class or genus. The term 'Being' does not define that realm of entities which is uppermost when these are Articulated Conceptually according to genus and Species:,... The 'universality' of Being 'transcends' any universality of genus."[৬]

জীবনানন্দের কাব্যে মানব ব্যক্তি-অস্তিত্ব মহাজাগতিকতা, সম্পূর্ণ সমগ্রতার বিশ্বাস ধরে পৃথিবীতেই নেমে এসেছে। সমগ্রতার অংশ হয়েই সর্বপ্রাণবাদে মিশে আছে- গ্রহ, নক্ষত্র, আলো, অন্ধকারের পরে এই পৃথিবীতেই। জীবন থেকে তিনি ব্যক্তি মানবের সেই অবিস্মরণীয় সততার পিয়াসী। তিনি শত যন্ত্রণা, বিক্ষোভেও মনে করেছেন- মরণের চেয়ে বড়ো জীবনের সুর। তাঁর চৈতন্যে জাগরিত উপনিষদের পরাবিশ্ব। মৈত্রেয়ীই যাজ্ঞবল্কের কাছে ধনরাশি, সম্পদ নয়- পরাবিদ্যা তথা ব্রহ্ম সাধনার মার্গ চেয়েছিল একদিন। জীবনানন্দের পরাবিদ্যা, ব্রহ্মচেতনা বারবার সভ্যতা ও সমাজের বিষাক্ত ছোবলে বিষময় হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজ অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখেছেন সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভেতর থাকা জ্ঞান, প্রেমের আলোর অনুভবেই। তাই পরমসত্তাগত ব্যক্তি-অস্তিত্বই নেমে এসেছে জটিল বিষাদময় পৃথিবীর বুকে ব্যক্তি মানুষের নির্বিকারচেতনায়। যদিও তিনি জানেন কিছুই শাশ্বত নয় তাই জীবনের প্রবাহের মধ্যে চেতনাকে সংবলিত করে রাখতে চেয়েছেন। জেগে থাকার অবিরাম ভারকে লাঘব করতে চেয়েছেন। জেগে থাকা অর্থে চেতনাময় হওয়া।

> গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
> আমাকে কেন জাগাতে চাও? (কাব্যসমগ্র:অন্ধকার:১৫৩)

চেতনাশূন্য অস্তিত্বের মধ্যে ক্লান্তি নেই শুধুই স্তব্ধতা। কিছু হয়ে ওঠার মধ্যেই বিক্ষুব্ধতা, অস্থিরতা। সময় এক নিবিড় গ্রন্থি। এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয় তিনি বলেছেন। সময়, ইতিহাসে সবকিছুই বাঁধা। বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পৃথিবীর অস্থিরতায় সেই চির শান্তি খুঁজে পেতে জীবনানন্দ বারবার তিনকালকে এক করে দেখেছেন। দ্যলুজ

(Giles Deleuze) বর্ণিত 'রাইজোম্যাটিক' অবস্থান নিয়েছে প্রকৃতি, জগত আর সময়ের কাছে। তাঁর ঘাস, শঙ্খচিল শালিকের বেশ পৃথিবীর জীবজগত, প্রাণজগত কিংবা বস্তুজগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে থেকে যাওয়ার ইচ্ছেকে প্রকাশ করে। হাইডেগারের 'বিয়িং' (being) তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্যলুজের 'বিকামিং' (becoming) হয়ে উঠেছে। এরমধ্য দিয়েই ঘটেছে 'সর্বব্যাপকতা' (immanence)। দ্যলুজ বলেছেন- 'plane of immanence'[৭] কোনো পরমসত্তা কিংবা একক বস্তু-বিষয়ে আবদ্ধ নয় সত্তা, চেতনা কিংবা অস্তিত্বের বোধ। সময়, ইতিহাস, পরিসরের ওপর আঘাত হানছে ভেঙে পড়া 'অতিবর্তিতা' (transendence)। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল খসে গেছে। জীবনের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে নব মূল্যবোধ। মহাবিশ্বের চেতনা দিয়ে সৃষ্টির বিশালতায় সবকিছুকে গতিশীল ভেবে মানুষের ব্যক্তি অস্তিত্বের অতিক্ষুদ্র অবস্থানকেও মেপে দেখেছেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের হিংসা, ক্ষয়ের ইতিহাস সব ভেস্তে দিয়েছে। তাঁর অস্তিত্ববাদ মূলত তিনটি পথ ধরে এসেছে। দেশকাল-রাজনীতি, জন্ম-মৃত্যু-ধ্যান এবং সৃষ্টি-প্রেম-শূন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের শকুন, অবসরের গান, ক্যাম্পে প্রভৃতি কবিতাতেই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, যান্ত্রিক যুগের বিষ। 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যের কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কোরাস, সবিতা, আজকের এক মুহূর্ত, সূর্যসাগরতীরে- কবিতায় দেশকাল রাজনীতি বিশ্বচেতনায় আজকের মানুষের বিবর্ণতা উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে তিনি বুঝিয়েছেন এই যন্ত্রযুগীয় শাসন একবারে মহাসত্য নয়। এর আবর্তন ঘটবে কালচক্রে শুভবোধ জাগবেই। ধ্বংসের চরম মুহূর্তেও তাই প্রেম, মঙ্গল ভাবনা চির উজ্জ্বল। ভালোবাসার পথেই সে উত্তরণ। নীটশে্র আগ্রাসী মানব 'অস্তিত্ব-ক্ষমতার প্রেষণা' (will to power) থেকে জীবনানন্দের অস্তিত্ব-চিন্তা অনেক দূরে। জাতিস্মর, পুনর্জন্ম, নতুন জীবন, নতুন দেহ এমন বহু কথাটাতেই তিনি পুনরায় নিজ সত্তাকে পৃথিবীর পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। আর এই ব্যক্তি অস্তিত্বকে ধারণ করেছে কোনো বৃহৎ নাগরিকতা নয় বরং দেশজ অনুভব, লোকসংস্কৃতি, কৌম সমাজ ভাবনা। বারবার আঁকড়ে ধরেছেন দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভূগোল, রহস্যময় মানব জীবন। বর্তমান শূন্যতায় রুদ্ধশ্বাস-দ্বার খুলে খোলা হাওয়া চাইলেন। পিরামিডেই প্রাণ চাঞ্চল্যে জেগে উঠতে চায় যেন তাঁর মন। নিজ স্বপ্নময় জগতের ধ্যান ছড়িয়ে দিলেন মহাবিশ্বলোকে। প্রাণদায়িনী উৎসের সন্ধানে ঘুরলেন দিকবিদিক। পেগান গ্রীস, কনফুসিয়াসের চীন, বৌদ্ধ ভারত, চণ্ডাশোক, ধর্মাশোক, বিম্বিসার, মালয়সাগর, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস ইত্যাদি। প্রকৃত সত্য, মূল্যচেতনা আর বিশ্বাসের হ্রদে ব্যক্তিচৈতন্যকে শীতল আস্থানা দিতে চেয়েছেন বারবার। জীবনানন্দ আইনস্টাইনের 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলেই বিশ্বাস করি। আবার যে-কোনো তত্ত্বই তো কেবল আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকে না। তত্ত্বের সত্য অন্ধকারে ঘুমের ভেতর অনেক আগে থেকে লালিত হয়। জীবনানন্দের অস্তিত্ববাদে এই 'আপেক্ষিকতা' দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। সময়ের হাত ধরে এক তীব্র ঘূর্ণন জীবনের। সময়ই মৃত্যুর বুক হতে আরেক জীবনের সৃষ্টির সদ্‌ভাব নিয়ে আসে। সময় তাঁর কাব্যে তিনকালের সঙ্গেই চতুর্থ মাত্রা। পৃথিবীর সকল বিষয়ের মতো মহাবিশ্বও গতিশীল। এই গতির সম্প্রসারণের জীবনে অনিশ্চয়তা এক বিরাট অস্তিত্ব। ধ্রুব সত্যে বিশ্বাস রেখে চলা কঠিন। বস্তুজগৎ আর ভাবজগতের মধ্যে এক সমন্বয় সময়ের হাত ধরে। পদার্থ আর শক্তির রূপান্তরের বিজ্ঞান তাঁর কাব্যে। এভাবেই নানারূপে ফিরে আসতে চেয়েছেন নবান্নের দেশে। কিন্তু বিজ্ঞান বলে একটি ফুলকে ঝরে যাওয়ার পর আবার সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। জীবনানন্দের কল্পিত ভাববিশ্ব বস্তুজগতের সেই সত্যতাকে মেনেই বিচলিত হয়েছে। প্রেম ও প্রকৃতির ভেতর অস্তিত্বের অভিসার করেছেন। তিনি জানেন

সৃষ্টির বহুসংলগ্নতা গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি কিংবা পুনরায় জেগে উঠবার বাসনায়-

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন? (কাব্যসমগ্র:অন্ধকার:১৫৩)

সৃষ্টির আলোকে সময়ের হাত ধরে জেগে ওঠা বারবার। অন্ধকার সৃষ্টির সেই নীরব বেদনা যা মহাবিশ্বের সত্য। দেশ-বিদেশের পুরাণ, শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে সৃষ্টির পূর্বকার এক অন্ধকার মুহূর্তের কথা। যেন গর্ভগৃহ পৃথিবীর। এই অন্ধকারেই তাঁর পুনর্জন্মের বীজ লুকানো। কোটি কোটি বছরের এক দীর্ঘ সময়ের পর টুকরো টুকরো প্রাণের বেগ এসেছে পৃথিবীতে। সে সময়গ্রন্থির সাধনাকে ভেবে নিজ অস্তিত্বের অনুভব তাঁর কবিতায়। সময়কে নিয়ে খুব বেশি বিচলিত, ভাবিত তিনি। সময়কে অতিক্রমণের চেষ্টা 'সময়ের বিভ্রম' (time delusion) সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কাব্যে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভ্রমণ এবং অনুভূতি, অভিজ্ঞতা জড়ো করার মধ্য দিয়ে সময়ের কূটাভাসের (time travel paradox) সৃষ্টি হয়েছে। একই জীবনে থেকে চতুর্থ মাত্রা যে সময় তাকে অতিক্রম করে অস্তিত্বে থেকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন খেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা;
এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান করে ফেলে জলের মতন এক ঢোঁকে; (কাব্যসমগ্র: আবহমান: ১৬৯)

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান আর মানব সভ্যতার দীর্ঘ পথপরিক্রমা সময়ের বুকেই। তাই সময়ের কাছে ব্যক্তি অস্তিত্বকে দেখেছেন। কল্পিত সময়কে (Imagery Time) বাস্তব সময়-জীবনে (Real Time) নামিয়ে আসলে না-থাকা, না-হওয়া, অতৃপ্ততা, অনস্তিত্বকে ভুলে জাদু-বাস্তবিক অনুভব করতে চাইলেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস আর কালকে কবি ব্যবহার করলেন ব্যক্তি মানুষের অনস্তিত্বের ভেতর আরও এক অস্তিত্বের স্বাদ পেতে। একটা মানুষ, গ্রহের মৃত্যু সময়ের কাছে সামান্য ঘটনা। নিরন্তর সময়ের কাছে আর সব গ্রহের কাছে আমাদের এইসব যাপিত জীবন চলমান প্রক্রিয়া। তাই তাকে বলতে শুনি-

... হে গভীর গতির প্রবাহ
... আমার শরীর ভেঙ্গে ফেলে
নতুন শরীর করো- (কাব্যসমগ্র: একটি কবিতা: ২২২)

একেই তো দ্যলুজ বলেছেন- অস্তিত্বের অনড়, অঘনীভূত প্রবাহ (fluid) যা ক্রম-সঞ্চারিত হয় স্থির নয়। সাধারণ বিজ্ঞান- সত্য আর পদার্থবিদ্যাকে কীভাবে জীবনের স্বাদ পেতে তিনি ব্যবহার করলেন বোঝা যায়। তাই জীবনানন্দের কাব্য কেবল দার্শনিক কবিকল্পে বিবেচ্য নয়, এক বৈজ্ঞানিক কালচেতনাতেও আলোচ্য। পার্থিব যুগের অপূর্ণতা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে গভীর বেদনায়। বেদনা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে কবিতায়। বন্ধ্যাযুগের চিত্রকল্পে, হেমন্ত ঋতুর ধ্যানে, বিচ্ছেদ-মেদুরতায় এক অনন্ত সময় গ্রন্থিতে বারবার জন্ম, প্রেম, শান্তির নীরব সাধনায় মানুষের হাড়মাংসহীন অবয়বহীন সত্যটাকে খুঁজেছেন দেহ দিতে। পদার্থের রূপান্তর তত্ত্ব তাঁর কবিতায় রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি মৃত তারার সন্তান-এ-কথা কমবেশি সকলেই বুঝি। মহাজগত, পৃথিবীর পদার্থেই প্রাণ পেয়েছি। শরীরের মধ্য দিয়ে সেই অসীম কালের স্বাক্ষর বহমান।

তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন; (কাব্যসমগ্র: সবিতা: ১৬৩)

এই আদিচেতনাই সৃষ্টিকে চিরনতুন করে ধরে রেখেছে তাঁর কবিতায়। মহাবিশ্ব, পৃথিবীর আদিজগতের অনুভূতি যেমন রয়েছে তেমনি মানুষের নিজস্ব সভ্যতার আদি সংস্কৃতি, দেশ, লোকজ, কৌম চেতনা রয়েছে। এই জাগতিকতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন পৃথিবীতে। বস্তুজাগতিক ও ভাব-জাগতিক দুই-ই রয়েছে। তাই মৃতুচেতনাও কখনো কখনো দেহাতীত হয়ে উঠেছে। দেহ সারমাত্র। সাধনার মাধ্যম। মৃত্যুতে তাঁর একটি অবিরাম ধারায় ছেদ পড়ে।

সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব হৃদয় শরীরে। (কাব্যসমগ্র: একটি নক্ষত্র আসে: ৩০৭)

মৃত্যু এক অভিজ্ঞতার পুঞ্জিভূত সার। এক জীবনে তাকে রেখে গিয়ে বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন প্রাজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে তুলতে। পরিপূর্ণতার সেই ইচ্ছে যে অবাস্তব তা তিনি জানেন। তবুও মানুষ মৃত্যুতে যা রেখে যায় তাই তার অস্তিত্ব- মৃত্যু তবু এক শেষ শান্ত পবিত্রতা তাঁর কাছে।

Without the world there is no selfhood, no person, without selfhood, the person, there is no world.'[৮]

একটি মানব জীবন এই পৃথিবীর বুকে জল, আলো, বাতাস, মাটিকে ছুঁয়েই সত্য। এর বেশী কিছু নেই। ঋষি, মনীষী- অশ্বিনী, স্বাতি তারা হবে। কর্মজগতের মধ্য দিয়ে জ্ঞান, প্রেম আর আলো ছড়িয়ে বুদ্ধ কিংবা রবীন্দ্রনাথ। বাস্তবিকতায় তাই ঘটে ফলক, মূর্তি, ছবি আর স্মৃতি কিংবা গ্রন্থ, বাণীময় চেতনা। সেখানে মানবের অস্তিত্ব আছে কিন্তু ব্যক্তি মানুষ সশরীরে নেই। হাইডেগারের মতে যে অনস্তিত্ববোধ তা এই মৃত্যু, বিনাশের মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে। আবার জীবনের যে সার সংগ্রহ তাও হারিয়ে যায় ক্রমেই বিলীন হয়ে যায়। এশিরিয়া আজ ধুলো, বেবিলন ছাই হয়ে আছে কিন্তু মানুষের জীবনের গল্প থেকে যায়। এইজন্যই ইতিহাস, ঐতিহ্য, সময়ের মূল্য- 'To recover what has been lost and found and lost again and again'[৯]। জীবনানন্দীয় অনুভবে-

দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়-
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। (কাব্যসমগ্র: সুচেতনা: ১৬৫)

জীবন মানে ঘুরেফিরে আসা নদী। সময়গ্রন্থিতে আবর্তন। একই চিন্তার কাছে বারবার ফিরে যেতে হয়। অথচ এও তো কিছুদিন। চেতনা হারিয়ে গেলেও জীবনের প্রবহমানতা চলতে থাকে। সকল প্রত্যয়ই সাময়িকী। যা চরম সত্য তা হল এই-

সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব-
নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়! (কাব্যসমগ্র: স্বপ্নের হাতে: ১৩৬)

এই অনস্তিত্ব, নশ্বরতার অনুভব থেকে আসা ট্রমা (trauma), হতাশা, মৃত্যু চেতনা জড়জগতের সঙ্গে অর্থের সংশ্লেষ করতে চায়। চেতনাকে দীর্ঘজীবী করতে কিংবা অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চলে পরিবর্তনমুখী, প্রক্রিয়াধর্মী সৃষ্টিবিশ্বের জাগরণ। সত্তাকে আর স্থির, অখণ্ডতায় দেখা হয় না। সমাজ, জগতের সঙ্গে পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্তার বোধ তৈরি হয়। অন্তর্জগতে বিশ্বের অভিনিবেশ, সংশ্লেষই সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি,

ইতিহাস, ঐতিহ্যের বস্তুগত ভিত্তি নগর, সভ্যতা, পুরাণ-চরিত্র সত্তাকে সৃষ্টি করবার জন্যই। ধ্রুব, শাশ্বত নয় পরিবর্তনই নিয়ম তাই বস্তুজগতের সঙ্গেই চেতনার সংশ্লেষে সত্তার অনুভব পূর্ণ হওয়ার বাসনা লক্ষ করা যায়। এজন্যই 'রূপসী বাংলা' কাব্যে ধ্বনিত ফিরে আসার বাসনা, ইচ্ছে 'বিয়িং'-কে 'বিকামিং' -এ নিয়ে যাওয়া। পশু-পাখি (Becoming Animal), প্রকৃতি (Becoming Nature) সবকিছুতে নিজেকে স্থাপন।

ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। (কাব্যসমগ্র: ঘাস: ১৪৩)

জীবনানন্দ দাশ অনুভব করেছেন ভালোর সঙ্গে মন্দ, আলোর সঙ্গে অন্ধকার, দিনের সঙ্গে রাত, আনন্দের সঙ্গে বেদনাও থাকে। যেখানে সবচেয়ে বেশি রূপ সেখানে সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা। অর্থাৎ জীবনের মানেই হচ্ছে এই জটিল, স্ব-বিরোধীতার মধ্যে বেঁচে থাকা। এরমধ্যে থেকে সত্তার অস্থিরতা, অসম্পূর্ণতা এবং তা থেকে মুক্ত হতেই ভ্রমণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কাল, প্রকৃতিতে নিজেকে স্থাপন। হাইডেগারের 'সত্তা' অস্তিত্ববাদী চেতনায় নিজেকে খোঁজা তথা 'বিয়িং'-এর মধ্য দিয়ে ক্রমেই নিজেকে হতে দেখা, বিষয় ও বস্তুর মধ্য দিয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠা দ্যলুজের দর্শনের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। দ্যলুজ জীবনানন্দের অনেক পরবর্তী দার্শনিক। কিন্তু সার্বিক সত্তার বোধ, ব্যক্তি-অস্তিত্বের চেতনা, ক্ষণবাদী দর্শনের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দের কবিতায় অস্তিত্বের বিকল্প বিন্যাসের অনেক চিহ্ন রয়েছে। জীবনানন্দ এক্ষেত্রে 'কাউন্টার মর্ডানিস্ট' হয়ে উঠেছেন অনেক ক্ষেত্রে।

আকর গ্রন্থ:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। ২০১৫। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

তথ্যসূত্র:

১। Sartre, Iean-Paul. 1970. Existentialism and Humanism. Translated by, Philip Mairet. London. Methuen. Page: 28.
২। দাশ, জীবনানন্দ। ২০১৫। কবিতার কথা। আধুনিক কবিতা। সিগনেট প্রেস: কলকাতা। পৃষ্ঠা: ১০৩।
৩। heidegger, Martin. 2001. Being and Time. Translated by John Macquarrie & Edward Robinson. Blackwell. Uk. Page: 42.
৪। প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।
৫। প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।
৬। Heidegger, Martin. 1962. Being and Time. Translated by John Macquarrie & Edward Robinson. Blackwell oxford UK & Cambridge USA. Page: 22.
৭। Deleuze, Giles. and Guattari. 1994. what is Philosophy?., New York: Columbia University Press. Hereafter. W.P. Page: 75.
৮। Sartre, Jean-Paul. 1956. Being and Nothingness The principal text of modern existentialism. Hazel E. Barnes. University of Colorado. Page: 123.
৯। Maxwell, D.E.S. 2016. The Poetry of T.S. Eliot. Routledge Taylor & Francis Group. London & New York. Page: 22.

মধুসূদন দত্তের নাটকে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ : প্রসঙ্গ কৃষ্ণকুমারী নাটক

চন্দন বাউরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো কানহো বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: মধুসূদন দত্তের নাটকগুলি হল শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন (নাটক), একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ (প্রহসন)। অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ শিল্পবোধের স্বাভাবিক অধিকারের ফলে মধুসূদন অতি অল্পসময়ের মধ্যেই মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯ খ্রিঃ) নামে একখানি পৌরাণিক নাটক লিখে ফেললেন। পাশ্চাত্যজ্ঞান ও জীবনভাবনাও যে মাতৃভূমির গৌরব, জাতির অন্তরে উল্লাস, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও জাতীয় চেতনার জন্ম দেয় তা জাতিয়তাবাদকেই বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। তাই শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, যযাতি-চরিত্রগুলো অধিকতর জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত হয়েছে। সর্বোপরি দেশ বা জাতির আত্মমর্যাদা বিশ্বজনীন স্তরে পৌঁছেছে। ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে সাহিত্য রচনায় বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন-ই সর্বপ্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র সূত্রপাত করেন। এই নাটক রচনার পশ্চাতে রয়েছে কর্নেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' নামক গ্রন্থটি। তাই এই নাটকটির যথেষ্ট ঐতিহাসিকমূল্য রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যা জর্জর পটভূমিতে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সামাজিক সমস্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টির আকর্ষণ ও তার সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগানোর প্রচেষ্টা। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল ঐতিহাসিক ট্রাজেডি নাটক "কৃষ্ণকুমারী"-তে। আমরা দেখলাম যুগসমাজে মানুষের প্রতিফলন। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবিকতার সংঘাতে ব্যক্তি মানসিকতার পরাজয়ের বেদনা। এই পরাজয়ের পশ্চাতে রয়েছে পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণা। এই ট্রাজেডি রচনার মূল তথ্য ও বিষয় কল্যাণময় দেশহিতব্রত ও মহৎ আত্মোৎসর্গের বেদীমূলে নিহিত আছে। দেশের শতসহস্র অধিবাসীর জীবনকে বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্য, আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব রক্ষার্থে একটি নিষ্পাপ বালিকা কিভাবে স্বেচ্ছায় জীবনকে উৎসর্গ করেছিল সেই বিষয়কে নাট্যকার মধুসূদন স্বদেশানুভূতির আবেগমথিত চিত্তে বর্ণনা করেছেন।

সূচক শব্দ: নাট্যকার মধুসুদন দত্ত, পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, ইতিহাস চেতনা, স্বদেশ চেতনা, জাতীয়তাবোধ।

মূল আলোচনা:

নাটকের মাধ্যমে জীবনের বহুবিচিত্র রূপের শক্তিশালী দর্পণে জনজাগরন বা গনচেতনার উদ্বোধন ঘটিয়ে জাতির গভীরতর রস-চৈতন্যের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলা নাটকে প্রথমযুগ থেকেই দেশ-প্রেমের প্রকাশ নানাভাবে হয়েছিল। আসলে দেশ বা জাতির গৌরবকথাকে তুলে ধরা বা স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করা ঊনিশ শতকের বাঙালিয়ানা নাট্যকাররা তাদের লেখনীতে মনে-প্রাণে স্বাগত জানিয়েছেন। এই নবচেতনায় বাংলার মানুষ সবকিছুকে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে মানসলোকে আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করছিল। আর এই আত্মপ্রকাশ অভিব্যাক্তির অন্যতম দিক হল জাতীয়তাবাদ। জীবনের

সকলক্ষেত্রে যখন নবচেতনা বা নবজাগরনের উন্মেষ ঠিক সেই মুহূর্তে নবযুগের পরকাষ্ঠা মাইকেল মধুসূদন দত্ত নবজাগরনের পুরোহিত হয়ে তাঁর রচিত বাংলা নাটকে সচেতনভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যধর্মী আঙ্গিকের সমন্বয়সাধন ঘটিয়েছেন। যার ফলে বাংলা নাটক যথেষ্ট নব আধুনিকতার সঞ্চার হয়েছিল। তিনিই যুগচেতনার এক অন্যতম মূল কাণ্ডারী। মধুসূদনের চিত্তবৈকল্যে ডিরোজিও এবং হিন্দু কলেজের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ডঃ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন "ইয়ং বেঙ্গল যুবকদের ইতিহাস চেতনাশ্রয়ী, সাংবাদিক মনোভাব, সংস্কার বাসনা ও স্বদেশপ্রীতি তাঁকে বাল্যকাল থেকেই আছন্ন করেছিল।”[১] তাই স্বদেশ, স্ব-সংস্কৃতি ও স্বজাতির অতীত মাহাত্ম মধুসূদন দত্ত মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। ডঃ প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে আবার মন্তব্য করেছেন- “মধুসূদন দেশনেতাদের স্বাদেশ হিতকামী মনোবাসনার সঙ্গে যে একাত্ম হয়েছিলেন, তার পরিচয় অন্য এক স্থানে পাওয়া যায়। তিনি যখন মহাকাব্য রচনার জন্য বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন স্বদেশ চিন্তার সিদ্ধকাম পুরুষ রাজনারায়ন বসু তাঁকে 'সিংহল বিজয়' কাহিনী মহাকাব্যের উপাদান হিসেবে গ্রহন করতে অনুরোধ করেন। কারন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এই পৃথিবীতে বাঙ্গালীর দেশপ্রেম ও বাহুবলের যে সার্থক মহিমার কথা লিপিবদ্ধ আছে তা দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করবে। আর মধুসূদন 'সিংহল বিজয়' কাহিনী সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। একজন প্রকৃত স্বদেশহিতবাদী নেতার সঙ্গে মধুসূদনের এই মানসিক একাত্মতা অবশ্যই তাঁর স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করে।”[২]

মধুসূদন দত্তের নাটকগুলি হল শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন (নাটক), একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ (প্রহসন)। অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ শিল্পবোধের স্বাভাবিক অধিকারের ফলে মধুসূদন অতি অল্পসময়ের মধ্যেই মহাভারতীয় ঘটনা অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯ খ্রিঃ) নামে একখানি পৌরাণিক নাটক লিখে ফেললেন। পাশ্চাত্যজ্ঞান ও জীবনভাবনাও যে মাতৃভূমির গৌরব, জাতির অন্তরে উল্লাস, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও জাতীয় চেতনার জন্ম দেয় তা জাতিয়তাবাদকেই বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। তাই শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, যযাতি-চরিত্রগুলো অধিকতর জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত হয়েছে। সর্বোপরি দেশ বা জাতির আত্মমর্যাদা বিশ্বজনীন স্তরে পৌঁছেছে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন- “খ্রীস্টান মাইকেল মধুসূদন যিনি এতদিন পাশ্চাত্য সাহিত্যের পুষ্পকাননে বিহার করছিলেন, তিনি যে ভারতের সাহিত্য বিশেষত মহাভারত সম্বন্ধে এতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা কেউ ভাবতে পারেননি।”[৩] শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী ও রচনার কোন কোন অংশ মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও স্বদেশীয় সংস্কৃতি তথা মাতৃভাষায় নাটকের দূরবস্থায় মধুসূদন যে মর্মপীড়িত ছিলেন তা তার প্রথম নাটকের 'মঙ্গলাচরণ ও প্রস্তাবনায় স্পষ্ট। মধুসূদন দত্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শর্মিষ্ঠা'র উপহার দিয়ে বলেন –“মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলাবাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষীতাদি গুনরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনঃদ্ধারন করেন ইতি।”[৪] এখানে প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পের প্রতি মধুসূদনের গৌরববোধের প্রকাশ এবং মাতৃভাষায় সেই গৌরব অর্জনের বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনামূলক অংশে সঙ্গীতের ভাবটির মধ্যেও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পায়।-

“শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়...”[৫]

মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' (১৮৬০ খ্রিঃ) নাটকে গ্রীকপুরানের কাহিনীর আদলে ভারতীয় ঐতিহ্যরীতি সংস্কারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রীক কাহিনির এই ভারতীয় করণে মধুসূদনের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তিন দেবীর মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা এবং প্রেমের দেবীরই জয়লাভ এই মূলভাবটিকে তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশেই উপস্থাপন করেছেন। আর স্বর্ণ আপেলকেও কবি স্বর্ণেপদ্মে রূপান্তরিত করে ভারতীয় পরিবেশ দান করেছেন। নাটকে শচী, রতি, পদ্মাবতী চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন ভারতীয় ঐতিহ্য ও রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে নিছক প্রেমমূলক কাহিনীর ভারতীয় সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

আমার আলোচ্য বিষয়ের শিরোধার্যে মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১ খ্রিঃ) নাটকে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের পরিচয়ের নিদর্শন দেখানো হবে। ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে সাহিত্য রচনায় বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন-ই সর্বপ্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র সূত্রপাত করেন। এই নাটক রচনার পশ্চাতে রয়েছে কর্ণেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' নামক গ্রন্থটি। তাই এই নাটকটির যথেষ্ট ঐতিহাসিকমূল্য রয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন- “ইতিহাস অবলম্বনে বাঙ্গালায় নাটক লেখা এই-ই প্রথম। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী টডের রাজস্থান ইতিবৃত্ত হইতে লইয়াছিলেন। তবে কাহিনীর সন্ধান পাইয়াছিলেন ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষসংখ্যা ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারী' ইতিহাস প্রবন্ধ হইতে। ইতিহাস কাহিনীর সহিত নাটক কাহিনীর সম্পর্ক ক্ষীণ। তাই কৃষ্ণকুমারীকে পুরোপুরি 'ঐতিহাসিক' নাটক বলা চলে না”।[৬]

যাইহোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সমস্যা জর্জর পটভূমিতে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সামাজিক সমস্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টির আকর্ষণ ও তার সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগানোর প্রচেষ্টা। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল এই কৃষ্ণকুমারী নাটকে। আমরা দেখলাম যুগসমাজে মানুষের প্রতিফলন। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবিকতার সংঘাতে ব্যক্তি মানসিকতার পরাজয়ের বেদনা। এই পরাজয়ের পশ্চাতে রয়েছে পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণা। এই ট্রাজেডি রচনার মূল তথ্য ও বিষয় কল্যাণময় দেশহিতব্রত ও মহৎ আত্মোৎসর্গের বেদীমূলে নিহিত আছে। দেশের শতসহস্র অধিবাসীর জীবনকে বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব রক্ষার্থে একটি নিষ্পাপ বালিকা কিভাবে স্বেচ্ছায় জীবনকে উৎসর্গ করেছিল সেই বিষয়কে নাট্যকার মধুসূদন স্বদেশানুভূতির আবেগমথিত চিত্তে বর্ণনা করেছেন। আত্মঘাতী সংগ্রামে, গৃহযুদ্ধ, ক্ষাত্রশক্তির অপব্যাবহারে জাতি কিভাবে হীনবীর্য হয়ে পড়ে তার চিত্রও তিনি নাটকের কুশীলবের আচরণগত ঘটনার মাধ্যমে এঁকেছেন। এছাড়াও নাটকের ইতিহাস চেতনাকে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা তদানুযায়ী চরিত্রের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া ও পটভূমির মধ্যে দিয়ে নিজস্ব শিল্পকৌশলের মাধ্যমে স্থান-কাল ও ঘটনাগত বা ক্রিয়াগত ঐক্যকে সীমিতকালের আয়তনে ও নিজস্ব শিল্পরস সচেতন ব্যঞ্জনাদান করেছেন। ডঃ অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘নাট্যকার মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী' গ্রন্থ অংশে বলেছেন- “নাট্যগত প্রয়োজনে মধুসূদন এই জাতীয় ঐতিহাসিক তথ্যের কিছু পরিবর্তন ঘটালেও সেখানে তিনি ইতিহাসের সীমিত ক্ষেত্রেও কলানৌচিত্য দোষ ঘটাননি। অতীত ইতিহাসের রাজপুত জাতীর শৌর্য-বীর্যকে

মধুসূদন সমসাময়িক কালের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে কৃষ্ণকুমারী নাটকে ইতিহাস চেতনাকে পারিপার্শ্বিক দেশ-কালের আয়তন সম্পৃক্ত এক গভীরতা দান করেছেন। নাটকটির কেন্দ্রীয় রসপ্রবণতাকে অর্থাৎ স্বাদেশিক আনুগত্যকে এমনভাবে রূপান্তরিত করেছেন, দেশ ও কালের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও কৃষ্ণকুমারী নাটকের ইতিহাস চেতনায় সমকালীনতা সমাক্রান্ত হয়ে এক নতুনত্ব এনে দিয়েছ।”[৭]

মধুসূদন দত্ত ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম ভীমসিংহ চরিত্রে স্বাদেশিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তপস্বিনীর সঙ্গে সংলাপে রাজা ভীমসিংহ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন-

> “ভগবতি এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এদেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায় হায়। যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কার্যে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ সৃষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে।” (২/১)

ভীমসিংহের এই আক্ষেপে যেন সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কথা প্রতিধ্বনিত হতে শুনি। সাধারন মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে কি রকম মর্মান্তিক ক্ষতিকর হতে পারে মধুসূদন নাট্যচরিত্র উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের মুখে তা প্রকাশ করেছেন। তপস্বিনীকে দুঃখ করে ভীমসিংহ বলেছেন-

> “ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী,
> সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে
> জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে যে কত
> গলযোগ হয়ে উঠবে তার কি সংখ্যা আছে?” (৩/২)

কিন্তু, মধুসূদন দত্ত নৈরাশ্যের মধ্যে ভীমসিংহের আক্ষেপের পরিসমাপ্তি যোষণা করেননি। দেশ ও জাতির সফল অমানিশা যে অচিরেই দূর হবে, তার আস্থার কথাও তিনি প্রচার করেছেন তপস্বিনী চরিত্রের মাধ্যমে। নাটকে ভীমসিংহকে সান্ত্বনা দিয়ে তপস্বিনী বলেছেন-

> “মহারাজ, এ ভারতভূমির এ অবস্থা কিন্তু
> চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না
> বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার
> করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিতে
> চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? অদ্যাবধি চন্দ্র
> সূর্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধম্ম আছে।” (৩/১)

এখানে পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীল তপস্বিনীর মুখে ধর্মের জয় ও শক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণাতে মধুসূদন দেশপ্রেমের জয়গান গেয়েছেন।

মধুসূদন আপন দেশবাসীর অতীত গৌরবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের শিল্পাদর্শে সার্থকতার আসনে উন্নীত। ঊনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় নারীজাতির বন্ধন মুক্তির জন্য বিভিন্ন সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে, মধুসূদনও ছিলেন ঐ পথের দিশারী। তাই নাটকে বিশেষ করে বিলাসবতী, মদনিকা ও কৃষ্ণকুমারী এই নারী চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই আপন মহিমায় স্বাতন্ত্র্য

থেকেছে। মধুসূদন পদ্মিনীর আত্মত্যাগের কাহিনীর কথা বিপুল গৌরবে বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নদর্শনে বিহ্বলা কৃষ্ণা তপস্বিনীকে আবেগ মথিত কণ্ঠে বলেছেন-

“বোধ হলো যেন, আমি কোন
সুবর্ণমন্দিরে একখানি কমল আসনে বসে
রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী
একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে
দাঁড়িয়ে বললেন, বাছা, তুমি আমাকে প্রনাম
কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।
তারপর তিনি বললেন, দেখ, বাছা যে যুবতী এ
বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে,
সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই। আমি এই
কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী।
তুমি যদি আমার মত কম্ম কর, তা হলে
আমারই মতন যশস্বিনী হবে...।” (৩/২)

আসলে জাতীয়তাবাদ এমন এক আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয়। আর তাই তো জাতির কুল-মান রক্ষার্থে কৃষ্ণার আত্মবিসর্জনে রাজপুত জাতির শৌর্য বীর্যের মহিমাকে প্রদর্শিত করেছে। কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনের মহান রূপ ও বীরত্বব্যঞ্জক মহানব্রতকে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও নারীজাতির বন্ধনমুক্তি বলে মনে করেছেন। এইভাবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ট্র্যাজেডি রচনার মুখ্য চিন্তার পাশ দিয়ে স্বদেশপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তবে পরাধীনতার মর্মবেদনা মধুসূদনের দেশাত্মবোধের ভাবধারা যেন নাটকে জনগনের সামনে প্রকৃষ্টভাবে প্রচার করা হয়েছে। তাই এই নাটকে কৃষ্ণা তার কাকা বলেন্দ্র সিংহের কাছে দেশ বা জাতির ঐক্যে আত্মত্যাগ মহিমার কথা স্বগর্বে বলেছেন-

“কাকা এমন জীব নাই, যে বিধাতা
তার অদৃষ্টে মরণ লেখে নাই। কিন্তু সকলের
ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক
তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু
আবার কোন কোন তরুর কাছে দেবপ্রতিমা
নিরম্মান হয়। কুলমান রক্ষার্থে কিম্বা পরের
উপকারের জন্য যে মরে, সে চিরস্থায়ী হয়।” (৫/৩)

নাটকে নিষ্পাপ সবলা রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু উপস্থাপিত করে নাট্যকার রাজপুত নারীর তীব্র স্বাদেশিকতার মনোভাব ও জাতীয়তাবাদের পরকাষ্ঠা লক্ষ্য করেছেন কৃষ্ণা চরিত্রের মধ্যে। কৃষ্ণকুমারীর এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মহূতি সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় গৌরবের বস্তু। আসলে মানবজীবনের এই পরিণতির মূলেই আছে দেশপ্রেম। যা স্বদেশব্রতের গৌরব ও বেদনার বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এই সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কৃষ্ণকুমারী' নাটকে উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ, রাজকুমারী কৃষ্ণা, রাজমহিষীর সহচরী তপস্বিনী চরিত্রগুলোর সংলাপে নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বদেশভাবনা বা স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়ে নবযুগের দ্বার উন্মোচন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। ডঃ ভট্টাচার্য, প্রভাত কুমার, 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব' (১৮০০-১৯১৪), প্রথম প্রকাশঃ দোল পূর্ণিমা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯, পৃষ্ঠা ২০৫।

২। ডঃ ভট্টাচার্য, প্রভাত কুমার, 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব (১৮০০-১৯১৪), প্রথম প্রকাশঃ দোল পূর্ণিমা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা -৯, পৃষ্ঠা-২০৫।

৩। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণঃ ২০০৮-২০০৯, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট// কলকাতাঃ ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা- ৩০২।

৪। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদক), 'মধুসূদন রচনাবলী' সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৫, পুনর্মুদ্রণঃ জানুয়ারী ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫০।

৫। বসু, যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণঃ ১৯২৫, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১৭২।

৬। ডঃ সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড) (উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ), প্রথম মুদ্রণ: ১৩৬২, কে. পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬, পৃষ্ঠা ৫৮।

৭। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার নাট্যকার মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী, ৩য় সংস্করণ। মার্চ ২০০৪, ১ম পুনর্মুদ্রণঃ ২০০৫-২০০৬, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণঃ ২০১৪-২০১৫ প্রাক্তন বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ডঃ ভট্টাচার্য, প্রভাত কুমার, 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব' (১৮০০-১৯১৪), প্রথম প্রকাশঃ দোল পূর্ণিমা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯।

২। ডঃ ভট্টাচার্য, প্রভাত কুমার, 'বাংলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব (১৮০০-১৯১৪), প্রথম প্রকাশঃ দোল পূর্ণিমা ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা -৯।

৩। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণঃ ২০০৮-২০০৯, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট// কলকাতাঃ ৭০০০৭৩।

৪। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদক), 'মধুসূদন রচনাবলী' সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৫, পুনর্মুদ্রণঃ জানুয়ারী ২০০৪।

৫। বসু, যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণঃ ১৯২৫, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৮৫।

৬। ডঃ সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খন্ড) (উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ), প্রথম মুদ্রণ: ১৩৬২, কে.পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬।

৭। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার নাট্যকার মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী, ৩য় সংস্করণ। মার্চ ২০০৪, ১ম পুনর্মুদ্রণঃ ২০০৫-২০০৬, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণঃ ২০১৪-২০১৫ প্রাক্তন বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী

চন্দন চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে ব্যতিক্রমী শঙ্খ ঘোষ, তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ করি তাঁর কবিতাগুলো আত্মের হয়েও সমগ্রের হয়ে উঠছে। তাঁর প্রতিটি কবিতায় মানুষ, প্রেম, প্রকৃতি আর মানুষের স্বার্থপরতার অপ্রিয় সংমিশ্রণ ঝংকৃত হয়। কবিতায় সংহত আবেগের আত্মমগ্নতা রচনা করলেও শঙ্খ ঘোষকে শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতা হয়ে উঠছে কখনো সমাজ সংস্কারের কবিতা, কখনো ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে উচ্চকিত। তিনি সময়ের দগদগে ক্ষত চিহ্নিত করেই কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতা শুধু শাসক, রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র, পুলিশ-প্রশাসনিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব এমনটা নয়, ক্ষমতার অন্যান্য কেন্দ্রকেও তিনি তীক্ষ্ণবাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। চিরকালই যে প্রান্তিক মানুষ অত্যাচারিত হয় তাদের কথা বারবার কবির কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী চেতনার আন্তরিক প্রকাশ পাঁচের দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে কবি শঙ্খ ঘোষকে স্বতন্ত্র করেছে। তিনি ক্ষমতার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করেননি, বরং ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কবিতায় প্রতিবাদকে প্রকৃত কবির কর্তব্য বলে মনে করেছেন এবং তিনি তা বারবার তাঁর অজস্র কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সমাজ ও মানুষের কাছে এবং প্রকৃতির প্রত্যয়ের কাছে দায়বদ্ধ থেকে কবিতায় সত্য কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যি বলতে গিয়ে তিনি কবিতায় মানুষের কথা বলেন আবার মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যের কথাও তুলে ধরেন মোলায়েম সুরে অথচ তীব্র বলিষ্ঠতায় আর মানুষের কথা বলতে গিয়ে কখনো কখনো শাসকের বিরুদ্ধে তর্জনী উঁচু করে ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কবিতায় প্রশ্ন করেন এবং সেই প্রশ্ন কবি সরাসরি চিৎকার না করে পরোক্ষভাবে করে চেতনায় আঘাত দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, তাই তাঁর কবিতাগুলো ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী হয়ে উঠেছে।
সূচক শব্দ: শঙ্খ ঘোষ, পাঁচের দশক, ক্ষমতায়ন, নিঃশব্দের তর্জনী, শোষণ, নিম্নবর্ণ।

মূল আলোচনা:

চারের দশকের অধিকাংশ কবি তাঁদের লেখনীকে চালনা করেছেন প্রতিবাদে-প্রতিরোধে, আন্দোলনে কিংবা বিপ্লবী কার্যক্রমে, কিন্তু পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে একটা বড় অংশ সমাজ ও রাজনৈতিক সমস্যা-সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে অতিশয় ব্যক্তিগত ও স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা রচনায় নিমগ্ন থাকেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় চারের দশক ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। একদিকে সামাজিক অস্থিরতা, অগস্ট আন্দোলন, কালোবাজারিদের তাণ্ডব ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তুলেছিল। ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্ররা কলম ধরেছিলেন কবিতায় সাম্যবাদী রাজনৈতিক ভাবনার জোয়ার বইয়ে দিতে, কিন্তু পাঁচের দশকের প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। ভারতবর্ষ স্বাধীনহলেওদেশ জুড়ে অরাজকতা, খাদ্যসঙ্কট, হাংরি আন্দোলন মানুষের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক অসম বিষন্নতাবোধ বা অজানা

অসুখ পাঁচের দশকের কবিতাকে আত্মমুখী বা স্বীকারোক্তিমূলক করে তুলেছিল। তাই এই দশকের কবিতায় আমরা তেমন জীবনমুখী স্লোগান বা বক্তব্যমূলক কবিতা কিংবা মিছিলে হাঁটবার কবিতা পাই না। লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে ব্যতিক্রমী শঙ্খ ঘোষ, তাঁর কবিতাগুলো আত্মের হয়েও সমগ্রের হয়ে উঠছে। তাঁর প্রতিটি কবিতায় মানুষ, প্রেম, প্রকৃতি আর মানুষের স্বার্থপরতার অপ্রিয় সংমিশ্রণ ঝংকৃত হয়। কবিতায় সংহত আবেগের আত্মমগ্নতা রচনা করলেও শঙ্খ ঘোষকে শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শঙ্খ ঘোষের কবিতা হয়ে উঠছে কখনো সমাজ সংস্কারের কবিতা, কখনো ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে উচ্চকিত কবিতা। তিনি সময়ের দগদগে ক্ষত চিহ্নিত করেই কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা শুধু শাসক, রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র, পুলিশ-প্রশাসনিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব এমনটা নয়, ক্ষমতার অন্যান্য কেন্দ্রকেও তিনি তীক্ষ্ণবাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। চিরকালই যে প্রান্তিক মানুষ অত্যাচারিত হয় তাদের কথা বারবার কবির কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী চেতনার আন্তরিক প্রকাশ পাঁচের দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে কবি শঙ্খ ঘোষকে স্বতন্ত্র করেছে। তিনি ক্ষমতার কাছে কখনো আত্মসমর্পণ করেননি, বরং ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কবিতায় প্রতিবাদকে প্রকৃত কবির কর্তব্য বলে মনে করেছেন এবং তিনি তা বারবার তাঁর অজস্র কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-র ভূমিকা অংশে বলেন:

> “সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার। কিন্তু জীবিকাবশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত যে একটি কবিতার জন্যেও কখনো-কখনো অনেকদিন থেমে থাকতে হয়। উপরন্তু আমি যে আধুনিকতার কথা ভাবি সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগলভতার কোনো প্রশ্রয় নেই। তাই কম লিখি বলে আমার ভয় হয় না।”[১]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা সমাজ ও মানুষের কাছে এবং প্রকৃতির প্রত্যয়ের কাছে দায়বদ্ধ থেকে কবিতায় সত্য কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যি বলতে গিয়ে তিনি কবিতায় মানুষের কথা বলেন, আবার মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যের কথাও তুলে ধরেন মোলায়েম সুর অথচ তীব্র বলিষ্ঠতায় আর মানুষের কথা বলতে গিয়ে কখনো কখনো শাসকের বিরুদ্ধে তর্জনী উঁচু করে ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কবিতায় প্রশ্ন করেন এবং সেই প্রশ্ন সরাসরি চিৎকার না করে পরোক্ষভাবে চেতনায় আঘাত দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, তাই তাঁর কবিতাগুলো ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী হয়ে উঠেছে। শঙ্খ ঘোষ এপ্রসঙ্গে নিজেও স্বীকার করেছেন:

> “যে কোনো মানুষের সমাজের প্রতি কিছু দায় থাকে, কবিরও তা আছে। সে-দায় তিনি ব্যক্তিগত স্তরে বহন করবেন, এটা প্রত্যাশিত। সব কবি তা করেন না, সব ব্যক্তিমানুষও করেন না তা, সেটা ভিন্ন সমস্যা। কিন্তু এই দায় বহন করার মানে এই নয় যে, কবিতায় একজন কবিকে সব সময়ে সমাজের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। এমনকী কোনোসময়েই তেমন তিনি না বলতে পারেন। তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি সমাজবিমুখ। কেননা কবিতার মধ্য দিয়ে যদি ভিন্নতর কোনো সত্যের কোনো সুন্দরের বোধ তৈরি হয়ে ওঠে, কোনো কল্পনাজগতের যদি প্রসার

হয়ে থাকে, সেও তো একরকম সমাজেরই কাজ, সামাজিক মননকে উদ্বোধিত করে তুলবারই কাজ। তাছাড়া, কে যে কীভাবে সমাজের দায় পালন করেন কবিতার ভিতরে, বহিরঙ্গে সেটা বোঝাও যায় না সবসময়ে।"[২]

আমরা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সবসময় বহিরঙ্গে পাই না কিন্তু সমাজের দায় পালন করেন কবি কবিতার অন্তরঙ্গে। শঙ্খ ঘোষ সমাজের কথা ভাবতে গিয়ে কখনো ক্রুদ্ধ হন কিন্তু কখনোই কবিতায় তা চিৎকার করে প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেননা। কবি মনে করেন একজন কবির কবিতায় সমাজ, সময় থাকবেনা তাহতে পারেনা কিন্তু তা সবসময় সরাসরি উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করতে হবে তা নয়, তিনি বলেন:

"কবিতায় যদি (বা যখন) সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি থাকে, সে তো আর চালচিত্রের মতো আলগা হয়ে পটভূমিতে ঘিরে থাকে না, থাকে রক্তমাংসে। যখন বলি যে, হ্যাঁ, রক্তেমাংসেও সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সবসময়েই থাকে, তখন সেটা কেবল এই অর্থে সত্য যে একজন মানুষের অতএব একজন কবিরও সম্পূর্ণ অবস্থান অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির প্রতিবেশে। তাই কবিকে বা তার কবিতাকে আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করতে গেলে চারপাশের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিকে বুঝবার দরকার হতে পারে। কিন্তু কবি যে সবসময় সচেতনভাবে এ নিয়ে লিখবেন বা লিখে যাচ্ছেন, এমন কোনো কথা নেই।"[৩]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে পড়তে এবং সমসাময়িক সময়ের দিকে চোখ ফেরালে আমরা বুঝতে পরি তাঁর কবিতায় সময়ের কথা, সময়ের চিত্র উঠে এসেছে, তিনি শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন কিন্তু তা উচ্চ কণ্ঠে নয়। তাঁর কবিতায় যেমন খাদ্য আন্দোলনের উঠে আসছে, তেমন উঠে আসে নকশাল আন্দোলনের কথা এবং পরবর্তীতে লালগড়, নন্দীগ্রামের কথা উঠে আসে শুধু তাই নয় আমৃত্যু তিনি তাঁর কবিতায় সময়ের কথা, সময়ের অবক্ষয়ের কথা বলার পক্ষপাতী ছিলেন। তবেকবি কখনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি যখন দেখেছেন সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে তখনই তিনি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী তুলে ধরেছেন।

শঙ্খ ঘোষের কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায় কবির প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকবির প্রতিবাদী মানসিকতা। যেমন আমরা দেখি কোচবিহারে খাদ্য-আন্দোলনের সময় মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি চালনা এবং এককিশোরী হত্যার প্রতিবাদে কবিলিখছেন 'যমুনাবতী' কবিতাটি। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে ১৫ অগস্ট স্বাধীনতার পর সাধারণ জনগণের মনে যে এক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু রাষ্ট্রের শাসকদের কার্যকলাপে স্বাধীনতার মোহ অবশ্য অচিরেই ফিকে হতে শুরু করেছিল। মানুষ সামান্য খাদ্যের জন্যে হাহাকার করে, শুরু হয় কুচবিহারে খাদ্য আন্দোলন, সেই খাদ্য-আন্দোলনের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি চালনা এবং এক কিশোরীর মৃত্যু হয়, তার প্রতিবাদে কবি লেখেন:

"হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়
নিভন্ত এই চুল্লিতে তবে

একটু আগুন দে।
হাতের শিরায় শিখার মতন
মরার আনন্দে।”[৪]

প্রান্তিক মানুষের সব হারানোর যন্ত্রণা এবং অপরদিকে শোষকের ভূমিকা কবির হৃদয়কে আন্দোলিত করে, এরফলে জেগে উঠে কবির অন্তরে প্রতিবাদী সত্তা। শাসকের এই ব্যর্থতা ফলে ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতি কবির ঘৃণার জন্ম হয়, এই ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কবিতার অক্ষরে প্রকাশ করেন। ‘যমুনবতী’ কাব্যগ্রন্থের ‘শিশুসূর্য’ কবিতায় কবি শাসকের কাছে প্রশ্ন করেন:

“এ কোন দেশ?
মৃত্যু তার স্খলিত অঞ্চল ঢালে দয়িতমুখে
শিশু তার জন্মে পায় দুর্বল দুয়ারে হাহাকার”[৫]

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। নূন্যতম দুবেলা দু-মুঠো খাবার জোটাতেও হয়েছিল অসমর্থ। ফলে দিনদিন হাহাকার বেড়েই চলেছিল, সামান্য খাবারের অভাবে মৃত্যুশোকে ভরে গিয়েছিল এদেশের আকাশ, কবি মেনে নিতে পারেনি এই বীভৎসতা। কবিতার ছত্রে ছত্রে তুলে এনেছেন শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রশ্নের সূচিমুখে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন পাঠকের হৃদয়।

পরবর্তীক্ষেত্রে লক্ষ করি ‘বাবরের প্রার্থনা’ কিংবা ‘বন্ধুরা মাতি তরজায়’ কাব্যগ্রন্থে কবির ক্ষমতাতন্ত্র বিরোধী স্বর তুঙ্গস্পর্শী। ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। আমরা জানি সাতের দশক ছিল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে টালমাটাল সময়। সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে বঙ্গীয় মেধাবী যুবক-যুবতীদের একটা বড় অংশ সেদিন আত্মকেন্দ্রিকতার অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষিজীবী জনতার মধ্যে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর কংগ্রেস সরকারের শুরু হয় অত্যাচারের নয়া অধ্যায়। এই সময়ের চিত্র এই দুটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় উঠে আসে।

পাঁচের দশকে অধিকাংশই কবি সময় ভুলে, সমাজ ভুলে রোমান্টিক ভাবালুতার নিরাপদ স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিলেন। এমন সময় মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, প্রতিবাদে তাঁদের কবিতা গর্জে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে তীক্ষ্ণতম প্রতিবাদ যাঁর কবিতায় সংহত হয়েছিল তিনি নিঃসন্দেহে শঙ্খ ঘোষ। তবে লক্ষ করার বিষয় নবারুণ ভট্টাচার্য কিংবা মণিভূষণ ভট্টাচার্যের মতো উচ্চস্বরে তিনি প্রতিবাদ করেননি, কবিতায় তিনি ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন মগ্নস্বরে।

তাঁর দুটি কবিতা ‘রাধাচূড়া’ এবং ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’ রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অন্যতম কবিতা। ক্ষমতাতন্ত্রকে যে শানিত লেখনীর দ্বারা ভয় পাওয়ানো যায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুটি কবিতার মধ্যে। এই কবিতাদুটি প্রকাশের পর তৎকালীন সরকার কর্তৃক কবিতা দুটিকে নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ‘রাধাচূড়া’ কবিতাটিকে সরকার নিষিদ্ধ করলে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো নির্ভীক কবি-শিল্পীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। ‘রাধাচূড়া’ পুরোপুরি রূপক কবিতা কিন্তু ‘রাধাচূড়া’কে কেন ভয়ের দৃষ্টিতে দেখেছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাতন্ত্র? আসলে রূপকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারের শাসনের চিত্র তুলে আনেন কবি, এখানে মালি কর্তৃক গাছপালা পরিচর্যাকে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতা বজায় রাখার সুচতুর কার্যক্রমের সঙ্গে তুলনা করে দেখান। আসলে ক্ষমতাতন্ত্র স্বাধীনচেতা উন্নত মস্তক প্রতিবাদী নাগরিককে ভয়

পায় তাই সেই স্বাধীনচেতা উন্নত মস্তক প্রতিবাদী নাগরিকের মাথা ছেঁটে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়, এই কবিতায় রূপকের আড়ালে তৎকালীন শাসকের নগ্নরূপ তুলে ধরেন:

"খুব্ যদি বাড়্ বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠান্ডা, চুপ –
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া"[৬]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাসক পাল্টেছে, শাসকের রূপ পাল্টেছে, শাসকের শাসনের ধরণ পাল্টেছে কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ নিজের লেখনীকে কোনো শাসকের কাছে বন্ধক রাখেননি। শাসক পাল্টালেও যখন শাসক সাধারণ জনগণের উপর অত্যাচার করেছে তখনই সোচ্চার হয়ে উঠেছেন কবিতায়। কংগ্রেসী শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট সরকার। যখন তাঁর মনে হয়েছে এই সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে, অত্যাচার করছে তখন এই সরকারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন কবিতায়। বামফ্রন্টের রাজত্বের শেষ পর্বে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ক্লীন্ন রূপ দেখেও যখন একদল সুবিধাবাদী কবি-সাহিত্যিক শাসকদলের স্তাবকতা করেছেনতখন শঙ্খ ঘোষ চুপ করে থাকতে পারেননি। বামফ্রন্ট সরকার মেহনতি মানুষের মনে যে আশা জাগিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, সেই মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে চলে যায়, সেই ভণ্ডামিকে বিঁধেছেন বক্রবাচনে :

"তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে
এরকমই দিন থাকবে না চিরদিন
তা শুনে কত-না ধামাকায় মেতে গিয়ে
কী আশ্চর্য নেচেছি অন্তহীন।"[৭]

বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ নির্ভর হয়ে যখন নিজেদের জনগণতান্ত্রিক আদর্শ ও আচরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে জনগণের উপর অত্যাচার করে তখন ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখতে দ্বিধাবোধ করেননি কবি, তিনি 'ন্যায়-অন্যায় জানিনে' কবিতায় লেখেন:

"তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায়, লোকে
এত বজ্জাত হয়েছে!
স্কুলের যে ছেলেগুলি চৌকাঠেই ধ্বসে গেল, অবশ্যই
তারা ছিল সমাজবিরোধী।
ওদিকে তাকিয়ে দেখো ধোয়া তুলসীপাতা
উলটেও পারে না খেতে ভাজা মাছটি আহা অসহায়
আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই জানে না বুলেটেরা
দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা বটে দেখে মাঝে মাঝে।
পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।"[৮]

শঙ্খ ঘোষ সব পর্বেই যখন দেখেছেন শাসকের অত্যাচার জনগণের উপর নেমে এসেছে, তখনই ক্ষমতাতন্ত্রের সীমাহীন ঔদ্ধত্যকে কবিতায় বারবার বিঁধেছেন।

কবি শঙ্খ ঘোষ শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র, পুলিশ প্রশাসনিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই সরব হননি, তিনি কবিতায় ক্ষমতার অন্যান্য কেন্দ্রকেও তীক্ষ্ণবাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন।

আরওয়ালে উচ্চবর্ণের গুণ্ডাবাহিনী রণবীর সেনার দ্বারা একসময় সংঘটিত হয়েছিল মারাত্মক গণহত্যা, তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছিলেন কবি। চিরকাল প্রান্তিক বর্গের মানুষ অত্যাচারিত হয় উচ্চবর্ণের দ্বারা। উচ্চবর্ণের এই নারকীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবি কবিতায় গর্জে উঠেছিলেন, তিনি লেখেন:

"আমার সবটাই আলো আমার সবটাই অন্ধকার
আমার সবটাই জন্ম আর আমার সবটাই মৃত্যু-দ্বার
আমার ধর্মও নেই আমার অধর্ম নেই কোনো
আমার মৃত্যুর কথা যদি কেউ দূর থেকে শোনো
জেনো – এ আমার মাটি এ কাল আমার দেশকাল
জালিয়ানওয়ালাবাগ এবার হয়েছে আরওয়াল!"[৯]

আমরা লক্ষ্য করি বেশিরভাগ লেখক, কবি যখন শাসকের অন্যায় দেখেও চুপ থাকেন অথবা তোষণ করতে দ্বিধা বোধ করেন না, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে পিছুপা হননি শঙ্খ ঘোষ। ক্ষমতার কাছে কখনোই আত্মসমর্পণ করেননি, তবে তাঁর কবিতায় যে সবসময় ক্ষমতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেছেন তা নয়বরং কবিতায় ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন আর শঙ্খ ঘোষকে স্বতন্ত্রতা প্রদান করেছে তাঁর এই ক্ষমতাতন্ত্রবিরোধী অবস্থানের জন্যে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭০, পৃষ্ঠা-৭।
২. ঘোষ শঙ্খ, কথার পরে কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা-১৪৮।
৩. ঘোষ শঙ্খ, কথার পরে কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা-৯০।
৪. ঘোষ শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ, যমুনাবতী, যমুনাবতী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৌষ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-৫২।
৫. ঘোষ শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ, শিশুসূর্য, যমুনাবতী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৌষ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-৩৮।
৬. ঘোষ শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ, রাধাচূড়া, বাবরের প্রার্থনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৌষ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-১০০।
৭. ঘোষ শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, তুমি বলেছিলে, সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭০, পৃষ্ঠা-১৯৩।
৮. ঘোষ শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ন্যায় অন্যায় জানিনে, লাইনেই ছিলাম বাবা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭০, পৃষ্ঠা-১৫৩।
৯. বইদেশ, শঙ্খ ঘোষ : তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা (www.boidesh.com)।

ইমতিয়াজ মাহমুদ ও আনিফ রুবেদের নির্বাচিত কবিতায় দৃশ্যরূপ : একটি শৈল্পিক অন্বেষণ

চৈতালি ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপের মধ্যে একটি হল কবিতা। প্রত্যেক দৃশ্যময় বস্তুর যেমন একটি নির্দিষ্ট বাহ্যিক আকার বা রূপ থাকে, কবিতাও তেমনি বিশেষ রূপের অধিকারী। কবিতার এই বাহ্যিক বা শরীরী রূপকেই আমরা বলতে চাইছি কবিতার দৃশ্যরূপ। দৃশ্যরূপের উপর প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে কবিতা লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও সে ব্যতিক্রম ঘটেনি। গতানুগতিক স্তবকসজ্জার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা ও পাঠকমনকে ভিন্ন স্বাদের কবিতাপাঠের আনন্দ দেওয়ার জন্য কবিরা প্রয়াসী হয়েছেন অনেকসময়। ইমতিয়াজ মাহমুদ ও আনিফ রুবেদ সে তালিকার উল্লেখযোগ্য দুই নাম। কবিতার দৃশ্যরূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চারুশিল্পের দুই সংরূপ চিত্র ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁরা সমন্বয় ঘটিয়েছেন ও কবিতাকে শৈল্পিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।
সূচক শব্দ: কবিতা, দৃশ্যরূপ, শৈল্পিক অন্বেষণ, ইমতিয়াজ মাহমুদ, আনিফ রুবেদ।

মূল আলোচনা:
সাহিত্যের বিভিন্ন লিখিত সংরূপগুলির মধ্যে কবিতা অত্যন্ত ঘন সঙ্ঘবদ্ধ চিন্তার নির্যাস থেকে জাত। সে কারণে নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিরা খুবই সংবেদনশীল হন, নানা রকম শিল্পকৌশলের আশ্রয় নেন। কবিতার দৃশ্যরূপ তথা শরীর গঠনের কাজটিও এই শিল্পকৌশলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কবিতার দৃশ্যরূপের জন্ম হয় নতুন আঙ্গিক খোঁজার তাগিদ থেকেই।

'দৃশ্য' অর্থে দর্শনীয়, চোখে দেখার মাধ্যমে যে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয় তা-ই। 'রূপ' অর্থে বোঝায় আকার, আকৃতি, শরীর, মূর্তি, স্বভাব ইত্যাদি। অর্থাৎ 'দৃশ্যরূপ' বলতে কোনো বস্তু বা বিষয়ের বাহ্যিক আকার-আকৃতিগত ধারণাকেই ইঙ্গিতদান করা হয়। যাবতীয় বস্তু, যাদেরই নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, তাদেরই একটি ফর্ম বা রূপ আছে; যা আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে। রেখা ও রঙের মধ্য দিয়ে ছবিতে, কথা ও সুরের মধ্য দিয়ে সংগীতে রূপের প্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে সাহিত্যে রূপের প্রকাশ ঘটে শব্দের মাধ্যমে। বর্ণ, শব্দ, ছত্র, স্তবকের সমন্বয়ে কবিতা তার একটি নিজস্ব বহিরাঙ্গিক চেহারা লাভ করে এবং সবগুলি মিলিয়ে একটিমাত্র রসোত্তীর্ণ এককে পরিণত হয়। এভাবেই একটি কবিতা লাভ করে তার নির্দিষ্ট দৃশ্যরূপ। 'সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর' প্রবন্ধে ভবতোষ দত্ত বলছেন-

> 'রূপ বলতে প্রাথমিক ভাবে বুঝি আয়তনযুক্ত কোনো সত্তাকে। শুধু চোখে যে-আয়ত বস্তু দেখি তা নয়, কানে যা শুনি, যার গন্ধ পাই, স্পর্শ পাই সবই রূপ। ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে পাই, তাকে সাধারণভাবে বলতে পারি রূপ।'[১]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'রূপ' শব্দের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে তিনি আরও বলছেন-

> 'রোমান্টিক যুগে রূপ, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ ফর্ম শব্দটির প্রয়োগ হতে লাগল অন্তরঙ্গ অর্থে। শব্দ ছন্দ বাক্য পদ দিয়ে যে পঙক্তি রচিত হয়ে ভাব

> প্রকাশ করল, তার বহিরঙ্গ চেহারাটা যেমন এক অর্থে রূপ, বাইরের এই চেহারাটাকে গৌণ করে ভাবের যে চেহারাটা কবির মনে মনে উদিত হয়, আর এক অর্থে তারও নাম রূপ।’[২]

কবিতার এই বাহ্যিক রূপ তথা দৃশ্যরূপকেও যে বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলা যায়, এই ভাবনা থেকেই কোনো কোনো কবি চেষ্টা করেছেন গতানুগতিক স্তবকসজ্জার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে। দৃশ্যরূপের উপর প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কবিরা কবিতা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই কবি-ব্যক্তিত্ব হুলেন- ইমতিয়াজ মাহমুদ ও আনিফ রুবেদ।

শিল্প অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফসল। ডঃ মঞ্জুলিকা চক্রবর্তী তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও সৌন্দর্যদর্শন’ গ্রন্থের ‘শিল্প’ অধ্যায়ে বলেছেন-

> ‘শিল্প শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণভাবে বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত ও সাহিত্য সবই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল শিল্পকে দুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা-কারুকলা ও চারুকলা।’[৩]

প্রয়োজনের তাগিদে যে ‘নির্মাণ’ তাকে অনেক সমালোচক বলেছেন কারুশিল্প। প্রয়োজনকে অতিক্রম করে মানুষের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিতৃপ্তি ঘটানোর জন্য যে ‘সৃষ্টি’, তাকে বলা হয় চারুশিল্প। চারুশিল্পের অন্তর্গত হল- সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য ও সংগীত। একবিংশ শতকের কবি ইমতিয়াজ মাহমুদ ও আনিফ রুবেদের কবিতার মধ্য দিয়ে চারুশিল্পের দুই সংরূপ-চিত্র ও সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটতে দেখা যায়, যা কবিতার বিশেষ দৃশ্যরূপ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

ইমতিয়াজ মাহমুদের জন্ম ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। তাঁর প্রকাশিত বই- ‘অন্ধকারের রোদ্দুরে’ (২০০০), ‘মৃত্যুর জন্মদাতা’ (২০০২), ‘সার্কাসের সঙ’ (২০০৮), ‘মানুষ দেখতে কেমন’ (২০১০), ‘পেন্টাকল’ (২০১৫) এবং ‘ম্যাক্সিম’ (২০১৭)। ২০১৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কালো কৌতুক’-এর নির্বাচিত কিছু কবিতা অবলম্বনে দৃশ্যরূপ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছি।

অপর কবি আনিফ রুবেদের জন্ম বাংলাদেশের চামাগ্রাম, বারঘরিয়ায়, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- ‘পৃথিবীর মৃত্যুদণ্ডপত্র’ (২০১১), ‘এসো মহাকালের মাদুরে শুয়ে পড়ি’ (২০১৫)। এ ছাড়া চৌত্রিশটি কবিতার সংকলনে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘শরীরীয়ত শরীরীয়া’ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা দৃশ্যরূপের দিক থেকে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। গ্রন্থের ‘পাঠরোধক’ অংশে তাঁর কবিতা সম্পর্কে আনিফ রুবেদ বলছেন–

> ‘এগুলো যতটা না পড়ার যোগ্য তার চেয়ে বেশি দেখনযোগ্য। শরীরসর্বস্ব কবিতা এগুলো।’[৪]

আলোচনার সুবিধার্থে এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা নির্বাচন করে নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের কবিতায় দৃশ্যরূপের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করব।

দৃশ্যরূপধর্মী কবিতার নানা প্রকার-প্রকরণ রয়েছে। এই প্রকারের মধ্যে একটি হল ‘ক্যালিগ্রামেস’ বা হস্তলিপি। শব্দ, বাক্যাংশ প্রভৃতির সমন্বয়ে এই ধরনের কবিতায় একটি দৃশ্যময় ছবি তুলে ধরা হয়, যা কবিতার বিষয় বুঝতেও সাহায্য করে। যেমন- ইমতিয়াজ মাহমুদের ‘চোখ’ বা ‘গাছের কথা বলি’ কবিতা। দ্বিতীয় কবিতাটিকে সাজানো হয়েছে গাছের

আকারে, প্রথম কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে সাজিয়ে কবি চোখের ন্যায় একটি আকার প্রদান করেছেন। এই কবিতা তাঁর যাপিত জীবন-অভিজ্ঞতারই আশ্লেষ। কবি বলছেন-

চোখ
চোখ একটা
অবাক করা বিষয়
আপনি যখন তখন চোখ
বন্ধ করে আপনার জগত বদলে
ফেলতে পারেন, আবার চোখ খুলে
ফের সেই জগতে ফিরেও আসতে
পারেন। অন্যদিকে জগতও কম
অবাক করার মতো নয়, আপনি
চোখ বন্ধ করে খোলার ফাঁকে
সেও নিজেকে বদলে ফেলে
অন্য একটা জগত
তৈরি করতে
পারে।[৫]

জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই আসলে অনুভবের রং বদলে দেয়, জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটায়। সেই খোলা চোখ নিয়ে দেখা জগতও পলকে নিজেকে বদলে ফেলে, উপনীত করে নতুন এক জগত তথা সত্যের সম্মুখে।

দৃশ্যরূপধর্মী কবিতার অপর এক প্রকার হল 'প্যাটার্ন পোয়েট্রি' বা নকশা কবিতা। এই ধরনের কবিতাগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে এটি একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা নকশা অনুসরণ করতে পারে। এই প্যাটার্নের মধ্যে দিয়েই আসলে কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা থিম পরিব্যক্ত হয়। ইমতিয়াজ মাহমুদের লেখা কবিতা 'এলিজি'-এর আদর্শ উদাহরণ। মায়ের মৃত্যুতে লেখা এই কবিতায় কবি তাঁর মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কবিতাটিকে সাজানো হয়েছে ঢেউ-এর মতো তরঙ্গায়িত করে। কবিতায় 'ঢেউ' শব্দের উল্লেখও রয়েছে। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবদমিত হয়ে থাকা বেদনা এই কবিতার মধ্যে দিয়ে নিঃসরণের পথ পেয়েছে। মৃত্যুশোককে নদীর সাথে একাত্ম করার কারণে কবিতাটি হয়ে উঠেছে বিশেষ ইঙ্গিতবাহী-

এলিজি
আমি
তত
দূর
যাব
ঢেউ
যত
চায়,
মায়ের
কবরে
এসে

নদী
থেমে যায়![৬]

ভিজুয়াল পোয়েট্রির বহিরাঙ্গিক রূপও অভিনব। মুদ্রণবিন্যাস, গঠন, পরিচ্ছদ ইত্যাদির সমন্বয়ে এই ধরনের কবিতা সাজানো হয়। কবিতার এই দৃশ্যরূপ অর্থবোধেরও সহায়ক হয়ে ওঠে। যেমন- ইমতিয়াজ মাহমুদের 'কান্নার ক্বাসিদা'। 'কান্নার ক্বাসিদা' বিষণ্ণতার ইতিকথাই পাঠককে শুনিয়েছে। হৃদয়ের বেদনাকে বৃষ্টি পরার ন্যায় রূপ দিয়ে কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায়। দিগ্‌ভ্রান্ত কবি দিশাহীন জীবনে বেঁচে থাকার সম্বল হাতড়ে বেরিয়েছেন পরম আকুতি ভরে। সুষ্ঠযাপনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা অথচ লগ্ন হতে না পারার যন্ত্রণা কবিকে তাড়িত করেছে। বেপথুমান কবিকণ্ঠের আকুল আততি প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়- 'এই জীবন নিয়ে আমি কোথায় যাই?/ ভরদুপুরে আমি পিকনিক থেকে/ পালিয়ে এসেছি'।[৭] পৃথিবীর বুকে 'রোদ্দুর' আশীর্বাদ হয়ে নামে, নতুন প্রাণের স্পন্দনকে স্বাগত জানায়। অথচ কবির জীবনে 'রোদ্দুর' বয়ে নিয়ে আসে অভিশাপ। 'সাতটা সাগরের পানি'-র প্রবল উল্লাসে মেঘ হয়ে আকাশে বিচরণ এবং সুনিশ্চিত পতন তীব্র বাস্তবতার সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয়, যখন কবি বলেন-

পতনের জন্যই এইসব উড্ডয়ন, আহা! তারা যদি জানত। তবু
বৃ বৃ বৃ
ষ্টি ষ্টি ষ্টি
বৃ বৃ বৃ
ষ্টি ষ্টি ষ্টি
...
হলো_ কেউ আটকাতে পারল না।[৮]

বৃষ্টির এই ঝরে পরা আসলে পুঞ্জীভূত অভিশাপ বর্ষণকেই সংকেতিত করে, যার পরিণাম মৃত্যু- 'কোথাও ঠাঁই না পেয়ে ফের মায়ের পেটে_আমি গিয়েছিলাম কালও/মা বেঁচে থাকলে বলতেন, এভাবে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।'[৯]

কংক্রিট কবিতায় শিল্পগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য শব্দ দিয়ে দৃশ্যত উপাদান তৈরি করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আনিফ রুবেদের 'মৃত্যুর প্রতি প্রেরিত পত্র' কবিতার কথা। 'মৃত্যুর প্রতি প্রেরিত পত্র' শিরোনামের কবিতাটিকে সাজানো হয়েছে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা একটি চিঠির আকারে। খামের একপ্রান্তে রয়েছে প্রেরকের ঠিকানা, অন্যপ্রান্তে প্রাপকের ঠিকানা। 'মৃত্যু'-কে 'প্রিয়' সম্বোধন করে কবিকথক প্রদত্ত চিঠির মাধ্যমে তাকে নিয়ে যাওয়ার ডাক পাঠিয়েছেন। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিন্দুর মুখে লেপটে থাকা মৃত্যুর প্রতিবিম্ব দেখে চিনে নিতে বলেছেন তার মরণকে। 'আমাদের মৃত্যুগুলো নতুন জন্ম দিয়ে/ ধুয়ে দেবে কবে?'[১০]- এই উদ্দেশ্য নিয়েই যেন মৃত্যুর হাতে জীবনের সমর্পণ। এহেন সহজ আহ্বানে মৃত্যুও জীবনের অঙ্গ রূপে প্রকাশ পেয়েছে-

মৃত্যুর প্রতি প্রেরিত পত্র

খামের গতর : প্রেরকের ঠিকানা
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ব্রহ্মাণ্ড থেকে
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সৌরজগৎ থেকে
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পৃথিবী থেকে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, আনিফ রূবেদ থেকে
খামের গতর : প্রাপকের ঠিকানা
নাম : মৃত্যু
ধাম : জানি না ।
....
চিঠির গর্ভ :
প্রিয় মৃত্যু, নিয়ে যাও আমাকে।[১১]

দৃশ্যরূপধর্মী কবিতার অপর এক প্রকার হল 'শেপ পোয়েম' বা আকার কবিতা। এই ধরনের কবিতায় বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে এটি একটি নির্দিষ্ট বস্তুর রূপ বা ছবি তৈরি করে, যা কবিতার অন্তর্নিহিত বোধ বা অনুভূতিরও পরিস্ফুটক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইমতিয়াজ মাহমুদের লেখা 'বন্ধু কী খবর' কবিতার কথা। কবির যাপিত জীবনে বিষণ্ণতাই যেন হয়ে উঠেছে বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী। বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শকের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে সে। তাই দূর সম্পর্কীয় কোনো বন্ধুর (কাছের বন্ধু নয় এমন) কুশল সংবাদ জানার প্রশ্নে কবির প্রত্যুত্তর প্রগাঢ় বিষন্নতার ছবিকেই ফুটিয়ে তুলেছে-

বন্ধু কী খবর?
আমি যেখানে
পা
রাখি
সেখানেই
তৈরি হয়ে যায় কবর ।[১২]

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, সেটি একটি মনুষ্য অবয়বের রূপ পেয়েছে, যেন মনে হচ্ছে শায়িত কোনো মরদেহ। কবিতার বিষয়-ভাবনা ও দৃশ্যরূপ এভাবে এক হয়ে গেছে।

এই ধরনের দৃশ্যরূপধর্মী কবিতার গতিপ্রকৃতি আলোচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ও ছবির সহাবস্থানই পরিস্ফুট হতে দেখলাম। এছাড়া দৃশ্যরূপ কীভাবে কবিতার বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে- এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তা-ও দেখতে পেলাম। পাঠককে নিছক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে এই ধরনের কবিতা রচিত হয়েছে তা নয়, কিছু কিছু দৃশ্যরূপধর্মী কবিতা আছে যার আবেদন বিশ্বব্যাপী, ভিন্ন ভাষাভাষীর কবিতা পাঠকদের জন্য এই বিশেষ দৃশ্যরূপধর্মী কবিতা আন্তর্জাতিক মাধ্যমেরও ভূমিকা নিয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আলোচনা শেষ করব বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক পশুপতি শাশমলের 'প্রবন্ধ অষ্টাবিংশতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কবিতার দৃশ্য রূপ : তত্ত্বে ও প্রয়োগে' নামাঙ্কিত প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি যথার্থই বলেছেন-

> "কবিতার বিষয়কে পরিস্ফুট করা বা তার ভাবকে বিশদ কিংবা আভাসিত করার প্রয়োজনে তার এ প্রকারের রূপবিন্যাসটুকু যেন নিবেদিত।"[১৩]

তথ্যসূত্র:

১। দত্ত, ভবতোষ, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, 'সাহিত্যের কথা', কলকাতা-০৬, সাহিত্য লোক, পৃ. ১০০।
২। তদেব, পৃ. ৯৬।
৩। চক্রবর্তী, মঞ্জুলিকা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৮, 'রবীন্দ্রনাথ ও সৌন্দর্যদর্শন', শান্তিনিকেতন-৭১৩২৩৫, সুবর্ণরেখা, পৃ. ১৮।

৪। রুবেদ, আনিফ, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ‘শরীরীয়ত শরীরীয়া’, ঢাকা-১২০৪, নৈঋতা ক্যাফে, পৃ. ৮।

৫। মাহমুদ, ইমতিয়াজ, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ‘কালো কৌতুক’, ঢাকা-১১০০, দিব্যপ্রকাশ, পৃ. ৩৪।

৬। তদেব, পৃ. ৪২।

৭। তদেব, পৃ. ১৬।

৮। তদেব।

৯। তদেব।

১০। চক্রবর্তী, ভাস্কর, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, ‘গদ্য সমগ্র-১’, কলকাতা-৩২, ভাষাবন্ধন, পৃ. ৭৩।

১১। রুবেদ, আনিফ, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ‘শরীরীয়ত শরীরীয়া’, ঢাকা-১২০৪, নৈঋতা ক্যাফে, পৃ. ৩৪।

১২। মাহমুদ, ইমতিয়াজ, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ‘কালো কৌতুক’, ঢাকা-১১০০, দিব্যপ্রকাশ, পৃ. ১৭।

১৩। শাশমল, পশুপতি, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ‘প্রবন্ধ অষ্টাবিংশতি’, কলকাতা-০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪৮।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বুধীর বাড়ি ফেরা’ : ভাবনার অন্য ভুবন

চিরঞ্জিত মাণ্ডি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, করিমপুর, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। যাকে আমরা প্রকৃতি প্রেমিক সাহিত্যিক রূপে পরিগণিত করি। তাঁর কথসাহিত্যেই প্রথম প্রকৃতির নবনব কলেবর অন্যমাত্রায় স্থান করে নিয়েছিল। প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আমার এই প্রবন্ধে প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণের সত্ত্বাকে বিচ্ছিন্ন রেখে সংবেদনশীল দরদী সত্ত্বাকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। তাঁর ‘বুধীর বাড়ি ফেরা’ গল্পটি সেই সংবেদনশীল দরদী সত্ত্বার এক অমুল্য রতন। একটি স্বরহীন প্রাণীও (গরু) যে মানুষের মতন করে গল্পে রূপ পেতে পারে এবং মানুষের মতন করেই গল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ‘বুধীর বাড়ি ফেরা’ তাঁর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এই প্রবন্ধে বুধী চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের নানান দিক আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে মানবের সঙ্গে পশুর ঐকান্তিক মিলনের প্রতিচ্ছবি।
সূচক শব্দ: বিভূতিভূষণ, বুধী, পশু, পাউন্ড ঘর, কসাইখানা।

মূল আলোচনা:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪- মৃত্যু ১লা নভেম্বর ১৯৫০। প্রথম জীবনে বিভূতিভূষণের পড়া-লেখার পাঠ শুরু হয় পিতার কাছে। পরবর্তীতে গ্রামের কয়েকটি পাঠশালায় পড়াশোনা শুরু করেন। এরপর বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স এবং ১৯১৬ সালে কলকাতার রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে প্রথম বিভাগে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় ও ডিস্টিংশনসহ পাশ করেন। পরবর্তীতে এম.এ ও আইন বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণ বশত সেই পড়াশোনা হয়ে ওঠেনি।

সাহিত্যিক রূপে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি পাঠককে অসংখ্য উপন্যাস ও ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় ‘উপেক্ষিতা’ নামক গল্পপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল-‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯), এটি বিভূতিভূষণের প্রথম ও সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল- ‘অপরাজিত’ (১৯৩২), ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯), ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ (১৯৪০), ‘ইছামতী’ (১৯৫০), ‘অশনিসংকেত’ (১৯৩৬) প্রভৃতি।

তাঁর বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি হল— ‘মেঘমল্লার’ (১৩৩৮), ‘মৌরীফুল’ (১৩৩৯), ‘যাত্রীদল’ (১৩৪১), ‘জন্ম ও মৃত্যু’ (১৩৪৪), ‘কিন্নরদল’ (১৩৪৫), ‘তালনবমী’ (১৩৫১), ‘উপলখন্ড’ (১৯৪৫), ‘কুশলপাহাড়ী’ (১৯৬১), ‘শ্রেষ্ঠগল্প’ (১৯৪৭) প্রভৃতি। এছাড়া কিশোর পাঠ্য ‘চাঁদেরপাহাড়’, ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’ প্রভৃতি এবং ভ্রমণ-কাহিনী ও দিনলিপি রচনা করেন।

কথাকার বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, প্রকৃতি তাঁর কাছে বিচিত্র ও রঙিন রূপে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানুষ এক সারিতে বিরাজমান তাঁর লেখায়। শুধুমাত্র নিসর্গ প্রকৃতির শোভাবর্ধন তাঁর লেখার বিষয় হয়ে ওঠেনি, সেই প্রকৃতির অন্তরালে বিরাজিত পশুপাখি তাঁর সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পশুপাখি নিছক রচনায় শোভাবর্ধন করেনি তারা চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এক অসাধারণ দক্ষতায়। বিভূতিভূষণের পশুপ্রেমের এমন এক অনন্য ধারার গল্প হল-'বুধীর বাড়ি ফেরা'। গল্পটি 'কিন্নরদল' গল্পগ্রন্থের (১৩৪৫) অন্তর্ভুক্ত।

'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটি আলোচনার আগে এইধারার সাহিত্যসম্পর্কিত দু-একটি প্রসঙ্গ এইক্ষেত্রে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। তবে আমরা বিভূতিভূষণের 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটি বিচার করতে পারব।

আদিযুগ থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারার সাহিত্যেই পশুপাখি, জীব-জন্তু চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গ্রীকসাহিত্য, পারস্য উপকথা, চীনা লোকগাঁথা থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন রূপকথা, উপকথা, আখ্যান, উপাখ্যানে বিচিত্র প্রাণীদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিভিন্ন প্রাণীদের চিত্র আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। যেমন, চর্যাপদে কাক, কোকিলসহ অনেক প্রাণীর কথা কবিরা উল্লেখ করেছেন। এরপরে মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রায় সবগুলি ধারায় প্রাণীর কথা আছে। যেমন, মনসা মঙ্গলে সাপ, চণ্ডীমঙ্গলে বিভিন্ন প্রাণীর প্রসঙ্গ পাই। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যের ধারার বিভিন্ন লেখকদের রচনায় ও ঘোড়া, উটসহ বিভিন্ন প্রাণীর কথা আমরা পেয়েছি। আধুনিকযুগের বাংলাসাহিত্যে মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণীর বিচিত্র ছবি আমাদের চোখে পড়ে। ঊনিশ শতকের কবি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'য় হরিণের প্রসঙ্গ, ঈশ্বর গুপ্তের 'তপসে মাছ', 'পাঁঠা' প্রভৃতি প্রাণীর প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি। ঊনিশ শতকের শেষেরদিকে সাহিত্যের যে শাখাটি বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা হল কথাসাহিত্য। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ছোটগল্পের শাখাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধারায় প্রাণীবৈচিত্রের কয়েকটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। যেমন,গৃহপালিত চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী, পশুপাখি, বন্যপশু এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

আমরা ক্রমান্বয়ে এই পর্বের গল্পগুলি উল্লেখ করি—

গৃহপালিত চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী:

গরু: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'সুভা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'মহেশ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধীর বাড়ি ফেরা', মাহবুবউল আলমের 'কোরবানী', সত্যেন সেনের 'লালগরুটা' প্রভৃতি গল্প।

ছাগল: পরশুরামের গল্প 'লম্বকর্ণ'।

মোষ: পরশুরামের গল্প 'রাজমহিষী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'কালাপাহাড়', বনফুলের গল্প 'বুধী' ইত্যাদি।

বন্যপশু:

ঘোড়া: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'লালঘোড়া', তারাশঙ্করের 'গবিণ সিংয়ের ঘোড়া'।

হাতি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প 'সৈনিক', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিনী'।

কুকুর: প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'কুকুরছানা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওঘরের স্মৃতি', বনফুলের গল্প 'বাঘার নায়ক' প্রভৃতি গল্পে পরোক্ষভাবে কুকুরের প্রসঙ্গ এসেছে।

সরীসৃপশ্রেণী:

সাপ:-কাজী নজরুল ইসলামের গল্প 'পদ্মগোখরা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'নারী ও নাগিনী', প্রভাত কুমারের গল্প 'বাস্তুসাপ' প্রভৃতি গল্প। এছাড়া বিড়াল, বানর, হনুমান, শেয়াল, বাঘ প্রভৃতি প্রাণীরা গল্পের চরিত্ররূপে নিজেদের অস্তিত্ব স্থাপন করেছে।

এইবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পে বুধী নামের এক গরুর করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই গল্পের পটভূমি বা প্লট নির্মিত হয়েছে। অচিন দেশের বাধা বিপত্তিকে জয় করে খুকির দেশে ফেরা এই হল এই গল্পের মূলকাহিনী। পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের গল্প লেখা হয়েছে বলে আমার মনে পড়েনা। গল্পের অভিনবত্বের একটি দিক হল 'বুধী' (গরু) যেখানে নিজের কথাকে পরিবেশন করেছে। গল্পের কাহিনী প্রসঙ্গে বলা যায়- বুধী খুকির পরিবারের পালিত গরু ছিল। জীবনের অনেকটা সময় সে তাদের বাড়িতে অতিবাহিত করেছে। একসময় বয়সের ভারে সে যখন জর্জরিত তখন পরিবারের লোক তাকে চালানে বিক্রি করে দেয়। সেখান থেকে তাকে কসাইখানায় নেওয়া হয়েছিল। সেই কসাইখানা থেকে পালিয়ে কীভাবে একটার পর একটা গ্রাম, শহর, প্রান্তর ঘুরে ঘুরে নিজ বাড়ি অর্থাৎ যেখানে জীবনের দীর্ঘসময় কাটিয়েছে সেই খুকির পরিবারে ফিরে এসেছে। সেই হৃদয়স্পর্শী করুণকাহিনী গল্পকারের ভাবনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

গল্পের সূচনায় প্রতিভাষিত হয়েছে বুধীর (গরু) আত্মযন্ত্রণার কথা। বার্ধক্যের কারণে যে চির-বঞ্চিত যার আশ্রয় হয়েছে পাউণ্ড ঘরে। পাউণ্ড ঘরে অবস্থানকালীন বুধী-র মনে পড়েছে চির-পরিচিত খুকির কথা, গোয়াল ঘরের কথা, মাঠের সবুজ ঘাস, মুক্ত প্রান্তর, পাখিদের কোলাহল, ঝিঁঝিঁর ডাক যা বুধীর অতীতকে মনে করিয়ে দিয়েছে। বুধী যেন আজ সমাজ, সংসার, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। গল্পকার বিভূতিভূষণ মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি'কে বুধীর মধ্য দিয়ে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরদিকে পাউণ্ড ঘরে অবস্থানকালীন কসাইখানার তাজাতাজা রক্তের গন্ধ, স্ব-জাতীয়দের দুর্দশা, হতাশা প্রভৃতি বুধীকে যেমন মর্মপীড়িত করেছে। তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রতি বুধীর মায়া, মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতি। মানবমনের অনুভূতিগুলি বুধীকে যথার্থ মানব রূপের মর্যাদা দিয়েছে। গল্পের কাহিনী ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে বুধীর দীর্ঘকালীন পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরার মধ্য দিয়ে। পাউণ্ড ঘর ভেদ করে পথ, ঘাট, নদী, সবুজপ্রান্তর, বাজার, জনপদ, গ্রাম পাড়ি দিয়ে বুধী ফিরে এসেছে চির-পরিচিত খুকির পরিবারের কাছে এই হচ্ছে গল্পের মূল বিষয়ভাবনা।

বুধী চারিত্রিক ভঙ্গীতে লেখকের দৃষ্টিতে এক অসাধারণ সৃষ্টি। বিভূতিভূষণ বুধীকে শুধুমাত্র মূক, বধির প্রাণী রূপে অঙ্কন করলেন না, অঙ্কন করলেন মানব চরিত্রের আলেখ্য রূপে। মানব মনের নানা দর্শন স্নেহ-মায়া-মমতা, মাতৃসুলভ বাৎসল্যতা প্রকাশিত হয়েছে বুধী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। গল্পের প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করলে বুধী চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। বুধীর আত্মকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় খুকির পরিবারে সে আশ্রিতা, যে পরিবার তাকে লালন, পালন করে বড়ো করে তুলেছিল। বিশেষ করে ছোট্টশিশু খুকি খুব ভালোবাসতো, আলিঙ্গন করত, গলায় ছোট্টহাতের স্পর্শদিত। মানুষের সঙ্গে প্রাণীর যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাঁর প্রতিরূপ হিসেবে বুধী চরিত্র। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে যখন খুকির পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন বুধী অনুভব করেছে খুকির স্নেহ, আদর। বুধীর অনুভবে তা স্পষ্ট ভাবে উদ্ভাসিত—

> "যে সেই ছোট খুকি তাকে ভালবাসিত, যত্ন করিয়া খাওয়াইতো, গলা ধরিয়া কত আদরের কথা বলিত। ...কোথায় গেল ছোট খুকিটা? "

পাউন্ড ঘরে অবস্থানকালীন বুধী অনুভব করেছে তার চির পরিচিত ছোট খুকিটাকে। তাই বারবার পাউন্ড ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। পাউন্ড ঘরে থাকাকালীন সে দেখেছে নির্মমতা, যন্ত্রণা আর অসহায়তাকে। স্বজাতীয় দের প্রতি উদার প্রাণতা, সহানুভূতি মর্মেমর্মে বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে। তাদের দুঃখ-বেদনার শরিক হতে চেয়েছে বুধী এবং মুক্তির জন্য নানান অলীক কল্পনা করেছে। কখনো মাতৃরূপে তাদের স্নেহ করতে হাত বাড়িয়েছে, কখনো মনে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের যন্ত্রণা প্রশমিত করতে চেয়েছে। বুধী যেন এখানে মানবচরিত্রের মাতৃরূপের কাণ্ডারী রূপে নিজেকে মেলে ধরেছে। পাউন্ড ঘরের বন্দিদশা তাকে বারবার পীড়ন করেছে একটা মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছে খুকি'কে দেখার মধ্য দিয়ে। খুকির সঙ্গে মিলনের জন্য পাড়ি দিয়েছে। দীর্ঘপথ যাত্রা করেছে। এই দীর্ঘকালীন যাত্রায় বুধীর পরিচয় ঘটেছে স্ব-জাতীয়দের সঙ্গে, মানব শিশুদের সঙ্গে এখানে বুধী অনন্য চরিত্ররূপে ফুটে উঠেছে। স্ব-জাতীয়দের সঙ্গে মিলনের সময় তাঁর শিশুমনের পরিচয়কে অন্বেষণ করতে পারি। মানব শিশুর মতন করে খেলা করা, গল্পের ছলে কথোপকথন এই গুণগুলি তা নির্দেশ করে। পথপ্রান্তে পুকুরে মাছ ধরা এক শিশু খুকিকে দেখে নিজের আদরের খুকির কথা মনে পড়েছে। তাই সেই খুকির সঙ্গে নিজের মনের কথা বলতে চেয়েছে,তাকে স্নেহ রসে আলিঙ্গন করতে মন চেয়েছে বুধীর। সেইদৃশ্য বিভূতিভূষণ গল্পে উপস্থাপন করেছেন—

> "স্নেহের বুধীর মন গলিয়া গেল। বুধী বলিতে চাহিল -গুঁতিয়ে দেব কেন, খুকি-সোনা আমার, মানিক আমার, আমি কিছু বলবনা ভয় কী? ধরো তোমরা মাছ ধরো। "

এখানে বিভূতিভূষণ বুধীকে শুধুমাত্র মূক, বধির প্রাণীর প্রতিরূপ হিসেবে আঁকলেন না। তিনি বুধী'কে যথার্থ মানব চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

পাখির প্রসঙ্গটিও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। বুধী যখন মাঠে ঘাসখাওয়ার জন্য চরে বেড়াত এক পাখি যখন শিঙে এসে বসত বুধী সেই পাখিকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বসার সুযোগ করে দিয়েছে। এই গুণগুলি বুধী'কে যথার্থ মানবীয় রূপে উন্নীত করেছে। মানবের সঙ্গে প্রানীর যে বন্ধন গল্পের শেষ পরিণতিতে তা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। বুধীর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে খুকির সংস্পর্শ লাভ এই দৃশ্য আমাদের মনে করাই প্রাণীর সঙ্গে মানবের জন্ম-জন্মান্তরের সেই আত্মিক বন্ধনকে, যা বুধী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। গল্পে বুধী প্রাণী হয়েও যথার্থ মানবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পে একজন অ-বলা প্রাণী তাঁর আত্মকথা বলছে তা শুধু নয় মানুষের মতন করে সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়া, মানুষের মতন করে বাঁচা ইত্যাদি বিষয়গুলি বুধীকে অনন্যতা দান করেছে।

পরিশেষে বলা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিকে নিয়ে যেমন জয়মাল্য রচনা করেছিলেন। প্রকৃতি তাঁর কলমে শুধুমাত্র নির্জীব, নির্বাক বস্তু রূপে প্রতিস্থাপিত হয়নি, প্রকৃতি নিজের অন্তরের কথা মনুষ্য সমাজকে জানিয়েছে,তাদের সুখ-দুঃখের শরীক হতে চেয়েছে। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পের বুধী'কেও (গরু) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূক, বধির প্রাণীর রূপ দিলেন না, তাকে মনুষ্যতর প্রাণী রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গল্পে বুধী স্নেহ, মধুর সম্পর্ক ভরা মানব চরিত্ররূপে নিজের আত্মকথাকে প্রকাশ করেছে সাবলীল ভাবে। মানবশিশু খুকির সঙ্গে বুধীর যে সম্পর্ক গল্পে ফুটে উঠেছে, তা নিঃসন্দেহে বুধীর সেই পরিচয় বহন করে।

তথ্য নির্দেশ:

১। তারাদাস, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), 'বুধীর বাড়ি ফেরা', বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (১ম খণ্ড), শুভম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩।

২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৫।

৩। **১১.** শান্তিময় খাঁ ও লিল্টু মণ্ডল, *'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য*, কলিকাতা লেটারপ্রেস, কলকাতা, ২০১৯।

ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে ধর্ম

জাগৃতি চ্যাটার্জী
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: 'ধর্ম' শব্দটি সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় পরম্পরায় ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বেদ, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এই 'ধর্ম' পদটির বহুল ব্যবহার এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ভারতীয় পরম্পরায় অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে 'ধর্ম' সম্পর্কে তার ধারণা এবং প্রয়োগ উভয়ই সংকুচিত হয়ে গেছে। যেমন- বর্তমানে 'ধর্ম' শব্দটি শুধুমাত্র 'Religious Beliefs' অথবা আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে সেই অর্থে ধর্ম শব্দটি কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। বৈদিকসাহিত্যে ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে এবং স্ব স্ব কর্মানুষ্ঠানই হল 'ধর্ম', বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও এই মত স্বীকৃত হতে দেখা যায়। তবে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষত বেদবিরোধী দর্শনগুলি এই মত স্বীকার করেনি তারা সম্পূর্ণ অন্য অর্থে 'ধর্ম' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছে এবং শুধুমাত্র চার্বাক সম্প্রদায় ধর্মে বিশ্বাসী নয়। এছাড়াও নৈতিক অর্থে, পুরুষার্থ অর্থে, পদার্থের গুণ বোঝাতে, মোক্ষলাভের উপায় অর্থে, যাগাদি কর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি অর্থে 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই।
সূচক শব্দ: ধর্ম, অর্থ, দর্শন, মোক্ষ, কর্ম।

মূল আলোচনা:

'ধৃ'-ধাতুর উত্তর 'মন্'-প্রত্যয় যোগ করলে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, যার অর্থ ধারণ করা। 'ধর্ম' শব্দটির বহু অর্থ প্রচলিত, তবে বর্তমানে শব্দটি অত্যন্ত সংকীর্ণার্থে প্রয়োগ হয়, বিশেষত আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক অর্থেই অধিক প্রচলিত। তবে বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য-মহাকাব্য, পৌরাণিক সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ্যে ধর্মের নানাবিধ অর্থ লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি যে ধর্ম শব্দটি সামাজিক নৈতিকতা, কর্তব্য, লৌকিক জীবন চর্যা, অধ্যাত্ম চিন্তা প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও সত্যতা বিচারের ক্ষেত্রে ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রে কর্ম অনুসারে ধর্মের নানান বিভাগ পরিলক্ষিত হয়, যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম। কর্মের এবং জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্মে বিভক্ত করা হয়েছে এবং স্ব স্ব কর্ম পালনকেই ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ভাগে বর্ণব্যবস্থা এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চারটি ভাগে আশ্রমপ্রথা বিভাজিত ছিল। মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রগুলিতে স্বধর্ম পালনের[১] বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে এবং বিশেষত কৌটিল্য বলেছেন এই স্বধর্ম পালনের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তিজনিত সুখ এবং অনন্তসুখপ্রদ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়[২]।

'দর্শন' শব্দটি 'দেখা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও দর্শনশাস্ত্রে 'দর্শন' শব্দটি 'প্রকৃষ্টরূপে কোনো বস্তুর স্বরূপ অনুধাবন করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং গভীর চিন্তন এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করে যে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটিই দর্শন এবং যে শাস্ত্রে মনীষীরা সেই জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিপাদনের মাধ্যমে তাঁদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটিই দর্শনশাস্ত্র। বিভিন্ন

দার্শনিক ধর্ম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মকে মোক্ষলাভের মূল পদক্ষেপ বলে মনে করেন। তাই বলা যেতে পারে ধর্ম এবং দর্শন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত[৩]। ভারতীয় পরম্পরায় পুরুষার্থের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়; চতুর্বিধ পুরুষার্থ হল- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি সকলেই পুরুষার্থ স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের মতে মুখ্য পুরুষার্থ হল মোক্ষ এবং এই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ধর্মাচরণকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। শুধুমাত্র চার্বাক সম্প্রদায় ধর্মকে স্বীকৃতি দেননি। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিতে ধর্ম কী সেই বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হল-

আস্তিক দর্শন:

সাংখ্য দর্শন: এই দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি কপিল। সাংখ্য দর্শনে ত্রিবিধ দুঃখ থেকে আত্যন্তিক মুক্তিলাভ কীভাবে হয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভই হল সাংখ্যমতে পুরুষার্থ। দুঃখ থেকে নিবৃত্তির পথ হিসেবে 'পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব'-এর জ্ঞানকে স্বীকার করেছেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব হল- প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগে বুদ্ধি বা মহতের এবং বুদ্ধি বা মহৎ থেকে অহংকার, অহংকারের সাত্ত্বিক অংশ থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তামসিক অংশ থেকে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান। এই দর্শনে পুরুষার্থ হিসেবে ধর্মের উল্লেখ না থাকলেও বুদ্ধি বা মহতের একটি রূপ হিসেবে ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে মহতের আটটি রূপ রয়েছে (সাত্ত্বিক রূপ- ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য এবং তামসিক রূপ- অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য)[৪]। এই আটটি রূপের মধ্যে ধর্ম হল প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ রূপ, বুদ্ধির সাত্ত্বিকগুণ থেকে ধর্মরূপ বুদ্ধি জন্ম নেয় যা প্রকৃতি এবং পুরুষের পার্থক্য করতে সাহায্য করে, প্রীতিকর-অপ্রীতিকর, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। এছাড়াও ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'য় ধর্মের ফল হিসেবে উর্ধ্বগমন প্রাপ্তির উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা ভূ-আদি সপ্তলোক প্রাপ্ত হয় এবং অধর্মের দ্বারা পাতালাদি সপ্ত অধোলোক প্রাপ্ত হয়[৫]।

যোগ দর্শন: যোগ দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি পতঞ্জলি। তিনি যোগের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি এবং মুক্তি লাভের পথ দেখিয়েছেন। 'যোগ' শব্দের অর্থ 'সমাধি', চিত্তবৃত্তিনিরোধই হল যোগ এবং চিত্তের সার্বভৌমধর্ম হল যোগ। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি এই পাঁচটি হল চিত্তবৃত্তি। পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্র'-এ ধর্ম শব্দটি সরাসরি ব্যবহার না করলেও চিত্তবৃত্তি, পঞ্চক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ), চিত্তবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার মার্গ দেখিয়েছেন এবং কুশল-অকুশল কর্মের উল্লেখ করেছেন যার থেকে একপ্রকার ধর্ম পালনেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইসমস্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ, আত্মোপলব্ধি এবং কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় হিসেবে অষ্টাঙ্গ যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন; এই অষ্টাঙ্গযোগ[৬] হল- যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ), নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান), আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ যোগ এবং অন্তিম তিনটি অন্তরঙ্গ যোগ, এই যোগাঙ্গগুলির দ্বারাই আত্মোপলব্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পশ্চাৎ কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। ফলত অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমেই চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন: ন্যায়দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি গৌতম এবং বৈশেষিকদর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি কণাদ। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন দুটি ভিন্ন দর্শন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী ব্যাখ্যাকারদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই দর্শন দুটি বন্ধুভাবাপন্ন কেননা

উভয়েই একে অপরের বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এইজন্য ন্যায় এবং বৈশেষিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সমানতন্ত্র দর্শনরূপে। অন্নংভট্টের 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে ধর্ম এবং অধর্ম উভয়েই পদার্থের চব্বিশটি গুণের অন্তর্গত। শাস্ত্রবিহীত কর্ম হল ধর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হল অধর্ম; এখানে শাস্ত্র বলতে বেদকেই বোঝানো হয়েছে। কেশবমিশ্র তাঁর 'তর্কভাষা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ধর্ম এবং অধর্ম সুখ ও দুঃখের অসাধারণ কারণ[৭]। ধর্ম ও অধর্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, এগুলি অতীন্দ্রিয় তাই অনুমান এবং আগমের দ্বারা তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। নৈয়ায়িকরা ধর্মাধর্মকে আত্মার বিশেষগুণ বলে উল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রবিহীত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত স্বর্গাদিসুখের যে সাধক ভোগ্য পদার্থ এবং ভোগায়তন শরীরাদির কারণ হল ধর্ম।

বৈশেষিকসূত্রে উল্লেখ আছে- **"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः"**[৮]। অর্থাৎ যা থেকে তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক মোক্ষলাভ হয় সেটিই ধর্ম। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানপূর্বক ধর্ম থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ছয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের প্রয়োজক।

শঙ্কর মিশ্র উক্ত সূত্রটির দুই রকম অর্থ করেছেন; প্রথমটি হল- 'যাহা হইতে অভ্যুদয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষের সিদ্ধি লাভ হয় তাহা ধর্ম', দ্বিতীয় অর্থ হল- 'যাহা হইতে অভ্যুদয় অর্থাৎ সুখস্বরূপ স্বর্গ এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ দুঃখাভাবরূপ মুক্তি সিদ্ধ হয় তাহা ধর্ম'[৯]। সুতরাং যা থেকে তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হয়ে মোক্ষ সিদ্ধি হয় এবং স্বর্গলাভ হয় সেটিই ধর্ম। অতএব বৈশেষিকদর্শনে ধর্ম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একাধারে কণাদ ধর্ম বলতে মোক্ষলাভের সাধন হিসেবে প্রকাশ করেছেন অপরদিকে প্রশস্তপাদ ধর্ম বলতে পদার্থের সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্যকে বুঝিয়েছেন।

পূর্ব-মীমাংসা: এই দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি জৈমিনী। মীমাংসা দর্শন মূলত বেদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈমিনী রচিত 'জৈমিনীসূত্র' গ্রন্থে তথ্যসূত্রটি হল- **"अथातो धर्मजिज्ञासा"**[১০]; মীমাংসা দর্শনের শুরুটাই ধর্মের বিচার দিয়ে, 'অথ' শব্দের দ্বারা বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য বোঝায়, 'অতঃ' পদের দ্বারা বেদাধ্যয়নের দৃষ্টার্থত্ব বোঝায় এবং 'জিজ্ঞাসা' পদের দ্বারা বিচার বোঝায়। জৈমিনী ধর্মের লক্ষণ দিয়েছেন- **"চোদনালক্ষণার্থো ধর্মো"**[১১], 'চোদনা' পদের দ্বারা সম্পূর্ণ বেদকে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু সম্পূর্ণ বেদে ধর্মের তাৎপর্য বর্ণনা হয়েছে তাই সমগ্র বেদই ধর্মের প্রতিপাদক।

মীমাংসকরা প্রধানত বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়কেই ধর্ম বলে স্বীকার করেছেন তার উদাহরণ বিভিন্ন মীমাংসক রচিত গ্রন্থ থেকে পাই, যেমন- লোগাক্ষিভাস্কর তাঁর রচিত 'অর্থসংগ্রহ' গ্রন্থে, যা মীমাংসাদর্শনের প্রকরণ গ্রন্থ, বেদের পাঁচটি ভাগ (বিধি-মন্ত্র-নামধেয়-নিষেধ-অর্থবাদ) সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে তিনি ধর্মের লক্ষণ এইরূপ করেছেন- **"वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति"**[১২], অর্থাৎ যা বেদপ্রতিপাদ্য, প্রয়োজনযুক্ত এবং অর্থসম্পন্ন তাই-ই ধর্ম; এককথায় যাগাদিই হল ধর্ম- **"যাগাদিরেব ধর্মঃ"**[১৩]। সুতরাং বেদবিহীত কর্মপালনই মীমাংসা মতে ধর্ম।

উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত: ভারতীয় আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত অন্যতম হল বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসা। 'বেদান্ত' পদটির অর্থ হল বেদের অন্তিম ভাগ অর্থাৎ উপনিষদ যাকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। উপনিষদগুলি এই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি। যে বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করে বেদান্তদর্শনের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত তাকে প্রস্থানত্রয়ী বলা হয়, তিনটি প্রস্থান হল-১) শ্রুতি প্রস্থান- উপনিষদ, ২) স্মৃতি প্রস্থান- ভগবদ্গীতা, ৩) ন্যায় প্রস্থান- ব্রহ্মসূত্র।

বেদান্ত দর্শনের মূলগ্রন্থ হল ব্রহ্মসূত্র, রচয়িতা বাদরায়ন। বেদান্তদর্শনে পৃথক পৃথক কয়েকটি সম্প্রদায় রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় এই ব্রহ্মসূত্রের ওপর ভাষ্য রচনা করেন, যেমন- অদ্বৈতবাদের আচার্য শঙ্কর রচিত শারীরকভাষ্য, দ্বৈতবাদের আচার্য মধ্বাচার্য রচিত পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আচার্য নিম্বার্ক রচিত বেদান্তপারিজাত, শুদ্ধাদ্বৈতবাদের আচার্য বল্লভাচার্য রচিত অনুভাষ্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আচার্য রামানুজ রচিত শ্রীভাষ্য ইত্যাদি এগুলির মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ।

বেদান্তের সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন মতাদর্শের যেমন কেউ কেউ বৈষ্ণব সম্প্রদায়, কেউ কেউ শৈব সম্প্রদায় আবার কেউ কেউ এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন। শঙ্করাচার্য এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে স্বীকার করেছেন এবং জ্ঞানলাভই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রকৃত ধর্মের উল্লেখ এখানে না পাওয়া গেলেও শঙ্করাচার্যের ভাষ্য এবং অদ্বৈতবেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ 'বেদান্তসার' গ্রন্থ থেকে ধর্ম সম্পর্কে একপ্রকার ধারণা পাওয়া যায়। বেদান্তসার গ্রন্থে ছয়প্রকার কর্মের[১৪] উল্লেখ রয়েছে, চিত্তশুদ্ধি বা বুদ্ধিশুদ্ধি-এর উল্লেখ রয়েছে যা পাঁচপ্রকার কর্ম সাধনের ফলস্বরূপ, বেদ নির্দেশিত পাঁচপ্রকার কর্ম হল- কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক এবং প্রায়শ্চিত্ত এগুলো ছারাও যে আর এক প্রকার কর্ম রয়েছে তা হল উপাসনা কর্ম যার ফল চিত্তের একাগ্রতা যার মাধ্যমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সম্ভব। এই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠানই ধর্মের প্রতিপালন। যেহেতু উপনিষদগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান শঙ্করাচার্যও সেই বিদ্যার কথা বলেছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অজ্ঞান নামক অন্ধকার থেকে জ্ঞানরূপ আলোকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন করিয়েছেন। বেদান্ত মতে এটিই ধর্ম। চিত্তের একাগ্রতার মাধ্যমে আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেই আত্মা যে ব্রহ্মেই লিপ্ত হয় পথই হল ধর্ম।

নাস্তিক দর্শন:

বৌদ্ধদর্শন: গৌতম বুদ্ধ এই দর্শনের প্রবক্তা। এই দর্শনের মূলগ্রন্থ ত্রিপিটক- বিনয়পিটক, সুত্তপিটক, অভিধম্মপিটক। বৌদ্ধরা ধর্ম-কে পালিভাষায় 'ধম্ম' বলে। বৌদ্ধমতে ধম্ম হল বুদ্ধের উপদেশ। বৌদ্ধমতে ত্রিরত্ন হল নির্বাণ লাভের উপায়। ত্রিরত্ন হল- বুদ্ধ, ধম্ম, সংঘ। এই তিনটি রত্ন হল বুদ্ধের উপদেশ এবং তা পালনকর্তাদের একটি সম্প্রদায়। বুদ্ধের উপদেশ মূলত চারটি আর্যসত্যকে কেন্দ্র করে; চারটি আর্যসত্য- ১) দুঃখ, ২) দুঃখ সমুদায়, ৩) দুঃখ নিরোধ, ৪) দুঃখনিরোধ মার্গ। দুঃখসমুদায় হল দ্বাদশ নিদান- অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ এবং দুঃখনিরোধের মার্গ হল অষ্টাঙ্গিকমার্গ- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাণী, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ প্রযত্ন, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি। এছাড়াও পঞ্চশীল (অহিংসা, অস্তেয়, সত্যভাষণ, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ) পালন এবং দ্বাদশায়তন (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি)-কে নিয়ন্ত্রনপূর্বক সম্যক্ কর্মানুষ্ঠান; প্রধানত এগুলিই বুদ্ধের উপদেশ এবং এগুলির প্রতিনিয়ত অনুশীলন ধম্মরূপে আখ্যাত। ধম্মের পালনেই পরমসুখপ্রাপ্তি এবং নির্বাণ প্রাপ্তি হয়।

জৈনদর্শন: ভারতীয় প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে একটি জৈনদর্শন। এই দর্শনে ২৪ জন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঋষভদেবের নাম পাওয়া যায়, যাঁকে অনেকেই জৈনদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মনে করেন। ২৩তম তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ এবং সর্বশেষ ছিলেন মহাবীর। জৈনদর্শনের তত্ত্ব ২, ৫, ৭, ৯ এইপ্রকারে বিভক্ত। জৈনমতে দ্রব্য ছয়প্রকার[১৫]- জীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, পুদ্গল, কাল। জীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, পুদ্গল এই পাঁচটি অস্তিকায় দ্রব্য এবং কাল হল অনস্তিকায় দ্রব্য। এই ছয়টি দ্রব্য দিয়েই সমগ্র জগৎ-সংসার

গঠিত এবং পরিচালিত হয়। জৈনদর্শনে ধর্ম একটি দ্রব্য যা গতিশীলতাকে কার্যকর করে। ধর্ম নিত্য এবং শাশ্বত, জাগতিক-মহাজাগতিক বস্তু, আত্মা, পুদ্গল এই সবকিছুকেই গতিশীল করে তুলতে সাহায্য করে। ধর্ম নিজে গতিশীল এমনটা নয়, শুধুমাত্র গতিশীলতাকে সম্ভব করে তোলে। গতিহেতুত্ব ধর্মের একটি গুণমাত্র।

চার্বাকদর্শন: এই দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি বৃহস্পতি। চার্বাক দর্শনকে নাস্তিক শিরোমণি বলা হয় কারণ তাঁরা বেদ, ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক কোনো বিষয়েই বিশ্বাসী ছিলেন না। চার্বাক শব্দের অর্থ চারু বাক্ অর্থাৎ মধুর মধুর কথা। চার্বাকদর্শন সুখবাদী দর্শন, তাঁদের মতে মৃত্যুতেই অপবর্গ লাভ হয়। চার্বাকমতে দুটি পুরুষার্থ- অর্থ এবং কাম; ধর্মকে পুরুষার্থ হিসেবে কোনো স্বীকৃতি দেননি। চার্বাক মতে- "यावत् जीवेत् सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योगोचरः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।"[১৬] উক্তিটির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে চার্বাকরা স্বর্গ অথবা জন্মান্তর কোনোকিছুই স্বীকার করতেন না, মৃত্যুতেই জন্ম শেষ এবং মৃত্যুতেই অপবর্গ তাই জীবনযাপনের কোনো নিয়মাবলী তাঁরা মানেননি অথবা ধর্ম-কর্মের পক্ষাবলম্বী নন এমনকি যেহেতু তাঁরা কামকেই পরমপুরূষার্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই বলেছেন "यावत् जीवेत् सुखं जीवेद्दणं कृत्वा घृतं पिवेत्"[১৭]। তাই ধর্মের উল্লেখ বা ব্যাখ্যা কোনোটাই চার্বাকদর্শনে পাওয়া যায় না।

অবশেষে আমরা বলতে পারি চার্বাকদর্শন ব্যতীত অন্যান্য আটটি দর্শনে ধর্ম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আমরা পেয়েছি। প্রধানত আস্তিকদর্শন গুলি (সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা, বেদান্ত)-তে ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাখ্যার সাদৃশ্য থাকলেও নাস্তিকদর্শন (বৌদ্ধ, জৈন)-গুলিতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা আমরা পাই। বর্তমানে 'ধর্ম' শব্দটি আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা অর্থাৎ 'Religion'- এই অর্থে বেশি প্রযুক্ত হলেও তৎকালীন সমাজে তা হত না তার উদাহরণ আমরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ থেকে পেয়ে যায়। আমাদের কর্মের মধ্যেই ধর্ম প্রতিফলিত হয়, কর্মের দ্বারাই বিবেচিত হয় আমরা ধর্মী না অধর্মী।

আস্তিক এবং নাস্তিকভেদে এই নয়প্রকার দার্শনিক সম্প্রদায় থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, সমস্ত জাগতিক, মহাজাগতিক, আত্মা, পরমাত্মা, স্থাবর, জঙ্গম বিষয়েই তাদের নিজস্ব ধর্ম বর্তমান যা প্রত্যেকটি ভিন্ন বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

তথ্যসূত্র:

১। দ্রষ্টব্য- ড. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.), ১৪২২, *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* ১০১ বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা- ৭০০০০৬, সদেশ, পৃষ্ঠা- ১৮,২০।

২। দ্রষ্টব্য- ঐ, *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* পৃষ্ঠা-২২।

৩। দ্রষ্টব্য- বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, আগস্ট, ২০১৮, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* এ কিউ ১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃষ্ঠা- ৫১৬।

৪। Virupakshananda, Swami, 1995, *SĀṀKHYA KĀRIKĀ of ĪŚVARA KṚṢṆA with THE TATTVA KAUMUDĪ of Śrī Vācaspati Miśra,* Mylapore, Madras 600004, SRI RAMAKRISHNA MATH, Page no.66।

৫। *SĀṀKHYA KĀRIKĀ of ĪŚVARA KṚṢṆA with THE TATTVA KAUMUDĪ of Śrī Vācaspati Miśra,* Page no.93।

৬। *Pātañjali's Yoga Sūtras with the commentary of Vyāsa and the gloss of Vāchaspati Miśra,* Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Page no-154.

৭। Prof. Ganguly, Sarbani (Ed. and Trans.), March 2005, *Keśavamiśra's TARKABHĀṢĀ,* 38, Bidhan Sarani, Kolkata 700006, Sanskrit Pustak Bhandar, Page no.97.

৮। ত্রিপাঠী, দীননাথ নবতীর্থ ন্যায় মহাচার্য, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রমঃ (অনুবাদাদিকারকঃ), জানুয়ারি, ২০২১, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্ প্রথম ভাগঃ,* ২৮/১ বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃষ্ঠা নং- ৪০।

৯। *প্রশস্তপাদভাষ্যম্ প্রথম ভাগঃ,* পৃষ্ঠা নং- ৪০।

১০। Mahamahopâdhyâya Jha, Ganganatha, 1979, *THE PÛRVA-MIMÂMSÂ-SÛTRAS OF JAIMINI,* 42 43 U.B Jawhar Nagar, Delhi 110007, BHARATIYA PUBLISHING HOUSE, Page no. 1, Sutra- 1/1/1.

১১। *THE PÛRVA-MIMÂMSÂ-SÛTRAS OF JAIMINI,* Page no. 1, Sutra-1/1/2

১২। Gajendragadkar, A.B. And Karmakar, R.D. (Ed. and Trans.), 1998, *THE ARTHASAṀGRAHA OF LAUGĀKṢI BHĀSKARA,* Bungalow Road, Delhi 110007, MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED, Page no.2.

১৩। *THE ARTHASAṀGRAHA OF LAUGĀKṢI BHĀSKARA,* Page no.2.

১৪। পাল, বিপত্তঞ্জন (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা), ১৪২০ বঙ্গাব্দ, *পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যশ্রীশ্রীসদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতীপ্রণীতঃ বেদান্তসারঃ,* ৩৮ বিধান সরণী, কোলকাতা—৬, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃষ্ঠা নং.-২৯।

১৫। श्री कृष्णदास, खेमराज, १९६२, *सर्वदर्शसङ्ग्रहः श्रीमन्माधवाचार्य विरचितः,* स्वकीये "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् यन्त्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशितः, पृष्ठा- ६०

১৬। *सर्वदर्शसङ्ग्रहः श्रीमन्माधवाचार्य विरचितः,* पृष्ठा- २, श्लोक नं- ५

১৭। *सर्वदर्शसङ्ग्रहः श्रीमन्माधवाचार्य विरचितः,* पृष्ठा-१०, श्लोक नं- २५।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার (সম্পা.), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* সদেশ, ১০১ বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা- ৭০০০০৬, ১৪২২।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, এ কিউ ১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, আগস্ট, ২০১৮।

৩। Virupakshananda, Swami, *SĀṀKHYA KĀRIKĀ of ĪŚVARA KṚṢṆA with THE TATTVA KAUMUDĪ of Śrī Vācaspati Miśra,* SRI RAMAKRISHNA MATH, Mylapore, Madras 600004, SRI RAMAKRISHNA MATH, 1995.

৪। Prasāda, Rāma (Trans.), *Pātañjali's Yoga Sūtras with the commentary of Vyāsa and the gloss of Vāchaspati Miśra,* Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box- 5715, Rani Jhansi Road, New Delhi 110055, 1998.

৫। Prof. Ganguly, Sarbani (Ed. and Trans.), *Keśavamiśra's TARKABHĀṢĀ,* Sanskrit Pustak Bhandar, 38, Bidhan Sarani, Kolkata 700006, March 2005.

৬। ত্রিপাঠী, দীননাথ নবতীর্থ ন্যায় মহাচার্য, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রমঃ (অনুবাদাদিকারকঃ), জানুয়ারি, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্ প্রথম ভাগঃ,* সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮/১ বিধান সরণী, কলকাতা- ৭০০০০৬, জানুয়ারি, ২০২১।

৭। Mahamahopâdhyâya Jha, Ganganatha, *THE PÛRVA-MIMÂMSÂ-SÛTRAS OF JAIMINI,* BHARATIYA PUBLISHING HOUSE, 42 43 U.B Jawhar Nagar, Delhi 110007, 1979.

৮। Gajendragadkar, A.B. And Karmakar, R.D. (Ed. and Trans.), *THE ARTHASAṀGRAHA OF LAUGĀKṢI BHĀSKARA,* MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED, Bungalow Road, Delhi 110007, 1998.

৯। পাল, বিপদ্ভঞ্জন (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা),, *পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র সরস্বতী প্রণীতঃ বেদান্তসারঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কোলকাতা—৬, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

১০। श्री कृष्णदास, खेमराज, *सर्वदर्शसङ्ग्रहः श्रीमन्माधवाचार्य विरचितः,* स्वकीये "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् यन्त्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशितः, १९६२।

১১। ড. গাঙ্গুলী, শর্বাণী, অন্নংভট্টকৃতঃ তর্কসংগ্রহঃ(দীপিকাসমন্বিত), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, মার্চ ২০১৩।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত

প্রলয় শঙ্কর অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
প্রভাত কুমার মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য ও জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে ধর্মীয় গ্রন্থ, মহাকাব্য, দার্শনিক রচনা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সাহিত্য দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা ও শাসনব্যবস্থার জ্ঞান সংরক্ষণ করেছে। যা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায় - **"প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য ও জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ধর্মীয় গ্রন্থ, মহাকাব্য, দার্শনিক রচনা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।"**[1]

বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তি গঠন করেছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ হিন্দু দর্শন ও আচারবিধির মূল ভিত্তি। উপনিষদ মহাজাগতিক বাস্তবতা ও আত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে, যা ভারতীয় ও বিশ্ব দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, যেমন ত্রিপিটক ও আগম, ধর্মীয় চিন্তাধারার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত নৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক কৌশল উপস্থাপন করে। মহাভারতের অংশ ভগবদ্গীতা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর মতে - **"রামায়ণ ও মহাভারত নৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক কৌশল উপস্থাপন করে, আর ভগবদ্ গীতা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।"**[2] মনুস্মৃতি ও অর্থশাস্ত্র শাসন ব্যবস্থা, আইন ও অর্থনীতির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও কূটনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

সুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর্যভটীয় ও ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। শূন্য ও দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ভারতীয় সাহিত্যে উদ্ভূত।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষার সাহিত্য ভাষাগত ঐতিহ্য গঠন করেছে। কালিদাস ও তুলসীদাস ধ্রুপদী ও ভক্তিমূলক সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। পঞ্চতন্ত্র ও জাতক কাহিনি নৈতিক শিক্ষা দিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে গল্প বলার ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পারস্য, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপে পৌঁছে গিয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। এটি আজও বিশ্ব ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সূচক শব্দ: সাহিত্য, সংস্কৃতি, মহাকাব্য, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, ভাষা, শিক্ষা, বিজ্ঞান।

---

[1] A History of Indian Philosophy

[2] The Bhagavad Gita: With an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes

ভূমিকা-

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য ও জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে ধর্মীয় গ্রন্থ, মহাকাব্য, দার্শনিক রচনা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সাহিত্য দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা ও শাসন ব্যবস্থার জ্ঞান সংরক্ষণ করেছে। যা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায় - **"প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য ও জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ধর্মীয় গ্রন্থ, মহাকাব্য, দার্শনিক রচনা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।"**[3]

বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তি গঠন করেছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ হিন্দু দর্শন ও আচারবিধির মূল ভিত্তি। উপনিষদ মহাজাগতিক বাস্তবতা ও আত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে, যা ভারতীয় ও বিশ্ব দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, যেমন ত্রিপিটক ও আগম, ধর্মীয় চিন্তাধারার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত নৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক কৌশল উপস্থাপন করে। মহাভারতের অংশ ভগবদ্ গীতা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এর মতে - **"রামায়ণ ও মহাভারত নৈতিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক কৌশল উপস্থাপন করে, আর ভগবদ্ গীতা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।"**[4] মনুস্মৃতি ও অর্থশাস্ত্র শাসন ব্যবস্থা, আইন ও অর্থনীতির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও কূটনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

সুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর্যভটীয় ও ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। শূন্য ও দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ভারতীয় সাহিত্যে উদ্ভূত।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষার সাহিত্য ভাষাগত ঐতিহ্য গঠন করেছে। কালিদাস ও তুলসীদাস ধ্রুপদী ও ভক্তিমূলক সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন। পঞ্চতন্ত্র ও জাতক কাহিনি নৈতিক শিক্ষা দিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে গল্প বলার ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পারস্য, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপে পৌঁছে গিয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। এটি আজও বিশ্ব ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

1.জ্ঞান ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ-

আসুন গভীরভাবে অন্বেষণ করি, কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য জ্ঞান ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। কল্পনা করুন এমন একটি বিশ্ব, যেখানে মুদ্রণযন্ত্র নেই, কম্পিউটার নেই, এমনকি সহজলভ্য লেখার উপকরণও নেই। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে জটিল ধারণা, ঐতিহাসিক বিবরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত হতো? প্রাচীন ভারত এর এক অসাধারণ সমাধান খুঁজে পেয়েছিল—একটি শক্তিশালী মৌখিক ঐতিহ্য, যা পরবর্তীতে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়েছিল।

- **মৌখিক ঐতিহ্যের শক্তি**- লেখার প্রচলনের আগে জ্ঞান মৌখিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তর হতো। এটি শুধু মুখস্থ করার বিষয় ছিল না; বরং উন্নত

[3] A History of Indian Philosophy

[4] The Bhagavad Gita: With an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes

স্মরণশক্তি, আবৃত্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংরক্ষিত হতো। কবি, পুরোহিত ও জ্ঞানীরা জ্ঞান আয়ত্ত ও সংরক্ষণে জীবন উৎসর্গ করতেন। একে মানব লাইব্রেরি বলা যায়, যেখানে ব্যক্তি কাহিনি, স্তোত্র ও দার্শনিক জ্ঞানের বাহক ছিলেন। মৌখিক ঐতিহ্য পরিবর্তনশীল হলেও বিশুদ্ধতা রক্ষায় কঠোর প্রশিক্ষণ ও স্মৃতিশক্তিবর্ধক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো, যাতে মূল শিক্ষা অক্ষুণ্ণ থাকে। মহাভারতের শান্তি পর্বে এর নিদর্শন -"**শ্রুতির্মাতাস্মৃতি:পিতা।**" (ShrutirmātāSmṛtiḥPitā)। **অর্থাৎ** "শ্রুতি (বৈদিক জ্ঞান) হল মাতা, আর স্মৃতি (ঐতিহ্যগত জ্ঞান) হল পিতা।"[5] এই শ্লোকটি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় মৌখিক সংরক্ষণের গুরুত্বকে তুলে ধরে, যেখানে শ্রুতি (যা শুনে শেখা হয়) ও স্মৃতি (যা স্মরণে রাখা হয়) জ্ঞানের প্রধান দুই স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত।

- **লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা** - মৌখিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি, লেখার বিকাশ এই জ্ঞানের সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলো তালপাতা, ভোজপাতা এবং পরবর্তীতে কাগজের ওপর লেখা হতো। এই লিখিত গ্রন্থগুলো দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড হিসেবে কাজ করত, যা মানুষের স্মৃতিভ্রষ্টতা ও সময়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ছিল। তবে, গ্রন্থ রচনা ও অনুলিপি করা ছিল একটি শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া, যা এগুলোকে অত্যন্ত মূল্যবান ও বিরল করে তুলেছিল।
- **সংরক্ষিত জ্ঞানের ব্যাপ্তি** - প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিভিন্ন জ্ঞানবিষয়ক ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। **দর্শন**শাস্ত্রে উপনিষদ বাস্তবতা, আত্মা ও ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছে। **ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা** ক্ষেত্রে বেদ ও পুরাণ প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে। **বিজ্ঞান ও গণিতে**, সুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতা চিকিৎসা বিজ্ঞানে, আর্যভটীয় ও ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত গণিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। **রাষ্ট্রনীতি ও আইনে**, অর্থশাস্ত্র প্রশাসনিক ও সামরিক কৌশল বিশ্লেষণ করেছে। **সাহিত্য ও শিল্পে**, কালিদাসের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যের শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রতিফলিত করেছে। এই সাহিত্য জ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিস্তারে অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছে।
- **সংরক্ষণের গুরুত্ব** - প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের সংরক্ষণ শুধু অতীতের দলিল নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক মূল্যবান সম্পদ। এই সাহিত্য আমাদের **অতীত বোঝার** সুযোগ করে দেয় এবং সামাজিক কাঠামো ও বৌদ্ধিক কৃতিত্ব সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। **অতীত থেকে শিক্ষা** গ্রহণের মাধ্যমে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক জ্ঞান আজও প্রাসঙ্গিক। এটি **ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ** রক্ষা করে, বিশেষ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য। একইসঙ্গে, এটি **সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রশংসা** করতে শেখায়। মূলত, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য টাইম ক্যাপসুলের মতো জ্ঞান ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে, যা আজও আমাদের সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত উদ্ধৃতি হলো-

[5] মহাভারত, শান্তি পর্ব ৩৪৯.৬৫

"श्रुतंचदृष्टंचपरेणसंचितंतेनोपदेशेननरोऽभिवर्धते।"[6] (Śrutaṁ ca dṛṣṭaṁ ca pareṇasaṁcitaṁtenopadeśenanaro’ bhivardhate.) **অর্থাৎ** *বণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঞ্চিত জ্ঞান দ্বারা মানুষ বিকাশ লাভ করে।*

2.ধর্মীয় ও দার্শনিক অবদান-

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক অবদান অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এগুলো শুধুমাত্র ভারতের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলকে গঠন করেনি, বরং বিশ্বব্যাপী দার্শনিক চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করেছে। চলুন, এই অবদানগুলো বিস্তারিতভাবে অন্বেষণ করি:

ক. বেদ: হিন্দু চিন্তা ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি

বেদ হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, যা বৈদিক সংস্কৃতে রচিত স্তোত্র, প্রার্থনা ও ধর্মীয় আচারবিধির সংকলন। চারটি প্রধান বেদ হলো:

- **ঋগ্বেদ:** দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্র সংকলন, যা ইন্দো-আর্য সমাজের বিশ্বাস ও আচার প্রতিফলিত করে।
- **যজুর্বেদ:** যজ্ঞ ও ধর্মীয় আচারবিধির জন্য মন্ত্র ও নিয়মাবলি বিশ্লেষণ করে।
- **সামবেদ:** সংগীত ও স্তোত্রের সংকলন, যা সোম যজ্ঞে গাওয়া হতো।
- **অথর্ববেদ:** দৈনন্দিন জীবনের প্রার্থনা, মন্ত্র ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করে।

বেদ শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং দর্শনের বীজও বহন করে। কর্ম, পুনর্জন্ম ও সৃষ্টির আন্তঃসংযুক্ততার ধারণা এর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে।

খ. উপনিষদ: বাস্তবতার প্রকৃতি অনুসন্ধান-

উপনিষদ, যা বেদান্ত নামেও পরিচিত, হলো বেদগুলোর অন্তিম অংশ এবং গভীর দার্শনিক গ্রন্থ। এগুলো ব্রহ্ম (সর্বোচ্চ বাস্তবতা), আত্মা (আত্মান) ও বিশ্বজগতের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। উপনিষদগুলিভারতীয়দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

উপনিষদের প্রধান ধারণাগুলি হল:

- **ব্রহ্ম:** এটি চূড়ান্ত বাস্তবতা, যা সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস ও অবলম্বন। ব্রহ্মকে কখনো নিরাকার, অনন্ত ও মানব উপলব্ধির অতীত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- ***"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।"***[7] **অর্থাৎ** ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।
- **আত্মান:** এটি ব্যক্তিগত আত্মা, যা আসলে ব্রহ্মের সাথেই একীভূত। **"তৎ ত্বম্ অসি"**[8] (তুমি তাই) উক্তিটি এই ধারণা প্রকাশ করে যে ব্যক্তিগত আত্মা (আত্মান) ও সর্বজনীন আত্মা (ব্রহ্ম) অভিন্ন।
- **কর্ম ও পুনর্জন্ম:** উপনিষদে কর্ম (পূর্বজন্মের কর্মফল) এবং পুনর্জন্ম (পুনরায় জন্মগ্রহণের ধারণা) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপনিষদে বর্ণনা আছে - ***"यथाकरीयथाचारीतथाभवति।"***[9] **অর্থাৎ** - যেমন কর্ম, তেমনই ফল। আমাদের কাজের ফল আমাদের ভবিষ্যৎ জন্ম নির্ধারণ করে। এই চক্র চলতে থাকে যতক্ষণ না আত্মা মুক্তি (মোক্ষ) অর্জন করে।

---

[6] মহাভারত, শান্তি পর্ব (৩৪৯.৬৫)

[7] तैत्तिरीयोपनिषद् 2.1.1

[8] छान्दोग्यउपनिषद् 6.8.7

[9] बृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.5

- **মোক্ষ:** এটি জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি, যা আত্ম-সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মোক্ষ অর্জন মানে আত্মান ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রামাণিক বাক্য-***"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ব্রহ্মাপ্যেতি।"***[10] **অর্থাৎ** মোক্ষলাভের পর আত্মা আর পুনর্জন্ম নেয় না, বরং ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়।

উপনিষদগুলি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদেরও প্রভাবিত করেছে, যেমন আর্থার শোপেন হাওয়ার ও অলডাসহাক্সলি।

গ. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ: গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা সংরক্ষণ করেছে। প্রধান গ্রন্থ ত্রিপিটক তিনটি অংশে বিভক্ত: **বিনয়পিটক**, যা ভিক্ষুদের বিধি-নিয়ম নির্ধারণ করে; **সূত্র পিটক**, যেখানে বুদ্ধের উপদেশ সংকলিত; এবং **অভিধর্মপিটক**, যা বৌদ্ধ দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রদান করে। মূল দর্শনসমূহের মধ্যে চার আর্য সত্য (দুঃখ ও মুক্তির পথ), **অনিত্য** (সবকিছু পরিবর্তনশীল), **অনাত্ম** (কোনো স্থায়ী আত্মা নেই) এবং **প্রতিত্যসমুৎপাদ** (কার্য-কারণ সংযোগ) অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থসমূহ বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতিগুলো ব্যাখ্যা করে এবং আত্মজ্ঞান ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে। এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

1. **চার আর্য সত্য সম্পর্কে-** **"দুঃখংঅরিয়সচ্চং, দুঃখসমুদয়অরিয়সচ্চং, দুঃখনিরোধঅরিয়সচ্চং, দুঃখনিরোধগামিনীপ্রতিপদাঅরিয়সচ্চং।"**[11]

   "Dukkhamariyasaccaṃ, dukkhasamudayaariyasaccaṃ, dukkhanirodhaariyasaccaṃ, dukkhanirodhagāminīpaṭipadāariyasaccaṃ."

   অর্থাৎ দুঃখ একটি সত্য, দুঃখের কারণ একটি সত্য, দুঃখ নিবারণের উপায় একটি সত্য এবং দুঃখ নিরসনের পথও একটি সত্য।

2. **অনিত্য (অনিক্কা) সম্পর্কে** **"অনিচ্চাবততাসংখারা, উপ্পাদ-বয়-ধম্মিনো। উপ্পজ্জিত্বানিরুজ্জন্তি, তেসংবিপস্সমোসুখং।"**[12]

   "Aniccāvatasaṅkhārā, uppāda-vaya-dhammīno; uppajjitvānirujjhanti, tesaṃvūpasamosukho."

   অর্থাৎ সমস্ত সংযোজিত বস্তু অনিত্য, তাদের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বাভাবিক। যা উৎপন্ন হয়, তা ধ্বংস হয়—এটাই তাদের প্রকৃতি, এবং এই উপলব্ধিতেই শান্তি। এই উদ্ধৃতিগুলি বৌদ্ধধর্মের মৌলিক দর্শন ও জীবনবোধের সারমর্ম তুলে ধরে।

ঘ. জৈন ধর্মগ্রন্থ: তীর্থঙ্করদের শিক্ষা

জৈনধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো আগম নামে পরিচিত, যা তীর্থঙ্করদের শিক্ষা সংরক্ষণ করে। জৈন দর্শন নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলোকে গুরুত্ব দেয়:

- **অহিংসা (অহিংসা):** সমস্ত জীবের প্রতি পরম শান্তি ও দয়া বজায় রাখা।
- **অনেকান্তবাদ (নিরপেক্ষতা):** সত্য একক নয়, বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করা যায়।

---

[10] বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ 4.4.6

[11] ধম্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, *সাম্যুক্তনিকায় 56.11*

[12] মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র, DīghaNikāya 16

- **অপরিগ্রহ (সংযম):** সম্পদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, কর্ম ও পুনর্জন্মের ধারণা হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ধারণাগুলোর আন্তঃসম্পর্ক প্রাচীন ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সাহিত্য ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলকে গঠন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। আজও এই গ্রন্থগুলো মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, আত্ম-অনুসন্ধানে সহায়তা করে এবং বাস্তবতার গভীর উপলব্ধি প্রদান করে। প্রাচীন দর্শনের অধ্যয়ন মানব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরে প্রবেশের এক অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করে।

পরস্পরোপগ্রহোজীবানাম্[13] (Parasparopagrahojīvānām.) **অর্থাৎ** সকল জীব পরস্পর নির্ভরশীল। এই উক্তিটি জৈন দর্শনের অহিংসা, নিরপেক্ষতা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির মৌলিক নীতিগুলোর প্রতিফলন ঘটায়। **অনেকান্তবাদাদ্দৃষ্টিবাদ:**[14] **(Anekāntavādāddr̥ṣṭivādaḥ.) অর্থাৎ** বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সত্যের উপলব্ধি। (*Tattvārthasūtra*) **সংযমাৎসর্বদু:খানাংনিরোধ:** (Saṃyamātsarvaduḥkhānāṃnirodhaḥ.) **অর্থাৎ** সংযমের মাধ্যমেই সকল দুঃখের অবসান ঘটে। এই উক্তিগুলো জৈন ধর্মের মূল দর্শন—অনেকান্তবাদ (নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যের অনুসন্ধান) এবং সংযমের গুরুত্ব—প্রতিফলিত করে।

৩. মহাকাব্য ও নৈতিক শিক্ষা

রামায়ণ ও মহাভারত শুধুমাত্র গল্প নয়; এগুলো ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি, যা জাতির ইতিহাস, দর্শন ও শিল্পের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দুটি মহাকাব্য ভারতীয় সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে, যা আমাদের সত্য, মিথ্যা, কর্তব্য ও পরিণতির শিক্ষা প্রদান করে। একইসঙ্গে, এগুলো প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক কৌশল, সামাজিক গঠন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

ক. রামায়ণ: আদর্শ ও বাস্তবতা

রামায়ণ, ঋষি বাল্মীকির রচিত মহাকাব্য, রাজপুত্র রামের জীবনকাহিনি বর্ণনা করে। রামের স্ত্রী সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণ অপহরণ করলে, রাম অবশেষে তাকে পরাজিত করে এবং অযোধ্যায় ফিরে আসেন। এই কাহিনি শুভ শক্তির অশুভ শক্তির ওপর বিজয়ের প্রতীক। তবে রামায়ণ শুধুই এক কাহিনি নয়; এটি ধর্ম, কর্ম ও ভক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে। রাম আদর্শ মানব, সীতা নারীত্বের প্রতিচিত্র, আর রাবণ অহংকারের প্রতীক। মহাকাব্যটি নৈতিক সংকট, ধর্ম রক্ষার গুরুত্ব ও আত্মোন্নতির পথ নির্দেশ করে, যা আজও মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *তপোবন* প্রবন্ধে রামায়ণের নৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন—

> **"অরণ্যের ধর্ম ত্যাগ করে যখন রাজসভা সমস্ত সমাজকে অধিকার করে, তখন সত্যের পরিবর্তে প্রচলিত মত, আত্মত্যাগের পরিবর্তে আত্মগৌরব, আপন কর্তব্যের পরিবর্তে পরের আজ্ঞাপালন প্রধান হয়ে ওঠে।"**[15]

---

[13] *Tattvārthasūtra*, 5.21

[14] Tattvārthasūtra

[15] *তপোবন*, রবীন্দ্র রচনাবলী

খ. মহাভারত: ধর্মের জটিলতা
মহাভারত, ঋষি ব্যাসদেব রচিত মহাকাব্য, পাণ্ডব ও কৌরবদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ধর্ম, কর্ম, নিয়তি ও স্বাধীন ইচ্ছার জটিলতা অন্বেষণ করে। পাণ্ডবরা ন্যায়ের প্রতীক হলেও, কাহিনির নৈতিকতা অস্পষ্ট, যেখানে ধার্মিক চরিত্ররাও নৈতিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়। মহাভারত প্রশ্ন তোলে—ধর্ম কি সর্বজনীন, নাকি পরিস্থিতি নির্ভর? সংঘর্ষের মুহূর্তে কোন কর্তব্য অনুসরণীয়? এটি সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাঠকদের গভীর চিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণে প্ররোচিত করে। মহাকাব্যটি কেবল ঐতিহাসিক কাহিনি নয়; এটি মানবজীবনের জটিলতা ও নৈতিক দ্বিধা উপলব্ধির এক অসাধারণ প্রতিফলন। মহাভারতের নৈতিক জটিলতা ও কর্তব্যবোধ প্রতিফলিত করতে পারে—

"ধর্মেণবিজিতাঃপাপংধর্মেসত্যংপ্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাদ্ধর্মংপ্রবক্ষ্যামিধর্মোহিপরমংশ্রুতম্॥"[16]

অর্থাৎ ধর্ম দ্বারা পাপ জয় করা হয়, ধর্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত। তাই আমি ধর্মের কথা বলছি, কারণ ধর্মই সর্বোচ্চ শ্রুত (জ্ঞান)। এই শ্লোক মহাভারতের মূল দর্শনকে তুলে ধরে, যেখানে ধর্মের প্রকৃতি, নৈতিক সংকট ও কর্তব্যের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

গ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকবর্তিকা
ভগবদ্গীতা, মহাভারতের একটি অংশ, অর্জুন ও কৃষ্ণের মধ্যকার দার্শনিক সংলাপ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের মানসিক দ্বিধা কাটাতে কৃষ্ণ ধর্ম, কর্ম ও মুক্তির শিক্ষা দেন। এটি হিন্দু দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যেখানে কর্ম যোগ (স্বার্থহীন কর্ম), ভক্তি যোগ (ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা) ও জ্ঞান যোগ (আত্ম-উপলব্ধি) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গীতা শেখায় যে কর্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং আত্মার প্রকৃতি চিরন্তন। এর গভীর দর্শন ভারতীয় চিন্তাধারায় সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে এবং এটি বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পথপ্রদর্শক হিসেবে সমাদৃত। স্বামী বিবেকানন্দ ভগবদ্গীতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন:

"**গীতা** is the best commentary we have on the Vedanta philosophy – curiously enough, the scene is laid on a battlefield, where Krishna teaches this philosophy to Arjuna, who, in the middle of the fight, has become despondent and has refused to do his duty."[17]

ঘ. ভারতীয় শিল্প, নাটক ও সাহিত্যে প্রভাব
রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় শিল্প, নাটক ও সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। মন্দিরের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় এসব মহাকাব্যের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে, যা শুধু গল্পই নয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতিও প্রকাশ করে। রামলীলা, কাথাকলি প্রভৃতি নাট্যশৈলীতে এসব কাহিনি জীবন্ত হয়ে ওঠে, যা নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। সাহিত্যেও রাম ও কৃষ্ণের কাহিনির পুনর্কথন ও ব্যাখ্যা বারবার উঠে এসেছে। এই মহাকাব্য শুধু অতীতের গল্প নয়; এটি ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা মূল্যবোধ, দর্শন ও জ্ঞানের ধারক হিসেবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত রয়েছে।

---

[16] *মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ৪৩.৬*

[17] *The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol. 1, p. 394

৪. আইন ও রাজনৈতিক চিন্তা

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সেই সময়কার আইন ও রাজনৈতিক ভাবনার একটি চিত্তাকর্ষক চিত্র তুলে ধরে, যা সমাজ কীভাবে সংগঠিত, পরিচালিত ও শাসিত হতো তা বোঝার সুযোগ করে দেয়। এ বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল— মনুস্মৃতি (Laws of Manu) এবং অর্থশাস্ত্র (Science of Politics)। যদিও মনুস্মৃতির সামাজিক বিধিনিষেধগুলি আজকের সময়ে ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়, উভয় গ্রন্থই প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে সহায়ক।

ক. মনুস্মৃতি: সামাজিক ও আইনি বিধানগুলোর প্রতিফলন (সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)

মনুস্মৃতি প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আইনগত বিধান সংকলন, যেখানে বর্ণব্যবস্থা, আশ্রম ব্যবস্থা, বিবাহ, উত্তরাধিকার ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে সমাজের শ্রেণিবিন্যাস, নারীদের অধিকার সীমাবদ্ধকরণ ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিধান উল্লেখ আছে, যা আধুনিক মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কিত। যদিও এটি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মাচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে, তবুও এর অনেক বিধান বৈষম্যমূলক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। মনুস্মৃতিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। **"ধর্মে সর্বংপ্রতিষ্ঠিতংতস্মাদ্ধর্মংপরমংবদন্তি।"** (*Dharmesarvaṃpratiṣṭhitaṃtasmāddharmaṃparamaṃvadanti.*)[18]" সমস্তকিছু ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত; অতএব, ধর্মকেই সর্বোচ্চ বলা হয়।" এই শ্লোকটি *মনুস্মৃতি*-তে ধর্মের মৌলিক গুরুত্বকে তুলে ধরে, যদিও এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে।

খ. অর্থশাস্ত্র: রাজনীতি ও কূটনীতির এক অনন্য গ্রন্থ

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক কৌশল নিয়ে এক বাস্তববাদী গ্রন্থ। এটি রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসন, রাজস্বনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক কৌশল সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনা প্রদান করে। রাজ্যের শাসক কেমন হওয়া উচিত, কীভাবে প্রশাসন ও অর্থনীতি পরিচালিত হবে, এবং পররাষ্ট্রনীতিতে কূটনীতি, যুদ্ধ ও গুপ্তচরবৃত্তির ভূমিকা কী—এসব বিষয় এতে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য *অর্থশাস্ত্র* রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং এটি আজও গবেষকদের কাছে প্রাসঙ্গিক। একটি উপযুক্ত উদ্ধৃতি হতে পারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে—

"সুখস্য মূলং ধর্মঃ, ধর্মস্য মূলম্ অর্থঃ, অর্থস্য মূলং রাজ্যং।"[19] *Sukhasyamūlaṃdharmaḥ, dharmasyamūlaṃarthaḥ, arthasyamūlaṃrājyaṃ.* **অর্থাৎ** *"সুখের মূল হলো ধর্ম, ধর্মের মূল হলো অর্থ, আর অর্থের মূল হলো রাষ্ট্র।"* এই উদ্ধৃতিটি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের মৌলিক বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে। এটি বোঝায় যে ন্যায় ও সুশাসনের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা, যা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

যদিও মনুস্মৃতি বিতর্কিত এবং এর বহু বিধান আজকের সমাজে অগ্রহণযোগ্য, তবুও এটি প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও আইনগত কাঠামো বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, অর্থশাস্ত্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দর্শনের এক অনন্য দলিল, যা আজও রাষ্ট্র পরিচালনার

---

[18] *মনুস্মৃতি* - ৮.১৫

[19] অর্থশাস্ত্র

ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করলে ভারতের সমৃদ্ধ ও জটিল ইতিহাস এবং এর রাজনৈতিক ও আইনগত চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়।

৫. বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক অগ্রগতি-

প্রাচীন ভারত শুধু আধ্যাত্মিক সাধক ও দার্শনিক চিন্তকদের জন্মভূমি ছিল না; এটি ছিল বিজ্ঞান ও গণিতের উদ্ভাবনের অন্যতম কেন্দ্র। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও বিদ্বানরা চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন, যা আজও বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

ক. চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ: সুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতা

আয়ুর্বেদ ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা প্রাচীন জ্ঞান ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর দুটি প্রধান গ্রন্থ **সুশ্রুত সংহিতা** ও **চরক সংহিতা** চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করেছে। **সুশ্রুত সংহিতা** শল্যচিকিৎসা (সার্জারি) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, যেখানে চোখের ছানি অপারেশন, প্লাস্টিক সার্জারি ও মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের উল্লেখ আছে। **চরক সংহিতা** অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা নিয়ে রচিত, যেখানে রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে **আয়ুর্বেদ** ভারতে এবং বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। আয়ুর্বেদের ভাষায় **“হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্যহিতাহিতম্। মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃ স উচ্যতে॥”**[20] **অর্থাৎ** য়ায যয়াতত জীবনের কল্যাণ ও অকল্যাণ, সুখ ও দুঃখ, এবং আয়ুর উপকারী ও অপকারী দিক ব্যাখ্যা করে, তাই আয়ুর্বেদ।

খ. গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান: আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত-

প্রাচীন ভারতের গণিতবিদরা *দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি* ও *শূন্যের ধারণার* বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। *আর্যভট্ট (৫ম শতাব্দী)* তাঁর *"আর্যভটীয়"* গ্রন্থে *পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান* নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি *সাইন টেবিলের হিসাব* প্রণয়ন করেন *এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের ধারণা* প্রথম দেন। যেমন **“न खं स्थिरं जायते न क्षितिः स्थिराद् भ्रमात्।”**[21]*(Aryabhata asserts that the Earth rotates on its own axis, countering the geocentric view.)*

ব্রহ্মগুপ্ত (৭ম শতাব্দী) তাঁর *"ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত"* গ্রন্থে *শূন্যকে পূর্ণসংখ্যা* হিসেবে উল্লেখ করেন এবং শূন্যের গাণিতিক কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেন। তিনি *দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের* সূত্র প্রদান করেন। তাদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার আধুনিক গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যথা -**“शून्यं संख्याविशेषः स्यात्। तत्खेन युक्तं खं भवति, खं हृतं खं भवति।”**[22] *(Brahmagupta describes zero as a number and defines its arithmetic operations.)*

প্রাচীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক অবদান হলো **দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও শূন্যের ধারণা।** দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি **স্থানীয় মান** ব্যবহার করে সংখ্যা প্রকাশ সহজ করে। **শূন্যের ধারণা,** যা প্রথমে বিন্দুর মাধ্যমে প্রকাশিত হতো, শুধুমাত্র "কিছু নেই" বোঝাত না, বরং উচ্চতর

---

[20] *চরক সংহিতা ১.৪১*

[21] आर्यभट्टस्य गणित-ज्योतिषसिद्धान्ताः

[22] ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः

গণিতের বিকাশেও ভূমিকা রেখেছিল। এই উদ্ভাবন ভারত থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং **আধুনিক গণিতের ভিত্তি** গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রাচীন ভারতে **বিজ্ঞান ও দর্শন** পৃথক ছিল না; অনেক বিজ্ঞানী একইসঙ্গে দার্শনিকও ছিলেন। **মহাবিশ্ব ও মানবদেহের অনুসন্ধান** শুধু জ্ঞানার্জনের নয়, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথও ছিল। **যোগ ও আয়ুর্বেদ** স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে একটি সমন্বিত দর্শন তৈরি করে। **নব্যন্যায় ও সাংখ্য দর্শন** যুক্তিবিদ্যা, গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

৬. ভাষাগত ও সাহিত্যিক বিকাশ

প্রাচীন ভারত ছিল ভাষা ও সাহিত্যচর্চার এক প্রাণবন্ত কেন্দ্র, যেখানে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যধারার বিকাশ ঘটেছিল। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষা ভাষাগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পাশাপাশি, কালিদাস ও তুলসীদাসের মতো সাহিত্যিক মহারথীরা ধ্রুপদী ও ভক্তিমূলক সাহিত্যসমৃদ্ধ করেছেন, আর তামিল সংঘম সাহিত্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির এক মূল্যবান জানালা খুলে দিয়েছে।

ক. সংস্কৃত: দেবভাষা ও বিদ্যাচর্চার মাধ্যম

সংস্কৃত, যা *"দেবভাষা"* নামে পরিচিত, প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান *ইন্দো-আর্য ভাষা*। এর ব্যাকরণ *পানিনি রচিত "অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থে* সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত। এটি *ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, বিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় সাহিত্যের* মূল ভাষা ছিল। *সংস্কৃতের প্রভাব* আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে সুদূরপ্রসারী, যেমন *হিন্দি, বাংলা, মারাঠি ও গুজরাটি*। সংস্কৃত থেকে বহু শব্দ ও ব্যাকরণিক গঠন গৃহীত হয়েছে। আজও এটি *ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পণ্ডিত মহলে* ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি উক্তি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে- আলংকারিক ভামহের মতে **"संस्कृतंनामदैवीवागन्वाख्यातामहर्षिभि:।"**[23] (Sanskrit is known as the divine language, as declared by sages.) তেমনি ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন - **"नास्तिसंस्कृतसमोभाषा।"**[24] (There is no language equal to Sanskrit.)

খ. প্রাকৃত: সাধারণ মানুষের ভাষা

প্রাকৃত ছিল একাধিক সংলগ্ন ভাষার একটি গোষ্ঠী, যা প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতের পাশাপাশি প্রচলিত ছিল।

- সংস্কৃত অপেক্ষা সহজবোধ্য হওয়ায় এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় ছিল।
- এটি বিভিন্ন জৈন গ্রন্থ ও নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- প্রাকৃত ভাষাগুলি আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ. পালি: বৌদ্ধধর্মের ভাষা

পালি ছিল মধ্য ইন্দো-আর্য ভাষার একটি শাখা, যা থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের মূল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নাগার্জুন মাধ্যমিক কারিকায় বলেছেন **"पालिभाषा बुद्धवचनस्य वहनीभूता।"**[25] *(Pali language became the carrier of Buddha's teachings.)*

- ত্রিপিটক নামে পরিচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত।

---

[23] *काव्यालङ्कार:*

[24] *सिद्धान्तकौमुदी*

[25] माध्यमिककारिका

- পালির প্রভাব ভারত ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কারণ এটি বৌদ্ধধর্মের প্রচারের সাথে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘ. তামিল সংঘম সাহিত্য: দ্রাবিড় সংস্কৃতির এক জানালা

সংগম সাহিত্য (Sangam Literature) প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এক অনন্য সংকলন, যা খ্রিস্টপূর্ব *প্রথম শতাব্দী থেকে ৩য় শতাব্দী* পর্যন্ত রচিত হয়। এটি তামিল সমাজ, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের অমূল্য দলিল। সংঘম সাহিত্যের দুটি প্রধান মহাকাব্য হলো *শিলাপ্পদিকারম,* যেখানে কোভালন ও কান্নাগীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। **"संगमकाव्येषु प्रेम, वीर्यं, प्रकृतेःसौन्दर्यं च निरूपितम्।"**[26] *(In Sangam poetry, love, valor, and the beauty of nature are depicted.)* **মণিমেকলাই,** যা বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এই সাহিত্য প্রেম, বীরত্ব ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের চিত্রায়নের জন্য প্রসিদ্ধ। সংঘম সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিচয় বহন করে।

ভারতের **ভাষা ও সাহিত্য** পারস্পরিক সংযোগ ও প্রভাবের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। **সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি** একে অপরকে প্রভাবিত করে আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিকাশে সহায়ক হয়েছে। **ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য, ভক্তিমূলক সাহিত্য ও সংঘম সাহিত্য** ভারতের **সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয়ে** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই **সাহিত্যিক ঐতিহ্য** আজও লেখক, শিল্পী ও চিন্তকদের অনুপ্রাণিত করছে এবং ভারতের সমৃদ্ধ **ভাষাগত ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার** বহন করে চলছে।

৭. সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য কেবল বিনোদন বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্যই ছিল না; এটি ছিল **সাংস্কৃতিক পরিচয়, নৈতিকতা ও সামাজিক বিধি-বিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ বাহক।** এই গ্রন্থগুলি মানুষের আচরণ গঠনে, মূল্যবোধ প্রচারে, এবং সমাজের কাঠামো নির্ধারণে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। আসুন দেখি কীভাবে এটি ঘটেছিল—

ক.সংস্কৃতির বন্ধন হিসেবে কাহিনিগুলি:

ভারতের *মহাকাব্য ও পুরাণ* একক গল্প ও নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলেছে। *রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ* বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক অভিন্ন ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই কাহিনিগুলো *বীরত্ব, খলনায়ক ও নৈতিক দ্বন্দ্ব* চিত্রিত করে। *আদর্শ চরিত্রের মধ্যে রামের ধর্মনিষ্ঠা, সীতার পতিব্রতা ও যুধিষ্ঠিরের সততা* অনুসরণের উপযুক্ত উদাহরণ। বিপরীতে, *রাবণের অহংকার ও দুর্যোধনের লোভ* সতর্কতামূলক শিক্ষা দেয়। এসব চরিত্র মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং আজও মূল্যবান শিক্ষা প্রদান করে। মহাভারতের এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ - **"धर्मेण विजयो नित्यं धर्मोमृत्योः परायणम्।"**[27] *(Victory is always with Dharma, and Dharma is the path beyond death.)*

[26] द्रविडसाहित्यपरिचयः

[27] (*Mahabharata, Udyoga Parva, 43.6*)

খ. গল্পের মধ্যে নৈতিকতার বুনন:
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে **ধর্ম** (Dharma) ছিল জীবনের মূলনীতি, যা **দায়িত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতা** নির্ধারণ করত। মহাকাব্যগুলোতে চরিত্রদের **সাংঘর্ষিক কর্তব্য** ও সিদ্ধান্তের জটিলতা তুলে ধরা হয়েছে। **কর্ম** (Karma) **ও প্রতিক্রিয়া** ধারণা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভালো-মন্দ কর্মের ফল ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। **মহাকাব্যগুলিতে নৈতিক দ্বন্দ্ব** চিত্রিত করে পাঠকদের **ন্যায়-অন্যায়** নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এসব কাহিনি মানুষের বাস্তব জীবনে **নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োগ** শেখায়, যা আজও জীবন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ. সামাজিক নিয়ম ও প্রত্যাশা:
প্রাচীন ভারতীয় সমাজে **বর্ণ** (Varna) **ও আশ্রম** (Ashrama) **ব্যবস্থা** প্রচলিত ছিল, যা সমাজের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রত্যাশিত আচরণ নির্ধারণ করত। **লিঙ্গভূমিকা** সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে—সীতা ভক্তি ও আনুগত্যের প্রতীক, দ্রৌপদী শক্তিশালী ও স্বাধীন নারীর প্রতিচ্ছবি। **পরিবার ও সমাজ** ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে **সহযোগিতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক দায়িত্ব** পালনকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। মনুস্মৃতি ও মহাকাব্যগুলিতে এই মূল্যবোধের চিত্র ফুটে উঠেছে, যা সমাজের আদর্শ ও নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল। উপনিষদের বাণী স্মরণীয় - “मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।"[28] *(Consider your mother as a goddess, your father as a god, and your teacher as a god.)*

ঘ. নীতিশিক্ষার গল্প ও উপদেশ:
পঞ্চতন্ত্র ও জাতক কাহিনি প্রাচীন ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ।

- **পঞ্চতন্ত্র:** জন্তু-জানোয়ারের চরিত্রের মাধ্যমে মানবীয় গুণ ও দোষ বোঝানো হয়েছে।
- **জাতক কাহিনি:** বুদ্ধের পূর্বজন্মের গল্প, যেখানে নৈতিকতা ও সঠিক আচরণের শিক্ষা রয়েছে।

এই কাহিনিগুলো সততা, দয়া, সাহস ও জ্ঞান ইত্যাদি মূল্যবোধ প্রচার করে, যা সর্বকালের জন্য প্রাসঙ্গিক। পঞ্চতন্ত্র ও জাতক কাহিনির বিশ্বব্যাপী প্রভাব গভীর, এবং এগুলোকে এজপের গল্প ও অন্যান্য নীতিশিক্ষামূলক কাহিনির পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি **মানুষের বিশ্বদৃষ্টি, সম্পর্ক ও নৈতিক কাঠামো** গঠনে সহায়ক ছিল। এই কাহিনিগুলো **পুনরায় বলা, ব্যাখ্যা করা ও বিভিন্ন মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে,** যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে।

৮. অন্যান্য সভ্যতার ওপর প্রভাব

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে, বহু সভ্যতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাণিজ্য পথ, ধর্মীয় মিশন এবং বিদ্বৎ সমাজের আদান-প্রদান এর মাধ্যমে ভারতের ধারণা, গল্প ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পারস্য, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এমনকি

[28] *Taittiriya Upanishad, 1.11.2*

ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। এই সাংস্কৃতিক বিস্তার বিভিন্ন অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে অবদান রেখেছে, যা চিন্তার বিনিময়ের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

ক. বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার: এক সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন

বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি সিল্ক রোডসহ বিভিন্ন বাণিজ্য পথের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্ম, পুনর্জন্ম ও মোক্ষের ধারণা বিশ্বে প্রসারিত হয়।

- **চীন:** খ্রিস্টীয় ১ম শতকে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করে এবং চ্যান (Zen) বৌদ্ধধর্মের জন্ম দেয়। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং ভারতে এসে বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।
- **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া:** বৌদ্ধধর্ম থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও কম্বোডিয়ায় বিস্তার লাভ করে। অঙ্গকোর ওয়াট ও বোরোবুদুর মন্দিরে এর শিল্প ও স্থাপত্যগত প্রভাব দেখা যায়।
- **মধ্য এশিয়া ও ইউরোপ:** বৌদ্ধধর্ম তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র বৌদ্ধধারার বিকাশ ঘটে।

খ. অন্যান্য সাহিত্যকর্মের বিস্তার

ভারতীয় সাহিত্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

- **পারস্য:** পঞ্চতন্ত্রের নীতিগল্প পার্সি ও আরবি ভাষায় অনূদিত হয়, যা পরে ইউরোপেও জনপ্রিয় হয়।
- **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া:** রামায়ণ ও মহাভারত থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মায়ানমারের সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।
- **ইউরোপ:** ঔপনিবেশিক যুগে সংস্কৃত সাহিত্য অনূদিত হলে শোপেন হাওয়ার ও এমার সনের মতো দার্শনিকগণ প্রভাবিত হন।

এই সাহিত্য বিশ্বব্যাপী দর্শন, নীতিশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে চিন্তার সংযোগ সৃষ্টি করেছে এবং জ্ঞান বিনিময়ের পথ উন্মুক্ত করেছে। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্ববুদ্ধির বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছে। আজও এসব অবদান বিশ্বজুড়ে মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিশ্ব সভ্যতার এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে চিরকাল টিকে থাকবে।

উপসংহার-

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য মানব মেধা ও সৃজনশীলতার এক বিরাট অর্জন, যা ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে এর প্রভাব কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব ঐতিহ্যের অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসুন, এই উপসংহারটিকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করি—

ক. জ্ঞানের এক অনন্য উত্তরাধিকার

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য মানব চিন্তার বহুমাত্রিক দিক উন্মোচন করে। উপনিষদের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব থেকে শুরু করে সুশ্রুত সংহিতার বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা, রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যিক কাহিনি থেকে কালিদাসের কবিত্বশক্তি— এসব রচনা মানব জীবন, বাস্তবতার প্রকৃতি ও জ্ঞানের সাধনার ওপর গভীর আলোকপাত করে। এ সকল সাহিত্য অস্তিত্বের রহস্য,

নৈতিকতা ও জীবনের অর্থ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে এবং বহু প্রজন্মের জন্য দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছে।

খ. ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনে ভূমিকা

এই সাহিত্য ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছে। এ সকল গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনি, চরিত্র ও দার্শনিক ধারণাগুলো ভারতীয় মানসিকতায় গভীরভাবে প্রোথিত, যা শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়। এগুলো ভারতের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্ম, কর্ম, অহিংসা, সহনশীলতা ইত্যাদি মূল্যবোধের প্রচার করেছে, যা আজও ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করে।

গ. বিশ্বব্যাপী প্রভাব

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব কেবল ভারতে সীমিত নয়, এটি পারস্য, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

- বৌদ্ধধর্ম ও তার নীতিশিক্ষা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে চিন্তার বিনিময় ঘটিয়েছে।
- ভারতীয় বিজ্ঞান ও গণিত, বিশেষত দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও শূন্যের ধারণা বিশ্বের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।
- পঞ্চতন্ত্রের নীতিকথা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বব্যাপী কাহিনির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ঘ. বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিশ্ব ঐতিহ্যের অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থগুলো শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়; এগুলো মানব অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা ও জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই সাহিত্য জাতীয় সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্ব মানবতার অংশ হয়ে উঠেছে। ফলে, এগুলোর সংরক্ষণ ও অধ্যয়ন মানব চিন্তার ইতিহাস বুঝতে এবং অতীতের জ্ঞান থেকে অনুপ্রেরণা নিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ. আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিকতা

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য আজও প্রাসঙ্গিক ও অনুপ্রেরণার উৎস।

- মহাকাব্যের নৈতিক দ্বন্দ্ব আমাদের সমাজে চলমান নৈতিক ও মূল্যবোধের চ্যালেঞ্জ বোঝার জন্য দিক নির্দেশনা দেয়।
- উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব আধুনিক জীবনের জটিলতাকে বোঝার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে।
- অর্থশাস্ত্রের বাস্তবিক জ্ঞান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য এখনও উপযোগী।

চ. এক জীবন্ত ঐতিহ্য

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য শুধু অতীতের গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ নয়, এটি এক জীবন্ত ঐতিহ্য, যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে ও নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করছে।

- এই গল্পগুলো নতুনভাবে বলা হচ্ছে, পুনঃব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং আধুনিক রূপে উপস্থাপিত হচ্ছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে।
- গবেষকরা এই সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করছেন, যা নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধির পথ উন্মুক্ত করছে।

- শিল্পী, লেখক ও চিন্তাবিদরা এগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও দর্শন সৃষ্টি করছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য একটি মূল্যবান জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা ভারতের অতীতকে গঠন করেছে, বর্তমানকে প্রভাবিত করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান শিক্ষা প্রদান করছে। এর বিশ্বব্যাপী প্রভাব ও বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি এর সার্বজনীন গুরুত্বকে তুলে ধরে। এই সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চার মাধ্যমে আমরা ভারতের সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে সংযুক্ত হতে পারি এবং নিজেদের ও বিশ্বকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারি।

গ্রন্থসূচী-

১. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ১৯২২, *A History of Indian Philosophy*, Oxford University Press

২. রাধাকৃষ্ণান, সর্বপল্লী, ১৯৪৮, *The Bhagavad Gita: With an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes*, Harper & Brothers

৩. **সিংহ, কালীপ্রসন্ন**। (১৮৬৬). *শ্রীমদ্ মহাভারত (বাংলা অনুবাদ)।* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। (পুনর্মুদ্রিত বিভিন্ন সময়ে)।

৪. **शिवानन्द, स्वामी.** (1954). *दशोपनिषदः*. डिवाइनलाइफसोसाइटी, हृषीकेश।

৫. **Bhikkhu Bodhi.** (2000). *The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the SaṁyuttaNikāya.* Boston: Wisdom Publications.

৬. उमास्वामी. (अ.श.).*तत्त्वार्थसूत्रम्*. संपादक: सुखलालसंघवी। भारतीयविद्याभवन, 1939।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *তপোবন*। **রবীন্দ্র রচনাবলী**, বিশ্বভারতী প্রকাশন।

৮. Bhattacharya, Haridas Siddhantabagish. *Mahabharata* (Bengali Translation and Commentary). 43 vols., Bishwabani, 1931–1939.

৯. Vivekananda, Swami. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* 9 vols., Advaita Ashrama, 1984.

১০. *মনুসংহিতা (মনুস্মৃতি).* অনুবাদ: হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, নবভারত পাবলিকেশন, ১৯৮৫।

১১. **কৌটিল্য.** *অর্থশাস্ত্র.* অনুবাদ: রাধাগোবিন্দ বসু, কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৯২।

১২. **রায়, প্রবোধচন্দ্র.** *চরক সংহিতা (বাংলা ভাষ্যসহ ব্যাখ্যা).* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫।

১৩. सारमा, के. वि. *आर्यभट्टस्यगणित-ज्योतिषसिद्धान्ताः*. भारतीयराष्ट्रीयविज्ञानअकादमी, 2001.

১৪. ब्रह्मगुप्तः.*ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तः*. संपादकः के.एस. शुक्लः, भारतीयविज्ञानअकादमी, 1985.

১৫. नागार्जुनः.*माध्यमककारिका*. संपादकः के. वि. सारमा, भारतीयराष्ट्रीयविज्ञानअकादमी, 2002.

১৬. रामचन्द्रन, टी. एन.*द्रविडसाहित्यपरिचयः*. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, 2010।

শম্ভু মিত্রের "ঘূর্ণি" নাটক সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল

অর্জুন কুমার কর
স্টেট এডেড কলেজ টিচার-১, বাংলা বিভাগ
করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ, করিমপুর, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: শম্ভু মিত্র ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে 'আওয়ার ইন্ডিয়া' নামক হিন্দি সিনেমার কাজের জন্য সস্ত্রীক মুম্বাইয়ে অবস্থান করছিলেন। সে সময় মুম্বাইয়ের নির্জন হোটেলে বসে তিনি এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। নাটকটি তিনটি অঙ্কে রচিত। নাটকটির কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেবেন্দ্র মুখুজ্জের পরিবার। এই পরিবারে দেবেনবাবু ছাড়াও আছেন তার রুগ্ন স্ত্রী বীনাদেবী। তাদের একমাত্র পুত্রের নাম প্রণব। প্রণব ছাড়াও দেবেনবাবু আরো দুই কন্যা সন্তানের জনক। তারা হলো খুকু ও সুমি। দেবেনবাবুর প্রকাশনার ব্যবসা। সেই ব্যবসায় অসততা ও আধুনিক পন্থা আনয়ন করতে না পারার কারণে চলছে মন্দা। এইরকম পরিস্থিতিতে সুযোগ বুঝে দেবেনবাবুর শ্যালক অবিনাশ তার ব্যবসা নিজের কব্জায় নিয়ে ফেলেছে। খুকু বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বিকাশকে ভালোবাসে। অন্যদিকে সুমি অনুরক্ত সমীরের প্রতি। খুকু ও সুমি কেউই প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠ নয়। আসলে সেই সময়ের পচা গলা দিকটিকে নাট্যকার নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

খুকু বিকাশের অনুগামিনী হয়েও দেখেছে বিকাশ পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তখন সে এক আদিবাসী যুবকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জড়িয়ে পড়ে। সেই সূত্রে তার গর্ভে জন্ম নেয় সেই আদিবাসীর ঔরসজাত সন্তান। এইরকম একটা সময়ে খুকুর সঙ্গে দেখা হয় তার পূর্ব প্রেমিক বিকাশের সঙ্গে। বিকাশ আজও খুকুকে সেই আগের মত ভালবাসে। কিন্তু খুকুর নোংরামিতে সে ব্যথিত হয়। উদার হৃদয় বিকাশ চায় খুকু তার গর্ভস্থ সন্তানকে তুলে দিক তার হাতে। এক কথায় নাটকের বিষয়বস্তু হলো সমাজের পাপ এবং ব্যাধি। শম্ভু মিত্রের 'ঘূর্ণি' নাটকটি কেবল একটি নাটক নয়, এটি সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি এবং মানব সম্পর্কের জটিলতার এক গভীর বিশ্লেষণ।

সূচক শব্দ: ছিন্নমূল, পাপ, পঙ্কিল, বামপন্থী, তেভাগা, আন্দোলন, ঔরসজাত, পরাবাস্তববাদী মন্বন্তর, বাস্তববাদ, নির্দেশনা, দাঙ্গা।

মূল আলোচনা :

পাপ-পুন্যের ভাবনা, সৎ-অসৎ ভাবনা কিংবা আমরা-আমিত্বের মিশ্রন জটিলতা শম্ভু মিত্রকে তখনও গণনাট্য সংঘের ভাবনা চিন্তা থেকে স্বতন্ত্র করে তোলেনি। কিন্তু ১৯৫০ খ্রী: লেখা 'ঘূর্ণি' নাটক থেকে তাঁর চিন্তা-ভাবনা-চেতনার একটা বদল আসতে শুরু করে 'পথিক' প্রযোজনার মধ্যদিয়ে তাঁর নবগঠিত নাট্য সংস্থা 'বহুরূপী' স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। এই সময় (১৯৪৯ স্ত্রী:) শম্ভু মিত্র সস্ত্রীক গিয়ে ছিলেন 'আওয়ার ইন্ডিয়া" নামক হিন্দী সিনেমার কাজে মুম্বাইয়ে সেই সময় তিনি নির্জন হোটেলের ঘরে বসে লিখে ফেললেন 'ঘূর্ণি' নাটকটি। অর্থাৎ নাটকটি তিনি রচনা করেন ১৯৫০ খ্রী:। গোড়ার দিকে মুম্বাইয়ের নির্জন হোটেলে বসে। মুম্বাইয়ে তাঁকে তিন মাস অধিষ্ঠান করতে হয়েছিল। নাটকটি বহুরূপীর সাহিত্য পত্রিকার ২৩ সংখ্যায় মুদ্রিত করবার সময় বেশ কিছু কাট ছাঁট করেছিলেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ঘূর্ণি' নাটকটি প্রকাশিত

হয়েছিল। এই নাটকটি প্রযোজনা করার কথা তাঁর মাথায় ছিল, কিন্তু মঞ্চগত প্রয়োগ কৌশলটি তিনি ধরতে পারছিলেন না। উপরন্তু কলকাতায় ফিরে 'চার অধ্যায়' অভিনয়ের ব্যবস্থায় নাটকটি আর অভিনীত হতে পারেনি। নাটকটি অভিনয় হয়নি বটে কিন্তু নাটকটির নাট্যরূপান্তর বারবার বদল করেছেন তিনি। 'উলুখাগড়া' নাটকের মতই এই নাটকটিও তিন অঙ্কে রচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, নাটকটির প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য বর্তমান। এই দৃশ্য বিভাগটি তিনি করেছিলেন দৃশ্যান্তর স্থানান্তর বোঝানোর জন্য নয়, সময়ান্তর বোঝাবার জন্য। প্রথম অঙ্কটি দৃশ্যস্থল দেবেন্দ্র মুখার্জীর বাইরের ঘর, দ্বিতীয় অঙ্ক পার্ক। তারই মধ্যে বিকাশ এবং অবিনাশের আলাদা আলাদা ঘরের ছবি হয়ে আবার পার্কে চলে আসে দৃশ্য। তৃতীয় অঙ্ক শহর থেকে দূরে এক পুরানো নবাবী আমলের বাড়ি। আগের দুটি নাটকের মত দৃশ্যস্থল একটি মাত্র নয়। অনেকটা যেন 'চার অধ্যায়' নাটকের প্রযোজনার ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। নাটকটি পড়তে পড়তে আঙ্গিক বিন্যাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় চাঁদ বণিকের পালা'র আভাস।

'ঘূর্ণি' নাটকটি শুরু হয়েছে ১৯৪৯-১৯৫০ খ্রী: কোনও এক রবিবারের সকাল দিয়ে। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেবেন্দ্র মুখুজ্যের পরিবার। এই পরিবারে দেবেনবাবু ছাড়াও আছেন—তাঁর রুগ্ন স্ত্রী বীণাদেবী। দেবেনবাবু ও বীণাদেবীর একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম প্রণব। প্রণব ছাড়াও দেবেনবাবু আরো দুই কন্যা সন্তানের জনক। তারা হল খুকু ও সুমি। দেবেন মুখুজ্যের প্রকাশনার ব্যবসা। সেই ব্যবসায় অসততা ও আধুনিক পন্থা আনয়ন করতে না পারার কারণে ব্যবসায় চলছে মন্দা। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে সুযোগ বুঝে দেবেনবাবুর শ্যালক অবিনাশ তাঁর ব্যবসাকে নিজের কব্জায় নিয়ে ফেলেছে। দেবেনবাবু সৎ নিতান্ত প্রগতিশীল আদর্শবাদী বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন যুবক বিকাশের বই প্রকাশ করতে আগ্রহী। কিন্তু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন অবিনাশ সে বই প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। কেননা তাঁর মনে হয় এই বইয়ের বিষয়বস্তু সেভাবে বাজারে কাটবে না। সে নারী পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক মূলক বই ছাপতে আগ্রহী। আবার এই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন যুবকের প্রতি দেবেনবাবুর কন্যা খুকু প্রেমাসক্ত। এবিষয়ে বাবা দেবেন মুখুজ্যের আপত্তি না থাকলেও অবিনাশ সেই সম্পর্ককে সমর্থন করে না। অন্যদিকে আবার দেবেনবাবুর ছোট মেয়ে সুমি অনুরক্ত সমীরের প্রতি। সমীর স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান সে একুশখানি বাড়ির মালিক আবার ক্লাসিক্যাল গানের ভক্ত। কিন্তু খুকু ও সুমি কেউ প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠ নয়। আসলে সেই সময়ে সমাজের পচাগলা দিকটি নাট্যকার নাটকটির মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয় কিভাবে মানব মনকে গ্রাস করেছিল এই নাটকের চরিত্রগুলিই তার প্রমান বহন করে। তাইতো অবিনাশ শ্যালক হলেও জামাইবাবুর সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে এক মুহূর্তও বিচলিত নয়। অবিশ্বাস মানব চরিত্রগুলিকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। তাই তো খুকু ও সুমি কেউই বিকাশ বা সমীর কাউকে পুরোপুরি মন দিতে পারেনি। খুকু বিকাশের অনুরাগিনী হয়েও দেখেছে বিকাশ পুরুষ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিকাশ বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আদর্শহীন ভোগবাদী পঙ্গু সমাজের পচাগলা পরিবেশকে দূর করে সেখানে আনতে চায় শোষনহীন শ্রেণীহীন সমাজ। বিকাশ হতাশ চোখে দেখেছে তৎকালীন যুবকেরা ভবিষ্যৎ জীবনের ঘূর্ণিপাকে বন্দী। অসহায় দরিদ্র শিক্ষক তার মেয়েকে পর পুরুষের দিকে লেলিয়ে দিচ্ছেন। বিকাশ অবশেষে তেভাগা আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য কৃষি বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়ে। সে দেখাতে চায়, কাপুরুষ বা ক্লীব সে নয় ।

এদিকে খুকু একদিন সমীরের সঙ্গে পালিয়ে আশ্রয় নেয় দূর পাড়াগাঁয়ে আদিবাসীদের মধ্যে। সেখানে গিয়ে খুকু ঘনিষ্ঠ হয় এক আদিবাসী যুবকের সঙ্গে। এই অবৈধ সম্পর্ক

জানাজানি হয়ে গেলে খুকু সমীরকে তাদের দুজনের মধ্যে থেকে সরিয়ে দিতে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে সমীরকে। আদিবাসী যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে খুকুর গর্ভে জন্ম নেয় সেই আদিবাসীর ঔরসজাত সন্তান। এরকম একটা সময়ে খুকুর সঙ্গে দেখা হয় তার পূর্ব প্রেমিক বিকাশের। বিকাশ আজও খুকুকে সেই আগের মতই ভালোবাসে। কিন্তু খুকুর এই নোংরারামিতে সে ব্যথিত হয় তার হৃদয়। বিকাশ চায় খুকু তার গর্ভস্থ সন্তানকে তুলে দিক তার হাতে।

শম্ভু মিত্র যে কত গভীরভাবে সমাজ বিশ্লেষণে নেমে এক বঞ্চিত মুক্তির ইশারায় উচ্ছ্বল, তা নাটকটি পাঠ করলে জানা যায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাকেই শোষণমুক্তি সম্ভব। এই বিশ্বাসে নাট্যকার স্থির। 'ঘূর্ণি' নাটক যখন তিনি রচনা করেন, তখন তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু সমাজ বদলের ডাক তিনি অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। এই নাটকের নায়কের নাম কেন বিকাশ রাখা হয় তা বুঝতে পাঠকের দেরী হয় না।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে শম্ভু মিত্র 'ল্যাবরেটরী', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। নাট্যকর্মী হিসাবে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা শম্ভু মিত্র স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে ‘ঘূর্ণি’ নাটক রচনায় স্বাভাবিক। ‘উলুখাগড়া’ ও ‘ঘূর্ণি’—এই দুটি নাটক শম্ভু মিত্র রচনা করেন তাঁর নাট্যকার জীবনের প্রারম্ভে। সেই জন্য এই দুটি নাটকের সংকলনকে তিনি ‘প্রারম্ভিক' নামকরণ করেন।

একটা দৃশ্য নাটকে মানুষের বিক্রি হয়ে যাওয়ার যে গল্প ছিল, তার আরও বিস্তারিত ও জটিল হয়েছে ঘূর্ণিতে এসে। নাটকও শুরু হয় বিক্রয়ের গল্প নিয়ে। দেবেনবাবুর প্রেস বিক্রি হয়ে যাওয়ার গল্প। আগের দুটি নাটকের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটা জায়গা ছিল। বিনোদ দেবব্রতকে চিহ্নিত করেছিল। নোংরামি দিয়ে ইতিহাসের সুতো পাকিয়ে চলার মানুষ হিসাবে যার মধ্যে ছিল না কোনও প্রতিবিধানের পথ। সুরেশ অবশ্য বিনোদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে তার মতো করে প্রতিবিধানের একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। পথ দেখিয়েছিল ‘একটা দৃশ্য’-র নগেনও তার মতো করে। ইতিহাসের ভূমিকা তখনও তত জটিল নয় বলে দেবব্রতর প্রতিপক্ষে কোনও মূল্যবোধের ইতিহাস ছিল না। কিন্তু বিভ্রান্তি ছিল বিনোদের মধ্যে। সেই বিভ্রান্তি অনেক পরিণত আকারে দেখা যায় ‘একটা দৃশ্য -র বাবার মধ্যে, তার উল্টোদিকে ভাই সাধন ও শ্রীশবাবুদের দৌলতে চোরাকারবারে যুক্ত হয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিল—ওসব অনেক কথা আছে ওর মধ্যে ওসব পলিটিক্সের কথা। পলিটিক্স্ পরিভাষাটিতেই শম্ভু মিত্র বারবার নিজের আপত্তির কথা জানিয়ে দেন। বিনোদের উত্তরে নিনার জবাবে যে তার কথা অবস্থা বিশেষ পাল্টে যায় তাঁর কারণ যে পলিটিক্যাল নেতা হওয়ার সাধনা করে। ‘একটা দৃশ্য’-র দাদা নিতান্তই সাধারণ লোক তাই সে পলিটিকস্ জানে না, জানতে চায় না। তার পক্ষে প্রতিবিধানের পথ বার করে নেওয়া অসম্ভব হয় না। কিন্তু ঘূর্ণি-তে পৌঁছে সময় আরও অনেক জটিল হয়েছে, তাই এ নাটকের নায়ক বিকাশ, বিনোদ-সুরেশ-নগেন সবার থেকে স্বতন্ত্র। খুকুর প্রতি স্নেহ প্রবন মামা অবিনাশ তার ভগ্নিপতির ব্যবসা কিনে নিয়ে প্রথমেই পলিটিকসের সেই সুযোগসন্ধানী মূর্তিটি চিনিয়ে দেয়। কিন্তু এ টুকুই নাটকের সব নয়। এই বিরোধ ইতিবৃত্তকে ঘিরে প্রথম অঙ্কে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে এক অন্ধকারের জগৎ। দেবেনবাবুর ছেলে প্রনব বিক্রি করতে চায় নিজেকে সময়ের চাহিদা মেটাতে, তার বড় বোন খুকু বিকাশকে ভালোবেসেও সমীরকে প্রলুব্ধ করতে থাকে নিজের মুক্তি খোঁজার আশায়। সময় যে ভাঙ্গন নিয়ে আসছে। তা সহ্য করতে পারে না দেবেনের স্ত্রী বীণা, মারা যায় প্রথম অঙ্কেই। জৈবিক এই মৃত্যুর পাশাপাশি আরও অনেকগুলি মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সুমি সমীর, খুকু বিকাশের সম্পর্কের মৃত্যু। উলুখাগড়া’-য় প্রেম মূল পাত্র-

পাত্রীর মধ্যে একটা অসমতা নিয়ে এসেছিল। সুরেশ ও মিনতির সম্পর্কে সেখানে যে জটিলতা আসতে পারত, তা যেন চলে এসেছে 'ঘূর্ণি'-র খুকু বিকাশের মধ্যে। বিকাশ অবশ্য এখানে একা নয়, তার সঙ্গে আছে সুমি, আর একজন রাজনৈতিক কর্মী। সুমিকে রাজনৈতিক বোধে দীক্ষিত করেছে বিকাশই, তবু জীনের বিচিত্র নিয়মে তারা দুজনেই ভালোবাসে বিপরীত মেরুর দুই যুবক-যুবতীকে। শঙ্খ ঘোষ সম্ভবত কিছুটা অনবধানবশত নাটকের পলিটিক্স বিমূর্খতার সঙ্গে সমীকরণ করেছেন প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শেষে সুমির প্রতি সমীরের আক্রমণকে। তার গানের ছাত্রী এবং প্রণয়িনী সুমি রাজনীতি করলেও কিন্তু আমরা দেখি চরিত্র মার খেয়েছে সমীরের কাছ থেকে প্রেমের বিমুখতা এবং খুকুর প্রবঞ্চনায়। বিকাশও তাকে ঠিক বোঝে বলে মনে হয়না, সুমির frustration-এর উৎস politic understanding-এর অভাব জনিত বলে মনে হয় তার।

কিন্তু frustration-এ নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে ব্যাপক। তাই প্রথম দৃশ্যেই খুকুর অস্থির আবেগ 'শুধু অকারণ পুলকে' কবিতা থেকে পৌঁছে যায় 'রাত্রি অন্ধকার মৃত দানবের অক্ষিকোটে'র মতোর লাইনে। 'উলুখাগড়া' থেকেই শম্ভু মিত্র চরিত্রের নামকরণের একটি প্রতীকী আভাস রাখেন। যেমন বিনোদ করুণা মিনতি। 'ঘূর্ণি'-তে তা আরও জোরালো 'খুকু'-র মধ্যে যে ছেলেমানুষি আছে, তাতে অবিনাশ ব্যবসাদারী ক্ষমতার আভাস পান। অবিনাশ তো সত্যই সমাজের অবিনশ্বর। নিরাপত্তালোভী রোমান্টিক মধ্যবিত্তকে চিনে নিতে তার ভুল হয় না। কোনরকম রাজনৈতিক মতাদর্শবিহীন খুকু কেবল মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বড়লোকের ছেড়ে সমীরকে ভুলিয়ে পালিয়ে যায় সারিন্দা গ্রামে। রোমান্টিকতার টানেই আদিবাসী যুবক কুরলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। উদভ্রান্তের মতো খোঁজে তার স্বপ্নের পুরুষকে। সে ঘটনার পরিনামে খুকু সমীরকে খুন করে বসে।

গ্রাম থেকে আসা ছিন্নমূল মাস্টার তারিণী ছাত্রদের বুনো রামনাথ, বিদ্যাসাগর, মহুসীনের 'প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিং'-এর বাণী শোনানোর ইতিহাসকে নিজেই ব্যঙ্গ করে, পথ থেকে খদ্দের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের সতীত্ব বিক্রি করে—'একটা দৃশ্য'-র বাবার মতো। হারিয়ে যায় প্রনব- সুমির প্রেম। দেবেন তার বংশগত ইতিহাসের রূপান্তর স্মরণ করে অনড় দুঃখ অনুভব করে। একমাত্র জেগে থাকে বিকাশ তার রাজনীতিবোধ নিয়ে, তার সংঘচেতনা নিয়ে। চাঁদ বণিকের পালা'-তে আমরা দুই প্রজন্মের জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের প্রভেদের মধ্য দিয়ে যে সংঘাত দেখতে পাব, সে সংঘাত 'ঘূর্ণি-তে নেই বটে, কিন্তু প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেবেন আর বিকাশের ইতিহাসবোধের মধ্যে একটা তফাৎ দেখতে পাওয়া যায়। দেবেনের বংশের ইতিহাসকে বিকাশ দেখে মার্ক্সীয় চোখে, দেবেন দেখে মানবিক দৃষ্টিতে জীবনের নীতি নির্ধারণের প্রবেশ।

দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে বিকাশের মনে প্রশ্নের শুরু হয়ে গিয়েছে। শতকরা নব্বইজন বামপন্থীর সাম্যবাদ নিয়ে প্রশ্ন। বৃষ্টিভেজা পার্কের রাতে অন্ধকার যেন ছেয়ে আসে নাট্যকাহিনিতে। তারিণীর মেয়ে বিক্রির পাশাপাশি ফ্ল্যাশব্যাকে আমরা দেখি বিকাশের অসহায় বোন বাণীর আত্মহত্যা, '৪৬-এর দাঙ্গায় গরীব ডিমওয়াকে বাঁচাতে গিয়ে দাঙ্গাবাজদের হাতে মার খাচ্ছে বিকাশ, তাদেরই একজনের কাছে আত্মসম্মান খুইয়ে তার বোন আত্মহত্যা করছে, কিছুই করার থাকছে না বিকাশের। খোলা এই পার্ক হয়ে যায় টুকরো টুকরো দৃশ্যের কোলাজ। খুকুর জালে সমীরের জড়িয়ে যাওয়া, তাদের ঘিরে অবিনাশের জাল বিস্তার, দেবেন-তারিণীর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, ভ্রষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে আত্মবিশ্লেষণ। তবুও বিকাশের মন থেকে বিপ্লবের

আশা মুছে যায়নি, দিশাহীনতার মধ্যে বসে সে-ও ইতিহাস বিচার করে। দেবেন বা তারিণীর মতো ভালোবাসাহীন হতাশ মন নিয়ে সভ্যতার অসুখ বিচার করে না, মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির কথা ভাবে না, পৃথিবীর থেকে সে বাঁচার মন্ত্র নেয়, মানুষের ক্ষুদ্রতার শিক্ষা নেয়, আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঁচার আশা খোঁজে সে। দৃশ্য শেষ হয় বাড়ির আওয়াজে, কেননা সংক্রান্তির এই কালের মৃত্যু ঘোষণা করেছে তারিণী—অতীত ও ভবিষ্যতে যার কোনও বিশ্বাস নেই। কিন্তু বিকাশ সংক্রান্তিকালের সার্থকতা খুঁজে নিতে চায় বর্তমানের নিরিখে। তার বিপ্লবের পথ হয়তো দলগতভাবে সরলীকরণে ভেসে গেছে, তবু দেবেনের সেই নানাবিধ সমস্যার সূত্র ধরেই ব্যক্তিগত দুঃখ ঝেড়ে ফেলে ভবিষ্যতের বিপ্লবের অপেক্ষা করে বিকাশ।

তৃতীয় অঙ্কে এই দুই স্তরের মধ্যে সমতাবিধান করেন শম্ভু মিত্র। ব্যক্তিস্তর এবং সংঘস্তরের বিপ্লবকে মিলিয়ে দেন তিনি। ‘বিকাশ’-ও এ নাটকের এক প্রতীকী নাম। তেভাগা আন্দোলনে কৃষকের সবল প্রতিবাদে যে মধ্যবিত্তের বিপ্লব ভেসে গিয়েছিল, বিকাশ যেন সেই বিচ্ছিন্ন সূত্র জোড়া লাগায়। বিকাশ এখন অন্ধ। চাষিদের হয়ে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সে চোখ খুইয়েছে। আবার তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে খুকুর পাপের ভারা পূর্ণ হতে দেখেও। সে- ই পথ দেখিয়েছ তারিণীকে, দেবেনের ব্যক্তিগত সার্থকতার বোধকে সে কাজে রূপ দিয়েছে, তার আদর্শ ও ইতিহাসবোধ দিয়ে চারপাশ পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতে চেয়েছে, নিজের মধ্যবিত্ততার আত্মদ্বন্দ্ব খসিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। সমস্ত পাপের অবসান ঘটিয়ে তার একান্ত ভালোবাসার খুকুর নষ্ট জীবনকেও সার্থক করতে তার গর্ভের অবৈধ সন্তানকে স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে, কিন্তু যথার্থ মানবসন্তান, কুর্‌লার ঔরসজাত শিশুকে মানুষ করার ব্যাকুলতায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এইভাবে শম্ভু মিত্রের অভিজ্ঞতা, তাঁর রাজনীতিবোধ পৌঁছতে চেয়েছে অসমাপ্ত বিপ্লবের পুনর্গঠনের কাজে। এই নাটকের যে অভিনয়রূপ তিনি ভেবেছিলেন, জুন ১৯৯৬-তে পুনঃপ্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকায় তার অভিনেত্রী নির্বাচনের সে ভাবনাটিও জনিয়েছেন। তাতে বিকাশ চরিত্রে কাকে নির্বাচন করেছিলেন তার উল্লেখ না থাকলেও সন্দেহ নেই, নাটকটি মঞ্চস্থ হলে তিনিই এই চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১) অজিত কুমার ঘোষ : ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’ দে’জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ; কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ (১৪১১ বঙ্গাব্দ)

২) আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস’ দ্বিতীয় খন্ড – এ. মুখার্জি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬২ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৩) শাঁওলী মিত্র (সম্পাদনা) : শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র – ‘আনন্দ পাবলিশার্স’, প্রথম সংস্করণ- ২০১৪

৪) শাঁওলী মিত্র (সম্পাদনা) : ‘শম্ভু মিত্র ধ্যানে ও অর্ন্তধ্যানে’- নান্দনিক, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১) জগন্নাথ ঘোষ : ‘শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা’ দেশ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।

২) দিলীপ ঘোষ : ‘শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী’ - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ (১৪০৫ বঙ্গাব্দ)

৩) দেবতোষ ঘোষ : ‘শম্ভু মিত্র শ্রীচরণেষু’ আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ২০১৫ খ্রীঃ

৪) রথীন চক্রবর্তী : ‘থিয়েটারের শম্ভু মিত্র’ প্রকাশক- নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেলা ২০১৪

৫) শম্ভু মিত্র : নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা, প্রথম প্রকাশকাল বইমেলা জানুয়ারি, ২০১৫

৬) শাঁওলি মিত্র : শম্ভু মিত্র : 'বিচিত্র জীবন পরিক্রমা' - ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া- প্রথম প্রকাশ ২০১০
৭) শোভন গুপ্ত : 'শম্ভু মিত্র অন্য সন্ধান'- প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১২

পত্রপত্রিকা :

১) সম্পাদক : রথীন চক্রবর্তী, নাট্য চিন্তা : 'শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষ প্রকাশ - (২০১৪ জানুয়ারি- এপ্রিল ২০১৫) বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১ - ৬
২) নাট্য আকাদেমি পত্রিকা : শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা - ১৭ । প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ২০১৬ (আশ্বিন ১৪২৩)
৩) নাট্য আকাদেমি পত্রিকা -৬, স্বাধীনতা উত্তর বাংলা থিয়েটার সংখ্যা- ৯৯
৪) নাট্যচিন্তা, শম্ভু মিত্র সংখ্যা, মে, ১৯৯৭ অক্টোবর
৫) পশ্চিমবঙ্গ স্মরণ সংখ্যা : পশ্চিমবঙ্গ, প্রকাশ- ২০০০।

রাগের ভিন্নতা ও শ্রোতার অভিজ্ঞতা : হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ঋতু মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সঙ্গীত বিভাগ
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

সারসংক্ষেপ: হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত বহু শতাব্দীর ইতিহাস সমৃদ্ধ এক ধারাবাহিক শিল্পচর্চা। এ ধারায় রাগ হলো সংগীতের আত্মা। প্রতিটি রাগ এক একটি আবেগ, এক একটি মুহূর্ত, এক একটি অনুভূতির ভাষা। কিন্তু রাগের এই বিশাল ভান্ডারে কিছু রাগ রয়েছে যেগুলোর স্বর, চলন, সময়, রস অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ভিন্ন বা সদৃশ রাগগুলো বহু সময় শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করে। এমনকি শিল্পীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এই প্রবন্ধে আমরা এমন কিছু রাগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করব, যেখানে শ্রোতার অভিজ্ঞতা, রাগের গঠন ও পরিবেশন রীতির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান।
সূচক শব্দ: সংগীত, রাগ, শ্রোতা, স্বর, শিল্পী।

মূল আলোচনা:
এখন আমরা আলোচনা করব রাগের ভিন্নতা কিভাবে সৃষ্টি হয়, কিভাবে তা শ্রোতার অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে এবং এই সংগীতধারার ভিতর দিয়ে শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যে কিভাবে এক আন্ত:সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

রাগ - সঙ্গীতের আত্মা: 'রাগ' শব্দটি সংস্কৃত 'রঞ্জ' ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ 'রঞ্জিত করা' বা 'রঙিন করে তোলা'। অর্থাৎ রাগ সেই সংগীতময় রূপ যা শ্রোতার চিত্তকে রঞ্জিত বা প্রভাবিত করে। একটি রাগের গঠন নির্ভর করে নির্দিষ্ট স্বরসমূহের ব্যবহার, তাদের ঊর্ধ্ব (আরোহ) ও নিম্ন (অবরোহ) গতির নিয়ম, গুরুত্বপূর্ণ স্বর (বাদী ও সমবাদী) এবং রাগের চলনের উপরে।

তবে রাগ শুধুমাত্র এই তত্ত্বগত কাঠামো নয়। বাস্তবের প্রতিটি রাগ এক-একটি অনুভবের জগৎ- কিছু রাগ দুঃখের, কিছু প্রেমের, কিছু আবার নির্মল আনন্দ বা উৎসবের প্রতিনিধিত্ব করে। এই আবেগ ও রসের বহুমুখী প্রকাশই রাগকে ভিন্নতা প্রদান করে।

রাগ ভিন্নতা / সদৃশতা কী?
ভিন্নতা বলতে এমন দুই বা ততোধিক রাগ যাদের আরোহন - অবরোহন স্বর চালনা একই হয়। এই সাদৃশ্যের ফলে সংগীত শ্রোতারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না কোন রাগটি পরিবেশন হচ্ছে। আবার অনেক রাগের নাম আলাদা হলেও তাদের ব্যবহারিক রূপ প্রায় অভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ -

রাগ	সদৃশ রাগ
দরবারী কানাড়া	আড়ানা, নায়কি কানাড়া
বেহাগ	গৌরসাড়ং

রচনাগত দিক -

দরবারী কানাড়া এবং আড়ানা - উভয়ই আসাবরী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত। দরবারী কানাড়া তার গভীরতা ও গাম্ভীর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। আড়ানা অপেক্ষাকৃত সরল। চলনে দরবারীর মত এতটা গভীরতা নেই।

বৈশিষ্ট্য	দরবারী কানাড়া	আড়ানা
ঠাট	আসাবরী	আসাবরী
সময়	মধ্যরাত	রাতের শেষ
জাতি	সম্পূর্ণষাড়ব	ষাড়ব-ষাড়ব

শ্রোতার দৃষ্টিকোণ:

দুই রাগ-ই রাতের পরিবেশে পরিবেশনযোগ্য হওয়ায় শ্রোতারা আবেগগত মিল অনুভব করেন। তবে দরবারীর গভীর কম্পন ও মীড় সহযোগে স্বরগুলি শ্রোতার মনে একটি ভিন্নধর্মী রস সৃষ্টি করে, যা আড়ানার তুলনায় অধিকতর গভীর ও বিষাদময়।

শ্রোতার বিভ্রান্তির কারণ সমূহ:

১) স্বর ও চলনের সাদৃশ্য: অনেক রাগে আরোহ- অবরোহ প্রায় অভিন্ন হওয়ায় শ্রোতারা রাগ চিনতে ভুল করেন।

২) বন্দিশের পুনরাবৃত্তি: একই বা অনুরূপ বোল অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন রাগে ব্যবহৃত হয়, যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

৩) রসগত মিল: কিছু রাগের অভিব্যক্ত রস এক বা কাছাকাছি - যেমন করুন, গাম্ভীর্য বা ভক্তিভাব - এতে করে শ্রোতার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্তি ঘটে।

যেমন রাগ মালকোস পরিবেশন করলে শ্রোতার মনে বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। মালকোস রাগটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম প্রাচীন এবং গম্ভীর রাগ। এটির রাতের গভীর সময়ে গাওয়া হয়। এবং এর স্বভাব ধ্যানমগ্ন, আধ্যাত্মিক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। এটি ভৈরবী ঠাঁটের অন্তর্গত। ঔড়ব জাতির রাগ। অর্থাৎ আরোহ-অবরোহে ৫ টি স্বর ব্যবহৃত হয়। ‘গ’, ‘ধ’, ও ‘নি’ স্বর তিনটি কোমল।

সা গ্ ম ধ্ নি্ - এই ৫ টি স্বর লাগে।

অনেক নতুন শ্রোতা যখন প্রথমবার এই রাগটি শোনেন, তখন তাঁদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কারণ রাগ মালকোস গম্ভীর ও ধীরগতির বলে অনেক শ্রোতার মনে এটি বিষাদের বা শোকের অনুভূতি তৈরি করে। অনেকে ভাবেন এটি দুঃখ প্রকাশের রাগ, কিন্তু বাস্তবে মালকোস মূলত ধ্যানমূর্তি ফুটিয়ে তোলে যা আত্মানুসন্ধানের সহায়ক।

আবার যারা খেয়ালে তীব্র তান শুনতে অভ্যস্ত, তারা মালকোসকে একঘেয়ে ভাবতে পারেন। এই ধীর গতি অনভ্যস্ত কানে বিভ্রান্তিকর মনে হয়, যেহেতু এই রাগে প্রাচুর্য নেই, তাই অনেকে মনে করেন এটি দুঃখময়, অথচ এই রাগের সৌন্দর্য তার শান্ত ভাবনাতে। আসলে রাতের নির্জনতা, ধ্যান, আভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনার রাগ হিসাবে মালকোস তখনই প্রভাব ফেলে যখন শ্রোতা সঠিক পরিবেশে শোনেন। দিনের বেলা শুনলে রাগটির আসল গভীরতা হারিয়ে যেতে পারে।

রাগের ভিন্নতা: অর্থ ও উৎস

ঘরানা অনুসারে রূপান্তর:

১) ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন ঘরানা রয়েছে - কিরানা, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র, জয়পুর, আগ্রা ইত্যাদি। প্রতিটি ঘরানার নিজস্ব রীতি ও উপস্থাপন পদ্ধতি রয়েছে, ফলে এক ঘরানার শিল্পী যেমন রাগ ইমনকে দীর্ঘ আলাপে গড়ে তোলেন, অন্য ঘরানার শিল্পী হয়তো একই রাগে তান ও বোলের মাধ্যমে রোমাঞ্চ তৈরী করেন। ঘরানা অনুযায়ী এই পার্থক্য শ্রোতার কাছে রাগের একাধিক স্বরূপ সৃষ্টি করে।

২) শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও রচনার প্রভাব একই রাগ, ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর গলায় ভিন্ন রূপ পায়। পন্ডিত বড়ে গোলাম আলি খাঁ রাগ দরবারী কানাড়াকে যেমন এক ধীর, গভীর ভাবনায় গড়েন, তেমনই পন্ডিত কুমার গন্ধর্ব সেটিকে অন্যরকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। শিল্পীর নিজস্ব দর্শন, রাগের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রোতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা রাগের বহুরূপ সৃষ্টি করে।

ঠাট অনুযায়ী রাগের ভিন্নতা:

প্রতিটি রাগ একটি নির্দিষ্ট 'ঠাট' থেকে উৎপত্তি হয়েছে । যেমন ভৈরব, কল্যান, তোড়ি, আসাবরী ইত্যাদি। এগুলো রাগের শ্রেণীবিন্যাসে সাহায্য করে।

রাগের ভিন্নতা : সময়, আবেগ ও ভাবভঙ্গিমায়

ক) সময় ভেদে বিভাজন: ভারতীয় সংগীতে প্রতিটি রাগের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে। এই সময় ভেদে পরিবেশন রাগের আবেগকে বাড়িয়ে তোলে । যেমন -

- ভোরের রাগ - ভৈরব, ললিত, শান্ত, ধ্যানময় অনুভূতি দেয়।
- দুপুরের রাগ - ভীমপলশ্রী, মধ্যমাদ সারং, অলস, মৃদু প্রশান্তি আনে।
- সন্ধ্যার রাগ - ইমন, মারোয়া - আবেগময়তা, রহস্যময় ভাব জাগায়।
- রাতের রাগ - মালকোস, দরবারী - গাম্ভীর্য, আত্মানুভব সৃষ্টি করে।

খ) আবেগ ভেদে ভিন্নতা: প্রত্যেকটি রাগ কোন না কোন রস বা আবেগ বহন করে। যেমন -

- শৃঙ্গার রস - (প্রেম) : রাগ দেশ, পিলু ইত্যাদি।
- করুণ রস - (বেদনা) : তোড়ী, ধানেশ্রী।
- বীর রস - (সাহস) : দুর্গা, হাম্বীর।
- ভক্তি রস : ভৈরবী।

গ) ঋতুভেদে রাগ: ভারতীয় সংগীতে এমনকি ঋতুভেদেও রাগ পরিবেশনের রীতি রয়েছে।

- বর্ষার রাগ : মিঞা কী মল্লার, গৌড় মল্লার।
- গ্রীষ্মের রাগ : গৌড়সাড়ং।
- শীতকালীন রাগ : বসন্ত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাগ সংগীতের বিবর্তন:

রাগের ধারণা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন 'নাট্যশাস্ত্র', 'সঙ্গীতরত্নাকর' ইত্যাদিতে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় রাগ কেবল সংগীত নয় বরং আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় চর্চার এক মাধ্যম ছিল।

মুঘল আমলে রাগ সংগীত রাজসভায় জায়গা করে নেয়। তানসেনের মতো গুণী শিল্পীরা বিভিন্ন রাগ সৃষ্টি ও বিকাশ করেন। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনার জন্ম হয়, যা রাগকে ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনায় রূপ দেয়।

গুরু শিষ্য পরম্পরা ও রাগ শিক্ষা

রাগ শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি হল গুরু-শিষ্য পরম্পরা। একজন গুরু শুধু সুর শেখান না বরং একটি রাগ কিভাবে উপলব্ধি করতে হয়, তা শেখান, সেই সাথে রাগের আধ্যাত্মিক দিক, তার রস এবং শ্রোতার মনে কিভাবে প্রভাব ফেলা যায় - এসব শেখানো হয় মুখে মুখে, চর্চায় চর্চায়।

এখনকার দিনে অনেকেই অনলাইনের মাধ্যমে রাগ, শেখেন, কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত শিক্ষা এখনো রাগ উপলব্ধির জন্য সবচেয়ে কার্যকর।

শ্রোতার অভিজ্ঞতা : অনুভব ও ব্যক্তিগত সংযোগ

রাগ সংগীতের শ্রবণ একটি গভীর ও আত্মিক অভিজ্ঞতা। এক একজন শ্রোতা এক এক ভাবে রাগ উপলব্ধি করেন। এটি নির্ভর করে তার সংগীতবোধ, মানসিক অবস্থা, জীবনের অভিজ্ঞতা, রাগ সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞানের ওপর।

একজন শ্রোতা হয়তো কোন রাগ শুনে চোখে জল এনে ফেলেন, অন্যজন হয়তো স্মৃতির ভেতর হারিয়ে যান। এই ব্যক্তিগত সংযোগই রাগসঙ্গীতকে এত গভীর করে তোলে।

রাগ সাধনার বিষয়, রাগ শিখতে গেলে কয়েকটি স্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করতে হয়। এই স্তরগুলি হল-

১) নবীন অভিজ্ঞতা - যারা সংগীত শেখা শুরু করেন, তারা প্রথমে রাগের মূল স্বরগুলো অর্থাৎ আরোহ, অবরোহ, পকড়, ছোট খেয়াল প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিচিত হন।

২) মধ্যম স্তর - এই পর্যায়ের শিল্পী রাগের বিভিন্ন অলংকার, গমক, মীড়, তান ইত্যাদি ব্যবহার করে রাগকে গভীর অনুধাবন করতে শেখেন।

৩) উচ্চ অভিজ্ঞতা - একজন দক্ষ শিল্পী রাগকে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন, তাকে প্রাণ দেন। তার গাওয়া রাগ শ্রোতার মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই স্তরে পৌঁছাতে শিক্ষার্থীর অনেক সময়, সাধনা ও আত্মিক উপলব্ধির প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাগসংগীত:

রাগসংগীতের ওপর মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে রাগসংগীত মনকে শান্ত করে, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কমাতে সাহায্য করে, স্মৃতিশক্তি বাড়াতে কার্যকর, নিদ্রাহীনতায় উপকারী।

রাগসংগীতের নির্দিষ্ট ছন্দ, সুর ও আবেগ শ্রোতার মস্তিষ্কে সেরোটোনিন ও ডোপামিন হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায়, ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে।

বিশ্ব সংগীতে রাগের প্রভাব:

রাগ সঙ্গীত শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের অনেক জায়গায় সমাদৃত। পন্ডিত রবিশঙ্কর, আলী আকবর খাঁ প্রমুখ গুণীজন পশ্চিমী সংগীতের সঙ্গে রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় সংগীতকে পরিচিত করেছেন। ফলস্বরূপ হলিউড চলচিত্রে রাগভিত্তিক মেলোডি ব্যবহৃত হয়েছে।

এতে বোঝা যায়, রাগের ভিন্নতা শুধু সংগীতেই নয়, বরং এর সার্বজনীন আবেদন রয়েছে।

রাগ ও আধুনিক ফিউসন সংগীত:

বর্তমান প্রজন্মের কাছে রাগ সঙ্গীতের আবেদন নতুন ভাবে ফিরে আসছে ফিউসন সংগীতের মাধ্যমে। যেমন হিন্দিপপ্ ও লোকসংগীত রাগের সুরকে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করছে। চলচ্চিত্র সঙ্গীতে রাগের প্রয়োগ আজও ব্যাপক - আর. ডি. বর্মন থেকে এ.আর. রহমান পর্যন্ত।

ফলে রাগসংগীত একদিকে ঐতিহ্য ধরে রেখেছে, অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে।

রাগসংগীত ও আত্মজ্ঞান এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা:

অনেক শিল্পী ও শ্রোতা রাগসংগীতকে এক ধরনের ধ্যান বা জপ হিসেবে দেখেন। দীর্ঘক্ষণ কোন রাগ পরিবেশন বা শ্রবণে এক ধরনের মোহময় অবস্থার সৃষ্টি হয় যা অনেকটা ধ্যানের মতো। বিশেষ করে সন্ধ্যা বা গভীর রাতে পরিবেশিত রাগ যেমন - দরবারী কানাড়া, মালকোস চন্দ্রকোস ইত্যাদি রাগগুলি গভীরভাবে মনকে আত্মস্থ করার সুযোগ এনে দেয়।

এই অভিজ্ঞতা শ্রোতার আত্মার সঙ্গে সংগীতের সংযোগস্থাপন করে। কেউ কেউ বলেন, রাগ সঙ্গীত শোনার পর মনটা যেন স্বচ্ছ হয়ে যায়, একটা প্রশান্তি অনুভব হয়। এই শান্তি মানসিক, আবেগীয় ও আধ্যাত্মিক যা শুধু শাস্ত্রীয় সংগীতই দিতে পারে।

প্রযুক্তি ও রাগ : নতুন যুগের শ্রোতার অভিজ্ঞতা

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির রাগ সঙ্গীতের বিকাশ বাড়িয়েছে। এখন ইউটিউব এর মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাজার হাজার রাগ ভিত্তিক পরিবেশনা পাওয়া যায়।

এই সুবিধায় একদিকে রাগ সংগীত অনেকের কাছে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে এর সঙ্গে কিছু অসুবিধাও সৃষ্টি হয়েছে।

সুবিধা:

ক) যে কেউ যেকোনো সময় রাগ শুনতে পারছে।

খ) পুরনো ও বিরল পরিবেশনাও সংরক্ষিত আছে।

গ) শেখার জন্য অনলাইন টিউটোরিয়াল ক্লাস পাওয়া যাচ্ছে।

অসুবিধা:

ক) শ্রোতা সময় ভেদে রাগ শুনছে না ফলে প্রকৃত আবেগ পাওয়া যাচ্ছে না।

খ) রাগের সারাংশ শুনে রাগ বোঝার প্রবণতা তৈরি হয়েছে, গভীরতা হারাচ্ছে।

গ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি সংগীত রাগের অন্তর্নিহিত আত্মাকে বুঝতে পারছে না।

তবে আশার কথা হল, এখনো অনেক নতুন প্রজন্মের শিল্পী এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন।

একই রাগ, ভিন্ন অভিজ্ঞতা:

শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গি -

একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, একই রাগ ভিন্ন শ্রোতার মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন -

১ নং শ্রোতা - রাগ ইমন শুনে প্রেমিকার কথা মনে পড়ে আবেগময় হয়ে ওঠেন।

২ নং শ্রোতা - ইমন তাকে আধ্যাত্মিক চেতনায় ডুবিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করেন।

৩নং শ্রোতা - ইমন রাগ শুনে কিছুই অনুভব করেন না কারণ হয়তো তার মন তখন প্রস্তুত নয়।

রাগ সংগীত এমন এক জগত যা শ্রোতার আভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর গভীরভাবে নির্ভর করে এই ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতার কারণে রাগ সংগীত কখনো একঘেয়ে হয় না প্রতিবার নতুন রূপে প্রকাশিত হয়।

রাগ ও নৃত্য:

রাগ কেবল শ্রবণের বিষয় নয় এটি নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভরতনাট্যম কথক ওড়িশি নৃত্যশৈলীতে রাগ সঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে তাল ভঙ্গিমা আবেগ ও মুখাভিনয় গড়ে ওঠে, যেমন

- রাগ হংসধ্বনি ব্যবহার হয় উল্লাস প্রকাশে।
- রাগ শ্রী ব্যবহার হয় ভক্তি বা অগ্নিরূপ প্রকাশে।

- রাগ ভৈরবী দিয়ে প্রকাশ পায় বেদনা।

এতে বোঝা যায় রাগ কেবল কানে দিয়ে নয়, চোখ দিয়েও অনুভব করা যায়।

বাংলা সংস্কৃতিতে রাগসংগীত:

বাংলা গানের শ্রোতাদের মধ্যে রাগসংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই রাগকে তাদের সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন।

- রবীন্দ্রনাথ : রাগ ইমন, ভৈরবী, মালকোস প্রভৃতির রাগে অনেক গান রচনা করেছেন।
- নজরুল : রাগ তোড়ী, ভৈরবী ইত্যাদির ওপর অনেক গান রচনা করেছেন।

ফলে বাংলা গানের জগতে রাগের প্রভাব ও গভীর সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপসংহার: রাগসংগীত চিরন্তন এক অনুভূতির নাম। রাগসংগীত এক ধরনের সময়ের ভাষা, আত্মার প্রকাশ। প্রতিটি রাগ এক একটি মানসিক আবেগ, প্রেম, বেদনা, আশা, ভক্তি, সাহস প্রভৃতি মনোবৃত্তির যেন এক জীবন্তরূপ। রাগের ভিন্নতা শুধু সংগীতের কাঠামোয় নয়, সময়, আবেগ, পরিবেশনা ও শ্রোতার অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয়।

শ্রোতার জন্য রাগসংগীত মানে কেবল সুর শোনা নয় - এটি আত্মার সঙ্গে সংলাপ, স্মৃতির ভেতর ভ্রমণ এবং জীবনের গভীরে এক সফর। সেই সফর কখনো আনন্দময়, কখনো বিষাদপূর্ণ, কখনো প্রেমময় আবার কখনো ঈশ্বরের ধ্যানে উদ্বুদ্ধ করে।

রাগসংগীত তাই কেবল অতীতের ঐতিহ্য নয়, বরং ভবিষ্যতের আশ্বাস। নতুন প্রজন্ম যদি এর ভিন্নতা, সৌন্দর্য ও শক্তিকে উপলব্ধি করতে শেখে, তবে রাগসংগীত যুগের পর যুগ শ্রোতার হৃদয়ে তার আলো ছড়াবে।

তথ্যসূত্র:

১। সঙ্গীত তত্ত্ব - দেবব্রত দত্ত

২। সঙ্গীতশাস্ত্র - ইন্দুভূষণ রায়

৩। ক্রমিক পুস্তক মালিকা - পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ন ভাতখন্ডে।

রাজনৈতিক চেতনা প্রশ্নে আল মাহমুদের কবিতা

ফজলুল হক তুহিন
সহকারী অধ্যাপক, ডেমনস্ট্রেশন ইউনিট-১
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় রাজনৈতিক চেতনার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক জীবনে প্রভাবশালী ডিসকোর্স হিসেবে এটি বিরাজমান। কবিতা তথা সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রাসঙ্গিকভাবে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের কবিতা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকল্পে অসামান্য শিল্পকারুময়। সেইসাথে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী ইতিহাস ও ভাবনাপুঞ্জ অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাব ও ভাষার অনন্য কণ্ঠস্বর তাঁর কবিতা। মানবাধিকার, সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনে তাঁর কাব্য-উচ্চারণ জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে। একটি জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র প্রকল্পের অভ্যুদয়ে ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে কবি আল মাহমুদের কবিতা রাজনৈতিক চেতনার রূপকল্পটি ধারণ করে নিজস্ব কাব্যভাষায় প্রকাশিত। ফলে বাংলা অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র ও সচেতন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর অভিপ্রায় বা আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় প্রাণবন্ত। বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে কবি আল মাহমুদের রাজনৈতিক চেতানার শিল্পভাষ্য অন্বেষা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: রাজনৈতিক চেতনা, বাংলাদেশ, আধুনিক কবিতা, আল মাহমুদ, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা।

মূল আলোচনা:

মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। সমাজকাঠামোর সমবায়ে রাষ্ট্র গঠিত, মানুষ সেই রাষ্ট্রের নাগরিক; রাষ্ট্র পরিচালিত হয় রাজনীতি দিয়ে। প্লেটোর মতে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে না। এক মানুষ অপর মানুষ থেকে অভিন্নও নয়। তারা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি গুণগতভাবে বিভিন্ন। এ কারণেই একে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি পরস্পর নির্ভরশীল সংগঠন। মানুষের স্বভাব এবং প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তাই রাষ্ট্র অবশ্যই স্বাভাবিক সংগঠন; অস্বাভাবিক কিংবা কৃত্রিম নয়, এবং অপ্রয়োজনীয় নয়; সে অপরিহার্য[১] মানুষের জন্যে গড়ে ওঠা এই অপরিহার্য সংগঠন পরিচালনার নীতিই রাজনীতি।

রাজনৈতিক চেতনা

আধুনিককালে রাজনীতি ব্যক্তিজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অনেকাংশে রাজনীতির দ্বারা ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ব্যক্তিজীবন এ ব্যাপারে সচেতন থাকুক আর না-ই থাকুক, রাজনীতিই ব্যক্তির অবস্থান ও সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দেয়। আধুনিককালে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র যতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিজীবন ততো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ফলে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় ব্যক্তির অবস্থান অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত।[২] প্রতিটি নাগরিকের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজ প্রত্যক্ষ বা পরক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশে রাজনীতির মূল সমাজ, সিভিল সোসাইটি (civil society) বা জনসমাজ। বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তা উনিশ শতক থেকে এই জনসমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক তাৎপর্যের সঙ্গে সংলগ্ন। এই আন্দোলন বস্তুত ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের ভেতর রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ অন্বেষণের সঙ্গেই যুক্ত। জনসমাজ সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্লেষণ নানা দিক থেকে প্রভাববিস্তারী আন্তনিও গ্রামসি জনসমাজকে নানা চিত্রকল্পে বোঝাতে চেয়েছেন। বস্তুত রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে জনসমাজের উপর হিজেমনি (Hegemony) বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি। এ কারণে রাজনীতির প্রধান ও প্রাথমিক কাজ জনসমাজকে গড়ে তোলা। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জনসমাজের তাৎপর্য আরও গভীর এই কারণে, এই জনসমাজ রাষ্ট্রের মুখোমুখি আক্রমণকে প্রতিরোধ করে। উনিশ শতক জুড়ে কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ এই জনসমাজেরই প্রবল প্রতিরোধ। এমন কি পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনও তাই। ১৯০৫-০৮-এর স্বদেশী আন্দোলনে, এ ভাবনা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গান্ধীর নেতৃত্বে তারই অনুসৃতি, যদিও ১৮৭০-এর দশক থেকেই এর বিরোধী একটি ধারা তৈরি হয়। এ-ধারার মধ্যে একটি অংশ বাহ্যত পশ্চিমী সভ্যতাকে বর্জন ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পুরুত্থান চাইলেও, কার্যত পশ্চিমী রাজনৈতিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতিকেই অনুসরণ করতে চায়। অথচ গ্রামসির চিত্রকল্পে ধরা পড়ে, পশ্চিমা রাষ্ট্র হচ্ছে: "an outer ditch, behind which there stand a powerful system of fortresses and earthworks." গ্রামসি রাষ্ট্রকে কখনও কখনও রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের যোগফল ভাবেন, কখনও বা মূর্ত বাস্তব মনে হয়, দুইটি ধারণা একই। কিন্তু একটি সামাজিক দলের, সমগ্র সমাজের ওপর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই যে রাষ্ট্র বা রাজনীতির সারকথা, একথা জোরের সঙ্গে তিনি জানান। অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে জনসমাজ, এই জনসমাজের আমূল রূপান্তরই রাজনীতির প্রধান কাজ। এটা না হলে, রাষ্ট্র দখলের প্রচলিত রাজনীতিও কোন মুক্তি আনে না। সমাজতান্ত্রিক জগতের বর্তমান সংকটে, এ সত্য ধ্বনিত হচ্ছে।[৩] রাষ্ট্র জনসমাজকে অর্থনৈতিক গঠনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু রাষ্ট্রকে এক্ষেত্রে ইচ্ছুক হতে হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এই প্রক্রিয়া ছিল বিপরীত। অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাষ্ট্র দুই-ই এ-দেশের বিরোধী শক্তি- আগের প্রক্রিয়ার ধ্বংসকারী। ইতিহাসের স্বাধীন-বিকাশে যে রূপান্তর আসার কথা, তা ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপে ব্যাহত ও বিকৃত হয়।

রাজনৈতিক চেতনা ও আধুনিক বাংলা কবিতা

গ্রামসির মতে, "জনসমাজকে দেখতে হবে 'as superstructural primary moment', আর রাজনৈতিক সমাজ 'secondary superstructural moment'। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ায় যে রূপান্তরের কাজ প্রথমে সক্রিয় হয় জনসমাজে"।[৪] জনসমাজে তাই রাজনীতির বিস্তার সর্বত্রগামী। সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, রাজনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত হয় ওপর কাঠামোর স্তর এবং সেটা উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের সমবায়ে সৃষ্ট কাঠামোর আদর্শগত প্রতিফলন মাত্র। নির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর সৃষ্ট বলে ওপর কাঠামোর বিভিন্ন উৎপাদনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। সেগুলো একে অন্যের প্রভাবে নিরন্তর সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হয়। সে প্রভাব ও সম্পর্ক একালে অধিকতর প্রত্যক্ষ ও গভীর, বিশেষত আধুনিককালে রাজনীতির প্রভাব হয়েছে সর্বগ্রাসী এবং তা স্পর্শ করেছে সমাজের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলকে। কবিতাও সে প্রভাবের অন্তর্গত।[৫] আধুনিক মানুষের জীবন যেমন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি আধুনিক মানুষের সৃষ্ট কবিতাও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার যোগসূত্রে আবদ্ধ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে, "আমিও মনে করি যে ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে

তোলাই কবি জীবনের পরম সার্থকতা।”[৬] অর্থাৎ আধুনিক কবি, কবিতা ও মানুষ পরস্পর আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ। আধুনিককালে রাজনৈতিক চেতনা বলতে যে বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে, তার প্রকাশ একান্ত আধুনিক যুগেই। প্রাচীন বা মধ্যযুগের চিন্তা-চেতনা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। উনিশ শতকে ব্রিটিশ উপনিবেশের চিন্তাবিপ্লবের সূত্রে এই চেতনার জন্ম।

রাজনৈতিক চেতনা প্রশ্নে আল মাহমুদের কবিতা:

বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা দেশবিভাগের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিলো ১৯৪৭ সালে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অবিভক্ত ভারতের অবাঙালি পুঁজিপতি, আমলা ও সামন্ত মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও কৃষক মুসলমান পাকিস্তানের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। ১৯৪৭ সালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক সত্তার আনুকূল্যে সেই মুসলমান মধ্যবিত্তের অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিকাশ ঘটে বাংলাদেশে; এবং এই সাহিত্য প্রধানত নতুন মধ্যবিত্ত সমাজেরই শৈল্পিক অভিব্যক্তি। উল্লেখ্য, ইংরেজ উপনিবেশে সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত যেমন আত্মবিকাশের অপূর্ব সম্ভাবনায় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে প্রাণচঞ্চল, আবার সিপাহী-বিদ্রোহের পরে আপন পরিণাম-দর্শনে বিমর্ষ; ১৯৪৭-এর পর অন্তত পাঁচ বছর মুসলিম মধ্যবিত্ত তেমনি আশাবাদে উদ্ভাসিত, এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তার প্রথম স্বপ্নভঙ্গ, সঙ্গে সঙ্গে নতুন পথচলা ও উজ্জীবন।

একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তপাত কোনো বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনা নয়; তা একাধারে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর চারিত্র্য ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ইঙ্গিতবহ। স্বপ্নভঙ্গে ব্যথিত, বিমূঢ় এবং উত্তেজিত মধ্যবিত্ত সেদিন গভীর আবেগে ভাষা ও জননীকে অভিন্ন বলে জেনেছিলো। ১৯৫৩ সালের মার্চে প্রকাশিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ সঙ্কলনের অন্তর্গত কবিতাবলী শুধু কবিতা হিসেবেই মৌলিক নয়, সমাজ বিকাশের অভিজ্ঞান হিসেবেও মূল্যবান।[৭] আবার ভাষা আন্দোলন যেমন পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি এই কাব্য সঙ্কলনও পরবর্তী কাব্যধারার ওপর ছায়াপাত করে। এ-সময়ে সমাজসচেতন ও সাম্যবাদী উভয় শিবিরের কবিরা স্বদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে কবিতায় পাকিস্তানবাদের স্থলে মা-মাটি-মাতৃভাষা স্থান করে নেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি হয়ে ওঠে কবিতার উৎসব।[৮] মা, মাটি ও জনতার পাশাপাশি রক্ত, সূর্য, কৃষ্ণচূড়া ও লাল রঙ হয়ে ওঠে কবিতার বহুল ব্যবহৃত উপমা ও প্রতীক। ভাষা আন্দোলনে উজ্জীবিত আল মাহমুদের কবিতায় এইসব প্রতীক উপমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের সাহসী ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়
বরকতেরই রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!
প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?
পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।
প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।
['একুশের কবিতা', *পাখির কাছে ফুলের কাছে*]

ভাষা-আন্দোলন আবহমান বাঙালির প্রবহমান সংগ্রামের এক উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভ, বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়- এই সত্যকে কবি ইতিহাসের আলোয় স্থাপন এবং তিতুমীর, ক্ষুদিরাম ও প্রীতিলতা- এই তিন আত্মত্যাগী ব্যক্তিত্বের অবদানের পাশে ভাষা শহীদের অবস্থান নির্ণয় করেন। সঙ্গে সঙ্গে কবি 'বঙ্গে' জন্মগ্রহণ করে বঙ্গের হাজার বছরের প্রচলিত ভাষা বঙ্গভাষা বা বাংলাভাষায় স্বতঃসিদ্ধ অধিকার জন্মেছে, এই সত্যও প্রকাশ করেন। সেজন্যে কবি ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান 'প্রভাত ফেরী'তে গিয়ে।

আল মাহমুদের দ্বিতীয় কাব্য 'কালের কলসে' (রচনা: ১৯৬৪-৬৭) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ভাবনা ক্রিয়াশীল। এই কালপর্বে পূর্ব-বাংলার রাজনীতি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। ১৯৬২ সালে আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রী শাসন প্রবর্তন ও শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হয়। ছাত্রসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-বিক্ষোভে কমিশনের রিপোর্ট বাতিল হলে দেশের প্রতিবাদী যুবশক্তি নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যে আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তবে মৌলিক গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে একনায়ক শাসনের শৃঙ্খলে তা হতাশাগ্রস্ত, রাজনৈতিক অধিকার পদদলিত এবং অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তবে ১৯৬৬ সালে বাঙালি মধ্যবিত্ত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হয় এবং কবিতার এক 'নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন' ঘটায়। এই সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আল মাহমুদের 'কালের কলস' প্রকাশিত হয়। সমকালের বিপন্নতাবোধ ও ক্ষোভকে এখানে তিনি নিগুঢ়ভাবে অনুভব এবং রাষ্ট্রীয় দমননীতি সত্ত্বেও পরিবেশের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রতিবাদকে উচ্চকিত করেন। এই কাব্যের বিশিষ্ট নতুন সুর হলো 'সমকাল ও স্বদেশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট রাষ্ট্রিক চেতনা'। এই বোধ পূর্ববর্তী গ্রন্থে ছিলো শুধুই মানবিকতার বোধ, এখানে সেটা সুনির্দিষ্ট এক শাসকবিরোধী কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় সেই সময় বাস্তবতা ও কবির অন্তর্গত বিক্ষুব্ধতা ধ্বনিত।

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত
নৈশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।
নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতঙ্গ মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্যকোন শ্যামলতা নেই।
বুঝি না রবীন্দ্রনাথ কী ভেবে যে বাংলাদেশে ফের

বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন।
গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।
['রবীন্দ্রনাথ', *কালের কলস*]

এই অন্ধকারময় 'বঙ্গদেশ' সামরিক শাসনে বন্ধ্যাভূমি বা পরিত্যক্ত জমিনে (Waste Land) পরিণত হয়েছে। কবির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা-উপলব্ধি বঙ্গদেশের জীবন ও প্রকৃতির রূপ-রূপান্তরকে চিহ্নিত করেছে এই নেতিবাচক প্রতীকে। সমালোচকের মতে, "এ রকম একটি কবিতাই বাক্রুদ্ধ জনতার মনে নিয়ে আসে বিদ্যুতের ঝলক, সত্যিকারের অস্ত্র হয়ে ওঠে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে পূর্ববাংলায় এ রকম একটি কবিতা লেখাই ছিলো সংগ্রাম।"[৯] অন্যদিকে 'ছয় দফা' কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাতে সামাজিক উজ্জীবন ও রাজনৈতিক চেতনার জাগৃতি ঘটে এবং কবিতায় তার ঢেউ আছড়ে পড়ে। এই সময়ই কবিদের মধ্যে আত্মজাগরণ, আত্মআবিষ্কার ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান লক্ষণীয়। আল মাহমুদের "নিদ্রিতা মায়ের নাম" কবিতায় সেই মনোভঙ্গি রূপান্তরিত।

তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে
তীরের ফলার মত
নিক্ষিপ্ত ভাষার চিৎকার:
বাঙলা, বাঙলা-
কে নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো?
জানালায় মুখ রেখে চকিতে দেখলাম
উদয়ের প্রান্তদেশে ভেসে ওঠে কালের কহ্লার
আর সমস্ত রাজপথে ফেব্রুয়ারির নিঃশঙ্ক পাখির আওয়াজ
রক্তাভ ফুলের মতো আমার সাঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব
বাঙলা--- বাঙলা---
আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।
['নিদ্রিতা মায়ের নাম', *কালের কলস*]

ভাষা-আন্দোলনোত্তর কবিতা, বিশেষভাবে একুশের কবিতায় মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি একাকার হয়ে যায়। বায়ান্নোর সেই রক্তাক্ত জাগরণ ছেষট্টিতে এসে আরো অগ্রসর ও বিস্তৃত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উত্তাল ও জাগ্রত জনতার স্রোত রাজপথে শঙ্কাহীন। মা ও মাতৃভূমি অভিন্ন যোগসূত্রে 'দেশজননী' হয়ে ওঠে জনতার মিছিলে ও কবির কবিতায়। কবি তীব্র আশা ও সম্ভাবনায় প্রত্যক্ষ করেন 'কালের কহ্লার'। সেজন্যে 'বাঙলা' মায়ের হারানো সম্পদ ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কবি অঙ্গীকারবদ্ধ। "নোলক" তাই বাঙলা মায়ের যুগসঞ্চিত প্রাণ-ঐশ্বর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে।

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
...বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা

আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।
[‘নোলক’, পাখির কাছে ফুলের কাছে]

রাজপথে জনগণ স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে না ফেরার অঙ্গীকারে উদ্দীপ্ত। এমনিভাবে কবিও গণমুখী জীবনবোধে সন্দীপিত হয়ে বাঙলা মায়ের হারানো ‘গয়না’ বা সম্পদ স্বাধিকার ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে না। জনগণ ও কবির কণ্ঠস্বর একই সুরে মিলিত হয়েছে স্বাদেশিকবোধে ও রাজনৈতিক প্রত্যয়ে। এই সময়ে শুধু আল মাহমুদ নয়, আরো অনেক নবীন ও প্রবীন কবি একই চেতনায় সৃজনশীল। নবীনদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণের ‘না প্রেমিকা না বিপ্লবী’, কাব্যের “হুলিয়া”, আবুল হাসানের (১৯৪৭-৭৫) ‘রাজা যায় রাজা আসে’ (১৯৭২), ফরহাদ মযহারের (জ. ১৯৪৭) ‘খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ’ (১৯৭২), হুমায়ূন কবিরের (১৯৪৮-১৯৭২) ‘কুসুমিত ইস্পাত’ (১৯৭২); শামসুর রাহমানের ‘নিজ বাসভূমে’ (১৯৭০), সৈয়দ শামসুল হকের ‘বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা’ (১৯৭০) এবং সৈয়দ আলী আহসানের ‘আমার পূর্ব-বাংলা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কালপর্বে আল মাহমুদ সম্ভাব্য জাগরণের আহ্বান জানান নিজস্ব কাব্যভাষায়:

গভীর পুরো কুয়াশা যাক্ হাওয়ার তোড়ে ভেসে
আগুন, পানি, খাদ্য হাতে ক্ষুধার্তরা এসে-
নীরব নীল শীতের মাসে লাগিয়ে দিক আগুন
করুণ মুখ তরুণ যত আগুন দেখে জাগুন।
[‘মন্ত্র’, কালের কলস]

সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে জনমানসের উজ্জীবন কবিতার ঋতুতে শীতকে বিদায় জানিয়ে বসন্তের আগমনকে সম্ভাবিত করে তোলে। কবি তাই প্রকৃতির মতো স্বদেশের গুণগত পরিবর্তনে প্রত্যয়দীপ্ত; জাগরণের আহ্বানে আন্তরিক।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান জাতীয় রাজনীতিতে বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। উপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাতে আন্দোলনরত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাফল্য একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে সমগ্র দেশব্যাপী গণজোয়ারের তরঙ্গ এসে পড়ে কবিতায়। এ সময়ের কাব্যে উদ্দীপ্ত জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম উত্তাপ ছড়ায়। আল মাহমুদের কবিতায় সরাসরি গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ আন্দোলিত। এই মুক্তি সংগ্রামে শহীদের ভূমিকা ও অবদানকে স্মরণ করে সামনের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণা তাঁর “ঊন সত্তরের ছড়া-১” ও “ঊন সত্তরের ছড়া-২”-এ প্রকাশিত।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
শুয়োর মুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।
কেন বাঁধবো দোর জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।
ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে
তোরাই তবে সোনামাণিক
আগুন জ্বেলে দে।

['উনসত্তরের ছড়া-১', পাখির কাছে ফুলের কাছে]

১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানে অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় আর সে আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছোয় উনসত্তরের জানুয়ারি মাসে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলন থেকেই এ দেশে প্রথম ধ্বনি উঠেছিল 'জাগো জাগো বাঙালী জাগো', 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাঙলাদেশ স্বাধীন কর'। এই আন্দোলনের চরম পর্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনারও চরম অভিব্যক্তি ঘটে 'জয় বাংলা' শ্লোগান এবং 'তোমার দেশ, আমার দেশ, বাংলা দেশ, বাংলা দেশ' ধ্বনির মাধ্যমে।[১০] এই গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ৬৮ সালের ডিসেম্বরের ৬ থেকে ৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখের মধ্যে সংগঠিত হয়। ৬৮ সালের ৬-ই ডিসেম্বর পল্টনে মওলানা ভাসানীর জনসভায় বীর জনতা শপথ নিয়েছিল: 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব', তারপর তারা লাট ভবন ঘেরাও করেছিল।

আওয়ামী লীগের মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত গোষ্ঠীর সঙ্গে আল মাহমুদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিলো। সে সময় তিনি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'ইত্তেফাকে' সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার সূত্রে কমরেড মোহাম্মদ তোহা খানের সংস্পর্শে আসেন।[১১] ফলে অনিবার্যভাবে কবিতায় মার্কসবাদী রাজনীতির ভাবনার প্রভাব পড়েছে। এই চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের পন্থায় উজ্জীবিত। তাই কবির কাছে ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভ বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ও সফল সশস্ত্র বিপ্লব হিসেবে বিবেচিত। কবি ৭১-এর সশস্ত্র যুদ্ধের একটা রূপরেখা অঙ্কন করেন "ক্যামোফ্লাজা" কবিতায়। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতার চিত্রময়তা আছে এখানে।

নিসর্গের ঢাল ধরো বক্ষস্থলে
যেন হত্যাকারীরা এখন
ভাবে বৃক্ষরাজি বুঝি
বাতাসে দোলায় ফুল
অবিরাম পুষ্পের বাহার।
জেনো, শত্রুরাও পরে আছে সবুজ কামিজ
শিরস্ত্রাণে লতাপাতা, কামানের ওপরে পল্লব।
ঢেকে রেখে
নখ
দাঁত
লিঙ্গ
হিংসা
বন্দুকের নল
হয়ে গেছে নিরাসক্ত বিষকাটালির ছোটো ঝোপ।
বাঁচাও বাঁচাও বলে
এশিয়ার মানচিত্রে কাতর

তোমার চিৎকার শুনে দোলে বৃক্ষ
নিসর্গ নিয়ম।

['ক্যামোফ্লাজা', সোনালি কাবিন]

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সবুজময় বাংলাদেশের পটভূমি একাকার এই কবিতায়। কৌশলগত লড়াইয়ে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে রঙ, জাল, গাছের ডাল-লতাপাতা ইত্যাদির সাহায্যে সৃষ্টি করা হয় মিথ্যা প্রতিভাস বা কূটবেশ; একেই 'ক্যামোফ্লা' বলা হয়। একাত্তরের রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর রক্তাক্ত যুদ্ধে এই ধরনের কৌশল ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্যে মুক্তিকামী মানুষের আর্তচিৎকার প্রকৃতিকেও করে তোলে বিহ্বল। কেননা এই লড়াই বাঙালি জাতির অস্তিত্ব, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানুষের সমানাধিকারের প্রশ্নের সাথে জড়িত। আল মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ স্বাদযুক্ত অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসত্তার রক্ষা, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে প্রত্যয়দীপ্ত। ১৯৫২-১৯৭১ কাল-পরিসরে বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা অর্থাৎ এক সার্বত্রিক মুক্তি সংগ্রামে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অনুভূতি, উজ্জীবন, ত্যাগ ও রক্তদানকে আল মাহমুদ নিজস্ব কাব্যভাষা ও আঙ্গিকে প্রকাশ করেন। এক সর্বময় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াজাত এই রক্তক্ষরণ যেমন স্বাভাবিক, কবিচৈতন্যে তার অনুরণনও তেমনি সঙ্গত ও অনিবার্য।[১২] আল মাহমুদ যুদ্ধোত্তর কালপর্বে একমাত্র র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা 'গণকণ্ঠে'র সম্পাদনার সূত্রে সেই অস্থিরতা, সংঘাত, সংকট ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটে খুব ঘনিষ্ঠভাবে। সেইসাথে কবির রাজনৈতিক চেতনা নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়।

উপসংহার:

আল মাহমুদ কাব্যকৃতিতে রাজনৈতিক চেতনাকে প্রবাহিত করেন মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে। এই মানবতা এসেছে তাঁর সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বোধ থেকে। কৈশোরে ও যৌবনে সাম্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং মধ্য বয়সে ইসলামের সাম্য ও মানবতাবাদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা থেকে তিনি মঙ্গলচেতনায় সন্দীপিত হন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার কেন্দ্রে মানুষের জন্যে কল্যাণব্রতের শিল্পিত অভিব্যক্তি স্পষ্ট।

তথ্য নির্দেশ:

১. প্লেটো, সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রিপাবলিক* (৫ম সং.; ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃ. ৯০।

২. মাসুদুজ্জামান, "উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব", ফকরুল চৌধুরী (সম্পা.), *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশিক পাঠ* (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৭), পৃ. ৪১।

৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক* (কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, ১৯৯১), পৃ. ১৩।

৪. *তদেব,* পৃ. ১৩-১৪।

৫. সাইদ-উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ২।

৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "ভূমিকা", 'অর্কেস্ট্রা', *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসমগ্র* (পু. মু; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪), পৃ. ৩১।

৭. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *কথা ও কবিতা,* পৃ. ১২৫-১২৯।

৮. মুহম্মদ নূরুল হুদা, "আমাদের কবিতা প্রসঙ্গে", আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (সম্পা.), *কণ্ঠস্বর* (ঢাকা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৬), পৃ. ১০২।
৯. সুমিতা চক্রবর্তী, "আল মাহমুদের কবিতা: পার্থিব সংযোগ", মুহাম্মদ নিযাম্দ্দীন (সম্পা.), *উপমা,* আল মাহমুদ সংখ্যা (চট্টগ্রাম, ১৯৯৪), পৃ. ৫০-৫১।
১০. রফিকুল ইসলাম, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা", মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৩০০-৩০৩।
১১. আল মাহমুদ, *বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ* (ঢাকা: একুশে বাংলা প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ৮৩-৮৪।
১২. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের কবিতা: সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর,* (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লি., ২০০২), পৃ. ৩৫।

শীতলামঙ্গলে বর্ণিত বিভিন্ন রোগ, লক্ষণ ও তার লোকায়ত চিকিৎসা

নীতীশ ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে শীতলামঙ্গলই একমাত্র কাব্য, যার মূল ভরকেন্দ্র বিবিধ প্রকারের রোগ, ঔষধ ও চিকিৎসাপদ্ধতি। তাই মঙ্গলকাব্যে লোকঔষধি ও লোকচিকিৎসার আলোচনায় 'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানি বাড়তি সমীহের দাবি করে। এই গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখেই আমাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকবে। যার মূলকেন্দ্রবিন্দু 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত তৎকালীন সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন রোগ, ঔষধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি। এই কাব্যের কাহিনিতে দেখা যায়, দেবী শীতলা তাঁর পূজা প্রচারের মানসে বিবিধ প্রকারের রোগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যে সমস্ত মর্ত্যবাসী দেবী শীতলার পূজা থেকে বিরত থাকেন, দেবী তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট-

উজানি নগরে রাজা চন্দর শিখর।
সেইতো না পূজা করে হত বুদ্ধি নর।। [১]

চন্দ্রশেখরের মত যে সমস্ত রাজা, প্রজা কিংবা কোনো সম্প্রদায় দেবীর পূজা থেকে বিরত থাকেন অথবা মান্যতাদানে অমতাদর্শী, সেখানে দেবী রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করেন-

মানুষ হইএ এত অপমান করে।
আজ পাঠাইয়ে দিব শমনের ঘরে।।
স্থানে স্থানে যত ব্যাধি ছিল।
তখনি স্মরণ করে নিকটে আনিল।। [২]

তাই তৎকালীন সমাজ ও সময়ে প্রচলিত, রোগারোগ্যের একটি ধারণা শীতলামঙ্গল কাব্য থেকে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন রোগের লক্ষণ টের পাওয়ার পদ্ধতি, মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যবহৃত লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসার একটি রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে। কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর শীতলামঙ্গল কাব্যে বসন্ত, গলগণ্ড, কাস, কোরণ্ড, সন্নিপাত, বাত, গোদ, কুষ্ঠ, পীলে, হরিদ্রা কামলা, উদরি, হাম, রক্তদল বসন্ত, মোরগী (মৃগী), ওলাওঠা, বোঁজ, কুয়াজ্বর, ধনুষ্টঙ্কার, ঝেলে, মন্দ আগোন (মন্দাগ্নি) প্রভৃতি রোগের উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত সমস্ত রোগের মধ্যে কেবলমাত্র বসন্তকেই বলা হয় 'বসন্তের দেবী শীতলা', এছাড়া কোনো কোনো স্থানে ওলাওঠার দেবী হিসেবে শীতলাকে মান্যতা প্রদানের তথ্য পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই সমস্ত রোগের মধ্যে বসন্ত ও ওলাওঠা ছিল, সমস্ত দিকদিয়েই ভয়ংকর প্রকৃতির। আমাদের আলোচনায় প্রধান প্রধান রোগের পরিচয় জ্ঞাপন, রোগের লক্ষণ ও কারণ, লোকঔষধ ও চিকিৎসাপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনার সাথে সাথে বসন্ত রোগের সঙ্গে দেবী শীতলার সম্পর্কটি কীভাবে জড়িত সে বিষয়েও আলোকপাতের চেষ্টা থাকবে।

সূচক শব্দ: বসন্তের গোড়, তক্ষণ, বোঁজ, রাজ গাঁড় (King's Evil)।

মূল আলোচনা:

বসন্ত রোগ - যে সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ছিল, তাদের মধ্যে বসন্ত রোগ ছিল অন্যতম। কবি কৃষ্ণরাম দাস এই বসন্ত রোগের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

ডাগর বসন্ত হইল চেরিল ইজার।
কালপোঁচ বসন্তে শরীর ছারখার।। [৩]

রোগের পরিচয় ও লক্ষণ - বসন্ত রোগ chicken Pox নামে পরিচিত। এই ব্যাধি অত্যন্ত সংক্রামক। মানবদেহে এই ব্যাধির স্থায়িত্বকাল ১০ থেকে ১৪ দিন। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত পরবর্তীকালে দ্বিতীয়বার আর এই রোগে আক্রান্ত হন না, এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে। বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। যেহেতু তাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণরূপে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশেষত প্রথমে বক্ষস্থল ও স্কন্ধাদেশ এবং পরবর্তীকালে হাত, পা ও মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্রাকৃতি স্ফোটক দেখা যায়। এই স্ফোটক নির্গত হওয়ার আগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোমরে ব্যথা, বমিভাব, মাথায় ব্যথা ও শিরপীড়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে স্ফোটকগুলির মধ্যে কিঞ্চিত জলবৎ রস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীক্ষেত্রে এই স্ফোটকগুলির পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে কিঞ্চিত উচ্চ ও লাল বর্ণ ধারণ করে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে এই স্ফোটকগুলি শুষ্ক ও পাতলা আকার নিয়ে ক্রমশ চর্ম থেকে স্খলিত হতে থাকে। আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে সামান্য জ্বর, সর্দি ও চর্মে কণ্ডূয়ন এবং শরীর থেকে একপ্রকার গন্ধ নির্গত হয়ে থাকে।

বসন্তরোগ ও শীতলাদেবী – শীতলাদেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন-

হেমকুণ্ড কাঁখে অবিরত থাকে
মার্জনী করে সুঠাম। [৪]

দেবীর কাঁখে হেমকুণ্ড, আর হাতে মার্জনী। দেবী কর্তৃক হস্তে মার্জনী ধারণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, মার্জনী বা ঝাঁটার মূল কাজ মালিন্য দূরীকরণ। দেবীর আশীর্বাদে বসন্তরোগকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সম্ভব। কিংবা বলা যেতে পারে, শীতলা দেবী ভক্তের প্রতি কৃপাপ্রার্থী হয়ে ঝাঁটা হাতে রোগকে দূরীভূত করে থাকেন।

আমাদের দেশে সাধারণত বসন্ত ঋতুতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এর ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। এই রোগের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে দেবী শীতলার পূজা, দেবীর স্তবকাদি পাঠ এবং শান্তি স্বস্ত্যয়নের রীতি প্রচলিত। মা শীতলা বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জ্বরাসুর তাহার সহকারী। অথর্ব বেদে (১/২৫/১) 'তক্ষণ' শব্দে শীতলা রোগের উল্লেখ আছে। বসন্ত রোগের সাথে 'শীতলা' দেবীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে জানা যায়-

> "দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নান স্থানে আজিও বসন্তের পরিবর্তে শীতলা নামেই এই রোগ কথিত হইয়া থাকে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলাদেবী বিস্ফোটকের উগ্রতাপনাশিনী এবং স্কন্দপুরাণে তিনি বিস্ফোটক বিশীর্ণের অমৃতধারিণী গলগণ্ডাদি দারুন গ্রহরোগ বিনাশিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই কারণে ব্রনজ ক্ষত বসন্তরোগের তিনিই অধিষ্ঠাত্রী।" [৫]

আরোগ্যহেতু লোকঔষধ ও চিকিৎসাপদ্ধতি – সাধারণত এই রোগের লোকচিকিৎসকগণ শীতলাদেবীর সেবাইত ব্রাহ্মণ হয়ে থাকেন। যেহেতু এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি তাই প্রথমেই রোগীকে স্বতন্ত্রগৃহে (Isolation), রাখার পরামর্শ দেওয়া হতো। সেইসঙ্গে রোগীর বাকি

পরিবারবর্গকেও কিছু বিধি নিষেধের পরামর্শ দেওয়া হতো, যেমন- মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকা, লাল পোশাক পরিধান না করা এবং পান খেয়ে ঠোঁট লাল না করারও পরামর্শ দেওয়া হতো। বিশেষত ঐ কদিন রোগীর পরিবারবর্গকে পরিশীলিত জীবন যাপনের নির্দেশ দেওয়া হতো। কারণ লোকায়ত সমাজের ধারণা গৃহে বসন্ত রোগের আবির্ভাব মানেই গৃহে মা শীতলার অধিষ্ঠান। প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য, দেবী শীতলার মূর্তিকে লাল বর্ণে গঠন করা হয়ে থাকে। আবার বসন্ত রোগীকে লাল রঙ থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। অনুধাবনের বিষয় এই রোগের সঙ্গে লাল রঙের কী সম্পর্ক ? এর উত্তর প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, লাল রঙের সঙ্গে এই সংক্রামক ব্যাধির একপ্রকার সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান। লোকচিকিৎসকগণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জেনেছেন, বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে লালবর্ণহীন ঘরে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। অর্থাৎ লাল রঙ রোগীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। কেননা এই সংক্রামক ব্যাধির প্রভাবে রোগীর সমগ্র শরীর লাল হয়ে ওঠে, ফলে সেই সময়পর্বে লাল রঙের যেকোনো বস্তু বা পদার্থ চোখকে পীড়া দিয়ে থাকে।

লোকচিকিৎসকগণ এই প্রকার রোগীর দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ ও শরীরের জ্বালা দূরীকরণে রোগীদের শরীরে চন্দন, কাঁচা হলুদের রস ও মাখনের সংমিশ্রণে একপ্রকার প্রলেপন দিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে বেল কাঁটা দিয়ে স্ফোটকগুলিকে নিস্ক্রিয় করার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কাঁটা প্রদানের পূর্বরাত্রে, লোকচিকিৎসকগণ রোগীর গৃহে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল, তুলা, খাঁটি দুধ ও পাঁচটি বেলের কাঁটা রেখে বলেন- "মা আসিয়া কাঁটা দিবেন, তারপর আবশ্যক মত আমরা দিব, আবশ্যক না হলে দিব না।" স্ফোটকে বেলের কাঁটা প্রদানের পরেই গাত্র জ্বালা নিবারণের জন্য নিম হলুদ ও মাখনের প্রলেপ দিয়ে থাকেন যা 'বসন্তের গোড়' নামে পরিচিত। অন্তিমপর্যায়ে বসন্তের দাগ দূরীকরণে ক্ষতস্থানে বেশ কিছু দিন ধরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডাবের জল লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

মন্দাগ্নি বা অগ্নিমান্দ্য

মন্দাগ্নি বা অগ্নিমান্দ্য বলতে সাধারণ অর্থে 'খিদে না খোলা' (Absence of apetite) রোগকে বোঝায় । কবি কৃষ্ণরাম দাস এই মন্দাগ্নি রোগ প্রসঙ্গে বলেছেন-

মন্দ আগোন বলে শুন রায়গুণাকর।
সকল ব্যাধির মূল আমি ভয়ংকর।। [৬]

অর্থাৎ শরীরে মন্দাগ্নি দেখা দিলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অন্য বহুবিধ রোগ শরীরে বাসা বাঁধে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম- এই চারপ্রকার জঠরানলের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি ঘটে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ও খাদ্য পরিপাক জনিত অক্ষমতাই মন্দাগ্নি বা অগ্নিমান্দ্যের অন্যতম কারণ। গড়ুর পুরাণে লিখিত আছে-

> চিত্রক ৮ ভাগ, শূরণ ১৬ ভাগ, শুণ্ঠী ৪ ভাগ, পিপ্পলী ২ ভাগ, পিপ্পলিমূল ও বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, মুষলি ৮ ভাগ, এই সকলের দ্বিগুন মাত্রায় গুড় দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদক ভক্ষণ করিলে মন্দাগ্নি প্রভৃতি অজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়। [৭]

ভাবপ্রকাশ অনুযায়ী, হরীতকী ও শুঁঠ, গুড় অথবা সৈন্ধবের সঙ্গে সর্বদা আহার করলে অগ্নিবৃদ্ধি হত। এছাড়াও গুড়াষ্টাক, হিংগুষ্টক, বৃহগ্নিমুখচূর্ণ, বৈশ্বানর ক্ষার, ভাস্করলবন, শমশর্করচূর্ণ, বড়বানলচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ মন্দাগ্নি নিবারক। এই রোগের কারণ হিসেবে গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ছাড়াও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, অতিশয় মানসিক চিন্তা, তামাকু-আফিম-গাঁজা-মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনকেও দায়ী করা হয়ে থাকে।

কুষ্ঠরোগ

কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে লোকায়ত সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে কুষ্ঠরোগীকে 'মহাপাপী' বলে মনে করা হতো। কুষ্ঠরোগী সম্পর্কে এই ধারণা গঠনে পুরাণ বা সংহিতাকে অনেকাংশে দায়ী করা যেতে পারে। ভবিষ্যপুরাণ অনুযায়ী, যে ব্যক্তির গণ্ডদেশে, কপালে, নাকে ও সর্বগাত্রে কুষ্ঠব্রণ আছে, সে ব্যক্তি দেবকার্য, পিতৃকার্য প্রভৃতি সমস্ত কার্যের অযোগ্য। এমনকি সেই ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে কোন তীর্থস্থানে বা কোন তরুতলে প্রোথিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তার পিণ্ডদান, তর্পণ ও দাহকার্য অত্যন্ত গর্হিত বলে সমাজে বিবেচিত হতো। এই রোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন-

গোবাক গদের বোঁজ কুষ্ঠচন্দন হইল বুঝি
আদার স্বরূপ ঝেলো হয়। [৮]

অন্য একটি স্থানে কুষ্ঠরোগ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

সকল শরীরে কুষ্ঠ ধবল আকার।
খেঁড়ো খাএ সন্নিপাত হইল সবার।। [৯]

অর্থাৎ চর্ম আদার আকার ধারণ করলে কুষ্ঠরোগের আশঙ্কা করা হতো। কুষ্ঠরোগ মূলত আঠার প্রকারের। তার মধ্যে সাতটিকে মহাকুষ্ঠ এবং বাকি এগারটি ক্ষুদ্রকুষ্ঠ নামে পরিচিত। লোকসমাজে কুষ্ঠরোগ নিশ্চিতকরণে যে লক্ষণগুলি বিবেচিত হত, সেগুলি হল-

১। চর্ম খরস্পর্শ, ঘর্মের স্বল্পতা, স্পর্শজ্ঞানরহিতা এবং চর্মে সূচিভেদ্য বেদনা অনুভব।
২। ব্রণের শীঘ্র উৎপত্তি, দীর্ঘকাল অবস্থিতি ও অত্যন্ত বেদনা এবং রক্তের কৃষ্ণবর্ণ ধারণ।

লোকঔষধ ও চিকিৎসা - কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে হরীতকী, শ্বেত সর্ষে, হরিদ্রা, সোমরাজি, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ এই দ্রব্যগুলি সমানভাগে গোমূত্র সহযোগে পেষণ ও প্রলেপনের পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়া নিমের ফুল-মুল-ছাল-পাতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ব্রাহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিরঙ্গ সার, বারাহীকন্দ, লৌহ, গুলঞ্চ, কুড় প্রভৃতি দ্রব্য সমভাগে পেষণপূর্বক প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়।

গ্রন্থিবাত

বাতকে ভালো কথায় বলা হয় গ্রন্থিবাত । এই বাত প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন-

"খেড় হইল সনিপাত সন্দেশ হইল বাত
তেলে হয় তিলের আকার।।" [১০]

মূলত অস্থি- সন্ধি প্রদাহ বাত বা আর্থ্রারাইটিস (Arthritis) নামে পরিচিত। এই রোগে প্রধানত অস্থি- সন্ধি আক্রান্ত হলেও হাড়ের প্রদাহ, ক্ষয় রোগ, মাংস পেশির ব্যথা মেরুদণ্ডের প্রদাহ ও আড়ষ্টতা বাত রোগের পর্যায় ভুক্ত।

লক্ষণ

অস্থিসন্ধিতে ব্যথা অনুভব, শরীরের যে কোন অংশ ফুলে ওঠা, অনিদ্রা, স্বাভাবিক চলনে অক্ষমতা, শারীরিক ওজন হ্রাস, পরিমিত ঘুমের অভাব, পেশির ব্যথা ও দুর্বলতা।

চিকিৎসা

বাতরোগ উপশমে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 'অহিফেন' সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও ঊর্ধ্বপাতিত গন্ধক দুগ্ধ সহযোগে পান করলে এই পীড়া থেকে কিছুটা শান্তি মেলে। দেহে প্রলেপনের জন্য কুব্জ প্রসারনি তৈল ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং সেবনের জন্য গুলগুল।

গোদ

গোদ বা ফাইলেরিয়া হল একপ্রকার পরজীবী ঘটিত রোগ। শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যাওয়া, চামড়া ও এর নীচের কোষগুলি মোটা হয়ে যাওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই গোদ রোগের পরিণাম ও লক্ষণ প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন –

গোদ বলে আমি গিয়ে ধরি হাত পা।
নারিতে নাহিক পারে পরবশ গা।। [১১]

অর্থাৎ গোদ সাধারণত হাত এবং পায়ে হয়ে থাকে। এই রোগের প্রভাবে রুগী স্বাভাবিক গমনে অসমর্থ হয়ে পরেন। দৈনন্দিন কাজ কর্মে সর্বদা অন্যের সহায়তার প্রয়োজন পরে। এই রোগের প্রসঙ্গে কবি অন্য একটি স্থানে বলেছেন-

গোদ বলে আমি গিয়ে হই দুই পায়।
বোঁজ আর কুয়াজ্বর পায়ে পায়ে ধায়।। [১২]

গোদ রোগের জীবাণু কেবলমাত্র হাত বা পাকেই আক্রান্ত করে ক্ষান্ত থাকে না, এই রোগের প্রভাবে মানব শরীরে ‘বোঁজ’ ও ‘কুয়াজ্বর’ এরও প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। এই কুয়াজ্বরকে কবি স্থানে স্থানে জ্বরবান নামেও উল্লেখ করে জানিয়েছেন-

তবে ধরে জ্বরবান জ্বরেতে হরিল জ্ঞান
ছটফট দেখ গড়াগড়ি।। [১৩]

মোরগী/মৃগী (Apilepsy)

মস্তিষ্কে আঘাত জনিত কারণে, চর্মে কিংবা দেহাভ্যন্তরে কোন অঙ্গে, কোন অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটলে, অন্ত্রে কৃমির সঞ্চার ঘটলে, মস্তিষ্কের গঠন অপরিমিত হলে, (মাথার এক দিকের চেয়ে অপর দিকের গঠন ভিন্ন হলে) মস্তিষ্কের ভিতরে অর্ব্বুদ, কীটাদি, পরাঙ্গপুষ্ট কিংবা প্রদাহাদি বিদ্যমান থাকলে, অথবা ভিতরে অস্থি বৃদ্ধি হলে মৃগী রোগের সৃষ্টি। পূর্বকালে কোন কোন জাতির এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে দেবতারা রুষ্ট হলে মানুষকে শাপ দেন; মৃগী রোগ সেই অভিসম্পাতের ফল। ইহুদি, গ্রিক ও রোমক পণ্ডিতরা এই রোগকে ‘ভূতে পাওয়া’ বলে মনে করতেন। কবি কৃষ্ণরাম দাস এই রোগ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

তবে ত মোরগী ব্যাধি সে বড় বিষম।
মানুষের উপরেতে দিতে এক যম।। [১৪]

অর্থাৎ মৃগী রোগ মানেই যেন সাক্ষাৎ যমের দর্শন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে মানুষ যেমন আচরণ করে, মৃগী রোগীর আচরণ কতকটা সেইরকমের হয়ে থাকে। এই রোগের প্রভাবে রোগী হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। যদিও অজ্ঞান হওয়ার আগে রোগী কতগুলো পূর্বলক্ষণ জানতে পারেন। তবে এই পূর্বলক্ষণ সবার ক্ষেত্রে সমান নয়, কারো ক্ষেত্রে মাথায় ব্যথা অনুভূত হয়, বা হঠাৎ মাথা ঘুরতে থাকে, তখন রোগী চারিদিকে নানা প্রকার বর্ণ দেখতে পায়। বায়ু জনিত মৃগী, লাল ও কালো প্রভৃতি নানা বর্ণের রূপ দেখতে পায়, পিত্তজনিত মৃগীরোগী হলুদ ও রক্তবর্ণ দেখে। কখন কখন সম্মুখে আগুন জ্বলছে বলে অনুভূত হয়। আবার কানের ভিতর ভিন্ন প্রকার শব্দ অনুভূত হয়। তখন রোগী স্পষ্ট কিছু দেখতে পায় না, তারপর শ্বাসনালীতে ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে এবং মূর্ছিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগী হতজ্ঞান হওয়ার পূর্বে এই সমস্ত লক্ষণগুলি টের পান। কোন কোন রোগী মূর্ছিত হওয়ার পূর্বে কটিদেশ থেকে পৃষ্টের উপর দিকে উষ্ণ অথবা শীতল জলের প্রবাহ অনুভূত করেন। কোন কোন সময় রোগী ভয়ঙ্কর চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হাতের সমস্ত আঙুল দৃঢ় ও জরিভূত হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুটিয়ে হাতের

তলে এসে যায়। ওষ্ঠ মৃতদেহের মতো বিবর্ণ হয়, দাঁতকপাটি লাগে। কোনো কোনো রোগী এই অবস্থায় উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেন। কিঞ্চিৎকাল পরে এই প্রকার অবস্থা দূরীভূত হয় এবং রোগী জ্ঞান ফিরে পান। জ্ঞান ফিরে পাবার পর রোগী পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারেন না।

গলগণ্ড, কুরণ্ড ও কাস

কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে গলগণ্ড, কুরণ্ড এবং কাস নামক রোগের উল্লেখ করেছেন। আলাদা আলাদা করে এই তিনটি রোগের উল্লেখ করেন নি। শুধুমাত্র রোগের পরিচয়টুকু দিয়েছেন মাত্র। শুধুমাত্র 'কাস' রোগের পরিণাম সম্পর্কে জানিয়েছেন-

গলগণ্ড বলে আমি কুরণ্ডের খুড়া।
কাস বলে আমি জোয়ান করিতে পারি বুড়া।। [১৫]

অর্থাৎ গলগণ্ড ও কুরণ্ড রোগের মধ্যে যেন সহোদর সম্পর্ক। এক রোগের প্রভাবে অন্য রোগের আবির্ভাব। আর কোন ব্যক্তি কাস রোগে আক্রান্ত হলে তার বউওস যেন এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায় বলে মনে হয়। এমনকি কাস রোগের প্রভাবে যুবক যেন বৃদ্ধদশাগ্রস্থ বলে প্রতিভাত হয়। এখন এই রোগগুলির পরিচয় ও ঔষধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

কাস

সুশ্রুত সংহিতা অনুযায়ী মুখ ও নাক দ্বারা মাত্রাতিরিক্ত ধূম ও ধূলা প্রবিষ্ট হলে, অপরিপক্ক রসের ঊর্ধ্বগমন ঘটলে, রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, মল মুত্রাদির বেগ ধারণ, এবং হাঁচির বেগ ধারণ এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হলে কাস রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কাস রোগ ছয় প্রকারের- বাতজ, পীতজ, শ্লেশ্মজ, সন্নিপাতজ, ক্ষতজ, ক্ষরজ। খুকখুকে কাসি এই রোগের প্রধান উপসর্গ।

লোকঔষধ- বেল, সোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গনিয়ারী এই পঞ্চমূল; অথবা শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারীর ক্কাথ পিপুল চূর্ণের সঙ্গে পান করলে ছয় প্রকার কাসেরই উপকার পাওয়া যায়।

গলগণ্ড

গলগ্রন্থির এক বা উভয় সূক্ষ্মভাস (Lobes) ফুলে স্থায়িত্বলাভ করলে চিকিৎসকগণ তাকে গলগণ্ড রোগ বলে থাকেন। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাহুমুল কিংবা গণ্ডদেশে আমলকীর মতো আকারযুক্ত গ্রন্থিমালার উৎপত্তি হলে, তাকে গণ্ডমালা বলে। দূষিত কফ ও মেদই এই রোগের মূলকারণ। গলগণ্ড মূলত অলাবুর মত লম্বমান, শরীর ক্ষীণ হলে ক্ষীণ এবং শরীর বর্ধিত হলে এটিও বর্ধিত হয়। রোগীর মুখ স্নিগ্ধ হয় এবং গলনালিতে সবসময় শব্দ হয়ে থাকে। এই গলগণ্ড রোগ সম্পর্কে বিশ্বকোষ গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড থেকে জানা যায়-

> পূর্বকালে য়ুরোপে গণ্ডমালা রোগের চিকিৎসা বড় অদ্ভুত উপায়ে হইত। বাইবেল পাঠে জানা যায়, যাজকেরা কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া এই রোগ আরোগ্য করিতেন। প্লিনি, টাসিসাস, সিউটোনিয়া প্রভৃতি গ্রন্থেও স্পর্শ দ্বারা গণ্ডমালা আরোগ্যের কথা আছে। দুইশত বর্ষ পূর্বের স্কন্দনাভ জার্ম্মান ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থে রাজস্পর্শে এই রোগ ভালো হইবার কথা দৃষ্ট হয়। এই জন্য ইংরাজি চলিত ভাষায় এই রোগ 'King's Evil' নামে পরিচিত। বঙ্গদেশেও স্থান বিশেষে ইহাকে 'রাজ গাঁড়' বলে। [১৬]

কুরণ্ড

অণ্ডকোষে জল জমে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পেলে তাকে 'কোরণ্ড' রোগ বলে। এই কোরণ্ড রোগকেই কবি কৃষ্ণরাম দাস 'কুরণ্ড' বলেছেন। এই রোগ মূলত একশিরা বা হাইড্রোসিল রোগের সমগোত্রীয়। কিন্তু একশিরা বা হাইড্রোসিল রোগের সাথে 'কোরণ্ড' রোগের একটি পার্থক্য লক্ষ্য

করা যায়। একশিরা বা হাইড্রোসিলের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষের চামড়া পুরু এবং মোটা হলেও এর মধ্যে কোন তরল পদার্থের সঞ্চালন পাওয়া যায় না।

পীলে (Spleen)

কথ্য বাংলায় প্লীহাকে 'পীলে' বলা হয়। মূলত এটি রক্তের Resurver হিসেবে কাজ করে। একজন স্বাস্থ্যবান পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্লীহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭-১৪ সেমি এবং ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়াকে কথ্য বাংলায় পীলে জ্বর বলা হত। সাধারণত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি নানাকারণে প্লীহা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই রোগের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন-

পেলায় কাঁকুড় শশা অগ্রমাস পীলে খাসা
যার নামে লোকে লাগে ভয়।। [১৭]

অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে যে সমস্ত ব্যাধি জনমানসে ভীতির সঞ্চার করতো, তার মধ্যে পীলে অন্যতম।

উদরি (Ascites)

লোকায়ত সমাজে 'পেটে জল জমা রোগ' উদরি নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উদরাময় এবং উদরি একই রোগ নয়। উদরি রোগ লক্ষণ ভেদে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। কবি কৃষ্ণরাম দাস এই উদরি রোগের উল্লেখ করে লিখেছেন –

কমলা সন্দেশ চিনি উদরি (হইল) ফেনি
ফোড়া হইল বদরি আকার ।।" [১৮]

আবার অন্য একটি স্থানে লিখেছেন-

পিলায় জুড়িল এই শশা যে খাইল সেই
কার কার হইল উদরী।। [১৯]

এই উদরি রোগ সম্পর্কে বিশ্বকোষ গ্রন্থ থেকে জানা যায়- বাতোদরে নাভির নিম্নভাগের গুরুতা ও উদর পরিপূর্ণ থাকে, শ্লৈষ্মিক উদরে সমস্ত উদরও গুরু ভারাক্রান্ত হয়, বদ্ধোদরে হৃদয় ও নাভির মধ্যদেশ শোথ পূর্ণ হইয়া উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; জলোদরে ও জাতোদকোদরে রোগীর উদর শোথের প্রবলতা বশত বৃহৎ জলপূর্ণ থলের ন্যায় বোধ হয় ও চকচকে দৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে মুত্রের এবং বায়ুরও রোধ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জথারীতি মূত্রের প্রবর্তন ও উদরস্থ বায়ুর নির্গমনের অভাব লক্ষিত হয়।

সন্নিপাত জ্বর

মঙ্গলকাব্যের সময় পর্বে লোকায়ত সমাজে যে যে প্রকারেরে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত, তার মধ্যে সন্নিপাত জ্বর ছিল সবচেয়ে ভীতিজনক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর নাটকে অমলের যে জ্বরের কথা আমরা জানতে পারি, তা হল সন্নিপাত জর। আমলের রোগ প্রসঙ্গে কবিরাজমশাই, আমলের পিসেমশাইকে এই সন্নিপাত জ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন-

পৈত্তিকান সন্নিপাতজান কফবাতসমুদভবান। [২০]

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ কুপিত হয়ে সন্নিপাত উৎপাদন করে। যদিও এই তিনটি গুণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী হলেও ঈর গুণ অপরকে ধ্বংস করে না বায়ু, পিত্ত ও কফের সঞ্চার ও প্রকপের কাল প্রত্যেকের ভিন্ন প্রকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

> এইরূপ অবস্থায় তিনটিতে মিলিয়া কিরূপে এককালে সন্নিপাত জ্বর উপস্থিত করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে ত্রিদোষজনক কারণের বলবত্তাপ্রযুক্ত এই তিনটি দোষ একেবারেই কুপিত হইয়া থাকে। [২১]

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে তেরো প্রকারের সন্নিপাত জ্বরের উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই জ্বরের চিকিৎসাপদ্ধতিরও বিধান নির্দেশিত হয়েছে-

> সন্নিপাতজ্বরে প্রথম কর্তব্য – সন্নিপাত জ্বরে প্রথমে আমদোষ ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্যক। তৎপরে পিত্ত ও বায়ুর উপশম করিতে হয়। আমদোষ শান্তির জন্য পঞ্চকোল ও আরগ্বধাদি পাঁচন সেবন করাইবে। শ্লোষ্মশান্তির জন্য সৈন্ধব লবন, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চুর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃপুনঃ অর্থাৎ থুথু ফেলিবে। সমস্ত দিনের মধ্যে এইরূপ ৩\৪ বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যায়। [২২]

কবি কৃষ্ণরাম দাস তার শীতলামঙ্গল কাব্যে বাত রোগের সাথে এই সন্নিপাত জ্বরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন-

খেড় হইল সনিপাত   সন্দেশ হইল বাত
তেলে হয় তিলের আকার।। [২৩]

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য থেকে লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসার অনুষঙ্গ থেকে পরিষ্কার সেযুগের মানুষ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে যেমন লোকঔষধের শরণাপন্ন হয়েছে, ঠিক তেমনি দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন দেবদেবীরও শরণাপন্ন হয়েছে। দেবীকে কেন্দ্র করে মানুষ কিছু রীতি নীতি পালন করতেন, যার আড়ালে রয়েছে আরোগ্য লাভের প্রচেষ্টা। যার ভিত্তি মানসিক শক্তি সঞ্চয় বা আত্মবিশ্বাস অর্জন। যা আরোগ্য লাভে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রিঃ, পৃ- ২৫৮।
২। তদেব, পৃ- ২৫৮।
৩। তদেব, পৃ- ২৫৬।
৪। তদেব, পৃ- ২৫১।
৫। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বকোষ (সপ্তদশ খণ্ড), ২১/৩ নং শান্তিরাম ঘোষের স্ট্রীট, বাগবাজার বিশ্বকোষ প্রেস, শ্রী রাখাল চন্দ্র দ্বরা মুদ্রিত, ১৩১৭, পৃ- ৭০৮।
৬। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রিঃ, পৃ- ২৫৮।
৭। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বকোষ (১৪ তম খণ্ড), ২১/৩ নং শান্তিরাম ঘোষের স্ট্রীট, বাগবাজার বিশ্বকোষ প্রেস, শ্রী রাখাল চন্দ্র দ্বরা মুদ্রিত, ১৩১৭, পৃ- ১৬৯।
৮। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রিঃ, পৃ- ২৫৩।
৯। তদেব, পৃ- ২৫৩।
১০। তদেব, পৃ- ২৫২।
১১। তদেব, পৃ-২৫৯।
১২। তদেব, পৃ- ২৫৯।

১৩। তদেব, পৃ- ২৬০।
১৪। তদেব, পৃ- ২৫৯।
১৫। তদেব, পৃ- ২৫৯।
১৬। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বকোষ (পঞ্চম খণ্ড), কলিকাতা ৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেস, ১৩০১, পৃ - ২৮৬।
১৭। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রিঃ, পৃ- ২৫৩।
১৮। তদেব, পৃ- ২৫৩।
১৯। তদেব, পৃ- ২৬০।
২০। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাকঘর, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ- ২।
২১। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত, বিশ্বকোষ (১৪ তম খণ্ড), ২১/৩ নং শান্তিরাম ঘোষের স্ট্রীট, বাগবাজার বিশ্বকোষ প্রেস, শ্রী রাখাল চন্দ্র দ্বরা মুদ্রিত, ১৩১৭, পৃ- ১৮৩।
২২। তদেব, পৃ- ১৮৩।
২৩। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিতঃ কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রিঃ, পৃ- ২৫২।

আবুল কাসেমের ‘অতীশ’ : বৌদ্ধধর্মে বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুরণ

কনক মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: হাজার বছর ধরে তিব্বতে মানুষ ‘দেবো ছেনপো’ বা মহাপ্রভু বলতে বাঙালি বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে মেনেছেন ও জেনেছেন। ‘তাঞ্জুর’ ও ‘কঞ্জুর’ শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলনে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বিপুল কর্মজীবন ও রচনা সম্পর্কে কিছু তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার হাজার বছর পরে এসেও অতীশ দীপংকর বাঙালির কাছে উজ্জ্বল চরিত্র। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস। অতীশ দীপঙ্কর মহাযান দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মহাযান ও হীনযানের দ্বন্দ্ব ও অতীশ দীপঙ্করের জীবনী ‘অতীশ’ উপন্যাসে আবুল কাসেম চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে অতীশ দীপংকর তিব্বতে গমন পর্বটিই আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে গিয়ে অতীশ দীপঙ্কর দেখেন কৌম সমাজের লোকেরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যোগিনী-ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবদেবীকে মহাযান দেবায়তনে স্থান দিয়েছেন। নানা গুহ্য, মন্ত্র-তন্ত্র, ধারণা তাদের লৌকিকধর্মকে প্রধান করেছে, ফলে গৌণ হয়েছে বৌদ্ধধর্ম। এই জায়গাটি বুঝতে পেরে লৌকিক ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়েই তিনি শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও নানা উচ্চমার্গীয় যোগাচার প্রতিষ্ঠা করেন। যা সহজসাধ্য ছিল না। এখানেই তিনি বৌদ্ধ দর্শনের নতুন অভিমুখ নির্মাণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। উপন্যাসটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যাবে কেনই-বা এত বছর পর অতীশ দীপঙ্করের চিন্তা ও ভাবনাকে চর্চা করা প্রয়োজন।

সূচক শব্দ: অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম, উপন্যাস, আবুল কাসেম, নব্য পথ, বৈপ্লবিক চেতনা, বৌদ্ধ দর্শন।

মূল আলোচনা:

> এই অনাদি পুনর্জন্ম চক্রে
> যখন তোমার ক্লেশের অন্তহীন প্রবৃত্তি জেগে ওঠে
> সুযোগ ও পরিস্থিতির অশুভযোগে,
> তখন আমার এই কবিতাটি স্মরণ কোরো
> তোমাকে সর্তক করতে যা আমি রচনা করেছি।[১]

তিব্বতি ভাষায় জেবো, জেবোজে অর্থে প্রভু, জেবো ছেনপো অর্থে মহাপ্রভু। গত একাদশ শতক থেকে বিশ শতক— এই হাজার বছর ধরে তিব্বতের মানুষ জেবোজে, জেবো ছেনপো বলতে প্রধানত যাঁকে জেনেছেন ও মেনেছেন, তিনি আমাদের বাঙালি বৈদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আবুল কাসেমের *অতীশ* (২০১৫) উপন্যাসে তাঁর সুবর্ণদ্বীপের সময় পর্ব থেকে তিব্বতে শেষ জীবন পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে। সুবর্ণদ্বীপে থাকাকালীনই অতীশ দীপংকরের গ্রন্থ রচনা শুরু। তারও উল্লেখ উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম এবং বুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা মিথ ও কিংবদন্তি। সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম, পুনর্জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ, নির্বাণ ইত্যাদিকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে নানা আখ্যান। বৌদ্ধমতে, এ রকম বিশ্বাস করা হয় যে তৃষ্ণার বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বারংবার সংসারে ফিরে আসতে হবে। বুদ্ধের ধর্ম-কায় কোনও উচ্চতর স্বর্গে থেকে শত-সহস্র বছর ধরে নির্মাণ-কায়রূপে বারংবার জন্ম নিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করতে করতে অবশেষে সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে বুদ্ধত্ব অর্জন করেছেন। সেই ধর্ম-কায় বুদ্ধ নিজেই ঠিক করেছিলেন কোন শতকে, কোন সালে, কোথায় এবং কার গর্ভে তিনি জন্ম নেবেন। এসব মিথ, উপকথা ও কিংবদন্তির মতোই শ্রীজ্ঞান অতীশের ভক্তদের কাছে দীপ্তি ছড়ায় তাঁকে নিয়ে প্রচলিত উপকথা ও কিংবদন্তিগুলো। এসব কাহিনির বাহ্যিক গড়ন অলৌকিকতায় মোড়ানো থাকলেও এদের মধ্যে নিহিত আছে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

গৌতম বুদ্ধ বোধি লাভ করার আগে পৃথিবীতে মানুষ ও পশুপাখিরূপে বহুবার জন্ম নিয়েছেন। সেই সব জন্মের গল্প নিয়েই রচিত হয়েছে জাতক-কাহিনি। তিব্বতীয় ইতিহাসবিদ সুমপা অতীশ দীপংকরের জীবনী লিখেছেন। সেখানে তাঁর পূর্বজন্মের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, বুদ্ধ যখন সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে পৃথিবীতে আসেন, তখন অতীশ রাজগৃহের এক গৃহস্থরূপে জন্ম নিয়েছিলেন, যাঁর নাম ছিল জিনপুত্র ভদ্রাচার্য। তিব্বতীয় উৎসগুলোকে অবলম্বন করে অতীশের একটা নতুন জীবনী লেখেন নাগওয়াং নিমা। এটাকে সংশোধন ও সম্পাদনা করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেন লামা চিম্পা। কিন্তু আবুল কাসেমের আগে বাংলায় অতীশ নিয়ে উপন্যাস রচিত হলেও সেখানে অতীশের বৌদ্ধধর্ম-দর্শন তেমন আশ্রয় পায়নি। আবুল কাসেম অতীশ দীপংকরের সেই না-বলা অধ্যায়কেই তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরলেন।

অবিভক্ত বাংলার বা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি মাটির ঢিবিকে 'অতীশের ভিটা' অথবা 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিব্বতের ধর্ম-ইতিহাস, রাজকাহিনি, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রগাঁথা ও সর্বোপরি তাঞ্জুর নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ-সংকলন— সে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মহৎ ও বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ তা তিব্বতি সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। আবুল কাসেমও এই গ্রন্থগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপন্যাসটি ঝরঝরে গদ্যে রচনা করেছেন।

গল্পের মোড়কে দর্শনচর্চা এর আগেও বাংলা সাহিত্যে হয়েছে। উনিশ শতকে অনেকেই কাহিনির ফাঁকে-ফাঁকে গল্প থামিয়ে অধ্যাত্ম দর্শনের অবতারণা করেছেন, কিন্তু তা কাহিনির সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত হয়নি— বিবৃতির স্তরে রয়ে গেছে বলে মনে হয়— ফলে দার্শনিক তত্ত্ব ও কাহিনির অগ্রগতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন। কিন্তু আবুল কাসেমের কাহিনির সঙ্গে যেমন আছে রূপবৈচিত্র্য তেমনই আছে দর্শনের স্ফুরণ।

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমুদ্রবেষ্টিত একটি দ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ। শ্রীজ্ঞান অতীশ এই সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশ) কাটিয়েছিলেন একযুগ সময়। বর্তমানে দেশটার নাম সুমাত্রা। একসময় প্রাচ্যে এটা ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান একটা কেন্দ্র। সুবর্ণদ্বীপের পাশেই জম্বুদ্বীপ। সমুদ্রপথে সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছাতে অতীশের চৌদ্দ মাস সময় লাগে। পাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই দেশের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অতীশ সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা করেছিলেন খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে। সুবর্ণদ্বীপ যাবার আগে তিনি অধ্যয়ন করেন কৃষ্ণগিরি বিহার ও নালন্দা মহাবিহারে। অতীশ যখন সুবর্ণদ্বীপে চন্দ্রকীর্তির ছাত্র, তখন সুবর্ণদ্বীপের রাজা গুরুপাল

দেবমতী নামের এক ভিক্ষুকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। অনুরোধ করেছিলেন সত্য প্রসঙ্গে কিছু লিখতে। তিনি তখন রচনা করেন *সত্যদ্বয়-অবতার* নামে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ। এই সময় থেকেই তিনি বৌদ্ধদর্শন নিয়ে রচনা শুরু করেন। আবুল কাসেম *অতীশ* উপন্যাসের সুবর্ণদ্বীপের বর্ণনা করেছেন—

> সুবর্ণদ্বীপের উপকূল অসম্ভব সুন্দর। পাহাড়, বালি, সৈকত আর জঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে সৌন্দর্য বিলাচ্ছে। পাখি এবং বন্যপ্রাণীদের নির্ভয় উপস্থিতি ও পদচারণা সৌন্দর্যের মাত্রাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।[২]

সুবর্ণদ্বীপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় তেঙ্গুরে সংরক্ষিত ধর্মকীর্তি রচনাবলির তিব্বতি অনুবাদের একটি পুস্তিকায়। সপ্তম শতকে সুবর্ণদ্বীপে শ্রীবিজয় নামে একটি বিশাল সমুদ্র রাজ্য ছিল। রাজা ছিলেন চূড়ামণি বর্মন। মশলার জন্য তার খ্যাতি বিস্তৃত ছিল সুদূর আরব পর্যন্ত।

অন্যদিকে ধর্মপাল নালন্দা মহাবিহারের সমৃদ্ধি আনয়নের পাশাপাশি সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমৃদ্ধ সুবর্ণদ্বীপের প্রতি চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের দৃষ্টি পড়ে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে তখন শৈলেন্দ্রদের শাসন। রাজা দীপঙ্করকে দায়িত্ব দিলেন দুর্লভ গ্রন্থের নিরাপত্তার। চোলরাজার আক্রমণের পর অতীশ ভারতে ফিরে আসেন। সাদরে আহ্বান করলেন রাজা মহিপাল। এরপর থেকেই আবুল কাসেমের অতীশের বৌদ্ধধর্মসংস্কার সম্পর্কে পাঠকের সামনে অবতীর্ণ হন।

অতীশ যখন ভারতে আসেন তখন বিক্রমশীল বিহারের বিশৃঙ্খলা অবস্থা। এই বিহারটি নির্মাণ করেন মহীপালের পূর্বপুরুষ ধর্মপাল। তার উপাধি ছিল বিক্রমশীল। তাঁর নামেই বিহারটির নামকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন লেখক। কখনও মনেই হয়নি যে একজন ঐতিহাসিক চরিত্রের খটমট আখ্যান এটি। অতীশ দীপংকরের দুই শিষ্য ব্রোমতোনপা ও ছুলঠিম জলবার স্তোত্রমূলক কবিতায় অতীশের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানা যায়। ব্রোম স্তোত্রে বলেছেন—

> ত্রিসম্পন্ন বঙ্গের সহর রাজকুলে
> যে বংশের শান্তিজীবের অনন্ত প্রদীপ জ্বলে
> সেই বংশজাত
> দীপংকরের শ্রীজ্ঞানের চরণে প্রণিপাত।[৩]

ছুলঠিম জলবার স্তোত্র বেশ দীর্ঘ। তিনি বলেন—

পুবের (দেশে) অত্যাচার্য সাহোরে/ এক মহান নগর ছিল নাম বিক্রমপুর/ এক রাজগৃহ ছিল তার কেন্দ্রস্থলে/ বিরাট বিস্তৃত প্রাসাদ/ স্বর্ণধ্বজ নাম তার/ নৃপতি ছিলেন/ রাজস্ব-ধনে-জনে চৈনিকরাজ তোঙখুনের সমান/ কল্যাণশ্রী সেই রাজার নাম/ রাজ্ঞী প্রভাবতী/ তিনপুত্র পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ আর শ্রীগর্ভ/ মধ্যম চন্দ্রগর্ভ/ বর্তমানে মহামান্য গুরু (সংক্ষেপিত)। এই চন্দ্রগর্ভই আমাদের অতীশ দীপংকর।

নয়পাল সময় আচার্য হিসেবে অতীশ যখন বিক্রমশীল মহাবিহারে যোগ দেন তখন ১১৪ জন আচার্য সেখানে শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত। ছাত্রের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। আবুল কাসেম ভুসুকুপা ও হেরুযোই অখ্যানটি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন উপন্যাসে। ভুসুকু চর্যাপদকর্তা। সে গান বাঁধে। হেরুযোইকে সুর করে গান শোনায়। ভুসুকু হেরুযোইকে হরিণা

নামে ডাকে। চোখ বন্ধ করে মনযোগ দিয়ে হেরুযোই ভুসুকুর গান শোনে। দু'জনের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চলে। আবুল কাসেম তাঁদের সখ্য এইভাবে বর্ণনা করছেন—

তেন চচুপই হরিণা পিবইণ পানী।
হরিণা হরিণী নিলয় ণ জানী।।
হরিণী বোলও শুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হো ভান্তো।।
তরংগতে হরিণার খুর ণ দাসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হি অহি ণ পইসই।।

(হরিণ তৃণ ছোঁয় না, পানি পান করে না। হরিণ জানে না হরিণীর ঠিকানা। হরিণী বলে, শোন তুমি হরিণ, ভান্ত হয়ে এ বন ছেড়ে যাও। তীব্র গতিতে ধাবমা হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে তা প্রবেশ করে না।)

হরিণা চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন গানটি। হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেছে। বললেন, এত তাড়াতাড়ি শেষ করলে সিদ্ধ? ভুসুকু বললেন, উপায় কী?

কী যে দারুণ গান করো তুমি! চিত্ত চলে যায় পদ্মা পার হয়ে। ঘুরে বেড়ায় গহীন বনের ভেতর। কোথায় লুকায় কে জানে!

তবুও তোমার চিত্তচাঞ্চল্য থামে না।

তুমি কী থেমেছ কখনও? একটা হৃদয় আছে বটে, তাকে আমি স্পর্শ করতে পারি না। তোমার জন্য ধর্ম-কুল-জাত সবই ছাড়লাম। এখন তোমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরি, কিন্তু তোমাকে পাই না।

একেবারেই পাও না?

মাঝে মাঝে পাই, মাঝে মাঝে পাই না।[৪]

ভুসুকুর বাড়ি বিক্রমপুরে। চর্যাপদে তিনি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন। ভুসুকু একাধারে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য, পদকার, কবি এবং সুরকার ও গায়ক। ভুসুকুর গুরু অতীশ দীপংকর। হেরুযোইকে অতীশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ভুসুকুর মাধ্যমে সাহিত্যিক এখানে বজ্রযানী মতের তিনটি নির্বাণের কথা বলছেন—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাসুখ। শূন্যতার পরম জ্ঞান নির্বাণ। শূন্যতত্ত্বের স্রষ্টা নাগার্জুন বলেন, দুঃখ কর্মফল, সংসার সমস্তই শূন্য। বজ্রযানীরা নির্বিকল্প জ্ঞানের নামকরণ করলেন নৈরাত্মা। বললেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ করলে এই নৈরাত্মাতেই বিলীন হয়। নৈরাত্মা দেবিরূপে কল্পিত। বজ্রযানীদের মতে, মৈথুনযোগে চিত্তের যে পরমানন্দময় ভাব, যে এককেন্দ্রিক ধ্যান, তাই বোধিচিত্ত। ভুসুকুর বজ্রযানী থেকে সহজযানীতে উত্তরণও আবুল কাসেম উপন্যাসে দেখাচ্ছেন। শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা হল পুরুষ অর্থাৎ নারী-পুরুষের মিথুন মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দ, তাই মহাসুখ। এ মহাসুখই ধ্রুবসত্য। এই সত্যের মুখোমুখি হয়েছে ভুসুকু ও হেরুযোই।

এরপর অতীশ তিব্বতের রাজার ডাকে সাড়া দিয়ে ধর্মসংস্কারের কাজে তিব্বতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নয়পালকে না জানিয়েই একরকম চলে এসেছিলেন অতীশ। তিব্বতিরা অতীশকে প্রচুর সোনা দিয়েছিলেন। তিব্বতে যাওয়ার প্রাক্কালে সোনাগুলো চার ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ পণ্ডিতদের সম্মান দক্ষিণার জন্য, এক ভাগ বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) নিত্যপূজার জন্য, তৃতীয় ভাগ বিক্রমশীল বিহারের জন্য এবং চতুর্থ ভাগ লৌকিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য তিব্বতরাজকে প্রদান করবেন। যখন তিনি তিব্বতে গমন করলেন তাঁর বয়স তখন ষাট ছুঁই

ছুঁই। এই সময় তিব্বতে প্রাচীন 'পোন' ধর্মের আধিপত্য। বৌদ্ধধর্মের কথা বলতে গিয়ে এ ধর্মের যক্ষ-রক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন অতীশ। তিব্বতে যাওয়ার আগে অতীশের নেপালরাজ অনন্তকীর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

নেপালে থাকাকালীন অতীশকে নয়পাল তাঁর না-থাকার শূন্যতা অনুভব করে একটি পত্র লিখেছিলেন। অতীশ সেই পত্রের দীর্ঘ উত্তর দেন। রাজা নয়পালকে চিঠিটা লেখেন ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে। এই পত্রটি তিব্বতীয় অনুবাদে *বিমলরত্নলেখ* নামে 'তাঞ্জুরে' সংরক্ষিত আছে। আবুল কাসেম পত্রটির গদ্যানুবাদ করে উপন্যাসে সংযোজন করেছেন। তার কিছু কিছু অংশ তুলে দিলে একজন রাজা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা বোঝা যাবে।

> ...নিদ্রা মূর্খতা ও আলস্য পরিত্যাগ করে অবিরাম সাধনা করবেন ও সর্বদা সতর্ক থাকবেন। সর্বনা স্মরণ, জ্ঞান ও যত্ন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলো সর্বভাবে প্রহরা দেবেন। দিবারাত্র বারবার মনের গতি পরীক্ষা করবেন। নিজের দোষ সম্পর্কে চক্ষুষ্মানের মতো ব্যবহার করুন। কিন্তু অন্যের দোষ সম্পর্কে অন্ধ হবেন। অন্যের দোষ সন্ধান করবেন না। নিজের দোষ প্রচার করবেন। অন্যের গুণ প্রচার করবেন নিজের গুণ গোপন রাখবেন।
>
> উপঢৌকন এবং উপহার গ্রহণ করবেন না। লাভ এবং যশ সর্বদা পরিহার করবেন। মৈত্রী ও করুণা ধ্যান করবেন। বোধিচিত্ত সুদৃঢ় করবেন। দশ অকুশল কর্ম পরিহার করবেন। শ্রদ্ধা দৃঢ় করবেন। কামনা-বাসনা খর্ব করে আত্মসন্তোষ লাভ করে ধর্ম আচরণ করবেন।
>
> ক্রোধ ও অহমিকা বর্জন করুন। চিত্তকে নম্র করুন। অসার জীবন ত্যাগ, করে ধর্মের জীবন যাপন করুন। সাংসারিক সকল বিষয় ত্যাগ করে আর্যধনে ধনী হোন। কোলাহলপূর্ণ আমোদ-প্রমোদের স্থান ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বাস করুন। বাক্যবাগীশ হবেন না। জিহ্বাকে সংযত রাখবেন। গুরু ও আচার্যের সান্নিধ্যে আসলে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের সেবা করবেন।
>
> ...জনক-জননী সন্তানের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেন, সকলের প্রতি সেই ব্যবহারই করবেন। ...পাপাচারী বন্ধুকে পরিহার করে কল্যাণমিত্রকে অনুসরণ করুন। ...পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। পুণ্যের জন্য সযত্ন হবেন। এমনকি সাংসারিক বিষয়ে যখন নিযুক্ত থাকবেন, তখনও চিত্তকে নিরাসক্ত রাখবেন। চিত্ত অহংকারে স্ফীত হলে, সেই অহমিকা দমন করবেন। চিত্ত অমনোযোগী হলে, তখনই শুরুর উপদেশ স্মরণ করবেন।[৫]

আবুল কাসেম শুধু অতীশের জীবনী রচনা করেননি। তাঁর ধর্মদর্শন, বিজ্ঞানচিন্তাকেও তুলে ধরেছেন সুকৌশলে। গল্প যত এগিয়েছে ততই ফুটতে থাকে বিশাল ক্যানভাসে আঁকা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীশের বৌদ্ধদর্শন চিন্তা। এরপর অতীশের তিব্বতে গমন, গ্রন্থ রচনা ও ধর্ম কারেকশন পর্ব।

তিব্বতের পোন ধর্মাবলম্বীরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী। পোনরা তিব্বতে প্রচার করেছেন প্রাচীন দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে দেশে মহামারী, প্লাবন, বজ্রপাত প্রভৃতিতে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অপেক্ষা করছে দুর্ভিক্ষ। অতীশের কাঁধে দায়িত্ব এল এদের ভ্রান্তচিন্তার অবসান ঘটানোর। পোনরা অদ্ভুত পোশাক পরে। কেউ কেউ জটাধারী। কল্পিত ভূত-প্রেত, দেও-দানবের সান্নিধ্য ও কৃপা লাভের

জন্য ভয়ংকর ভাবে গড়ে তুলেছেন। নরহত্যা, নরমুণ্ড দিয়ে যোগ সাধনা, মদ পান করা, যৌনাচারে মত্ত থাকা তাদের লৌকিক-আচার। অতীশ প্রথমে পোনদের এ পথ থেকে বের করে আনতে না পারলেও তর্ক-বিতর্কের ফলে একসময় সক্ষম হন। তারা অতীশের কথা মেনে নেয় মনে-প্রাণে। এখানেই অতীশের জ্ঞানের জয়।

তন্ত্র সাধনা নিয়ে এখানে বিস্তর আলোচনা করেছেন আবুল কাসেম। চর্যাপদের টীকায় বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে। যেমন সমাজতন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্র, হেরুকতন্ত্র আগম, সম্পূটোদ্ভবতন্ত্র রতিব্রজ ইত্যাদি। তন্ত্র সাধনার বিষয়। এ সাধনা নানা দেবীকে আশ্রয় করে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলাম ধর্মে তন্ত্রসাধনা লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটির শেষের দিকে কাহিনি বয়নের থেকেও ধর্মীয় কথোপকথন বেশি। একটানা পড়ে আসার পর এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়নি।

পোনদের মতো 'বন'দেরও মধ্যে অতীশ একই সমস্যা দেখতে পেলেন। সারা শরীরে এদের উল্কি আঁকা, মুখমণ্ডলে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব যক্ষ-যক্ষী এবং নানা লৌকিক দেব-দেবীর মুখোশ। অতীশ দেখলেন এদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদিবাসী মানুষের লৌকিকধর্ম ও দেব-দেবীদের বিশ্বাসের মিল আছে। এরা সব সময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে। অতীশ বুঝতে পারে না সে মন্ত্রের কথা। তাদেরকেও অতীশ বৌদ্ধধর্মের মূল ধারায় আনতে সক্ষম হন।

এরপর অতীশ চলে আসেন ক্রেথাং-এ। সেখানে একটি বিহার নির্মাণে হাত দেন। নাম দিয়েছিলেন তারা বিহার। দেবি তারাকে খুশি করবার জন্যই এ বিহারের নির্মাণ। অতীশ যেখানেই গিয়েছে তারা দেবীকে স্মরণ করলে অতীশের সফলতার পথ বলে দিয়েছেন। শেষ বয়সে অতীশ ছবি আঁকা শুরু করেন। একবার নিজের রক্ত দিয়ে নিজের ছবি আঁকলেন। ছবিটি এরকম— "ডান হস্তে স্বস্তিকা, বাম হাতের তালুতে গ্রন্থ স্থাপিত। পদ্ম আসনে উপবিষ্ট। নানা উপচার চারদিকে।"[৬]

অতীশের মতে, ভারতীয় বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আছে পর্বতকান্তারবাসী সুবৃহৎ কৌম সমাজের লোকেদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যোগিনী-ডাকিনী, পিশাচ ও মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবীকে মহাযান দেবায়তনে স্থান দেওয়া হয়। নানা গুহ্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ধারণা প্রভৃতিও তাদের সঙ্গে আসে। এর ফলে লৌকিকধর্ম প্রধান হয়ে যায়, গৌণ হয়ে পড়ে বৌদ্ধধর্ম। অতীশ ঠিক এই জায়গাটি বুঝতে পারে। অতীশ উপন্যাসের এক স্থানে বলছেন—

> সাধারণ বৌদ্ধদের পক্ষে শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, নানা উচ্চমার্গীয় যোগাচার অনুসরণ সম্ভব ছিল না, বুঝতও না। তাদের কাছে যাদুশক্তি, মন্ত্র প্রভৃতি সহজ ছিল। আর তাই অবলম্বন করে নিল নিজস্ব লৌকিক ঐতিহ্যে।[৭]

অতীশ তন্ত্রসাধনার পদ্ধতি মেনে নিতে পারেননি। অথচ বাইরে শ্রামণ্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা বজায় রেখেও তিনি তান্ত্রিক দেবী তারার উপাসক। অতীশের মনে চলেছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃত সাধনাকে— শূন্যবাদ। এইভাবে অতীশ বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চমার্গীয় চেতনার মাধ্যমে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্গঠন করেছেন। বলাবাহুল্য সেই সময় বৌদ্ধধর্মে বিপ্লব এনেছিলেন তিনি। সে কথায় বলবার জন্যই আবুল কাসেমের *অতীশ* উপন্যাসের কাহিনি বিস্তার। অতীশ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন—

> অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের কুঞ্চিকা তাঁহারই হাতে; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হইয়া যাইবে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। অসংখ্য তুরুষ্ক

> সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছে; আমি অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করিতেছি। তবু, আর্শীবাদ করিতেছি, তুমি অতীশ ও তোমাদের সঙ্গী লইয়া তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাও, সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের সেবা ও কর্ম নিয়োজিত হউক।[৮]

তথ্যসূত্র:

১। রাইন, রায়হান (অনুবাদ ও সম্পাদনা, ২০২১)। *অতীশ দীপঙ্কর রচনাবলি*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন। পৃ. ১৫১
২। কাসেম, আবুল (২০১৫)। *অতীশ*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। পৃ. ২০
৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৩
৪। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৭
৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০১
৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৫
৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৭৯
৮। রায়, নীহাররঞ্জন (১৪২৭ ব.)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ৭৪৮-৭৪৯।

‘পুঁইমাচা’ : বিষয়বস্তু নিতান্ত নগন্য হয়েও গল্পে অসাধারণত্ব

অরূপ পলমল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গর্ভ: জেনারেল ডিগ্রি কলেজ গোপীবল্লভপুর- টু
বেলিয়াবেড়া, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ: বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে লক্ষ্য করা যায়, একেবারে গল্প না বানাবার একটা প্রবণতা। বিভূতিভূষণের গল্পে যে গল্প বানাবার কোন সচেতন উদ্দেশ্যই নেই, লেখক যেন চিন্তা করছেন কোন চরিত্র বা কোন পরিবেশ নিয়ে একটা কিছু লেখা যায় কিনা- এবং সেই চিন্তাতেই গল্পের সূচনা ও পরিসমাপ্তি। বিভূতিভূষণের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, গ্রামের প্রতি আকর্ষণ। তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি অবশ্য প্রায় প্রবাদ হয়ে আছে এখনো। গ্রামের তুচ্ছ সহজ সৌন্দর্যও তাঁকে কী ভাবে মুগ্ধ করে, তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যেই তার পরিচয় আছে। ‘পুঁইমাচা’ গল্পের গল্পকাহিনি অত্যন্ত সহজ সরল ও সাধারণ। গল্পের ঘটনা সম্পূর্ণই গ্রামীণ পরিবেশে ছোটখাটো পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ক্ষেন্তি, যে গ্রাম্য পরিবেশে এক সহজ সরল মেয়ে। যার চরিত্র জুড়ে রয়েছে ভোজনপ্রিয়তা। তার খাদ্য লোলুপতা আবর্তিত হয়েছে সারা গল্প জুড়ে গ্রাম্য পরিবেশের সাধারণ সহজলভ্য কোন প্রকৃতি খাদ্যকে কেন্দ্র করেই। ক্ষেন্তির মৃত্যু আমাদের হৃদয়, মমত্ববোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে টানে। তার মৃত্যু আমাদের যেমন বেদনা জাগায়, তার চলে যাওয়ার স্মৃতিসূত্রটি যখন লেখক তারই লাগানো পুঁইগাছ ও পুঁইমাচার ব্যঞ্জনায় এনে হটাৎ নীরব হয়ে যান, তখন তার বেঁচে থাকার অসহায়তা ও তার প্রতি নিয়তির নির্মম প্রহার আমাদের একেবারে মর্মে গিয়ে ঘা মারে। গল্পের অন্তিম প্রতীক বিশেষ এক ক্ষেন্তির সাধারণ চরিত্র রূপকে অসাধারণ, অলৌকিক এক চরিত্র- স্বরূপে নির্বিশেষ করে তোলে।
সূচক শব্দ: প্রকৃতির পটভূমি, জীবন-মৃত্যুর রহস্য, প্রকৃতির নিরাসক্ত নির্মমতা, প্রকৃতিই নিয়ামক শক্তি, ভোজনপ্রিয়তা, খাদ্য লোলুপতা।

মূল আলোচনা:

এক

‘আসলে বুদ্ধিসর্বস্ব নাগরিক জীবন বা তথাকথিত বিদ্রোহী দৃষ্টি
যেন পরিহার করেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা’

‘কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে সমালোচক অলোক রায় কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে উপরিউক্ত কথাগুলি যথার্থই বলেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আবির্ভাব অনেকখানি আকস্মিক। তখন ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, ‘প্রগতি’র লেখকেরা দেশের শিক্ষিত মহলে বেশ একটা কোলাহল তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে তাঁরা ঋণী হলেও রবীন্দ্রপথ অনুসরণ করতে চাইলেন না। মোটকথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে কতকটা সমাজমানসের তাড়নায় এবং বেশিরভাগ পশ্চিমী হাওয়ার অনুকরণে কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি লেখকগোষ্ঠীর একটা যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। ঠিক এইরকম পরিবেশে অবহেলিত গ্রামবাংলার ছবি নিয়ে এলেন বিভূতিভূষণ। পল্লী-প্রকৃতির নিবিড়তম সান্নিধ্যে গ্রামের কল্পনাপ্রবণ একটি শিশুর জীবন কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠছে-

গ্রামের ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, গাছপালা, মাঠঘাট, আকাশ, নদীর মধ্যেও যে কী অমৃতরস লুকিয়ে থাকতে পারে এবং সেখানকার দারিদ্রপীড়িত মানুষদেরও তুচ্ছতম আচরণও কতো মধুর হতে পারে, কিম্বা তাদের শান্ত জীবনেও কারুণ্যের কী রকম স্পর্শ লাগতে পারে- বিভূতিভূষণের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে তা আমরা দেখিনি।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প পাঠকের কাছে যে এক স্বতন্ত্র আস্বাদ আনে, তিনি বিশ্বাস করেন-'সুখ অতি সহজ সরল'। জীবনকে চিনতে গিয়ে তিনি কোন তত্ত্বকথার আশ্রয় দেন না, তাকে নিজের আরোপিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও কণ্টকিত করেন না। জীবন যে রকম, ঠিক যেমনটি তাঁর চোখে পড়ছে, সেইভাবেই জীবন ফুটে ওঠে তাঁর কলমে। ফলে একটা মানবিক সত্যের উন্মোচন ঘটে তাঁর বেশিরভাগ গল্পে। গল্প বানিয়ে এক নাটকীয় চমক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের তীব্র অনিচ্ছা। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে যেমন চমক খুব অল্প, বিভূতিভূষণের ছোটগল্পেও চমকিত ঘটনা ঘটে অত্যন্ত কম। তাঁর গল্পের উপসংহারে তেমন কোন নাটকীয় সমাপ্তি ঘটে না। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে লক্ষ্য করা যায়, একেবারে গল্প না বানাবার একটা প্রবণতা। বিভূতিভূষণের গল্পে যে গল্প বানাবার কোন সচেতন উদ্দেশ্যই নেই, লেখক যেন চিন্তা করছেন কোন চরিত্র বা কোন পরিবেশ নিয়ে একটা কিছু লেখা যায় কিনা- এবং সেই চিন্তাতেই গল্পের সূচনা ও পরিসমাপ্তি। সমালোচকের মতে-

> "গল্পগুলিকে একজাতীয় অ্যান্টি- স্টোরি বলা যায়, কিন্তু এই ধরনের গল্প লিপিবদ্ধ করার মধ্যে লেখকের সে অসম্ভব আত্মবোধ ও প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়- উপভোগ্যতা সম্বন্ধে যে সুনিশ্চিত বিশ্বাস থেকে তিনি এগুলি রচনা করেন সে বিশ্বাস ও বোধের বলিষ্ঠ তা অত্যন্ত উঁচুদরের সাহিত্যিক ছাড়া সম্ভব নয়।"[১]

আধুনিক লেখক সাধারণত সংস্কার, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনাগুলিকে এড়িয়ে চলতে চান। বিভূতিভূষণ কিন্তু সরল বিশ্বাসেই তাদের গ্রহণ করেন। জীবনে যেমন যুক্তি আছে, যুক্তিহীনতাও আছে, লৌকিকের সুস্থির নিয়ম আছে, সাময়িক দুর্বলতায় অলৌকিককে আঁকড়ে ধরার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। জীবনের এই পূর্ণরূপকেই গ্রহণ করতে উৎসাহী বিভূতিভূষণ। সংহতি ছোটগল্পের এক অপরিহার্য গুণ, এবং তার একমুখিতা। বিভূতিভূষণের এক শ্রেণীর গল্পে সময়ের বিস্তার অনেক বেশী। অর্থাৎ ব্যাপ্ত সময়ের এক পটভূমি। যে সময়ে গল্পটির শুরু হয়, শেষ হয় তার বেশ কয়েক বৎসর পরে। বিভূতিভূষণের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, গ্রামের প্রতি আকর্ষণ। তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি অবশ্য প্রায় প্রবাদ হয়ে আছে এখনো। গ্রামের তুচ্ছ সহজ সৌন্দর্যও তাঁকে কী ভাবে মুগ্ধ করে, তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যেই তার পরিচয় আছে। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে-

> "বিভূতিভূষণ জাত- রোমান্টিকের মতোই গ্রামবাংলাকে দেখেছেন প্রকৃতি- ভাবুকতায়। ... বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি দূর থেকে দেখা কোনো অস্তিত্ব নয়, বিলাসের কাম্যবস্তু নয়, প্রকৃতি তাঁর অস্তিত্বের প্রেরণা, মাটি, মাটির সজীব প্রাণ- স্বভাব। প্রকৃতিই তাঁর রক্ত-মাংস- মজ্জা- প্রাণ। আর এই প্রকৃতি নগর- জীবনের কৃত্রিমতায় ধূসর নয়, গ্রামজীবনের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতায় চিরসবুজ।"[২]

অতিতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণের প্রায় ছোটগল্পে রসোত্তীর্ণ করে তোলার শিল্পকৌশল নিয়ে হাজির হন। এক একটি ছোট খণ্ডে ছোট ছোট জীবন নাট্যের আশ্রয়ে

গল্পগুলি তৈরি করেন। প্রমথনাথ বিশীর মতে- 'মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের যে লীলা চাঞ্চল্য আছে, সুখের ভিতর যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইঙ্গিত আছে, বিভূতিভূষণ সাহিত্য রচনার জন্য সে গুলিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জীবনাড়ম্বর তাঁহার সাহিত্যের উপজীব্য নয়'। 'পুঁইমাচা' গল্পে একটি সাধারণ মেয়ের মৃত্যুকে একটি সাধারণ পুঁইশাকের মাচার সুত্রে জুড়ে এক অসাধারণকেই পাঠকের সমক্ষে হাজির করেছেন তিনি।

দুই

'পুঁইমাচা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল **১৩৩১** বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রবাসী পত্রিকায়। পরে শ্রাবণ **১৩৩৮** এ বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' এ গল্পটি স্থান পায়। 'পুঁইমাচা' গল্পে আছে প্রকৃতির পটভূমিতে জীবন-মৃত্যুর রহস্য, জীবনের বিপরীতে প্রকৃতির নিরাসক্ত নির্মমতা। আসলে, এ গল্পে প্রকৃতিই একমাত্র নিয়ামক শক্তি। 'পুঁইমাচা' গল্পটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্যটিই হল প্রকৃতি। এই লক্ষ্যে ক্ষেন্তির মতো একটা গ্রাম- বাংলার সহজ-সরল কিশোরী যুক্ত হয়ে যাওয়ায় গল্পটি কথাকারের অপরূপ শিল্প- স্বাদের ফসল হয়ে উঠেছে।

সমগ্র গল্পটির পটভূমিতে আছে বাংলার এক প্রকৃতি- লালিত শান্ত গ্রাম, তার মানুষজন, তার গাছপালা, ফলমূল। ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরি চাটুয্যের যে আচার- আচরণ, সংসার- জীবনের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে নিরাসক্তি তাও একান্তভাবে গ্রামের সরল জীবন- যাপনেরই প্রতিচ্ছবি। যেমন গল্পের শুরুতে -

> "সহায়হরি চাটুয্যের উঠোনে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন- একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।"

অথবা সংসারজীবন সম্পর্কে উদাসীন সহায়হরি যখন বলে -

> "সহায়হরি তাছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন- এই ! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর! –ওঃ!"

কিম্বা, এক শীতের সকালে সহায়হরি যখন ক্ষেন্তিকে বলেন -

> "হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয় ? দেখ দিকি, এই শীত? ... হ্যাঁ দে মা, এক্ষুনি দে– অসুখ- বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে? – সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এখন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে"

আবার তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার যে উৎকণ্ঠা, আবেগ, স্নেহ, আর্তি, ভয়, যন্ত্রণা ও সঙ্কট, হতাশা ও আশা– তাও শান্ত এক গ্রাম জীবনেরই দারিদ্র্যের পোড়- খাওয়া সংসারী বধুর -

> "অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষা ও শান্ত সুরে বলিলেন– দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি– ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। ... অত বড় মেয়ে যায় ঘরে, সে মাছ ধরে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি করে তা বলতে পারো? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?"

কিম্বা অন্নপূর্ণার মাতৃস্নেহ যখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে -

> "কি রে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।"

কখনো বা মায়ের মন স্বপ্ন দ্যাখে -

> "অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তী, চুলা তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজন পটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন- ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে।"

অতএব, 'পুঁইমাচা' গল্পে স্বামী- স্ত্রীর সংসারচিত্রের যে বাস্তবতা সমগ্র গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে– তা প্রকৃতি নির্ভর গ্রামের চিত্র রূপেই অঙ্কিত হয়েছে।

'পুঁইমাচা' গল্পের যে নায়িকা বড় মেয়ে ক্ষেন্তি– সেও প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে রক্তের আত্মীয়তায় লেগে আছে যে, গল্পের মধ্যে ক্ষেন্তিকে ধরে টান দিলে, গল্প থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করলে গল্পের শেষের সেই বেড়ে ওঠা পুঁইমাচাতেও টান পড়ে প্রবলভাবে। ক্ষেন্তি সহজ, সরল, অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ভোজন প্রিয় মেয়ে –

> "সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো– উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন– ক্ষেন্তি, আর নিবি? ... ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। ... বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নাও, ওতেই কিন্তু... সে পুনরায় খাইতে লাগিল।"

আবার তার নির্বাক চলাফেরায়, বাবা- মার প্রতি আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে তার স্বভাবের মধ্যকার শান্তরূপটি প্রকাশ পায় -

> "মেয়েটি শান্ত অথচ ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁইশাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চাহিলেন..."

কখনো বা –

> "বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল- বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল... তৎপরে পিতা- পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল- ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।"

যে স্বভাবে ক্ষেন্তি সারা গল্পে চিত্রিত, গল্পের শেষে সেই স্বভাবেই আসে প্রকৃতি -

> "সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে"

এই পুঁইমাচার চিত্র যেন ক্ষেন্তির অস্তিত্বকেই সারা গল্পের অবয়বে ব্যাখ্যার সহায়ক হয়েছে, অর্থাৎ একমাত্র ক্ষেন্তিই বুঝিবা সমগ্র 'পুঁইমাচা' গল্পের একমাত্র লাবণ্য।

'পুঁইমাচা' গল্পের গল্পকাহিনি অত্যন্ত সহজ সরল ও সাধারণ। গল্পের ঘটনা সম্পূর্ণই গ্রামীণ পরিবেশে ছোটখাটো পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ক্ষেন্তি, যে গ্রাম্য পরিবেশে এক সহজ সরল মেয়ে। যার চরিত্র জুড়ে রয়েছে

ভোজনপ্রিয়তা। তার খাদ্য লোলুপতা আবর্তিত হয়েছে সারা গল্প জুড়ে গ্রাম্য পরিবেশের সাধারণ সহজলভ্য কোন প্রকৃতি খাদ্যকে কেন্দ্র করেই। অতি সামান্য লোভ-বাসনা চরিতার্থতা করা নিয়েই দারিদ্র্যের সংসারে মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার বিরোধ তৈরী হয়। যদিও এই বিরোধে ক্ষেন্তির ভূমিকা নীরবতা। মা অন্নপূর্ণায় মেয়ের গ্রামের পরিবেশে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর ভালো নজরে দেখত না। মেয়েকে শাসন না করা, ও বিয়ের তোড়জোড় না করা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত। এই সব সাধারণ সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই গল্প কাহিনি এগোই। কিন্তু গল্পের শেষের দিকে ক্ষেন্তির মৃত্যু পাঠককে চমকে দেয়।

বয়সে বড় এক পুরুষের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিবাহ হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের অবহেলা, দুর্ব্যবহারবশত ক্ষেন্তির একদিন বসন্তরোগের কারণে মৃত্যু হয়। গল্পের শেষে পিঠে-পুলি তৈরির এক সন্ধ্যায় মা অন্নপূর্ণার স্মৃতিতে ধরা, এবং দুই বোন রাধী- পুঁটির কথোপকথনে ক্ষেন্তির স্মৃতি বড় হয়ে আসে। ক্ষেন্তির মৃত্যুতেই গল্প কাহিনি শেষ হওয়ার কথা ছিল স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু তা না হয়ে গল্প এগোয় লেখকের প্রতীকী ব্যঞ্জনার পথ ধরে। গল্পকাহিনি অগ্রসর হয় লেখকের মানব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত রহস্য গভীর ভাবনাকে কেন্দ্র করেই। ক্ষেন্তি গল্পের প্রথম দিকে যে পুঁইচারাটি অসময়ে মাটিতে পুঁতে রেখে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তার অন্তর রহস্যের প্রকাশ ঘটায়, গল্পের অন্তিমে সেই পুঁইচারাই তার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে আপন জীবন- বেগে বড় হয়ে ওঠে এবং গল্পের ব্যঞ্জনাকে গভীরতম সত্যে প্রকাশ করে। এখানেই ছোটগল্পকারের কৃতিত্ব ও সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য অধিকতর গ্রহণযোগ্য -

"কাহিনী ও ঘটনাকে একেবারে সহজ, সরল, সাদামাটা রেখে গল্প বা উপন্যাসের আধারের শিল্পমর্যাদাকে বড় গৌরব দানের ক্ষমতা সেকালে একমাত্র বিভূতিভূষণের লেখনীতেই অসামান্য মুল্য পেয়েছে- এ ব্যাপারে অন্য গল্পকার থেকে বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য স্থায়ী।"[৩]

তিন

গল্প- উপন্যাসে চরিত্ররাই রচনাকারের ভাব- ভাবনা ও অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। 'পুঁইমাচা' গল্প গতি পেয়েছে বা আবর্তিত হয়েছে ক্ষেন্তি চরিত্রটিকে অবলম্বন করে। তার সারল্য এই গল্পের সম্পদ। ক্ষেন্তি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনন্য সৃষ্টি। সে দরিদ্র ব্রাম্ভণ সহায়হরি চাটুয্যের প্রথমা কন্যা। চার বোনের মধ্যে সে সবার বড়। তার বয়স সম্ভবত ১৪-১৫ বছরের মতো। তৎকালীন হিন্দুসমাজের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ক্ষেন্তির বিয়ের বয়স পার হতে চলেছে। সে অরক্ষণীয়া। যথাসময়ে তাকে বিয়ে দিতে না পারলে গ্রামের কাছে পিতা মাতাকে হেনস্থা বা অপদস্ত হতে হবে। একঘরেও হতে পারে গ্রামের মানুষজনেদের কাছে। অথচ ক্ষেন্তির এখনো বোনেদের সাথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানোই যেন তার একমাত্র কাজ। তার শিশুসুলভ আচরণ এখনো বর্তমান।

ক্ষেন্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল ভোজনপ্রিয়তা। সে পুঁইশাক, পিঠে থেকে শুরু করে নারকেল কোরা সবই গোগ্রাসে খেতে দেখেছি। অতি সামান্য সামান্য বস্তুতে তার ভজনপটুতাকে, পিতা- মাতার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও সবসময় প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন। অন্যদিকে তার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সে বরাবরই শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। রায়দের ফেলে দেওয়া পুইশাক তুলে আনার কারণে মা অন্নপূর্ণা যখন বকাঝকা করে, তখন তাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তাকে হাজারো গালাগাল ও রাগারাগী করলেও তাকে কখনো কোন প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। অন্যদিকে সে ছিল সত্যবাদী। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও সে

মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতো না। তাই গল্পে পাঠক লক্ষ্য করে, বরজপোতার জঙ্গল থেকে চুরি করে আনা মেটে আলু সম্পর্কে সহায়হরি অন্নপূর্ণার কাছে মিথ্যা বিবৃতি দিলেও ক্ষেন্তি মায়ের প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা বলতে পারেনি।

ক্ষেন্তি ছিল লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। অন্যায় পেয়ে মা বকাবকি করলেও সে টুঁ শব্দটিও করতো না। এ কারণে তার মায়ের মুখে শুনতে পাই -

> ‘ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালো মানুষ, কাজে– কর্মে বকো, মারো, গাল দাও টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি।’

অন্যদিকে, সে ছিল এক হতভাগিনী ব্রাম্ভণকণ্যা। প্রথম যখন তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল তখন আশীর্বাদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। এ কারণে পাড়ার মানুষ তাকে উচ্ছৃগু করা মেয়ে বলে অভিহিত করতো। অগত্যা সহায়হরি চল্লিশ ঊর্ধ্ব পাত্রের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিবাহ দিয়েছিলেন। পণের টাকা বাকি থাকার কারণে ক্ষেন্তিকে আর বাপের বাড়িতে আসতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে হতভাগিনী ক্ষেন্তি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জনমদুঃখিনী এই মেয়েটি দুঃখকে সাথী করে পৃথিবীতে এসেছিল এবং দুঃখকে সাথী করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিবৃতি গ্রহণীয় -

> “ক্ষেন্তির মৃত্যু আমাদের হৃদয়, মমত্ববোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে টানে। তার মৃত্যু আমাদের যেমন বেদনা জাগায়, তার চলে যাওয়ার স্মৃতিসূত্রটি যখন লেখক তারই লাগানো পুঁইগাছ ও পুঁইমাচার ব্যঞ্জনায় এনে হটাৎ নীরব হয়ে যান, তখন তার বেঁচে থাকার অসহায়তা ও তার প্রতি নিয়তির নির্মম প্রহার আমাদের একেবারে মর্মে গিয়ে ঘা মারে। গল্পের অন্তিম প্রতীক বিশেষ এক ক্ষেন্তির সাধারণ চরিত্র রূপকে অসাধারণ, অলৌকিক এক চরিত্র- স্বরূপে নির্বিশেষ করে তোলে।”[৪]

সহায়হরি গ্রাম্য এক উদাসীন সংসারী মানুষ। সংসারই শুধু নয়, যাপিত জীবন, সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন চরিত্র সহায়হরি। সংসারে অভাব থাকলেও তার আঁচ থেকে সতত দূরেই থেকেছেন তিনি । বরং মেয়ের মতো সংসারের বদ্ধ কারাগার থেকে সরে প্রকৃতির বুকে মেলে দিয়েছেন তার মুক্তির পাখা। অন্যদিকে অন্নপূর্ণা চরিত্রটি গ্রাম্য জননীর সার্থক চিত্ররূপ। মা অন্নপূর্ণা গল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র। নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূ হওয়ায় দ্রারিদ্রের সঙ্গে অপমানের জ্বালা তাঁর নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তববাদী, নীতি- নৈতিকতায় বলিষ্ঠ, আপাত কঠোর অথচ মমতাময়ী একজন নারী চরিত্র অন্নপূর্ণা। সবমিলিয়ে ক্ষোভ- দুঃখ- অসহায়তা ও সন্তানস্নেহ তাঁর চরিত্রটিকে অসাধারণ করে গড়ে তুলেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় যে সময়ে গল্পটি লিখেছিলেন, সে সময়ে বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকপ্রথা ছিলো সমাজের রন্ধে রন্ধে। স্বাভাবিকভাবেই ‘পুঁইমাচা’ গল্পের শরীরে এটি একটি স্থান লাভ করেছে প্রত্যক্ষভাবেই। সংসার, যাপিত জীবন, সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সহায়হরির সাথে বাস্তববাদী, নীতি নৈতিকতায় বলিষ্ঠ, কঠোর অথচ মমতাময়ী একজন নারীর চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক এই গল্পে যে সমাজের কথা বলেছেন। সে সময়ে বিষফোড়ার মতো স্থান করে নিয়েছে বাল্যবিবাহ আর যৌতুক প্রথা। গল্পে তিনি জীবনের জটিল

মনস্তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা না দাঁড় করিয়ে দীনহীন একটি পরিবারের স্বাভাবিক করুণ কাহিনি সহজ সরল ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তবসম্মত চিত্র এঁকেছেন।

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হয়ে যায়, বছর চল্লিশের দ্বিতীয়পক্ষের এক পাত্রের সঙ্গে। কিন্তু দীনদরিদ্র সহায়হরি যৌতুকের টাকা ধীরে ধীরে শোধ করছিলেন। কিন্তু টাকা না পেয়ে ক্ষেন্তির ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকে। এর মাঝে মেয়ের বসন্ত হলে তার শরীর থেকে সোনা গয়না খুলে তাকে ফেলে রেখে যায় পাশেই অপরিচিত এক আত্মীয়র বাড়িতে। সে বাড়িতেই মৃত্যু হয় ক্ষেন্তির। ক্ষেন্তির মৃত্যুর বিষয়টি সহায়হরি ও তার প্রতিবেশি বিষ্ণু সরকারের সাথে আলাপচারিতায় স্বল্প কথায় বর্ণিত হয়েছে -

> "আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষমাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে– অবস্থা করেছে। শাশুড়িটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো, না- জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলেই এরকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পোষমাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু– হাতে!"
>
> "মেয়ে তো কিছুতেই পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও তবে মেয়ে নিয়ে যাও।"

এ কথাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের পণপ্রথার বিষময় ফলকে।

চার

'পুঁইমাচা' গল্পের নামকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী। উক্ত নামকরণের মধ্যে গল্পের বক্তব্য বিষয়কে ব্যঞ্জিত করার প্রয়াসই প্রকাশিত হয়েছে। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে পুঁইগাছের সুস্পষ্ট ক্রমবর্ধমান লাবণ্যের সঙ্গে যোগ রেখে ক্ষেন্তির জীবনের একটি যোগসূত্র রচিত হয়েছে। বেড়ে ওঠা সুপুষ্ট পুঁইগাছটি স্বরূপত ক্ষেন্তির জীবনতৃষ্ণারই রূপক, অকালে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও তার আশা- আকাঙ্খাগুলি তো মৃত্যুহীন, পুঁইগাছটি যেন তার সেই মৃত্যুহীন প্রাণেরই ব্যঞ্জনা বহন করে আনে -

> "সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে... মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে... সুপুষ্ট নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।"

এখানে পাঠক লক্ষ্য করে, পুঁইগাছের মাচা জুড়ে বেড়ে ওঠা, ক্রমবর্ধমান হয়ে মাচা থেকে বাইরে ঝুলে পড়া এবং সর্বোপরি সুপুষ্ট, নধর হয়ে জীবনের লাবণ্যে পূর্ণ হওয়া বুঝিবা ক্ষেন্তি বেঁচে থাকলে তার জীবন ও যৌবন বিকাশের পূর্ণ সম্ভবনাকেই ইঙ্গিত করেছে। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাবনায় প্রকৃতি অবশ্য গল্প শেষে অন্য মাত্রায় স্থান পেয়েছে –

> "বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি তাঁর আত্মার আত্মীয়। এই প্রকৃতিকে এ গল্পে পুঁইগাছের প্রতীকে ঘন পিনদ্ধ করেছেন।... ক্ষেন্তির সামগ্রিক জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতিরই খেলা। এই খেলা নির্মম নিরাসক্ত। তা না হলে ক্ষেন্তির চলে যাওয়ার পরেও কোন রহস্যে তারই শিশুকালে লালন করা বড় আদরের পুঁইগাছটি 'সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর' হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য পায়!"[৫]

গল্পের মধ্যে ক্ষেন্তি চরিত্রটির প্রথম প্রবেশ ঘটে পুঁইশাকের হাত ধরে। গল্পের সমাপ্তি যেমন শীতকাল, সূচনাও তেমনই এক শীতের সকালে। এক শীতেই ক্ষেন্তি সেই পুঁইশাকের চারা পুঁতেছিল। তারপরের পরের বছর শীতকালে পৌষপরবের জ্যোৎস্নায় সেই পুঁইশাকই মাচায় সুপুষ্ট, নধর হয়ে বেড়ে উঠেছিল। গল্পের সময়সীমা এক শীতকাল থেকে পরের বছর হয়ে তারপরের শীতকাল পর্যন্ত আনুমানিক তিন বছরের মতো। একদিন অসময়ে আগাছা তুলে আনার জন্যে অন্নপূর্ণা যে ক্ষেন্তিকে বকেছিল, আরেক শীতের অসময়ে সবুজ সজীব পুঁইলতাগুলির শ্রীবৃদ্ধি দেখে মা অন্নপূর্ণাকেই বিস্মিত হতে হয়েছিল। ক্ষেন্তির অকাল মৃত্যুতেই এই গল্পের ইতি টানা হলে হতে পারত, কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পরেও থেকে যায় প্রাণের প্রবাহ। পুঁইমাচা সেই নিষ্ঠুর, সুন্দর সত্যের রূপটিকে আখ্যানের অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছে। এখানেই গল্পকারের কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য –

> "তুচ্ছ সামান্য একটু পঁইশাক খাওয়াকে ঘিরেই এই পঞ্চদশবর্ষীয়া যে প্রায় এক ব্যক্তিগত আনন্দ উদযাপন করে- বিভূতিভূষণ সে নিভৃত উৎসবগুলির প্রতিমাশিল্পী। এই কারণেই আমরা দেখি ঐশ্বর্য তাঁর কলমে দারিদ্র্যময় হয়ে উঠলেও দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত।"[৬]

পুঁইমাচায় পুঁইগাছের বৃদ্ধির চিত্র গল্পের নামের গভীরতর ব্যঞ্জনা আনে। এই নামেই গল্পটি অধিক শিল্পসার্থক ও শিল্পতাৎপর্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

পাঁচ

বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পটি গ্রামীণ পরিবেশে লোকজীবনের প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পের শুরুতেই সহায়হরির মুখে শুনতে পাই –

> "একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভালো রস আনি।"

এই গল্পে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে পৌষপার্বণের পিঠে পরবের কথা। তার সঙ্গে এসেছে পায়েস- ঝোলপুলি- মুগতক্তি এবং পাটিসাপটার প্রসঙ্গ। নবান্ন লোকউৎসবের সাথে সাথে গল্পে এসেছে অরন্ধনের কথা, এসেছে হরিপুরের রাসের মেলার কথা, এসেছে চণ্ডী মণ্ডপের কথাও। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সৌগত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে –

"গল্পে লোকজীবনের প্রেক্ষিতকেও গ্রহণ করা হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। ... এসেছে এখানে চণ্ডীমণ্ডপের কথা, লোকবাদ্য-লোকপানীয়-লোকবিশ্বাস- লোকউৎসব প্রভৃতির প্রসঙ্গ, ঘটেছে প্রবাদ প্রভৃতির ব্যবহার।" (পুঁইমাচা : নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, গল্পচর্চা)

বিভূতিভূষণের গল্পের ভাষা তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশের যথার্থ অনুসারী। গল্পের আরম্ভই সহায়হরির কথায় প্রকৃতির সঙ্গে সূত্রবদ্ধ, এবং সারা গল্পের আবহে আছে ক্ষেন্তির পুঁইশাকের স্বাদু রসাস্বাদ গ্রহণের গভীর গোপন বাসনা। আবার গল্পের শেষে সেই প্রকৃতিই অন্যতম আধার পুঁইগাছের রসপুষ্ট নবীন চেহারার চিত্রণে। গল্পের শেষে যেভাবে শীতের সন্ধ্যার বর্ণনা, জ্যোৎস্না পরিবেশ ক্রমশ শান্ত নির্জনতা পার হয়ে চরিত্রের মানসিকতায় আলোড়ন তুলে প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রতীকে অমোঘতা পেয়েছে, তা এক সার্থক গল্পের কৃতী গল্পকারের অনবদ্য ভাষাচিত্র রচনার ক্ষমতাকে ধরিয়ে দেয়। সবশেষে বিশিষ্ট সমালোচকের সাথে একমত এই যে -

> "গ্রামীণ, আস্তিক, মানবধর্মে বিশ্বাসী এই গল্পকারের হাতে পরিচিত বাস্তব জীবনও অসামান্যতা পেয়েছে। ... জীবন সম্বন্ধে এক গভীর বিশ্বাস তাঁকে

মানুষের প্রতি প্রীতিতে সমবেদনায় মহীয়ান করেছে, সেই সঙ্গে তাঁর গল্পগুলিকেও।”[৭]

তথ্যসূত্র:

১। ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের ছোটগল্প: ব্যাপ্ত সময়, পূর্ণ মানুষ; আরণ্যক: বিভূতিভূষণ ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ: শুভ মহালয়া, ১৪১০, পৃষ্ঠা, ৬৮

২। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ; পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পঞ্চম সংস্করণ; জুলাই ২০০৪, পৃষ্ঠা, ৩০৬

৩। পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা, ৩১৩

৪। পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা, ৩১৩

৫। পূর্বোক্ত; পৃষ্ঠা, ৩১৭

৬। রাজীব চৌধুরী, পুঁইমাচা : প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, ড. শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৪৮

৭। শ্রাবণী পাল, বাংলা ছোটগল্পের ধারা : বিশ শতক, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, ড. শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৮।

রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদের এবং যোগাভ্যাসের মূল্যায়ণ

গৌর বেরা
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
প্রভাতকুমার মহাবিদ্যালয়, কাঁথি

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বর্তমানে প্রতিফলিত হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সিদ্ধান্তগুলিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকায় রোগের উৎসকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি রোগের উৎসকে জেনে বিনাশ করতে সক্ষম হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর অসুখকে চিহ্নিত করে সমূলে বিনাশ করে রোগীকে দীর্ঘায়ু লাভে সক্ষম করে। মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে ভেষজ চিকিৎসা প্রতি অভ্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে মানুষের রোগের প্রার্দুভাব কমে যাবে। এর ফলে মানুষ আয়ুর্বেদের চিকিৎসা প্রতি বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাছাড়া বর্তমানে মানুষ যদি দৈহিক ও শারীরিক কাঠামো সুস্হ রাখতে চায় ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, তার জন্য যোগাভ্যাস করা অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং প্রাচীন আয়ুর্বেদ রোগ নির্ণয়ের এক বিশেষ পদ্ধতি। এর মাধ্যমে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং স্নায়ুতন্ত্রের নেতিবাচক প্রভাবগুলির মতো সীমাবদ্ধতাগুলি পরিষ্কার হওয়ায় আয়ুর্বেদের গুরূত্ব যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।
সূচক শব্দ: আয়ুর্বেদের ধারণা – আয়ুর্বেদের চিকিৎসার কৌশল – যোগাভ্যাস।

মূল আলোচনা:

আয়ুর্বেদ ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গ। প্রাচীনশাস্ত্র সমূহে আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আয়ুঃ = জীবন, বেদ = বিজ্ঞান অর্থাৎ আয়ুর্বেদ বলতে জীবনের বিজ্ঞানকে বোঝায়। প্রাচীন ঋষিরা এই সত্যাশ্রিত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ করে বহু জটিল রোগ নিরাময়ে সমর্থ হয়েছেন। আয়ুর্বেদের অন্যতম গ্রন্থ চরকসংহিতায় আয়ুর্বেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে –

হিতাহিতং সুখং দুঃখম্ আয়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানং চ তচ্চ যত্রোক্তম্ আয়ুর্বেদঃ স উচ্যতে।।

জীবনের রোগনিরাময় করাই আয়ুর্বেদের লক্ষ্য। জীবনের সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ শরীর রক্ষার জন্য আয়ুর্বেদ শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে–

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগস্তস্যাপহর্তারং শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।

ধর্ম,অর্থ,কাম,মোক্ষ-এই চারটি পুরূষার্থের মধ্যে সুস্থ থাকাই হল মূলকথা। রোগ থেকে সুস্থতা ও জীবনকে সমৃদ্ধি রাখাই হল আয়ুর্বেদ। ভারতে আয়ুর্বেদের বহু তথ্য প্রথম পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত অথর্ববেদে। ভারতীয় ভৈষজ্য ও চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদের স্থানগুরূত্বপূর্ণ। আয়ুর্বেদের প্রথম গ্রন্থ হল–চরকসংহিতা। প্রাচীনভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তত্ত্ব, দর্শন, রোগ ও আরোগ্যবিষয়ক তত্ত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে–

চিকিৎসা বহ্নিবেশস্য স্বস্থাতুরহিতং প্রতি।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎক্বচিত্।।

আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য: আয়ুর্বেদ ভারতের মুখ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা। এটি প্রাচীন ভারতের লৌকিক স্থানীয় এবং মূলত ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থা যা রোগ নিরাময়ে তৎকালে সীমাহীন অবদান

রেখেছে। আয়ুর্বেদ এমন একটি শাস্ত্র যেখানে রোগ নিরাময়ের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রা ও তার ওপর নীরোগ শরীর গড়ে তোলা যায়। তাই বলা হয় –

প্রয়োজনং চাস্য স্বস্থস্য স্বাস্থরক্ষণমাতুরস্য বিকার প্রশমনং চ।

আমাদের জীবনযাত্রায় আয়ুর্বেদের চিকিৎসা প্রতিমুর্হূর্তেই খুবই গুরূত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন অজানা মারণ রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে মানুষকে আয়ুর্বেদ এবং যোগাভ্যাসের অভ্যস্ত করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। যার মাধ্যমে মানুষের শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে।

প্রবন্ধের পদ্ধতি: আয়ুর্বেদ বিষয়ে বিভিন্ন প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত গবেষণা করেছেন। এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রথমে পাওয়া যায় অথর্ববেদে। এছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ পুঁথিবিদ্যা, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, যোগসূক্তম্, চিকিৎসাসারসংগ্রহ ও নাগার্জুনের রচিতাদি গ্রন্থে আয়ুর্বেদের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে, যা গ্রন্থাগারে এই বিষয়ে লিপিবদ্ধ আছে। এইশাস্ত্রগুলিকে অবলম্বন করে আমি আমার প্রবন্ধের বিষয় উপস্থাপন করেছি।

আয়ুর্বেদের আবির্ভাব: এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে “ব্রহ্মসংহিতা” নামে একলক্ষ্য শ্লোকে নিবদ্ধ এবং একসহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আটটি অঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। প্রথমে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের শিক্ষা লাভ করেছিলেন বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য ও প্রজাপতি। “চরকসংহিতা” অনুসারে মানব কল্যাণে আয়ুর্বেদ পৃথিবীতে আনয়নের জন্য ঋষিগণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা লাভ করে প্রথমে অভিনন্দন আত্রেয় পুনর্বসুকে শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু সুশ্রুত ও কাশ্যপ সংহিতা অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র থেকে মর্ত্যলোকে আয়ুর্বেদ আনয়ন করেন মহর্ষি ধন্বন্তরি ও কাশ্যপ। পরবর্তীকালে ধন্বন্তরি সুশ্রুত, বৈতরণ, ভোজ ও অন্যান্য শিষ্যদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করেন। বেদ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক কথাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যক্ষারোগ বিষয়ে একটি অনবদ্য মন্ত্র পাওয়া যায় –

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিস্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে।।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে মনুষ্য শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে এতো বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যা দেখে বৈদিক সাহিত্যকে আয়ুর্বেদের অন্যতম উৎস বলতে কোনরকম দ্বিধার অবকাশ রাখে না।

রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদ: যার দ্বারা আয়ুর সম্পর্কে জ্ঞান হয়, মানুষের আয়ুর জন্য কল্যাণকারী এবং যার দ্বারা হানিকারক বস্তুর জ্ঞান হয়ে থাকে তাকেই আয়ুর্বেদ বলা হয়। সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে রক্ষার জন্য আয়ুর্বেদ জ্ঞান লাভ করা আমাদের অবশ্যই দরকার। রোগীর বিকারকে দূর করে তাকে সুস্থ রাখতে হলে রোগের কারণ, রোগের পরিচায়ক বিষয় এবং ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানুষের সবচেয়ে বড়সম্পদ হল স্বাস্থ্য। সুতরাং এই শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে হলে খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম, নিদ্রা ও সংযম প্রভৃতির দিকে নজর রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রধান বিষয় হল–শরীরের পঞ্চকর্মের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করে, তার রোধ করে পূর্বাবস্থায় ফেরানো। ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য, জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে শরীরে উপযুক্ত শক্তি এমনভাবে যোগান দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতেও রোগের প্রভাব না দেখা যায়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র এমন শাস্ত্র যা রোগের

গোড়া থেকেই ঔষধের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা বা পরে রোগের তীব্রতাকে রোধকরে যথাযথ আরোগ্য বিদ্যার প্রয়োগে পীড়ার প্রকোপকে সমূলে বিনাশ করা যায়।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ধরণসমূহ:

(১) শোধন চিকিৎসা: আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি দূর করে চিকিৎসা করা যায়। এই পদ্ধতিতে শরীরের ভিতর ও বাহিরের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যথাযথ পরিচালনার মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। প্রয়োজনীয় শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আরোগ্য আনা হয়। স্নায়ুরোগের জন্য, অস্থি ও মাংসপেশীর অসুখে, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পাচন প্রক্রিয়ার অসুখে এইচিকিৎসা বিশেষ করে উপযোগী হয়।

(২) শমন চিকিৎসা: শমনচিকিৎসায় রোগে আক্রান্ত দোষগুলিকে দমন করা হয়। যে পদ্ধতিতে দূষিত দোষ বা শরীরের ভারসাম্য নষ্টনা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসাকে শমনচিকিৎসা বলে। ক্ষুধার উদ্রেক ও হজমের মাধ্যমে, ব্যায়াম ও আলো হাওয়ায় শরীরের উজ্জীবিত করে এই চিকিৎসা করা হয়।

(৩) পথ্য ব্যবস্থা: দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক ক্রিয়া কর্ম, অভ্যাস ও আবেগজনিত অবস্থা সংক্রান্ত উচিত অনুচিত বিষয়ে ইঙ্গিতসমূহ পথ্যব্যবস্থায় অন্তর্গত। দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের উপর নিষেধাবলী জারি করে অগ্নিকে উদ্দীপিত করা এবং খাদ্যবস্তুর ভালভাবে হজম করানোর মাধ্যমে কলাসমূহের শক্তিলাভই হল এই ব্যবস্থার লক্ষ্য।

(৪) নিদান পরিবর্জন: নিদানবর্জন হল শরীর রোগগ্রস্ত হওয়ার যেসব কারণসমূহ দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় বর্তমান সেগুলির পরিহার। যে সকল কারণে রোগগ্রস্ত শরীর আরও রোগগ্রস্ত হতে পারে সে কারণগুলিকে পরিত্যাগ করাও এর মধ্যে অন্তর্গত।

(৫) সত্ববজায়: সত্ববজায় প্রধানতঃ মানসিক অসুবিধায় বেশি কাজ করে। মনকে অস্বাস্থ্যকর বস্তুর কামনা থেকে মুক্ত রাখা, সাহস, স্মৃতিশক্তি, বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান চর্চা থেকে অনেক বিশদভাবে আয়ুর্বেদে বর্ণিত আছে।

(৬) রসায়নচিকিৎসা: রসায়নচিকিৎসা মানবদেহে শক্তি ও প্রাণশক্তি আনয়নের চিকিৎসা। শারীরিক কাঠামোর দৃঢ়তা স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধি, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শরীর ও ইন্দ্রীয়সমূহে পূর্ণমাত্রায় শক্তিসংক্ষরণ – রসায়ন চিকিৎসার অন্যতম উপকারিতা।

রোগনিরাময়ে যোগাভ্যাস: যোগ বা অভ্যাস হল শরীর আর মন যুক্তকরে সুস্থ থাকার একটি প্রাচীন পদ্ধতি। আসলে যোগ শুধু ব্যায়াম নয়, যোগ কথার আসল অর্থ হল চেতনা। মানবজীবন হল আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমাদের অস্তিত্ব হিসেবে আমরা পেয়েছি দেহ, মন ও আত্মা। আমাদের এই দেহ মন ও আত্মা একীভূত করার নামই যোগ। চিকিৎসকেরা বলেছেন– রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন বারবার শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। গীতায় বলা হয়েছে- “যোগঃকর্মসুকৌশলম্”। আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং কর্মে সামর্থ্য থাকে, মেদবহুল দূরীভূত হয়–

লাঘবং কর্মসামর্থ্যং দীপ্তাগ্নির্মেদসঃ ক্ষয়ঃ।
বিভক্তঘনগাত্রত্বং ব্যায়ামাদুপজায়তে।।

মানসিক স্বাস্থ্যকে সুস্থ থাকার জন্য আয়ুর্বেদে প্রতিনিয়ত যোগাভ্যাস করার কথা বলা হয়েছে। কেননা সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক বেদনার নিবৃত্তি যোগাভ্যাসের মাধ্যমেই হয়ে থাকে– “যোগে মোক্ষে চ সর্বাসাং বেদানামামবর্ত্তনম্”। পণ্ডিতজ্ঞ মতে যোগ বলতে–

"শুদ্ধসত্ত্বসমাধানাত্তৎসর্ব্বমুপজায়তে"। সুতরাং এই যোগবলেই মনকে রজ ও তমঃ গুণ শূন্য করা যায়।

"যোগসূক্তম্" নামক গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ সম্পর্কে প্রথমে উপযুক্তভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করায় আমরা সকলে মহর্ষিকে নমস্কার জানাই–

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদিকেন।
যোপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোস্তি।।

"যোগসূক্তম্" গ্রন্থে অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় বর্ণিত রয়েছে। এই অষ্টাঙ্গযোগ সমূহ হল–যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াণ-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা-সমাধি। অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে আসন ও প্রাণায়াম যোগ অন্যতম। কারণ আসনযোগ দেহকে স্থিরভাবে সুখজনক অবস্থায় রাখে। যোগাভ্যাসের জন্য শারীরিক ও মানসিক নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। সুতরাং দেহ নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ রাখতে হলে–পদ্মাসন, ভদ্রাসন, যোগাসন, চক্রাসন, ধনুরাসন প্রভৃতি ব্যায়ামের প্রয়োজন। প্রাণায়াম মনকে শান্ত করে, উদ্বেগ হ্রাস করতে সাহায্য করে। যোগের মাধ্যমে রাগ, চঞ্চলতার মতো বেশকিছু মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সুতরাং আমরা যদি নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করি তাহলে আমাদের দেহ ও মন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকবে। এমন কী রোগের প্রাদুর্ভাব তেমন ঘটবে না। অতএব বর্তমানজীবনে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন ব্যায়াম করা অবশ্যই প্রয়োজন।

যোগাভ্যাসের মাধ্যমে রোগমুক্তির উপায়সমূহ :

(ক) শ্বাসকষ্টের সমস্যায়: শ্বাসকষ্টের সমস্যার মোকাবিলায় সিদ্ধাসন খুব উপকারি। এর জন্য একদম সোজা হয়ে অর্থাৎ মেরুদণ্ড সোজা রেখে পা গুটিয়ে বসা। অনেকটা পদ্মাসনের মতোই দেখতে লাগে। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করতে হবে। এই যোগাসন করলে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি ফুসফুসের কার্যক্ষমতা ও বাড়ে।

(খ) হজমের সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ: হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পবনমুক্তাসন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চিৎহয়ে শুয়ে প্রথমে ডান পা ভাঁজ করে বুকের সঙ্গে লাগাতে হবে, তখন বাম পা সোজা থাকবে। তারপর একইভাবে বাম পা ভাজ করতে হবে, তখন ডান পা সোজা থাকবে। সবশেষে দুটো পা একসঙ্গে ভাঁজ করে বুকের কাছে ধরতে হবে। এই যোগাসন করলে গ্যাস, অম্বল, হজমের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয় এবং খিদে বাড়ে।

(গ) অনুলোম-বিলোম: শ্বাসকষ্ট বা অ্যাজমা ও স্নায়ুর সমস্যায় ভুগলে রোগীদের জন্য অনুলোম-বিলোম অত্যন্ত উপকারী। এরজন্য প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে পদ্মাসনের মতো বসতে হয়। এবার এক হাতের বুড়ো আঙুলদিয়ে বাম নাক চেপে ধরে ডান নাক দিয়ে বড় করে শ্বাসনিতে হয়। শ্বাস ধরে রেখে মনে মনে দশ পর্যন্ত গুণতে হয়। তারপর একই হাতের তর্জনি দিয়ে ডান নাক চেপে বাম নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়।

(ঘ) হাঁটুর ব্যথা কমাতে: হাঁটুর ব্যথা থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে উত্থান পদাসন করা প্রয়োজন। চেয়ারে বসে পা তোলা ও নামানো অর্থাৎ পেলভিস ব্রিজ করতে হয়, এতে থাইয়ের পেশি সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়। চিৎহয়ে শুয়ে হাঁটু ভাঁজ করে উপরের দিকে তোলাকে পেলভিসব্রিজ বলে। এছাড়া কোমরের যন্ত্রণা কমাতে ভুজঙ্গাসন করতে হয়।

(ঙ) ডায়াবেটিস: ইনসুলিনের অপর্যাপ্ত উৎপাদন বা দেহে ইনসুলিনের অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে গ্লুকোজ স্তর বৃদ্ধি পায়। ডায়াবেটিস রোগীরা দেহের সুগারলেভেলনিয়ন্ত্রণ করতে অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন করা প্রয়োজন। এছাড়া এইরোগে চক্রাসন ও করা যেতে পারে।

(চ) মাইগ্রেনেরসমস্যা: মাইগ্রেন একটি ক্রনিক নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ, যার কারণে ঘনঘন মাঝারি থেকে গুরুতর মাথাব্যথা হতে পারে। এরজন্য পদ্মাসন ও শীর্ষাসন খুব উপকারি।

পদ্মাসন করলে মাইন্ডরিল্যাক্স করে এবং মাথাব্যথা উপশম করে। আর শীর্যাসন মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে। একে সমস্ত যোগাসনের রাজা বলা হয়।

(ছ) থাইরয়েড: থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে হলাসন এবং মৎস্যাসন করা প্রয়োজন। হলাসন ঘাড়সংকোচনে সাহায্য করে এবং থাইরয়েড গ্রন্থি উদ্দীপিত করে।

যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা: যোগাসন হল জীবনের সাথে প্রকৃতির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম। নিয়মিত যোগাসন করলে আমাদের শরীরে নানা উপকার হয়। যেমন –

(ক) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

(খ) শারীরিক সক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায়।

(গ) শরীরে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বাড়ায়।

(ঘ) হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট দূর করে।

(ঙ) মানসিক চাপ দূর হয়।

উপসংহার: বর্তমানকালে রোগমুক্তিতে আয়ুর্বেদে আস্থা রাখার দিন উপস্থিত হয়েছে। আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্য হল – স্বাস্থ্যরক্ষা ও তার উন্নতি এবং রোগের সঠিক নিরাময়। ভারত সরকার বর্তমানে রোগ – প্রতিরোধের জন্য আয়ুর্বেদ নামক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর গুরূত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া দেহ সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে হলে যোগাভ্যাস করা অবশ্যই দরকার। এই কারণে বর্তমানে যোগাভ্যাসের প্রতি ভারত সরকার বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। এখন প্রতি বছর জুন মাসে যোগদিবস পালন করা হয়। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হবে। পরিশেষে বলা যায়–

“সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেত।।
ওঁশান্তিঃ, ওঁশান্তিঃ, ওঁশান্তিঃ।”

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা–কবিরাজ বিদ্যার্থী
২. সুশ্রুত সংহিতা–যশোদানন্দ সরকার, কলিকাতা
৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস–ড. দেবকুমারদাস সদেশ প্রকাশন।
৪. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস–ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
৫. চরক আসংহিতা–কবি রাজ ব্রজেন্দ্রনশ, নবপত্র প্রকাশন
৬. মনুসংহিতা–মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৭. আনন্দবাজার পত্রিকা।

অন্তটীকা :

১. চরকসংহিতা সূত্রস্থান-1/41
২. চরকসংহিতা সূত্রস্থান-1/1/15
৩. চরকসংহিতা সিদ্ধিস্থান-12/53
৪. চরকসংহিতা সূত্রস্থান-30/26
৫. অথর্ববেদ/কাণ্ড 2/সূক্তম্ 33-1
৬. অষ্টাঙ্গহৃদয়ম্, সূত্রস্থানম্ – 2/10
৭. পতঞ্জলি সোগসূত্র।

উনিশ শতকে (১৮৭০-১৯০০) বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের নামকরণে 'আর্য্য' শব্দের ব্যবহার

পারঙ্গমা সেন সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের নামকরণের ধারাবাহিক ইতিহাস যদি দেখি, তাহলে দেখব প্রায় প্রতি দশকেই পত্র-পত্রিকাগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ঝোঁক তৈরি হয়েছে এবং প্রকাশের স্থান, পরিসর, বিষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবণতা অনুযায়ী তা বদলেছে বারবার। উনিশ শতকে 'আর্য্য' শব্দ সমন্বিত বাংলা পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে মোট ২৭টি। আমরা দেখেছি উনিশ শতকের ঠিক শেষ তিরিশ বছরে বাংলা পত্র-পত্রিকার নামকরণের দুনিয়ায় এই 'আর্য্য' প্রবণতা প্রকট। সংবাদপত্রের নামের শেষে 'দর্পণ' বা 'দর্শন' কিংবা শুরুতে 'সংবাদ' বা 'সমাচার' যোগ করার মতো নিছক কোন বহুল প্রচলিত ঝোঁক এটি নয়। এর পেছনে আছে গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি ধর্মীয় কারণ। ঠিক কোন নিগূঢ় কারণে উনিশ শতকের শেষ তিন দশক জুড়ে প্রায় প্রতি বছর একটি করে 'আর্য্য' শব্দ যোগ করে পত্রিকা বেরোত? সেই সব পত্রিকার বিষয়বস্তু, বক্তব্যের ধরণ, যুক্তিগত অবস্থান কি একই সুরে বাঁধা ছিল? নাকি তাতে ছিল বিবিধ বিষয়ের বৈচিত্র্য? পত্রিকাগুলির স্থায়ীত্ব কিরকম ছিল? পত্র-পত্রিকার দুনিয়া থেকে বেরিয়ে উনিশ শতকের সাহিত্য, থিয়েটার, সভা-সমিতি, মেলা প্রভৃতি অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিসরে 'আর্য্য' শব্দের তাৎপর্য্যটি ঠিক কী ছিল? সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত মাথায় রেখে এই গবেষণাপত্র খোঁজ করবে সেই সব প্রশ্নের উত্তরের।
সূচক শব্দ: উনিশ শতক, আর্যতত্ত্ব, সংবাদ-সাময়িকপত্র, হিন্দু পুনরুত্থান, নব্য জাতীয়তাবাদ, হিন্দুমেলা।

মূল আলোচনা:
উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের নামকরণের ধারাবাহিক ইতিহাস যদি দেখি, তাহলে দেখব প্রায় প্রতি দশকেই পত্র-পত্রিকাগুলির নামকরণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ঝোঁক তৈরি হয়েছে এবং প্রকাশের স্থান, পরিসর, বিষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবণতা অনুযায়ী তা বদলেছে বারবার। যেমন, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সংবাদপত্রের নামের সঙ্গে 'সমাচার' বা 'সংবাদ' কথাটা জুড়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল- *সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ বিভাকর* ইত্যাদি। আবার কোন সভার মুখপত্র হলে সেই সভার নামেই পত্রিকার নামকরণ হত। কখনও দেখা গেছে কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম পত্রিকার নামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে (যেমন- *হিন্দু হিতৈষী, ব্রাহ্ম জীবন, খ্রীষ্টীয় বান্ধব, ইসলাম প্রচারক* প্রভৃতি)। অনেক সমালোচকের মতে উনিশ শতকের বাংলায় শেষ তিরিশ বছর 'হিন্দু পুনরুত্থানের' যুগ। অথচ 'হিন্দু' শব্দ সমন্বিত পত্রিকার প্রকাশ কিন্তু গোটা উনিশ শতক জুড়েই হয়েছে, শেষ তিরিশ বছরে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মও কিন্তু উনিশ শতকের শেষ তিন-চার দশকে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে 'ভারত' শব্দ যোগ করে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ (*সংবাদ ভারতবন্ধু*) থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এবারে

যদি উনিশ শতকের ঠিক শেষ তিরিশ বছরে আসি তাহলে দেখব, বাংলা পত্র-পত্রিকার নামকরণের দুনিয়ায় 'আর্য্য' শব্দ যোগ করে পত্রিকা প্রকাশের প্রবণতা প্রকট। তবে সংবাদপত্রের নামের শেষে 'দর্পণ' বা 'দর্শন' কিংবা শুরুতে 'সংবাদ' বা 'সমাচার' যোগ করার মতো নিছক কোন বহুল প্রচলিত ঝোঁক এটি নয় বলেই মনে হয়। অন্তত উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে 'আর্য্য' শব্দের এই বহুল ব্যবহারকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়।

এই প্রবন্ধের আলোচনার ধারা মূলত দুটি খাতে বইবে। এক, 'আর্য্য' শব্দটি জুড়ে উনিশ শতকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, স্থায়িত্ব ও প্রবণতা সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনা, আর দুই, উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছরের পরিসরে 'আর্য' শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয়। আগে দ্বিতীয়টির বিষয়ে কথা বলা যাক।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অন্তত কলকাতা কেন্দ্রিক যে সামাজিক ইতিহাসের ধারা তাতে প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে সংস্কার, প্রতিস্থাপন এমনকি বাতিলের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। লোকাচার-দেশাচারে জর্জরিত ঈশ্বরের হিন্দু-পৌত্তলিক রূপ প্রতিস্থাপিত হয়েছেন খ্রিস্টান 'গড' আর ব্রাহ্ম 'ব্রহ্মের' দ্বারা, নাকচ হয়েছেন ইয়ং বেঙ্গলের ধারালো যুক্তিবাদে। সমাজ সংস্কার করা হয়েছে ধর্মের বিধিনিষেধকে শিথিল করেই। নিশ্চিতভাবে তাতে সমকালেই বিপুল বিরোধিতা এসেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদনের মতো লেখক, চিন্তক, সমাজ সংস্কারকেরা তাঁদের লেখায়, চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি কাঠামোতে ঈশ্বর নিরপেক্ষ বয়ান নির্মাণের চেষ্টা করে গেছেন বারবার। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হল এই যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই ধর্মই ফিরে এসেছে তৎকালীন সামাজিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিসরের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে। প্রথমার্ধে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল "সুপরস্টিসনের শিকলি কেটে"[১] "সোসীয়াল রিফরমেশন"[২] করা, অন্যদিকে দ্বিতীয়ার্ধে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার প্রকল্পে সভাসমিতিগুলি হয়ে উঠল পূর্ব প্রচলিত ধর্মের প্রচারক বা তার পুনর্গঠনের ক্ষেত্র।

উনিশ শতকের প্রথমাংশে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির রাজভক্তি অটুট ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তাতে সূক্ষ্ম এবং অতি ধীর গতিতে ফাটল ধরা শুরু হয়। তার রাজনৈতিক কারণ এখানে আলোচ্য নয়, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে যে বদল তা বিবেচনা করা দরকার 'আর্য' প্রসঙ্গটি মাথায় রেখেই। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়া মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে আত্ম পরিচয় সংক্রান্ত সচেতনতা ক্রমেই দানা বাঁধছিল। সেই আত্মচেতনাতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি খুঁজছিল নিজের অতীত উৎস, ইতিহাসকে সে প্রশ্ন করছিল গৌরবের দাবি নিয়ে। আর এই অনুসন্ধান পর্বে জাতীয়তা আর হিন্দুত্বের ধারণা ক্রমেই একাকার হয়ে যাচ্ছিল, কারণ অতীত নির্মাণের এই প্রকল্পে প্রধান কারিগর যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রধানত হিন্দু, উচ্চবর্ণ ও পুরুষ।

সে যুগের জাতীয়তাবাদীর কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, পাশ্চাত্য ও দেশীয় সংস্কৃতি থেকে কতটা গ্রহণ-বর্জন করা যায় এবং কীভাবে দুটিকে মেলানো যায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও ভারতীয়দের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, খাদ্য-পানীয়, পোশাক যেন ইংরেজদের মত না হয়ে যায়, তা সেই সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা চর্চার জন্য ১৮৬৭ তে শুরু হয় 'জাতীয় মেলা', যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্ররা। যে মেলায় 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু। ১৮৬৮ সালের অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানান, "এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা"[৩]। তাই হয়তো পরবর্তীতে এটি 'হিন্দুমেলা' নামেই বেশি পরিচিত হয়, 'জাতীয়' শব্দের বিকল্পে প্রায় প্রশ্নাতীত ভাবে ব্যবহৃত হয় 'হিন্দু' শব্দটি।

এই সময় একটি ঐক্যবদ্ধ 'আমরা'র নির্মাণের প্রধান সূত্র হিসেবে হিন্দু ধর্মকে তুলে ধরার ফলে সংস্কার আন্দোলন বাধা পাচ্ছিল ভীষণভাবে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিন্দু পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও আচার সর্বস্বতার বিরোধিতা করে একদিন যে ব্রাহ্মধর্মের জন্ম হয়েছিল, প্রগতির প্রশ্নে সেই ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৬ তে স্পষ্ট দুটিভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ছিল অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে, নিজেদের হিন্দু পরিচয় তুলে ধরার পক্ষপাতী (যেমন- উপবীত ধারণ ইত্যাদি)। আশ্বিন ১৭৯৮ শকে (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে) *তত্ত্ববোধিনী*তে প্রকাশিত প্রবন্ধে হিন্দু ধর্মকে প্রয়োজনমত সংস্কার করে সর্বসাধারণের গ্রহণের উপযোগী করে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

উনিশ শতকের শেষ তিরিশ বছর এমনি এক হিন্দু জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন ছিল। এহেন প্রেক্ষিতে 'আর্য' শব্দটিকে ঠিক কীভাবে গ্রহণ করত সমাজমন? এবারে আসব সেই আলোচনায়। সমকালে 'হিন্দু' ধারণার নবনির্মাণের অন্যতম কারিগর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সত্তরের দশকে লেখা একটি প্রবন্ধে, তাঁর কলমে 'আর্য' শব্দের তাৎপর্য্য নিয়ে সংশয় স্পষ্ট-

> "যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন তো অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 'আর্য' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য ছিলেন; অথবা তাঁহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আর্যবংশ। কিন্তু এই আর্য শব্দ আর বেদের আর্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আর্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহারদিগের অনুবর্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুষ, যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু সকলেই আর্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না; হিন্দুরা আর্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আর্য নহে। তবে আর্য শব্দের অর্থ কি?"[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যার সমাধান করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে এবং পরিশেষে পাশ্চাত্যের যে আর্য বহিরাক্রমণ তত্ত্ব, অর্থাৎ আর্যরা ভারতের প্রকৃত অধিবাসী নয়, তারা মধ্য ইউরোপের কোন অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে এসে এখানকার প্রকৃত অধিবাসীদের পরাজিত করে বসতি স্থাপন করেছে— এই তত্ত্ব কার্যত মেনে নিয়েছেন।

উনিশ শতকের গোড়াতেই ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে উইলিয়াম জোন্স প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়। যেখানে তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষাগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন এবং কোন একটি আদিম ভাষার কল্পনা করলেন যা এই সকল ভাষার উৎস। পরবর্তীতে সে আদিম ভাষার নাম দেওয়া হল 'ইন্দো-ইউরোপীয়'। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে নামটি দিলেন টমাস ইয়ং[৫]। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে দুটি প্রাচীনতম গ্রন্থ— আবেস্তা এবং ঋগ্বেদ, তাতে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হয়েছে 'ঐরিয়' বা 'আর্য' বলা হয়েছে।[৬] তাই ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রেও 'এরিয়ান' পরিভাষাটি ব্যবহার হওয়া শুরু হয়।

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সমূলার ছিলেন প্রথম বড় মাপের পণ্ডিত যিনি আর্যতত্ত্বকে ভারতের ইতিহাসে প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রয়োজন ছিল সংস্কৃত ও সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলিকে 'আর্য' নাম দিয়ে, ভারতের আদিবাসীদের ভাষাগুলিকে এর থেকে পৃথক করা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি 'আর্য' পরিভাষাটি 'ভাষা' ও 'জাতি' উভয়ক্ষেত্রেই পারস্পরিক বদল করে ব্যবহার করে গেছেন[৭]।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবিদের চিন্তা-চেতনার খাতে ম্যাক্সমুলারের এই আর্যতত্ত্বের প্রভাব বিষয়ে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য –

> "ম্যাক্সমূলর যখন বৈদিক ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্মদাতা আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমী হেলেনিক-লাতিন আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আত্মীয়তা খুঁজে পেলেন, তখন থেকে প্রাচীন যুগকে 'আর্য', পরে 'হিন্দু' ইত্যাদি অভিধা দেওয়া হতে লাগল।... উনিশ শতকের কোন সময় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, আর্য ইতিহাস, হিন্দু ইতিহাস- সব সমার্থক হয়ে গেল।"[৮]

বস্তুত, এই আর্যতত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে উনিশ শতকের বাংলায় দুটি ঘটনা ঘটল। এক, উপনিবেশবাদ বৈধতা পেল, আর দুই হিন্দু জাতীয়তাবাদ নিজেদের অতীত গৌরবের রসদ হিসেবে এটিকে ব্যবহার করল। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই আর্যতত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। যখন জাতীয়তাবাদ ও সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মুখ্য হয়ে দেখা দিল পরিচয় বা অভিজ্ঞানের প্রশ্ন, তখনই বিভিন্নভাবে অনেক রাজনৈতিক মতাদর্শ তত্ত্বটিকে নিজেদের সুবিধার্থে কাজে লাগাল।

বহিরাগত আর্যদের ভারত আক্রমণ ও এখানে বসতি স্থাপনের যে তত্ত্ব তার একটি দিক হল, এটিই প্রমাণ করা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি আসলে ইউরোপ কেন্দ্রিক। ইউরোপ থেকে এই ভাষা ও ভাষা ব্যবহারকারী উন্নততর বহিরাগতরাই ভারতে এসে ভারতকে মহমান্বিত করেছে। 'রেনেশাঁসের' বুখার্টীয়[৯] মডেলে, সমসাময়িক যুগের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরতে প্রাচীন ক্লাসিকাল সভ্যতার সাথে আত্মীয়তা স্থাপনের এক প্রয়াস দেখা যায়, যা তৈরি করে মধ্যবর্তী অন্ধকার যুগের ধারণা। এই অন্ধকার যুগের ধারণাকে আরও মান্যতা দিল আর্যতত্ত্ব। যে আর্যরা একদিন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে স্থাপন করেছে, সেই আর্যরাই আবার ফিরে এসে আধুনিক যুগের নির্মাণ করছে – এমন বক্তব্য ঔপনিবেশিক শাসকরা ব্যবহার করল নিজেদের স্বার্থে। দেশীয়দের রাজভক্তিও ইন্ধন পেল যথেষ্ট।

অন্যদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের অতীত গৌরবের পরাকাষ্ঠা হিসেবে তাঁদের প্রাচীন আর্য পরিচয়টিকে তুলে ধরল। পরবর্তীতে আর্যদেরকেই ভারতের প্রাচীনতম বাসিন্দা হিসেবে দেখাতে বহিরাক্রমণের তত্ত্বটিকে পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়া হল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বেতে দয়ানন্দ সরস্বতী তৈরি করলেন 'আর্য সমাজ'।

এই পরিস্থিতে উনিশ শতকের বাংলায় যদি ফিরি তাহলে দেখব এই শতাব্দীর শেষ তিরিশ বছরে প্রায় প্রতি বছরই একটি করে 'আর্য্য' শব্দ সমন্বিত সংবাদ-সাময়িকপত্র বেরোত। উনিশ শতকে 'আর্য্য' শব্দ যোগ করে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে মোট ২৭টি। এর মধ্যে প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশ পায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ থেকে। নাম *আর্য্যধর্ম্মপ্রকাশিকা*। আর উনিশ শতকে প্রকাশিত 'আর্য্য' শব্দ সমন্বিত শেষ পত্রিকাটি হল *আর্য্যসমাচার*, যেটির প্রকাশকাল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ। এই মোট ২৭টি পত্রিকার মধ্যে ১১টি বেরোয় মফঃস্বল থেকে। এর মধ্যে বেশিরভাগ পত্রিকাই খুব বেশিদিন চলেনি।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *আর্য্যধর্ম্মপ্রকাশিকা* ছিল ময়মনসিংহের 'হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী' সভার মুখপত্র। কৌলীন্য প্রথার সমর্থন ও প্রচার এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে বারুইপুরের *আর্য্যোদয়* (১৮৭১) ছিল জমিদার পরিচালিত পত্রিকা। পত্রিকাটির মনোভাব ছিল যথেষ্ট কট্টর, প্রথম থেকেই এটি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা প্রচারে মন দেয়। তাদের এই কুৎসা প্রচার প্রবণতা থেকে সমকালীন পত্রিকা *এডুকেশন গেজেট* একাধিকবার বিরক্তি প্রকাশ করে। ১৮৭২ এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আর্য্যপ্রবর* পত্রিকাটি বেশিদিন

চলেনি। তবে পত্রিকাটি ছিল তত্ত্ববোধক, শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানদ্যোতক।[১০] তবে এই 'আর্য্য' নামাঙ্কিত পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা হল *আর্য্যদর্শন।* এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাস নাগাদ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করতেন ক্যাথিড্রাল মিষন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ। প্রায় ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে পত্রিকাটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই তাদের নামের সাথে 'আর্য্য' শব্দটি যোগ করার বিষয়ে সচেতন ছিল। একদম প্রথম সংখ্যায়, 'আর্য্যবংশ' শিরোনামে যে লেখা বেরোয় সেখানে তাঁরা 'আর্য্য' শব্দটি বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন তা স্পষ্ট করা হয় –

> "আর্য্য- এই নামে আমরা কী বুঝিব? এই নামে সচারাচর কী বুঝায়? সচারাচর এই নামে কেবল হিন্দু মাত্র বুঝায়। ... আমরা কি সেই সংকীর্ণ অর্থেই এখানে 'আর্য্য' শব্দ প্রয়োগ করিলাম? না। - আর্য্য শব্দের যে গভীর ও বিস্তৃত অর্থ, যে অর্থে এসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমস্ত সভ্যজাতিই ইহার অন্তর্ভূত, সেই গভীর ও বিস্তৃত অর্থেই আমরা এ স্থলে এই 'আর্য্য' শব্দ প্রয়োগ করিলাম। হিন্দু ও পারসিক - কেল্‌তিক ও দৈতনিক – রোমিক ও গ্রীক – স্ক্লাভোনিক ও ঈলিরিক, সকলেই এই বিস্তৃতার্থে আর্য্য শব্দের বিষয়ীভূত।"[১১]

অর্থাৎ *আর্য্যদর্শনের* 'আর্যামি'তে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ছিলনা, বরং খানিক ঔপনিবেশিক শাসনকে মান্যতা দেওয়া ছিল। কারণ প্রথম সংখ্যার পরবর্তী লেখাতেই পত্রিকাটিকে দেখা যায়, তৎকালীন ভারতবর্ষের শাসক ও শাসিত যে আদতে একই জনগোষ্ঠীভুক্ত এই বিষয়ে রীতিমত আহ্লাদিত হতে। এইভাবে বৃহত্তর অর্থে আর্য-গৌরব প্রচার করার জন্যই *আর্য্যদর্শনের* বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে 'আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ', 'আর্য্যজাতির ব্যবহার বিজ্ঞান', 'আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি শিরোনামের রচনা। তবে শুধু এসবই নয়, বিহারীলালের *সারদামঙ্গল* কাব্যের কিছু অংশ, ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির জীবনীও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

'আর্য্য' শব্দটি সংযুক্ত অপর একটি পত্রিকা, যা নিয়ে কথা বলা দরকার, তা হল *ভারতবর্ষীয় আর্য্যপত্রিকা।* হরিনাভি থেকে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন, গোপাললাল বসু বর্মা; যিনি কিনা আবার ছিলেন 'ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভা'র মুখপত্র। এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল 'কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন'। শাস্ত্রীয় বচন তুলে কায়স্থরা যে আসলে কতখানি ক্ষত্রিয় সেটি প্রমাণের জন্য এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন রাজনারায়ণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি। ১৭৯৭ শকের আষাঢ় সংখ্যায় *তত্ত্ববোধিনীতে* এর উল্লেখ থেকে বিষয়টি জানা যায়। কায়স্থদের মহিমা প্রচার করে 'আর্য্য' শব্দ সহ আরও একটি পত্রিকা বেরোয়, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। সেটি হল *আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা।* এটি ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়, 'আর্য্যকায়স্থ সমিতি'- র মুখপত্র হিসেবে। কায়স্থদের মহিমা প্রচার এবং তাঁরা যে শূদ্র নন, তা প্রমাণ করাই ছিল হিন্দু ধর্মকর্মে আস্থাবান এই পত্রিকাটির অন্যতম প্রতিপাদ্য।

তবে শুধু হিন্দুরাই যে 'আর্য্য' শব্দটিকে ব্যবহার করে সমকালে বাংলা পত্র-পত্রিকা বের করেছিল এমন নয়; *আর্য্যদর্পণ* নামে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটি। এটি ছিল দেশীয় খ্রিস্টান সমাজের মুখপত্র। তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথাই এখানে স্থান পেত। দশ বছরেরও বেশি পত্রিকাটি চলেছিল, কিন্তু এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল সীমিত।

এগুলি ছাড়াও *আর্য্যপ্রতিভা* (১৮৮৯), *আর্য্যপ্রদীপ* (১৮৭৮), *আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি* (১৮৭৮), *আর্য্যকাহিনী* (১৮৮১), *আর্য্যরঞ্জন* (১৮৮২) প্রভৃতি 'আর্য্য' নামধারী স্বল্পস্থায়ী পত্রিকা কলকাতা, বরিশাল, কুমিল্লা, বর্ধমান ইত্যাদি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। যেগুলির কোনটিতে থাকত বেদ-পুরাণ-দর্শনের নিখাদ আলোচনা, আবার কখনও থাকত সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সমাহার। বিষয় বৈচিত্র্যে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিল শিশুদের শিক্ষামূলক উপদেশ, ভারতীয় আর্যদের আদি ইতিহাস, দেশি-বিদেশি মনীষীদের জীবনীও।

অর্থাৎ 'আর্য্য' শব্দ যুক্ত বাংলা পত্রিকাগুলির বিষয়বস্তু কখনোই সীমাবদ্ধ ছিল না উনিশ শতকে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ উদ্দেশ্যে 'আর্য্য' শব্দটি সেইসময় ব্যবহৃত হয়েছে। কট্টর হিন্দুত্বের প্রচার, কিংবা হিন্দুদের মধ্যেই জাতিবিচার, আবার দেশীয় খ্রিস্টানদের আঁতের কথা, বা সাধারণ ইন্দো-ইউরোপীয় অতীতের গর্বিত উদযাপন – সবরকম উদ্দেশ্যেই 'আর্য্য' শব্দের আশ্রয়ে সাধিত হচ্ছিল। তবে উনিশ শতকের শেষোর্ধে 'আলো ঝলমলে' রেনেশাঁসের সন্ধ্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে বাঙালির কাছে মধ্যযুগ ছিল নেহাতই অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই বাঙালির গৌরবময় অতীত পুনরুদ্ধার প্রকল্পে 'আর্যতত্ত্ব' হয়ে উঠেছিল অন্যতম সহায়ক ভাবনা। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চা থেকে জাত একটি 'অ্যাকাডেমিক' তত্ত্ব এভাবেই বিভিন্ন ব্যখ্যা ও আঙ্গিকে ব্যবহার হওয়া শুরু হয়েছিল রাজনীতিতে।

তথ্যসূত্র:

১. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, *"একেই কি বলে সভ্যতা?", মধুসূদন রচনাবলী (চতুর্থসংস্করণ),* ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ২৪৭
২. তদেব।
৩. বাগল, যোগেশচন্দ্র, *জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, এসকে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা- ০৮
৪. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্টোবর ২০১৮, "বাঙ্গালীর উৎপত্তি", *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রবন্ধ), দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৮২৩
৫. মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, জানুয়ারি ২০০৫ "ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা", *ইতিহাস চর্চার ধারা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃষ্ঠা- ৩৭৩
৬. থাপার, রোমিলা, জানুয়ারি ২০০৫, "আর্যতত্ত্ব ও ভারত ইতিহাসের সূচনা: একটি বিতর্ক", *ইতিহাস চর্চার ধারা,* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃষ্ঠা- ৩৭৩
৭. তদেব।
৮. ত্রিপাঠী অমলেশ, ১৯৯৫, *ইতালীর র‍্যনেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি,* কলিকাতা, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩৩
৯. ইতালীর রেনেশাঁস নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই লেখেন জ্যাকব বুখার্ট। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইয়ের নাম- *The Civilization of the Renaissance in Itali.*
১০. বসু, স্বপন, জানুয়ারি ২০১৮,*উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ৩৫১
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ যোগেন্দ্রনাথ, বৈশাখ ১২৮১ সংখ্যা, *আর্যদর্শন,* পৃষ্ঠা- ০৯।

রবীন্দ্রনাথের ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ ও ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসদ্বয়ে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা

মৌসুমী মণ্ডল

গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: উপন্যাস মাত্রই তা ইতিহাসের উপাদানে আধারিত। আর সমাজ ও সভ্যতার ক্রান্তিলগ্নে যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে সেখানে ইতিহাসের কথাই বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হল : **‘রবীন্দ্রনাথের বউ-ঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসদ্বয়ে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা’। যেখানে** বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসে** দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা; এবং **‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে** তুলে ধরেছেন ত্রিপুরার অধিপতি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাসের কাহিনীর বিবরণ। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভাবনার দীপ্তির প্রকাশও অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়েছে উপন্যাসদ্বয়ে।

সূচক শব্দ: ষড়যন্ত্র, নির্মম, উদ্ধত, স্বাধীনতাকামী, ভূস্বামী, বারভূঁইয়া, আদর্শবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব।

ভূমিকা: সর্বযুগের সর্বসেরা সাহিত্যিকদের অন্যতম শিরোমণি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে তাঁর ভাবধারা ও চিন্তাধারার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। তিনি ভারতের গর্ব এবং বিশ্ববরেণ্য অন্যতম এক পন্ডিত। সর্বদাই তাঁর পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে পথ দেখায়। উপন্যাসকে আমরা বলতে পারি প্রাচীন মহাকাব্যের আধুনিক রূপভেদ। আমরা জানি মহাকাব্যে তত্ত্বও আছে যেমন, দর্শনও আছে তেমন। আবার মহাভারত ও ভগবতগীতাতে দেখতে পায় দার্শনিক ভাবনার প্রভাব। এছাড়া টলস্টয়ের উপন্যাসেও কিন্তু আমরা ইতিহাস চেতনা পেয়েছি। সুতরাং, এটা তো স্বাভাবিক যে উপন্যাস মাত্রই তা ইতিহাস ও দর্শনে আবদ্ধ। আসলে সব উপন্যাসেই আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের উপাদান; এমনকি সমাজ ও সভ্যতার ক্রান্তিলগ্নে যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেখানে তো ইতিহাসের কথাই বলা হয়েছে। আমরা জানি দেশ-কাল-সময় উপন্যাসের পটভূমি এবং ইতিহাসের বিশেষ উপাদানে তা আধারিত।

বললাম টলস্টয়ের উপন্যাসেও ইতিহাস বর্ণিত আছে; তবে টলস্টয়ের উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, ব্যক্তি বিশ্বাসের মাধ্যমে ইতিহাসে কিভাবে মুক্তি এনেছিলেন। আর আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র আবার দেখিয়েছেন উপন্যাসে স্বদেশ প্রেমে বিশ্বাসী; কেননা তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে দেখতে পাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আর ‘রাজসিংহ’ ও ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসে তিনি মূলত ইতিহাসের উপাদানকেই স্পষ্টত করেছেন। আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে আমরা শুধুমাত্র ইতিহাসের সময়ের দলিলীকরণ মনে করি না, তাকে মানবিক অধিকারের কাহিনী ও মনে করা হয়।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৮৭৭ এ ‘করুণা’ লেখার মধ্য দিয়ে। তবে তিনি নিজেই এটিকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের মর্যাদা দিতে

চাননি। তবে আমরা এও জানি যে, বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই স্পষ্টত। তাঁরই উত্তরাধিকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ভাবনা এবং তা রচনার যাত্রা শুরু হয়। তবে উপন্যাস রচনার প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্রভেদী অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেইজন্যই মনে করা হয় তার প্রথম দুটি উপন্যাস রচনার সময়ে তিনি নিজের অগোচরেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন। যার পরিচয় আমরা পাই 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩), এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসে। যেখানে বাংলাদেশের যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের এবং ত্রিপুরার অধিপতি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; তবে তার মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভাবনার দীপ্তির প্রকাশ পায়।

মূল আলোচনা:

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে দেখতে পাই সেই সময়ের বার ভূঁইয়াদের অন্যতম যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর বিবরণ রচিত হয়েছে; আর রাজর্ষি উপন্যাসে রচিত হয়েছে ত্রিপুরার ইতিহাসের বিশেষ এক সময়ের রাজ বংশের রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনী। অবশ্য রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্ত কুমার পালের মতানুযায়ী, বার ভূঁইয়াদের কাহিনীর বিবরণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল প্রেরণাসূত্র পান পৌষ ১২৮৭ সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত কৈলাশ চন্দ্র সিংহের লেখা 'বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধ থেকে। যেখানে জীবনীকার বলছেন- "এই প্রবন্ধে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায়ের সম্পর্ক এবং তাঁর পরিণতি নিয়ে কিংবদন্তীমূলক একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে চিত্রাকর্ষক সেটি বেছে নিয়ে তাঁর কল্পনার জাল বুনেছেন; উদয়াদিত্য, বসন্তরায়, রামাই ভাঁড়, রামমোহন পাল প্রভৃতি ঔপন্যাসিক চরিত্র গুলির নাম ও তাদের প্রকৃতির পরিচয় সুত্রাকারে প্রবন্ধটিতেই আছে, বউ-ঠাকুরানীর হাট নামটিও উক্ত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।"[i]

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায় ও পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভার কথায় প্রাধান্য পেয়েছে, যার বেশিরভাগই নেই ইতিহাসে। আসলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে স্বাধীনতা স্থাপনে আগ্রহী রাজা প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্তার থেকেও প্রজাদের উৎপীড়নকারী, মূঢ়, নির্মম ও নিষ্ঠুর রূপের এক অপরিণামদর্শী চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে। বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও উপন্যাসের মূল কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। যেখানে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সংসার সীমায় আবদ্ধ এক পরিবারের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। আসলে উপন্যাস-প্রকরণ তো টুকরো ছবির ভিড় দিয়ে গড়া একটা সৃষ্টি; তবে আলোচ্য উপন্যাসটিকে মনে করা হয় যেন অনেকগুলো খণ্ডকালের ছবির সমাহার। কেননা এপ্রসঙ্গে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী একটু অন্যভাবে তাঁর আলোচনায় বলেছেন- "বউ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের সকল চরিত্রই যেন এক একটি বিশেষ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির প্রতীক, -ভালো চরিত্র নির্জলা ভালো, -মন্দ কেবল মন্দই।... ইতিহাসের সংঘাত, মাৎসর্য, ষড়যন্ত্রের ঘনঘটা, বাস্তব-সন্ধানী কৌতূহলকে প্রসঙ্গান্তরিত করতে পারার নূতন আকর্ষণ সঞ্চার করেছে।"[ii] তবে উপন্যাস জীবিত হয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি হল লেখকের সম্পাদনা। এপ্রসঙ্গে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসের সূচনায় স্পষ্টতই বলেছেন- "চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে

পারেনি। তারা আপন চরিত্র বলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।”[iii] রবীন্দ্রনাথ দেখালেন, যে রাজা প্রতিপাদিত্যকে সকলেই বীরত্ব বলে শ্রদ্ধা করছেন; সেই রাজা প্রতাপাদিত্যের রূঢ় নির্মমতায় কেমন করে অন্তপুরের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের জীবন বিষময় হয়ে উঠছে; পিতৃব্য প্রাণ হারাচ্ছেন, মেয়ে বিভার বিবাহিত দাম্পত্য জীবন কেমন করে ভেঙে যাচ্ছে! এই সমস্ত বেদনাপূর্ণ কাহিনীর বিবরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসে।

আগেই বললাম, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসে বিন্যাস্ত আছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট প্রভাব; এবং ইতিহাসের চালচিত্রে বহু চরিত্রের সমন্বয়ে বহু শাখায়িত ব্যক্তি ও বৈচিত্র্যে প্রভাবিত। তবে একথাও বলা যায়, আলোচ্য এই উপন্যাসে ইতিহাসের দূরাগত ছায়ার প্রভাবের থেকেও লেখক মানবিক সমস্যাকে বেশি করে তুলে ধরেছেন পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেই হিসেবে এই উপন্যাসকে আমরা পারিবারিক উপন্যাসও বলতে পারি; কেননা এর পটভূমিতে ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ের সূত্র ও সংকেতের উল্লেখ আছে। তবে ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতে আমরা যদি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থটিকে দেখি, তাহলে কিন্তু আমরা ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের উৎস মনে করতে পারি সেই গ্রন্থটিকে। কেননা এ কথা বলায় বাহুল্য যে, এই গ্রন্থের তথ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথও কিন্তু ঋণী ছিলেন; তবে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকেও সমানভাবে প্রাধান্য দিতে হয়। কারন আমরা জানি, এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা প্রতাপাদিত্য বঙ্গভূমির বিখ্যাত বার ভূঁইয়াদের প্রধান। তবে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে রাজা প্রতাপাদিত্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মান কোনটাই করতেন না; যদিও কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা প্রতাপাদিত্যকে তিনি বঙ্গভূমির বিখ্যাত ভূঁইয়াদের প্রধান হিসেবে দেখিয়েছেন। এ কথা অবশ্য স্পষ্ট যে, রাজা প্রতাপাদিত্যকে ঘিরেই কিন্তু স্বাধীনতা বোধের প্রকাশ প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলছেন- “স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। ...আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। ...আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।”[iv]

ইতিহাসের বেশ কিছু স্বীকৃত সত্য তথ্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে দেখতে পাই দিল্লির বাদশাহের বিরোধিতা, পিতৃব্য বসন্ত রায়ের হত্যা, জামাই রামচন্দ্রের হত্যার ষড়যন্ত্র; তবে একথাও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার রঙিন রঙে তাদেরকে রঞ্জিতও করেছেন। রাজা প্রতাপাদিত্য হয়ত নির্মম ও উদ্ধত ছিলেন, তবে সমসাময়িক যুগের লেখকেরা এটাও দেখিয়েছেন যে, এত কিছু সত্বেও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে কিন্ত স্বাধীনতাকামী একটা সত্তা ছিল। কেননা স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনার যুগে প্রতাপাদিত্যের মতো বীর চরিত্রের দেশপ্রেম, ম্লেচ্ছদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে আর্যধর্মকে রাহুমুক্ত করার সংকল্পে একথা বলে- “পিতৃব্য বসন্তরায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়েছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কাটিয়া

ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় রায়বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ঐ বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।”[v] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত পীড়ক সামন্তরাজ হিসেবে এবং হৃদয়হীন চরিত্ররূপে দেখিয়েছেন প্রতাপাদিত্যকে। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনুমান ঠিক ছিল বলেই জানা যায়; এবং প্রতাপাদিত্য ভাবনার দ্বারা রবীন্দ্রমনকে বিশেষভাবে আলোড়িত হতেও দেখা যায়। যার ফলে তিনি এই উপন্যাস রচনার প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯০৯ সালে এই উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামক একটি নাটক লেখেন; এবং এর আরো বিশ বছর পরে ১৯২৯ সালে প্রায়শ্চিত্ত পরিবর্তিত করে ‘পরিত্রান’ নামে একটি নাটক রচনা করেন।

আলোচ্য ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলে ধরেছেন শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে ক্ষমতা ও জনকল্যাণের আদর্শকেও। উপন্যাসটি একটি দীর্ঘ কাহিনী ও কয়েকটি চরিত্রের সমন্বয়ে সুচিত্রিত হয়েছে; যার মধ্যে পিতৃব্য বসন্ত রায়কে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা রবীন্দ্রনাথ এই খুড়ো মহারাজ বসন্ত রায়ের চরিত্রে বহু গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন কল্পনাকে আশ্রয় করে বা কল্পনার মাধ্যমে। তবে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অবশ্য অধুনা ইতিহাস সম্মত বলে প্রমাণিত হয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের বিরোধ ছিল মূল উপজীব্য। যেখানে প্রতাপাদিত্যের সাথে পুত্র উদয়াদিত্যের বিরোধ হলে, পুত্র দাদামশায়ের অনুগত হয়। যদিও প্রতাপাদিত্য ও খুড়ো বসন্ত রায় কিন্তু একই বংশের সন্তান, কারণ সম্পর্কের দিক থেকে বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের নিজের কাকা হন। অতএব এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইতিহাসের চালচিত্র থেকেই গল্প কাঠামো আলোচ্য উপন্যাসে পরিবারের মধ্যে আধারিত। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, আলোচ্য ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাস কিন্তু সেই অর্থে ততটা ঐতিহাসিক নয়; যে অর্থে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে করি। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের ‘হীরা’ চরিত্রের প্রভাব দেখতে পাই ‘রুক্মিণী’ চরিত্রের মধ্যে। কেননা কুন্দনন্দিনীর প্রণয়প্রার্থী ছিল দেবেন্দ্র এবং দেবেন্দ্রর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হীরা প্রতিশোধ নেয় কুন্দনন্দিনীর প্রতি; আর এখানেও উদয়াদিত্যের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণা রুক্মিণী উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমার সুখী দাম্পত্যকে বিনষ্ট করার জন্য সুরমাকে হত্যা করে বিষ পানে।

‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের কাহিনী দীর্ঘ এবং চরিত্র সমূহ যেন প্রত্যেকেই এক একটি মানস প্রবণতার মূর্ত প্রকাশ; অধুনা ইতিহাস সম্মত বলেই প্রমাণিত হয়েছে প্রতাপাদিত্য চরিত্রটি, তবে বসন্ত রায় চরিত্রটিকেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চিত্রিত করেছেন। কেননা বাস্তব জীবনে যে পরস্পর বিরোধী জটিল ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়; এনাদের মধ্যে কিন্তু জটিলতার সেই প্রকাশের অভাব দেখা যায়। তবে কাহিনীর ঘনত্ব ও চরিত্রের তির্যকতা- বিশেষত মানসিক দ্বন্দ্ব অতিশয় প্রাথমিক বলেই মনে হয়েছে। কেননা বিভিন্ন চরিত্রের উপরে যেসব আঘাত এসেছে তার সবটাই বলা যায় যান্ত্রিকভাবে কেবলমাত্র প্রতাপাদিত্যের দিক থেকেই এসেছে। আর বসন্ত রায় তার বিপদ তুষার পাতে জমাট-বাঁধা আনন্দ নির্ঝর। তবে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের রাজা গোবিন্দমানিক্য আবার এর বাস্তব সংগ্রামে বিমুখ ও অন্তরলোকে স্থির, আদর্শবাদ; যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শুভ ও কল্যাণবোধের মঙ্গলময় মূর্তি উদ্ভাসিত। যদিও ইতিহাস থেকে আগত এহেন চরিত্রের মধ্যে বিশেষ তত্ত্ব ও আদর্শকেই সঞ্চারিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেখানে রঘুপতিকে দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কারাবদ্ধ আচারনিষ্ঠা হিসেবে; সেখানে আবার

একমাত্র জয়সিংহকেই দেখা যায় জীবনের উভয়দিক সম্বন্ধে সচেতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হিসেবে।

আমরা জানি 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে ত্রিপুরার রাজবংশের একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে। যেখানে কল্পনার বৈচিত্র থাকলেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইতিহাসকে বড়ো কোথাও একটা অতিক্রম করেননি; বরঞ্চ বলা যায় উপন্যাসের শেষ দিকে কাহিনীকে পুরোপুরি প্রায় ইতিহাসের মধ্যেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা উপন্যাসের নর-নারী চরিত্রসমূহ গুলো সবই প্রায় বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের অধিবাসী; আর ইতিহাস এদের পাদপীঠ এবং জীবন এদের নেপথ্যগৃহ। আসলে এরা সকলেই ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে ভাবলোকের গুহা থেকে নির্গত হয়ে জীবনের আলোতে এসে প্রকাশিত হয়েছে; সেইসঙ্গে রহস্যের আঁধারের সাথে আলোক-চূর্ণের কল্পিত রশ্মি মাখা জীবনের সঙ্গে যেন সাধর্মের অভিনয় করেছেন। কেননা দেবমন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী রাজা গোবিন্দমানিক্যের সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির যে নিদারুণ দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে, তা আসলে সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাস আশ্রিত। এছাড়াও পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের সুযোগসন্ধানী ষড়যন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রঘুপতির সংস্কারাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যদম্ভ; এবং সর্বোপরি তাঁর মনে বাৎসল্যরসের আবির্ভাব, যা অতি চমৎকার ও উদারতর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিণত শিল্পকৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত এই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে; যা আবার রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলব্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন- "স্বপ্ন দেখিলাম, কোন-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুন ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত'। বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোন মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে ...জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।"[vi] গল্পের সাথে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের রাজা গোবিন্দমানিক্যের পুরাবৃত্ত ইতিহাস মিশ্রিত উপন্যাসই হল 'রাজর্ষি', যা ১৮৮৭ সালে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে উপন্যাসে ইতিহাসের অবদান থাকলেও, প্রধান বিষয় কিন্তু অবশ্যই লেখকের জীবনদর্শন। সেজন্যই লেখক ইতিহাসের সাথে কল্পনাকে মিশ্রিত করে নিজের বক্তব্যকেই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিক পুরুষ রাজা গোবিন্দমানিক্যই হলেন এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র; এবং বাংলার প্রান্তবর্তী ত্রিপুরার স্বাধীন হিন্দু রাজপরিবার হল উপন্যাসের পটভূমি। আলোচ্য উপন্যাস রচনার কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মুকুট' নাম একটি নাটক লেখেন; এবং এই উপন্যাস হল উক্ত নাটকেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ। কেননা কবিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল ত্রিপুরার রাজবংশের এই কাহিনী। ফলত একসময়ে বিশেষ এক সখ্যতার সম্পর্কও গড়ে ওঠে ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের; এবং ত্রিপুরার রাজমালার সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহের কাছ থেকে ত্রিপুরা রাজবংশের অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কেননা কৈলাসচন্দ্র সিংহ ছিলেন সমসাময়িক পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'র সহকারী সম্পাদক; এবং এই কৈলাসচন্দ্র সিংহের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ের বিবরণ আমরা পাই রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনকথা'র প্রথম খন্ডে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে তথ্যের জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন; যেখানে তিনি বলেন- "মহারাজ বোধকরি শুনিয়া

থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ‘রাজর্ষি’ নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব।”[vii]

আমরা জানি যে, রাজা গোবিন্দমানিক্যের রাজত্বকালেই কিন্তু দিল্লিশ্বর ঔরঙ্গজেবের ভাই শাহজাহানের পুত্র সুজা, ত্রিপুরাতে গুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে ছিলেন যা ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করা হয়। এমনকি রাজা গোবিন্দমানিক্য মুঘল দরবারে পাঁচটি হাতিও উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন, ঔরঙ্গজেবের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য ভীরু হওয়ায় যুদ্ধ না করে সেখান থেকে পালিয়ে যান। তবে ভীরু হলেও তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন; তাই বেশ কিছু মঙ্গলজনক কীর্তি স্বরূপ মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। উপন্যাসের কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ এই রাজাকেই তুলে ধরেছেন; এবং ত্রিপুরাতে সুজার আত্মগোপন যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনই ত্রিপুরার রাজত্ব নিয়ে স্বজন বিরোধীও ইতিহাসসম্মত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিহাসের প্রাধান্যকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে নিজ আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তবে একথা বলা বাহুল্য যে, উপন্যাসটি আসলে রচিত হয়েছে ধর্ম ও আদর্শের বিরোধকে কেন্দ্র করে, বা বলা যায় প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে সহিংস শক্তিপূজার বিরোধ; যদিও এতে ঐতিহাসিক তথ্য ও চরিত্রসমূহ সমন্বিত রয়েছে।

‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের নাট্যরূপ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বিসর্জন’ নামক একটি নাটক রচনা করেন; যেখানে মূলত মনুষ্যত্ব ও পশুত্বের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবপ্রেমের বাহক মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। ফলত বলা বাহুল্য নাটকটি জীবপ্রেম ও মানবপ্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত মানবপ্রেমকেই ধর্মের আদর্শ হিসেবে দেখিয়েছেন। সেজন্যই রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করাই ঈশ্বরের ইঙ্গিত বলে মেনে নিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে চলে যান। কেননা তিনি প্রেমের পূজারী এবং কোনোভাবেই কোনোকিছুর পরিবর্তেই রাজ তরবারিকে হিংসার রক্তে রাঙাতে চান না। তবে যাবার সময়ে ধ্রুবকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তার শূন্য পরিণামের পথের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে; কিন্তু কেদারেশ্বর শূন্য হাতেই গোবিন্দমাণিক্যকে ফিরিয়ে দেন। রাজপুরোহিত রঘুপতিও এখানে রাজার বিরোধী কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত; যাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও আদর্শের দ্বন্দ্বকে একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে পরিণত করেছেন। আবার রাজা গোবিন্দমানিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্র রায়কেও রঘুপতিই রাজার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে, এমনকি প্রজাদেরকে পর্যন্ত উত্তেজিত করেছে এই রঘুপতি।

তবে উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই, প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত রাজা গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্য সন্যাসীর রাজ্য হয়ে উঠছে; কেননা তিনি পেরেছিলেন অহিংসা ও প্রেমের পথে যাত্রা করতে। এমনকি প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্জলিত রঘুপতির মনও নবচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের অজেয় শক্তির কাছে নিরভিমানে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে। রঘুপতির কথায়- “আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য

করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।"[viii] এভাবেই ইতিহাসের সাথে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনা ও রোমান্সকে মিলিয়ে মিশিয়ে নির্ধারণ করেছেন আলোচ্য উপন্যাসের গতিপথ। সেইজন্যই উপন্যাসের শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, শাহজাহানের পুত্র সুজার সাথে তাঁর ভাই দিল্লিশ্বর ঔরঙ্গজেবের কাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি।

তথ্যসূত্র:

---

i পাল প্রশান্তকুমার, 'রবিজীবনী', দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২২ শ্রাবণ ১৩৯১, পৃঃ ১২০।

ii চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', তৃতীয় পর্যায় (১ম পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১২৭।

iii ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', প্রথম খন্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৪১৩, পৃঃ ২৭৮।

iv তদেব পৃঃ ২৭৮।

v তদেব পৃঃ ২৮২।

vi ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭, পৃ: ১৪৫।

vii ঠাকুরর বীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', অষ্টমখন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশ্বভারতী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ৭৫৩।

viii ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দ্বিতীয় খন্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২৫ বৈশাখ ১৪১৩ (৯ মে ২০০৬), পৃঃ ৩২২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১ বৈশাখ ১৪১৩।

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭।

৩. পাল প্রশান্ত কুমার, 'রবীন্দ্র জীবনকথা', দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ২২ শ্রাবণ ১৩৯১।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩।

৫. ঘোষ প্রতাপচন্দ্র, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, সম্পাদনা: শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-৭৩।

৬. চৌধুরী ভূদেব, 'বাংলাসাহিত্যের ইতিকথা', তৃতীয় পর্যায় (১ম ও ২য় পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের শৈলী বিচার

জয়ন্ত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়
উখরিদ, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ (Abstract): বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত যেকোনো উপাদান যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন সেই নির্মানশৈলীর উপাদান অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি অভিনব রূপলাভ করে। এই নির্মাণ কলার সঙ্গে অন্বিত বস্তুকে সেখান থেকে পৃথক করা যায় না। বাক্যবিন্যাস, পদের ব্যবহার কিংবা ভাবান্বয়ের নানা ক্ষেত্রে লেখকের বিচিত্র ভাবনা মিশে যাওয়াটাই প্রত্যেক সাহিত্যিকের নিজস্ব রচনাশৈলীর উপর নির্ভর করে। আসলে এক্ষেত্রে শুধু অভিজ্ঞতা কিংবা একাত্মতাবোধই নয়, শিল্পীর নিজস্ব প্রায়োগিক গুণের মধ্যে দিয়ে শৈলীর কায়ারূপ লাভ করে। শিল্পীর স্ব- শৈলীনির্মাণ ক্ষমতা এবং প্রায়োগিক দক্ষতা নির্ভর করে তাঁর নিজস্ব জগৎ বা সাহিত্য বিচরণের উপর। লেখকের নিজস্ব ভাবনা মিশে থাকে কাব্যকায়ায় উপরে, যেখান থেকে শিল্পীকে আলাদা করা যায় না। শৈলী কাব্য শরীরের সঙ্গে মিশে একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে। এমনকি কাব্যের শরীরের সামগ্রিক রূপেরই অংশ হয়ে ওঠে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার কায়া বা শৈলী নির্মানে বিভিন্ন উপাদান নতুনভাবে, নতুন বয়ানে ব্যবহৃত হয়েছে।তাঁর কবিতায় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান, লোকভাষা, এমনকি জীবনের চলার পথে সাধারণ বিষয়গুলো অসাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বয়নের অভিনবত্বে। শৈলীর সার্থক প্রয়োগ তাঁর কবিতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সমসাময়িক কালে একাধিক শ্রেষ্ঠ কবির উপস্থিতিতে শক্তি চট্টপাধ্যায়ে শৈলীগত বৈশিষ্ট্যে কৃতিত্বের দাবী রাখে। শৈলীকে আরও উপযোগী করে তোলার জন্য কাব্যসাহিত্যে তিনি মনোনিবেশ করেছেন আনায়াসে। আমাদের এই প্রবন্ধে শক্তি চট্টপাধ্যায়ের কবিতার শৈলীগত স্বতন্ত্রতা কোথায় কিভাবে এসেছে তার একটি পর্যালোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ (Key words): নির্মাণ কৌশল, সমান্তরতা, বিচ্যুতি, রেজিস্টার, জলন্ত রুমাল, বাগবিধি।

মূল আলোচনা (Discussion):

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিটি কাব্যেই শৈলীর অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। শব্দ নির্মাণ কৌশলে আছে নতুনত্ব। অব্যর্থ শব্দচয়ন কাব্যকে করেছে অনুপম। প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে তিনি শব্দের শরীর গঠন করেছেন কাব্যের প্রয়োজনে। এক্ষেত্রে কবির স্বকীয়তা পরতে পরতে জড়িয়ে। অনন্য বাগ্‌বিধিতে কবির কাব্য রঞ্জিত। শব্দ নিয়ে কবি যেন খেলেছেন নিজের ছন্দে। তাতেই তৈরি হয়েছে শৈল্পিক বৈচিত্র্য তথা শৈলীর ভিন্ন দৃষ্টিকোণ।

আমরা জানি শৈলী বিচারের মানদণ্ড নিয়ে নানা মতবিরোধ থাকলেও মূলত চারটি মানককে প্রধান হিসাবে ধরা হয়। যথা সমান্তরলতা (Parallelism) বিপর্যাস (inversion), প্রমুখণ

(foregrounding) এবং বিচ্যুতি (deviation)। এই চারটি মানদণ্ডের নিরিখেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের শৈলী বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

সমান্তরলতা: ধ্বনি, দল, পদ বা পদগুচ্ছ বা বাক্য কিংবা বাক্যাংশের আবর্তনে সমান্তরলতার সৃষ্টি হতে পারে। কবি বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্যই সমান্তরলতা প্রয়োগ করে থাকেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে এই সমান্তরলতা নানা ভাবে ধরা দিয়েছে। যেমন -

১) ধ্বনির স্তরে সমান্তরলতা: দলের বৈচিত্র্য, স্বর ও ব্যঞ্জনের ব্যতিক্রমী প্রয়োগ, অনুপ্রাস, একক রুদ্ধদলের মিল, একদলের সঙ্গে বহুদলের মিল, চরণ নির্ভর অন্ত্যমিল, ধ্বনিকেন্দ্রিক সমান্তরলতার অন্তর্গত। যেমন-

- দ্বিমুক্ত দলের মিল:
- সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে **পাবে না**

 ধরে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-সন ঘুরে **যাবে না** [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : পরস্ত্রী]

- অন্ত্যমিল:
- অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া **সরা**

ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন **জরা** [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ : প্রত্যাবর্তিত]

- বিপরীত শব্দের বন্ধনে:
- একি আলিঙ্গন ! একি সভ্যতার জড়ানো **চন্ডালে**
- আশির গোড়ালি নখ ! একি আলিঙ্গন **মানুষের** [চতুর্দশপদী কবিতাবলী : চতুর্দশপদী]
- চলছে দিন, **ডানেরটা বাঁয়ে** আসছে। বাঁয়ের টা ডানে
- চরণগত অন্ত্যমিল:
- মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

 মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও

 মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও ['মানুষ বড়ো কাঁদছে : দাঁড়াও]

- পদের পুনরাবর্তন:
- অচেনা সহসা, **ফোলা, ফোলা** সব **ফোলা** অন্ধকার। [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : জন্ম এবং পুরুষ]

২) দলের স্তরে সমান্তরলতা: কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে দলের স্তরে সমান্তরলতা এক অন্য ধরনের আবেশ তৈরি করে।

- নামলে সমুদ্র **সরে যাবে** শীতল **সরে যাবে** মৃত্যু **সরে যাবে**। [হে প্রেম হৈ নৈঃশব্দঃ জরাসন্ধ]

 এখানে **'সরে যাবে'** বারবার আবর্তিত হয়ে দলের স্তরে অসাধারণ সমান্তরলতা তৈরি করেছে।

- স্বপ্ন **নাও** স্মৃতিও **নাও** পদ্ম **নাও** অক্ষিপুটে। [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : মুকুর]

 'নাও' তিনবার ব্যবহৃত হয়ে দলের স্তরে সমান্তরালতা সৃষ্টি করেছে।

- সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে **অসুস্থ বিড়াল**

পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে **অসুস্থ বিড়াল**

খুব কাছে বসে আছে হিতব্রতী **অসুস্থ বিড়াল** [যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো : বিড়াল]

 'অসুস্থ বিড়াল' একাধিকবার আবর্তিত।

৩) শব্দের স্তরে সমান্তরলতা: শব্দের আবর্তনে এক অনন্য ধ্বনি ঝংকার তৈরি হয় এ ধরনের সমান্তরলতায়। যেমন –

- কেবল মেঘে-মেঘে-মেঘেই

দিন ফুরালো। [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : ঝাউয়ের ডাকে]

এখানে **"মেঘে "** শব্দটি পাশাপাশি তিনবার পরপর বসে অদ্ভুত এক আবেশ তৈরি করেছে।

৪) শব্দগুচ্ছের স্তরে সমান্তরলতা: একাধিক শব্দগুচ্ছ এই সমান্তরলতা সৃষ্টিকারী ।

- **ও নিরুপম, ও নিরুপম, ও নিরুপম........**

এই **'ও'** এবং **'নিরুপম'** শব্দগুচ্ছ তিনবার আবর্তিত হয়ে ধ্বনির আবেশ তৈরি করেছে।

৫) স্তবকের স্তরে সমান্তরলতা: একাধিক স্তবকের আবর্তনে সমান্তরলতা তৈরি হয়।

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?
এখন এসো, তোমার অমন আকাশ থেকে মাটির নীচে
এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, আমার আঁচে পোড়াও দুপা
দু হাত পোড়াও, নরম ননীর মতন শরীর পুড়িয়ে কালো
কলুষ করো, আমায় ধরো,.......... পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে
....
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো?
এখন এসো, তোমার একার আকাশ থেকে মাটির নীচে

[এই আমি যে পাথরে : পাতাল থেকে ডাকছি]

এখানে **"পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ"** স্তবকটি কবিতায় দু'বার আবর্তিত হয়ে স্তবকগত সমান্তরলতা সৃষ্টি করেছে।

বিপর্যাস ও প্রমুখণ শৈলীর গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান । প্রমুখণ কাব্যশৈলীকে বিশেষ রূপদান করে । কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে প্রমুখণ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে প্রমুখণ আলাদা এক রূপ ধারণ করেছে।

- তাকে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে মনে-মনে [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : নিয়তি]
- অতিশয় প্রেম নানা দিকে যায় পথিকের [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস]
- কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে [কবিতার তুলো ওড়ে : কবিতার তুলো ওড়ে]
- এ সমস্ত ফেলে পরা শাদা শুভ্র কাপড় একখানি, মাথায় উষ্ণীব যেন [এই আমি যে পাথরে : পলিমাটি নখে ছিঁড়ে]
- ভিটের ভাঙা ধুলোর কাঁদে ছাতার-পাখি একা [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : প্রত্যাবর্তিত]

উপরের উদাহরণগুলিতে **"মনে মনে"**, **"পথিকের"**, **"মনের ভিতরে"**, **"উষ্ণীব যেন"**, **'একা'** পদগুলো বাক্যের প্রথমে বা মাঝে বসার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না হয়ে শেষে বসেছে।

আর এর ফলেই তৈরি হয়েছে প্রমুখণ। যা কাব্য ভাষাকে অন্য এক ছান্দিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

বিচ্যুতি শৈলীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শৈলীর সংজ্ঞায় বলা হয় - "style is a deviation form Norm " অর্থাৎ প্রচলিত রীতি থেকে সরে আসাই হল শৈলী। এই সরে আসার ফলেই তৈরি হয় বিচ্যুতি। যদিও এই সরে আসা ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই, ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণেই।

ভাষাবিদ লিচ আট প্রকার বিচ্যুতির কথা বলেছেন। সেই নিরিখে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিচ্যুতি নিরূপণ করবো।

১) অর্থগত বিচ্যুতি: এই প্রকার বিচ্যুতি অর্থের প্রচলিত ব্যঞ্জনাকে ছাড়িয়ে যায়। অর্থের গভীরতর ব্যঞ্জনা ওঠে। অর্থগত বিচ্যুতি কবির কাব্যে দুভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। - প্রচলিত অর্থ অতিক্রম করে এবং শব্দ প্রয়োগে অর্থগত বিরোধ।

প্রচলিত অর্থ অতিক্রম করে গভীরতর ব্যঞ্জনা এসেছে নিম্ন কবিতায়-

- বাগানে ঘুরছে স্খলিত নিদ্রা, কেই- বা দুপুরে
ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁঝাঁ গায়ে গায়ে (হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : কারনেশন)
- ইট মেরে ডুম ভাঙতে যেমন, মেঘ ছুটে খায় জ্যোৎস্না যদি [প্রভু-নষ্ট হয়ে যায় : এখানে সেই অস্থিরতা]
- ভাষার দেয়ালে-দোরে লেগে গেছে সমস্ত নির্ভীক
রক্ত, হিম, তন্তুজাল। শব্দের এমনই ফাঁক আছে। [এই আমি যে পাথরে : রূপবান]
- উত্যক্ত হয়েছি আমি শব্দের আক্রান্ত জ্বরে, মোহে ! [জঙ্গল বিষাদে আছে: জেগে থেকে না খেলার অপরাধ গ্লানি]

বোঝা যায় **'স্খলিত নিদ্রা', ঝাঁঝাঁ গায়ে, ভাষার দেয়ালে-দোরে, 'নির্ভীক রক্ত', 'শব্দের আক্রান্ত জ্বর'** শব্দ কিভাবে অর্থগত বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। বাড়ির দেয়াল- দোর হতে পারে, তবে কবিতায় ভাষার দেয়াল-দোর। জ্বর নামক ব্যধি শব্দ মারফৎ বয়ে আসে। **"মেঘ জ্যোৎস্না ছুটে খায়"**। সমাসোক্তি অলংকারের মাধ্যমে কবি আসলে এক আগ্রাসী মনোভাবকেই তুলে ধরেছেন, যা জোৎস্নার মতো অপরূপ সৌন্দর্যকেও গ্রাস করে।

আবার শব্দ প্রয়োগে অর্থগত বিরোধ দেখা যায় এইখানে-

- কেয়ার নিচে যদিও বাড়ে **হাওয়ার** ভারি **ফণা**
বুড়ো দেয়াল ঠেলে রাখছে **যৌবনের হলকা** [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : বাহির থেকে]
- মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা –
[সোনার মাছি খুন করেছি : সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়]
- অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন [সোনার মাছি খুন করেছি : সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়]
- লেবুর কাঁটায় কাঁথা, মলিদা নিয়েছে ক্ষিপ্র যুই
অলস গোলাপ বেলি শুয়ে আছে মাথার বালিশে [আমাকে জাগাও : সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে]
- থালা-ভরা বুনো মোষ মস্ত হাতি, মর্কট বেবুন [ভাত নেই পাথর রয়েছে : আমি চাই]

"সাপের ফণা " থাকে, কিন্তু হাওয়া একপলক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তবে কবিতায় হাওয়া সাপের ফণার মতো। পাল্কি শববাহী গাড়ি নয়। নতুন বধূর আগমন ঘটে পাল্কিতে। অথচ "মড়ার পাল্কি " শব্দটি আমাদের বোধকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে

পাল্কিটা কী মড়ার না মড়া পাল্কি? আবার জুঁইয়ের মতো মিষ্টি ফুল ক্ষিপ্র হতে পারে, তীক্ষ্ণ হতে পারে ! এ আসলে শব্দের অর্থগত বিরোধ। গোলাপ, বেলির মতো সুগন্ধদায়িনী ফুল অলস। থালাতে বুনো মোষ, মস্ত হাতি, মর্কট বেবুন অনায়াসে থাকতে পারে। এই সমস্ত শব্দচয়ন আসলে অর্থের বিরোধের মাধ্যমে অন্যতর ব্যঞ্জনা আনে। এ ব্যঞ্জনা আমাদের বোধের স্তরে।

২) আন্বয়িক বিচ্যুতি: ভাষার পদক্রমের বিপর্যাস আন্বয়িক বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। ক্রিয়াপদের পূর্বস্থাপনা বা বিশেষ্য, বিশেষণ কিংবা অব্যয়পদের স্থান পরিবর্তনে এ বিচ্যুতি দেখা যায়। কবিতার ভাষাকে আলাদা মাত্রায় নিয়ে যায় এই বিচ্যুতি।

- দাও দুঃখ, দুঃখ দাও– আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি [যেতে পারি কিন্তু কেনো যাবো : যদি পারো দুঃখ দাও]
- মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে

বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : মনে পড়লো]

- আমাকে জড়িয়ে, ধরে হাওয়া তার বন্ধনে বাহুর। [যেতে পারি কিন্তু কেনো যাবো : যদি পারো দুঃখ দাও]
- পশ্চিম দিকে? কে গো তুমি বাসে মুখর বিরহ? [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : অন্ধকার শালবন]
- সহিতে পারি না, হে সখি, অচল মনে। [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : ছায়ামারীচের বনে]

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ করলে দেখা যায় প্রথম তিনটি উদাহরণে ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রচলিত রীতির নিয়ম মেনে হয়নি। প্রথম বাক্যে 'দাও দুঃখ' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'দুঃখ দাও। আবার দ্বিতীয় বাক্যে কবি ব্যবহার করলেন "তোমায় পড়লো মনে"। অথচ হওয়া উচিত ছিল "তোমায় মনে পড়লো"। তৃতীয় উদাহরণে 'জড়িয়ে ধরে' ক্রিয়াটি শেষে বসেনি। আবার চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণে সম্বোধন পদ **"কে গো"** কিংবা **'হে সখী'** বাক্যের মাঝে বসেছে। অর্থাৎ সম্বোধনপদের পরস্থাপনা ঘটেছে। তবে এতে কবিতার ভাব ও ভাষা অক্ষুণ্ণ আছে, বরং কাব্য সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

৩) ঔপভাষিক বিচ্যুতি: মান্য ভাষা থেকে সরে আসলে এই বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়। উপভাষার ব্যবহার, কথ্য
ভাষা বা লোকজ শব্দ ব্যবহার কিংবা শ্ল্যাং-এর প্রয়োগ ঔপভাষিক বিচ্যুতিতে থাকে।

- অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি [সোনার মাছি খুন করেছি: নীল ভালোবাসায়]
- ঘাসপাতা থেকে তৈরি জাব হয়তো বেটে খাবে কিছুটা বিলোবে [ভাত নেই পাথর রয়েছে : পোড়াতে চাই]
- যম-কালো এক মরদ, ছিলো নদীর ওপার। [প্রচ্ছন্ন স্বদেশ : আসছো কবে ?]
- কিছু পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যায় ওকে খন্দে ফেলে দিতে - [কোথাকার তরকারি কোথায় রেখেছে: বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল]
- লোকটা আছে, না ফুঁকে গ্যাছে-দিওনা-মোকে ধোঁকা [যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো : সুদর্শন পোকা]
- রয়েছে কেলিয়ে, জিব ফুটিফাটা, লোল! [কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে : সুখে থেকো পিতরৌ!]

এই উদাহরণগুলিতে **'গাঁ'**, **'গেরাম'**, **'গেরস্থালি'**, **'জাব বিলোবে'**, **'মরদ'**, **'খন্দে'** ইত্যাদি লোকজ শব্দগুলো মান্য ভাষার পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। আর সাহিত্যের ভাষায় 'ফুঁকে গ্যাছে', 'রয়েছ কেলিয়ে' ইত্যাদি শ্ল্যাং শব্দেরও অনায়াস প্রবেশ ঘটেছে।

৪) ধ্বনিগত বিচ্যুতি: ধ্বনি লোপ, ধ্বনির আগম, ধ্বনির রূপান্তরের নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত নিয়ম লঙ্ঘন করে ধ্বনিগত বিচ্যুতি সৃষ্টি হতে পারে। কবি ছন্দের প্রয়োজনে এবং ভাবের মাধুর্য সৃষ্টির জন্য ধ্বনিগত বিচ্যুতি ঘটান।

- নিত্যি নতুন পোক্ত তাড়ি [ঈশ্বর থাকেন জলে : আজ সকলই কিংবদন্তী]
  এখানে নিত্য > নিত্যি [ই স্বরধনির আগমন ঘটেছে শব্দের শেষে]

- বরসা কখন ঘন মরীচিকা সাজে [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : ছায়ামারীচের বনে]
  বর্ষা > বরষা, এখানে স্বরভক্তি হয়েছে।
- তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন। [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : কারনেশন]

স্বরধ্বনির পূর্ণরূপের (ঐ >অই) প্রয়োগ ঘটেছে।

- অবয়বের বাহিরে ছিল অচেনা অবয়ব

যামিনী রায়ের আঁকা নয়ান [কোথাকার তরবারি কোথায় রয়েছে : সমূহে একা রেখা]
নয়ন > নয়ান, মধ্য স্বরাগম ঘটেছে।

- তাদের নিড়ুনি দিয়ে তুলতে হয়, গাছ

সুখে থাকে, [আমাকে জাগাও : গাছ কথা বলে]
নিড়ানি > নিড়ুনি, স্বরসঙ্গতি হয়েছে।

- মালবিকা অইখানে যেওনাকো তুমি, [কিছু মায়া রয়ে গেল : ফিরে এসো মালবিকা]

স্বরধ্বনির পূর্ণরূপের (অইখানে) প্রয়োগ ঘটেছে।

- উলুক ঝুলুক শালুক ফুলের পাতায় দেহ চাটছে

ভালোবাসার হুলুস্থুলুস এই ভাবে তুই দুঃখ ভুলুস [অস্ত্রের গৌরবহীন একা: কষ্ট হয়]
এখানে বাক্যের মিলের কারণে **'স'** ব্যঞ্জনধ্বনির (হুলুস্থুলু > হুলুস্থুলুস) আগমন ঘটেছে শব্দের শেষে।

৫) রূপতাত্ত্বিক বিচ্যুতি: শব্দ গঠনের প্রচলিত নিয়ম থেকে কবি এক্ষেত্রে সরে আসেন। সমাস, কারক বিভক্তির নবনির্মাণ এ বিচ্যুতির অঙ্গ। পদসজ্জাতেও থাকে ব্যতিক্রম। তার এই ব্যতিক্রম কবির স্বকীয়তাকে চিহ্নিত করে।

- ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে **ছাতার-পাখি** একা [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : প্রত্যাবর্তিত]
- সবার বয়স হয় আমার **বালক-বয়স** বাড়ে না কেন? [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য :পরস্ত্রী]
- শিল্পের প্রস্রাব রসে পাকে গন্ড, পাকে গুহ্যদেশ। [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : পরস্ত্রী]

এই দৃষ্টান্তগুলোতে সমাসগত ও সম্বন্ধপদগত বিচ্যুতি ঘটেছে। 'ছাতার - পাখি', 'বালক- বয়স' পদগুলিতে হাইফেন (-) এর মাধ্যমে সমাস বোঝানো হয়েছে। **"ভিটের ভাঙা ধুলো"** কিংবা **"শিল্পের প্রস্রাব"** সম্বন্ধ বিভক্তির যোগে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। আবার সম্বোধন পদ মাঝে কিংবা পরে বসার দৃষ্টান্তও নেহাত কম নেই। যেমন -

- পশ্চিম দিকে? **কে গো** তুমি ব'সে মুখর বিরহ ? [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : অন্ধকার শালবন]
- তোমায় আচ্ছন্ন রাখি, **হে** বিষণ্ণ মহত্ত্বরহিত মাতা তোমাকেও। [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস]
- খসিল মৌচাক তারা উচ্ছ্রিত জোছনা **রে** [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : মুকুর]

প্রথম দুটি উদাহরণে **'কে গো', 'হে'** সম্বোধন পদ মাঝে বসেছে। আবার তৃতীয় উদাহরণে 'রে' সম্বোধন পদ একেবারে শেষে বসেছে। যদিও সম্বোধন পদ সর্বদা পদের শুরুতে বসে। তবে সম্বোধনপদের এরকম ক্রম বিপর্যয় কবিতাকে অনন্য করে তুলেছে।

৬) রেজিস্টার আশ্রিত বিচ্যুতি: কবিতায় প্রচলিত ভাষা ব্যবহার না করে কবি যখন নিজস্ব ভাষা বা শব্দকে একটু পাল্টে ফেলে ব্যবহার করেন, তখনই ঘটে রেজিস্টার আশ্রিত বিচ্যুতি। বাংলা শব্দে ইংরেজি বা হিন্দি কিংবা অন্য শব্দের প্রয়োগ, কবি ব্যবহৃত নিজস্ব সৃষ্ট শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়। তবে নানা ভাষার শব্দ প্রয়োগ কারলেও শব্দগত বিরোধ কিন্তু থাকে না। বরং নতুন অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করে শব্দগুলো। যেমন-

- লেভেল ক্রশিং - দাঁড়িয়ে আছে **ট্রেন**

এখন তুমি পড়ছো কি **হার্ট ক্রেন** ? [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : মনে পড়লো]

- **হ্যান্ডস্ আপ্** - হাত তুলে ধরো – যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ

তোমাকে তুলে নিয়ে যায় [সোনার মাছি খুন করেছি : সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়]

- নই **হার্ট ক্রেন** আমেরিকান কবির

মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে **ট্রেনের** সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলাম [হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান : স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি]

- উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত

হেন, করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা ! [পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি : পোকায় কাটা কাগজপত্র]

লক্ষ করলেই বোঝা যায় বাংলা শব্দের মধ্যে **'লেভেল ক্রশিং', 'ট্রেন', 'হ্যান্ডস্ আপ', 'হার্ট ক্রেন আমেরিকান, মিটিং'** ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ এবং **'হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা '** র মতো হিন্দি শব্দের অনায়াস প্রবেশ ঘটেছে। সাহিত্য তথা কাব্যে এ জাতীয় বিচ্যুতি আসলে কাব্য ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি বৈচিত্র্যও আনে।

৭) লৈখিক বিচ্যুতি: কবিতার অবয়বে নানা রূপ প্রদান করে কবি লৈখিক বিচ্যুতি তৈরি করে থাকেন। ছকবাঁধা কাঠামো থেকে কবি ক্রমশই সরে আসেন। কবিতার সজ্জায় থাকে বৈচিত্র্য। স্পেস চিহ্ন ব্যবহার করে সমাস ব্যবহার, ড্যাস এর পরিবর্তে স্পেস চিহ্নের প্রিয়োগ, সম পংক্তির পরিবর্তে অসম পংক্তির ব্যবহার, চরণে মাত্রার আধিক্য, সনেটের বিভাজন বৈষম্য, উক্তি প্রত্যুক্তির বন্ধনে কবিতা, শব্দ পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি লৈখিক বিচ্যুতির নজির। শক্তি চট্টোপাধ্যামের কবিতায় তাঁর দৃষ্টান্ত অজস্র। **স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেন্ট, তুমি** কবিতায় গদ্যের আবেশ আসে। **'সোনার মাছি খুন করেছি '** কাব্যগ্রন্থের **'তোমার হাত'** কবিতায় **'শান্তি'** শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

এই দেশে বসতি করে শান্তি শান্তি শান্তি 'যেতে-যেতে' কবিতাটির শিরোনামেই রয়েছে হাইফেন ব্যবহার। সমস্ত কবিতাতেই এভাবে হাইফেন ব্যবহৃত হয়েছে।

- যেতে - যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই তখনই চাবুক

আকাশে চিড়, ক্ষেত - ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ!
ঠাট্টা-বটকেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো, কেন? [সোনার মাছি খুন করেছি : যেতে-যেতে]

স্পেসের বিচিত্র ব্যবহার আছে **'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'** কাব্যের **'জরাসন্ধ', 'নিয়তি', 'পরস্ত্রী', 'ঝর্ণা', 'ফুল কি আমার'** ইত্যাদি কবিতায়। **'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান'** কাব্যের **'এক অসুখে দুজন অন্ধ'** কবিতায় অসম পংক্তির ব্যবহার দেখা গেছে। কবির **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'** কাব্যের বেশির ভাগ কবিতায় সনেটের নিয়ম মানা হয়নি। ৬১ থেকে ৭০ সংখ্যক কবিতায় সনেটের অষ্টক- ষটকের বিভাজন থাকলেও ১,৯, ১১, ২৬, ৩১, ৩৭, ৪০ ইত্যাদি সংখ্যক সনেটে তা নেই। অর্থাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র কাব্যে -লৈখিক বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত অনেক।

৮) শব্দগত বিচ্যুতি: কবিতার শরীর নির্মাণ হয় আসলে শব্দ দিয়ে। কবি শব্দের বুননে কাব্যের শরীর প্রদান করেন। শব্দের বিচিত্র ব্যবহার কবির কাব্যকে মহনীয় করে তোলে। প্রচলিত রীতি না মেনে কবি যখন নিজস্ব ভঙ্গিতে শব্দ নির্মাণ করেন তখনই সৃষ্টি হয় শব্দগত বিচ্যুতির। এই বিচ্যুতি নানা ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-

- পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারে -
- **ভিনদেশি** গাছপালার ছায়ায় ঢাকবো না আর [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : প্রম]
- আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে -
- জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে **হাঁসে-ফাঁসে** - কাপড়ের প্রেমে [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : সরোজিনী বুঝেছিলো]
- লোকায়ত শব্দ ব্যবহারে -
- হে **ডুবো** শরীর

চাড়া দিয়ে বুকে, নখে দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর উদোম সড়ক [আঁচলের খুঁট ধরে গ্রাস করবো]

'ডুবো শরীর', 'চাড়া', 'উদোম' ইত্যাদি শব্দগুলো লোক জীবনে প্রচলিত শব্দ বিশেষ|

- অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগে -
- পাখি আমার একলা পাখি, একলা **ভেকলা** দুজন পাখি [সোনার মাছি খুন করেছি : একলা পাখি]

'একলা' শব্দটির অনুকরণে **'ভেকলা'** বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা অপ্রচলিত শব্দ। আবার –

- এখন যেতে সর্ষে খেতে উল্টে পড়ে মেঘ –

হটরাপেটা চাঁদের দেশে থাকে হাওয়ার বেগ [সুখে আছি : চাঁদের দেশে]

'হটরেপেটা' শব্দটি প্রচলিত শব্দ নয়। মান্য ভাষার মধ্যে কবি এই ধরনের অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে কাব্যভাষাকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

- নব নির্মিত শব্দ প্রয়োগে -
- আজ একটা গোটা দিনই বাড়ি থেকে বেরুনো হয়নি

উবুশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, নড়ছে গাছের মাথা। [জ্বলন্ত রুমাল : নিচে নামছে]

- তারাভিলাষী মাতাল শুষ্ক **ফেনাবগাঢ়** রাতে [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : ভ্রান্তি]
- **উলুক ঝুলুক** শালুক ফুলের পাতায় দেহ চাটছে

ভালোবাসার হুলস্থুলুস এইভাবে তুই দুঃখ **ভুলুস** [অস্ত্রের গৌরবহীন একা : কষ্ট হয়]

'উবুশ্রান্ত' , 'ফেনাবগাঢ়', 'উলুক ঝুলুক', ভুলুস ইত্যাদি নবনির্মিত শব্দ।

- সাহসী শব্দের প্রয়োগ-
- দেড়বস্তা রাম্বসে বাচ্চার জন্য **দুধহীন মাই** খুলে রেখে বসে থাকি [ঈশ্বর থাকেন জলে : আমি সহ্য করি]

- **পোঁদের** কাপড় তুলে ছেঁকা দিই দু-পাটা মাংসের [প্রভু নষ্ট হয়ে যায় : কবিতার সত্যে]
- **নিতম্বে** জড়ুল দূর বাল্য ছোঁয়া সমুদ্রের ছোপ

গহ্বরে **লিঙ্গের** নিচে **অণ্ডকোষ** সুরক্ষার দ্বারী [এই তো মর্মরমূর্তি : এই তো মর্মরমূর্তি!]

'দুধহীন মাই', 'পোঁদের', 'নিতম্বের', 'লিঙ্গের নিচে অণ্ডকোষ' ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার খুব সাহসিকতা দেখিয়েছেন কবি। মান্য ভাষায় এ জাতীয় শব্দগুলোর অবাধ প্রবেশ নেই।

- সমার্থক শব্দ নির্মাণে –
- **বড়ো দীর্ঘতম** বৃক্ষে বসে আছে দেবতা আমার [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : পাবো প্রেম কান পেতে রেখে]
- সুখ-দুঃখ **ব্যাথা-বেদনার** ভিতর [ঈশ্বর থাকেন জলে : দূরে ঐ যে বাড়িটা]
- অনুকার শব্দের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগে -
- লোভে তার পড়োশি **তছনছ** [অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল : কী জানি]

এখানে **"তছনছ'** অনুকার শব্দটি আসলে ক্রিয়ারূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

- ধ্বন্যাত্মক বিশেষণের প্রয়োগে –
- ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁ ঝাঁ গায়ে গায়ে [হেম প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : কারনেশন]

ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর হতে পারে| তবে শরীর ঝাঁ ঝাঁ হতে পারে এ আমাদের ভাবনার বাইরে| আসলে কবি **'ঝাঁ ঝাঁ গায়ের'** মধ্যে দিয়ে অন্যতর এক গভীর অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যা ভাবনাকে অন্যস্তরে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও –

- চরের বালিতে তাকে **চিকিচিকি** মাছের মতন মনে হয় [ধর্মে আছো জিরাফেও আছে : অনন্ত কুয়াশার জলে চাঁদ পড়ে আছে]
- তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর

ছলোছলো [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : এবার হয়েছে সন্ধ্যা]

"চিকিচিকি" বালির বিশেষণ। কবি মাছের ক্ষেত্রে চিকিচিকি বিশেষণ প্রযুক্ত করেছেন। আবার **'ছলোছলো'** চোখ হতে পারে। কবি বললেন ছলোছলো জ্বর।

- শব্দদ্বৈতের বিশেষণ রূপে প্রয়োগে –
- **অলস-অলস** ভালোবাসা তুমি আসবে কি তুমি আসবে কি [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : ঝর্ণা]

শব্দদ্বৈত **'অলস-অলস'** এখানে **'ভালোবাসা'** বিশেষ্য পদটির বিশেষণ রূপেই প্রযুক্ত হয়েছে।

- সাধু-চলিতের মিশ্রণজাত শব্দের প্রয়োগ-
- **ফিরায়ো** না সে **শুভ্র** হাঁস **নখরাহতে** ধীর [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য: ভ্রান্তি]
- আজ সেই ঘরে **এলায়ে** পড়েছে ছবি [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : আনন্দ -ভৈরবী]

চলিত ভাষার মধ্যে **'ফিরায়ো', 'শুভ্র', 'এলায়ে'** ইত্যাদি সাধু ভাষার শব্দ ও ক্রিয়ার অবাধ প্রবেশ ঘটেছে। এতে কবিতার ভাষা হয়েছে শ্রুতিমধুর।

- বিদেশি শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে –
- বলি, বড়মিঞা, যাবো, সে কমলাপুলি [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : ছায়ামারীচের বনে]
- লেভেল-ক্রশিং - দাড়িয়ে আছে ট্রেন [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : মনে পড়লো]

বাংলা শব্দে **'বড় মিঞা'** আরবি শব্দ কিংবা **'লেভেল ক্রশিং', 'ট্রেন'** ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের অনায়াস প্রবেশ ঘটেছে|

- নিজস্ব সৃষ্ট শব্দ নির্মাণে –
- চতুর্দিকে সহজ শান্ত হৃদয় কোন স্রোতসফেন [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : পরস্ত্রী]

- দোয়ালির আলো মেঘে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত [ধর্মে আছো জিরাফেও আছো : অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে]

'দীপাবলী' শব্দটি প্রচলিত হলেও 'দোয়ালি' শব্দটি কবির একেবারে নিজস্ব শব্দ।

- বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগে –
- সে কারনেশন **শাদা** আর **লাল** সে কারনেশন ! [হে প্রেম হৈ নৈঃশব্দ্য : কারনেশন]
- **বুড়ো** দেয়াল ঢেলে রাখছে **যৌবনের** হলকা [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : বাহির থেকে]
- তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বাসি **কৃত্রিম** জীবনে [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : নিয়তি]
- অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল, **মন্দ ভালো** ! [অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল : অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল]

'শাদা-লাল', 'বুড়ো-যৌবন', 'প্রাকৃতিক-কৃত্রিম', 'মন্দ-ভালো' বিপরীতার্থক শব্দগুলো কবি একই চরণে ব্যবহার করেছেন। যা আলাদা এক ভাষার বুনন তৈরি করে।

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল কোনো বিশেষ শব্দ দ্বারা ইমেজ সৃষ্টি করা। যেমন

কবির কাব্যে **'একা', 'একলা'** ইত্যাদি শব্দগুলো একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ আবেশ তৈরি করেছে।

- ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার - পাখি **একা** [হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য : প্রত্যাবর্তিত]
- তবু আমার দুঃখ, দুঃখ হঠাৎ ঘরে ঢুকলো একা [সোনার মাছি খুন করেছি : বিষ-পিঁপড়ে]
- যখন **একাকী** আমি **একা**

মাঝেমধ্যে রাতে দেন দেখা [অস্ত্রের গৌরবহীন একা : যখন একাকী আমি একা]

- মনোকষ্ট বুকে নিয়ে রয়েছেন **একা একা**। [আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল : যে-পথে যাবার]
- ছারপোকা যেমন চাক ভেঙে রাত্রে খেলে **একা একা** [এই আমি সে পাথরে : পলিমাটি নখে ছিঁড়ে]
- একটি মুহূর্ত আমি **একা** চাই, জল নয় কাঠ ও পাথরে [মানুষ বড় কাঁদছে : ও গাছ, আমাকে নাও]
- মানুষ বড়ো **একলা**, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও। [মানুষ বড় কাঁদছে : দাঁড়াও]।
- রঙিন কাঁকড়ার স্তূপ সংঘ ভেঙে ছড়ায় মাদুরে

একা একা| উপকূলে। [কক্সবাজারে সন্ধ্যা : কক্সবাজারে সন্ধ্যা]

- সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি, এ- আমি নিতান্ত **একা**। [ও চিরপ্রণম্য অগ্নি : পারান্ত বই ?]

- উপমা অলংকার কবির কাব্যের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য। বিশেষ অর্থে উপমা অলংকার এখানে প্রয়োগ

করা হয়েছে। আপাত অর্থকে অতিক্রম করে বিশেষ অর্থ বহন করেছে কবিতায় ব্যবহৃত উপমা অলংকার।

- তোমার বুকের 'পরে বসে-থাকা, গায়ে থাবা গুঁজি

তোমারে জাগাতে যেন, কুমোরের **মতন** গম্বুজে [চতুর্দশপদী কবিতাবলী : ৭০ সংখ্যক সনেট]

- মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের **মতো** স্তব্ধ মনে করি [ঈশ্বর থাকেন জলে : কবির মৃত্যু]

- গাছের শিরার **মতো** সাপ আছে ছড়িয়ে সেখানে - [ঈশ্বর থাকেন জলে : পাথর গড়িয়ে পড়ে, গাছ পড়ে বোধ]
- রূপচাঁদা জালে পড়ে, খোলামকুচির **মতো** খেদ [কক্সবাজারে সন্ধ্যা : কক্সবাজারে সন্ধ্যা]
- শোকময় শাদা পাতা নিষ্পলক চোখের **মতন** পড়ে আছে। [কিছু মায়া রয়ে গেল : শাদা পাতা]
- আজ ধুম জব্দ হয়ে বসে আছে, বাতিল জামার

মতন আলপনার পাশে|। [কিছু মায়া রয়ে গেল : শাদা পাতা]

এভাবেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য জগৎ শৈলী দ্বারা আচ্ছন্ন। তিনি তাঁর কবিতাকে অন্য এক স্তরে নিয়ে গেছেন। যা ভাবনার অনেক গভীরে নিয়ে যায় আমাদের। শব্দ নির্বাচন, ইডিয়ামের ব্যবহার, অনন্য বাক্-শৈলী, ছন্দের বন্ধন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যকে অপরূপ শৈলীর বন্ধনে বেঁধেছে|

গ্রন্থপঞ্জী:

১. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৭।
২. অভিজিৎ মজুমদার, 'ভাষাপ্রসঙ্গ ও ধ্বনিবিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪।
৩. নারায়ন হালদার, জীবনানন্দের কবিতা : শৈলী ও শিল্পরূপ, ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, মদনপুর নদীয়া, ৩১ মে, ২০২১।
৪. পবিত্র সরকার, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮০।
৫. রামেশ্বর'শ 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা", পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৮ ফাল্গুন, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।
৬. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ, ১৯৭৩ (প্রথম প্রকাশ)।
৭. Birch (ed.) 'style, structure and criticism' (special Issue) Indian Journal of Applied Linguistics X: 1,2, 1984.
৮. R. Carter (ed.) 'Language and Literature' : An Introductory Reader in stylistics; London, George Allen and Unwin, 1982.

Indo - Bangladesh Relations : Since 1971

Manoj Basak
Assistant Professor, Dept. of Political Science
Maharaja Srischandra College

Abstract : Two significant nations in the South Asian region are India and Bangladesh. The India-Bangladesh border constitutes an extensive international demarcation spanning 4096.7 kilometres, ranking as the fifth-longest terrestrial boundary globally. This border traverses five distinct Indian states: West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. In 1947, India attained sovereignty from British colonial rule, forming two distinct nations, India and Pakistan. Subsequently, as Pakistan struggled to safeguard its territorial integrity, a new nation-state was established with India's assistance, which is referred to as the People's Republic of Bangladesh. Indo-Bangladesh deep relations can be observed in the common language, tradition and customs, history, civilization, customs, social system, economy, and politics. Therefore, India-Bangladesh relations are not only one-way, but also multi-faceted relationships. Bangladesh is at the crossroads of Southeast Asia, and this country has an important role in implementing India's Act East policy. Reviewing or evaluating the 53 years of relations since Bangladesh became independent in 1971, Warmth and cooperation can be seen in the Indo-Bangladesh relationship. The primary aim of this scholarly article is to analyze the achievements and shortcomings of the bilateral relations between India and Bangladesh since 1971.
Keywords: cooperation, peace, independence, foreign policy, India-Bangladesh relations, security.

Introduction:

India assumed a pivotal role in the attainment of Bangladesh's sovereignty from Pakistan. India extended military, diplomatic, and humanitarian support. West Pakistan sought to exert dominance over East Pakistan in all dimensions of language, culture, and economy. In response, Sheikh Mujibur Rahman aligned himself with the movement opposing West Pakistan. Although the population in East Pakistan exceeded that of West Pakistan, until the year 1970, East Pakistan was significantly underrepresented in various critical sectors, such as military and governmental institutions, in comparison to West Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman initiated a movement advocating for the six-point demands from East Pakistan in light of the prevailing discriminatory practices. These demands included the establishment of separate and independent currency systems, the

creation of an independent Foreign Reserve Bank, and the provision of autonomy for East Pakistan, among others.

For the first time after 23 years of independence, a surprising and fair election was held in Pakistan in 1970. The main agenda of this election was the six-point demand (20 March 1977) (R. S. Khan, 2016). In the Pakistan general elections of 1970, the popular political party of East Pakistan, the Awami League under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, won. Pakistan was against handing over power to the elected representative, Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the Awami League. Instead, on 25 March 1971, the infamous Operation Search Light was launched across East Pakistan (Khan, 2020). The level of atrocities was so extreme that, while expressing his thoughts, Anthony Mascarenhas wrote in his article “Genocide” that he saw Hindus being victimized, heard the screams of people being beaten to death, which shocked the whole world (Mascarenhas, 1971). In this situation, the government of India,Indira Gandhi wrote letters to 72 countries of the world to inform them about the then situation in East Pakistan and to resolve the crisis (Ramesh, n.d.). Before the war between India and Pakistan, the Indian government had tried various alternative methods but failed, so the only alternative was war as the last option. As a result, on 16 December 1971, a new state was born in Southeast Asia, which was named the People's Republic of Bangladesh, whose leader and head of state was Sheikh Mujibur Rahman.

Indo-Bangladesh Relations Since 1971

During Bangladesh's independence, Indira Gandhi, the Prime Minister of India, supported the Bangladesh independence movement and provided various types of military, political, and diplomatic assistance. The Indian government secretly provided training and military support to the Mukti Bahini. The Bangladesh government awarded Indira Gandhi the Bangladesh Freedom Owner Award on 25 July 2011 for her excellent leadership. And Indian Prime Minister Indira Gandhi played an important role in establishing a declaration about Bangladesh. That declaration was "Dhaka is now the free capital of a free country, we will the people of Bangladesh in their house of triumph. All nations that value the human spirit will recognize it as a significant milestone in man's Quist for liberty." Enmity and friendship can be observed at various times in the relationship between India and Bangladesh.

The first agreement between the Indian government and the newly independent Bangladesh was the Treaty of Friendship, Co-operation and Peace. This agreement was about mutual respect for independence, territorial integrity, and sovereignty, and non-interference in internal affairs (Panth, 2007). From 1971 to 1973, India-Bangladesh relations reached a high level during the reign of Mujibur Rahman, and India became a partner and helper in the development of Bangladesh (Singh, 2009). Later, after the assassination of Mujibur Rahman,

India-Bangladesh relations entered a period of prolonged bitterness. Relations deteriorated during the rule of Ziaur Rahman and Ershad (Majumdar, 2014). The relationship has also faced challenges during periods of military rule and under the Bangladesh Nationalist Party (BNP), which have historically been less favorable towards India (Ali, 2023). At that time, India was portrayed as an opportunist and imperialist regional hegemon from Bangladesh. After the Awami League came to power in 1996, India-Bangladesh relations improved. At that time, the Ganga Water Power was signed. India-Bangladesh relations gained momentum during the rule of Manmohan Singh. The defence relationship between India and Bangladesh has evolved significantly over the years, with cooperation in various areas such as counter-terrorism, border security, and joint military exercises at its core. This partnership not only enhances regional stability but also enhances mutual trust and understanding between the two countries, paving the way for a deeper strategic relationship in an increasingly complex geopolitical context. Further strengthening the relationship, both countries have engaged in cooperative initiatives aimed at addressing common security challenges, However, India-Bangladesh relations have been on a downward spiral since the fall of the Sheikh Hasina government. Some successful events are

Power cooperation –To alleviate the energy deficit experienced by the electricity-deprived nation of Bangladesh, India is presently engaged in the exportation of approximately 500 megawatts of electrical power to Bangladesh. At the ninth convening of the Bangladesh–India Joint Steering Committee on Power Cooperation, held in Dhaka in May 2015, a resolution was adopted to augment the electricity supply to Bangladesh by an additional 600 MW by the year 2017. Of the total 600 MW, 500 MW is designated to be sourced from West Bengal, while the remaining 100 MW is to be procured from the Palatana Power Project located in Tripura (*More Power from India by 2017*, 2015).

Economic Corporation- The inaugural trade agreement between India and Bangladesh, referred to as the 'Trade Agreement between the Government of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh,' was formally executed in March of the year 1972. Bangladesh is India's largest trade partner in South Asia and India is the second-largest trade partner of Bangladesh in Asia. India's exports to Bangladesh dipped to $11 billion in 2023-24 from $12.21 billion in 2022-23. Imports also declined to $1.84 billion in the last fiscal year from $2 billion in 2022-23 (PTI, 2024).

Cooperation between political leaders - The diplomatic ties between India and Bangladesh have undergone significant variations over the last fifty years. For example, during the leadership of notable Indian political figures including Indira Gandhi, Narasimha Rao, Manmohan Singh, and Narendra Modi, the diplomatic relations thrived, whereas throughout the administrations of

Sheikh Majibur Rahaman and Sheikh Hasina, the relations retained a cordial character from the perspective of Bangladesh.

Civil Societies relations - Civil society plays a crucial role in shaping and strengthening the relationships between India and Bangladesh by fostering dialogue, promoting cultural exchanges, and advocating for shared interests. Through grassroots initiatives and collaborative projects, civil societies create platforms for mutual understanding and cooperation, addressing common challenges such as environmental sustainability, human rights, and economic development. By engaging diverse communities and encouraging participation from various stakeholders, civil societies help build trust and solidarity between the two nations, ultimately contributing to a more stable and harmonious bilateral relationship (Tasnim, 2021). Civil societies in both countries have facilitated people-to-people connections, which have been instrumental in fostering mutual understanding and goodwill. This has been particularly important in maintaining a positive bilateral relationship despite political and economic challenges (Bhardwaj, 2022). Additionally, regional geopolitical tensions, such as those involving China and Pakistan, can complicate the role of civil societies in fostering bilateral cooperation (Ishfaq Ahmad et al., 2024)

Security cooperation- The security cooperation between India and Bangladesh has evolved significantly, particularly in response to shared challenges and historical tensions. While the two nations have faced conflicts over territorial disputes and resource management, recent years have seen a shift towards collaboration, especially in trade, energy, and regional security. This transformation is crucial for addressing mutual security concerns and enhancing stability in the region. Both countries have strengthened ties in the northeastern region of India, focusing on countering cross-border insurgencies and illegal migration (Rana, 2018). Illegal migration from Bangladesh into India, particularly into West Bengal, has been a significant security concern. This issue affects socio-political dynamics and has implications for bilateral relations (Nandy, 2019). Cross-border insurgencies and the use of the India-Bangladesh border by insurgent groups in India's northeastern region pose security challenges. Effective border management and cooperation are essential to address these threats (Kumar,Y.2024)

Educational and cultural relations- The cultural and educational interconnections between India and Bangladesh are profoundly entrenched in their collective historical narratives, linguistic affiliations, and geographical closeness. These relations have evolved over the years, influenced by various factors such as historical legacies, political dynamics, and socio-economic developments. Historically, India and Bangladesh share a rich cultural heritage, with commonalities in literature, language, art, and music, etc. The literary contributions of Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam, esteemed figures

in both nations, epitomize this cultural interconnectedness (Bhari, 2015). Historically, the area constituted a singular cultural milieu before the bifurcation of India in 1947, and the subsequent emancipation of Bangladesh in 1971 further fortified these connections. India has long been a destination for Bangladeshi students seeking higher education. In 2015, India and Bangladesh signed a joint proclamation that stresses "Natun Projanmo -Nayi Disha" and emphasizes the importance of Education in bilateral relations between the two countries (MEA, n.d.). Cultural exchanges, such as joint festivals, literary events, and artistic collaborations, have deepened the emotional bond between the two nations. These exchanges have been instrumental in promoting mutual understanding and trust (Ali, 2023). India and Bangladesh mirror each other's cultural essence, as both lands vibrantly celebrate a rich tapestry of cultural festivals, such as Durga Puja, Eid, and Pahela Baishakh, in a shared experience.

Certain domains of discord within the context of Indo-Bangladesh relations encompass

Border Dispute -The border dispute between India and Bangladesh has been a longstanding issue, rooted in the historical context of the partition of India in 1947. These disputes have been addressed through various agreements, culminating in the 2015 Land Boundary Agreement (LBA), which resolved many of the territorial issues. Although the border issues between India and Bangladesh have been resolved to some extent, there are still many issues that the two countries need to resolve. However, challenges such as border killings, human trafficking, and informal trade continue to affect bilateral relations. The 1974 Land Boundary Agreement (LBA) was a significant step towards resolving these disputes, but it took over four decades to implement fully. The 2015 LBA marked a major milestone, as it addressed the exchange of enclaves and adverse possessions, effectively resolving many of the territorial disputes (Ranjan, 2024). Border killings by the Indian Border Security Force (BSF) have been a significant issue, leading to human rights violations and straining bilateral relations. These incidents are often linked to illegal activities such as smuggling and human trafficking (Rahman & Islam, 2024). Informal cross-border trade continues to be a challenge, with significant economic, political, and security implications. Efforts have been made to address this issue through both unilateral and joint measures, but it remains a persistent problem(Shafique & Islam, 2022).

Water sharing issues- Water sharing and management disputes have historical roots and are influenced by geopolitical, Socio-economic, and environmental factors. The complexity of these issues is compounded by the geographical dependence of Bangladesh on India for water resources, as most of the rivers flow from India into Bangladesh. The disputes have led to significant socio-economic impact on Bangladesh, affecting agriculture, flood management, and biodiversity. Despite ongoing negotiations and some progress, such as the

1996 Ganga Water Treaty, many issues remain unresolved, particularly concerning the Teesta river. The India-Bangladesh Joint Rivers Commission (JRC) was established in 1972 to facilitate cooperative water management, but it has struggled to resolve key disputes (Mehrotra, 2022). Numerous accords and conventions, notably those executed in 1975, 1977, and 1996, have been established to tackle water distribution concerns; however, difficulties continue to exist, especially regarding the Teesta River (Gupta, 2023). The Tista River contention, which has persisted without resolution since 2011, continues to be a significant concern, as both nations maintain conflicting requirements regarding water distribution (D & Stalin, 2024). The two countries share 54 rivers, with the Ganges and Teesta being the most contentious. The water-sharing disputes have significant implications for bilateral relations, regional stability, and socio-economic development. Despite various treaties and agreements, challenges persist due to unequal distribution, climate change, and increasing water demand. The Teesta river dispute remains unresolved despite negotiations and a proposed agreement. The conflict is rooted in historical allocation demands and has been a significant point of contention in bilateral relations (Gupta,2023).

Securities disputes - India and Bangladesh are constituent nations of the Non-Aligned Movement Organization. The security dilemmas faced by India and Bangladesh constitute a pivotal element of their bilateral relations. The issue of unlawful migration from Bangladesh into India poses a considerable challenge, further complicated by the permeable characteristics of the Indo-Bangladesh frontier. Additionally, cross-border insurgencies and the transference of insurgent factions across the border have heightened the security complications in India's northeastern territory.

Conclusion- In summary, the dynamics between India and Bangladesh have been marked by a multifaceted interaction of achievements and setbacks that encapsulate the historical, political, and socio-economic aspects of both countries. The advancements in bilateral trade, cultural interactions, and collaborative efforts in regional security have considerably fortified relationships and encouraged shared progress. Nevertheless, obstacles such as territorial disagreements, migration concerns and political discord persist in challenging the durability of this alliance. As both nations maneuver through the complexities of their affiliation, it is crucial to emphasize cooperative strategies that tackle these impediments while leveraging the inherent strengths. Future diplomatic initiatives should focus on augmenting collaboration, ensuring sustainable advancement, and fostering tranquility in the region, ultimately culminating in a more cohesive Indo-Bangladesh partnership. This can be realized through consistent dialogues, joint endeavors in sectors such as trade and environmental issues, and nurturing interpersonal connections that cultivate trust and comprehensionbetween the two nations.

References:

1. Ali, M. A. (2023). 51 Years of India-Bangladesh Bilateral Relations: Opportunities and Challenges. *Journal of Asian Social Science Research*, *5*(1), 79–98. https://doi.org/10.15575/jassr.v5i1.75
2. Bhardwaj, S. K. (2022). Bonhomie of India-Bangladesh Relations in the Post-2008 Period. *Bangladesh Political Science Review*, *15*(1), 59–78. https://doi.org/10.57074/JGZK8759
3. Bhari, N. K. (2015). India-Bangladesh relations: Analyzing the recent developments. *International Journal of Advanced Resear...*, *4*(8), 58–67.
4. D, P. P., & Stalin, A. S. (2024). Discourse on The River Teesta's Role in Indo-Bangla Relations: Anxiety and The Way Forward. *Bangladesh Political Science Review*, *16*(1). https://doi.org/10.57074/BPSR.V16N1.A9
5. Gupta, K. (2023). Resolving Teesta River Conflicts: Harnessing Institutional Solutions for Cross-Border Water Cooperation. *Journal of Asian and African Studies*, 00219096231218436. https://doi.org/10.1177/00219096231218436
6. Ishfaq Ahmad, Abdul Hamid Kumar, & Khan, S. A. (2024). FROM SHARED HISTORIES TO STRATEGIC PARTNERSHIPS: EVOLVING DYNAMICS OF INDIA- BANGLADESH RELATIONS. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, *5*(3). https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.2704
7. Khan, M. N. S. (2020, June 12). *The struggle for freedom – Birth of a nation | Md Nazmus Sakib Khan | Oxford Political Review*. https://oxfordpoliticalreview.com/2020/06/12/the-struggle-for-freedom-birth-of-a-nation/
8. Majumdar, A. J. (2014). Making Sense of India–Bangladesh Relations. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, *70*(4), 327–340. https://doi.org/10.1177/0974928414545919
9. Mascarenhas, A. (1971, June 13). Genocide. *The Sunday Times*.
10. MEA. (n.d.). *Joint Declaration between Bangladesh and India during Visit of Prime Minister of India to Bangladesh- " Notun Projonmo – Nayi Disha."* Ministry of External Affairs, Government of India. Retrieved March 7, 2025, from https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25346/Joint_Declaration_between_Bangladesh_and_India_during_Visit_of_Prime_Minister_of_India_to_Bangladesh_quot_Notun_Projonmo_Nayi_Dishaquot
11. Mehrotra, O. N. (2022). Indo-Bangladesh Talks on Sharing of the Ganga Waters. *Strategic Analysis*, *46*(1), 137–140. https://doi.org/10.1080/09700161.2022.2058850
12. *More power from India by 2017.* (2015). The Daily Star. https://www.thedailystar.net/business/more-power-india-2017-82308
13. Nandy, D. (2019). Socio-political and security perspectives of Illegal Bangladeshi migrants in West Bengal: The impact on Indo-Bangladesh relations. *Journal of*

Historical Archaeology & Anthropological Sciences, *4*(3), 123–129. https://doi.org/10.15406/jhaas.2019.04.00190

14. Panth, H. V. (2007). India and Bangladesh—Will the Twain ever meet? *Asian Survey*, *47*(2), 231–249.
15. PTI. (2024, August 8). India-Bangladesh trade resumes from West Bengal's Petrapole land port amid tight security. *The Hindu*. https://www.thehindu.com/news/national/india-bangladesh-trade-resumes-from-west-bengals-petrapole-land-port-amid-tight-security/article68500014.ece
16. Rahman, Md. S., & Islam, Md. S. (2024). Bangladesh – India Border Conflict: Challenges and Opportunities. *Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences*, *5*(1), 77–104. https://doi.org/10.3126/ijmss.v5i1.62665
17. Ramesh, J. (n.d.). *Behind the Scenes of India's Response to the East Pakistan Crisis of 1971*. The Wire. Retrieved March 6, 2025, from https://thewire.in/books/indira-gandhi-pn-haksar-east-pakistan-bangladesh
18. Rana, Md. S. (2018). Transformation of Indo-Bangladesh Relations: From Insecurity to Cooperation in Northeast India. *Strategic Analysis*, *42*(6), 559–577. https://doi.org/10.1080/09700161.2018.1559976
19. Ranjan, A. (2024). India–Bangladesh Border Issues. In W. Menski & M. Yousuf, *Kashmir after 2019* (1st ed., pp. 229–255). Routledge India. https://doi.org/10.4324/9781003588849-13
20. Shafique, M. A., & Islam, M. S. (2022). Empirical Study on the Informal Cross Border Trade Nexus between Bangladesh-India Land Borders: Bangladesh Perspective. *ICRRD Quality Index Research Journal*, *3*(1). https://doi.org/10.53272/icrrd.v3i1.1
21. Singh, S. (2009). "Border Crossings and Islamic Terrorists": Representing Bangladesh in Indian Foreign Policy During the BJP Era. *India Review*, *8*(2), 144–162. https://doi.org/10.1080/14736480902901053
22. Tasnim, F. (2021). *Civil Society in Bangladesh: Vibrant but Not Vigilant* (Vol. 46). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4404-4
23. University of Lucknow, & Kumar, Y. (2024). Bangladesh's Role in Cross-Border Security Challenges in India's Northeastern Region. *International Journal of Emerging Knowledge Studies*, *03*(11), 923–930. https://doi.org/10.70333/ijeks-03-11-006.

Demographic Trends and Patterns of Nadia District

Chaina Debnath
Research Scholar, Dept. of History
Bankura University

Abstract: Nadia is a prominent district within the Presidency Division of Bengal, renowned since ancient times as a major global center for the study and practice of the Sanskrit language. However, the district's historical trajectory was significantly altered by the devastating famine of 1770 AD, which led to a sharp decline in prosperity and widespread depopulation. This demographic downturn persisted into the early 20th century. Beginning in the early decades of the 20th century, however, Nadia began to experience gradual transformation. Improvements in transportation infrastructure, advancements in public healthcare, and the steady growth of educational institutions contributed to the district's recovery, leading to renewed prosperity and population growth. This demographic shift became even more pronounced after the Partition of India in 1947. A large influx of homeless refugees from East Pakistan (present-day Bangladesh) and East Bengal settled in Nadia, a border district of West Bengal. While this migration presented immediate challenges, it ultimately played a vital role in the district's socio-economic development.
Keywords: River, Health, Partition, Refugee, Fertility, Mortality.

Nadia falls under the presidency district of West Bengal and it is situated between 22°53" and 24° 11" North Latitude and 88° 09" and 88° 48" East Longitude. The District of Nadia is situated in the heart of the Bengal delta. In the present chapter, I attempt to establish the demography of the population of Nadia district. This chapter has mainly tried to show how the pattern and character of population growth changed between 1901-2011 in Nadia district and Central Bengal. The preparation of this chapter relies on census data and uses data from different decades from 1901-2011. Various statistics such as population growth, fertility-mortality rate, sex ratio, and migration will be presented in aggregate to show trends and patterns in this explanation.

Firstly, it will be discussed how the demographical pattern changed in the Nadia district. various census reports and other supporting materials have been used to understand the position of the Nadia district. I will discuss this in two different approaches to better explain the circumstances.

Population growth in different decades, sex ratio, percentage of rural and urban population, population density, and representation in different decades are shown in the tables mentioned below.

Table no. 1

Population statistics of Nadia district Between 1901-1971

Year	Total Population	Percentage of increase	Population density
1901	7,73,202	-5.3	512
1911	7,75,986	0.4	514
1921	7,11,706	-8.0	472
1931	7,21,907	1.4	478
1941	8,40,303	16.4	557
1951	11,44,924	36.3	759
1961	17,13,324	49.65	1135
1971	22,30,270	29.94	1473

Sources: Census of India,1921, Vol- 5, Census 1951, Census 1961, Census 1971

In 1901 - 1911, the population began to increase in various districts of Central Bengal (Calcutta, 24 Parganas Howrah) centered on industry, trade, and commerce. In all these towns common people flocked from outside in search of work, even in Jalpaiguri in North Bengal, Cooch Behar, where the population grew, centered on the production of commercial crops. Even after the 1770s, the situation in Nadia district did not change significantly in terms of depopulation, even due to natural disasters and epidemics organized in the last decade of the 19th century, no significant change was observed in this situation. However, during the period 1911-21, the population growth rate collectively affected the whole of Bengal, but it is clear that the population growth rate was negative in all the districts of Bengal. This was largely attributed to the unsanitary environment of Bengal, particularly epidemics such as influenza and malaria. These epidemics were responsible for depopulating various districts. According to various contemporary data, about 40% of the people of Bengal died due to malaria and various other diseases. But "A steady and significant population growth rate was observed between 1921-1951, which was the highest between 1931 and 1941 in all the district”.[1] In 1941, it was very clarified from Table No. 2 that the population increased in every district belonging to Central Bengal.

Table -2

Inter District variation of percentage increase in population (1901-1951)

District	1901	1911	1921	1931	1941	1951
Howrah	11.4	10.9	5.7	10.2	35.6	8.1
24 pargana	-16.2	15	11.4	9.6	27	25.6
Calcutta	-	8.4	3.4	10.6	84.9	20.9
Nadia	-5.3	0.4	-8.3	1.4	16.4	36.3
Murshidabad	5.7	1.7	-9	12	19.7	4.6

Sources: Demographic Trends in Western Bengal,1881-1951, A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol-2

In the focus of the position of Post-Colonial Nadia district, the soil fertility of the district, livelihood opportunities, location of agriculture and industry, public health facilities, and size of the district as compared to the entire state must be kept in mind.

In reality, the impact of partition fell on this district as it did not in other districts of West Bengal. As mentioned earlier, the population of Nadia district declined due to epidemics, famines, and various natural calamities. Again in the second half of the 20th century, this district had to endure the pressure of a large number of refugees.

The population pressure of Nadia district is very high compared to its size. According to the 2011 census, this district has the seventh position in terms of population. The picture of this evolution of the population of Nadia district will be presented by dividing the 20th century into two phases.

First phase (1901-1950)

The main reason for the decline in the population of Bengal was the famine of 1770 AD. As a result of this famine, one-third of the people of Bengal died, half of whom belonged to the peasant class. Those who survived left West Bengal for East Bengal. This was also a reason for the population decline.[2] The uncultivated fertile land of agrarian Bengal was characterized by a lack of people.[3] RadhaKamal Mukherjee was a professor of economics and sociology. His book is 'The Changing Face of Bengal'

Radhakamal Mukherjee and his contemporary social ecologists attributed the destruction of property in Bengal to colonial constructions such as the construction of railways, roads, dams, etc. rather than natural causes. Almost two centuries later, Professor Sugata Bose presented a different opinion. Dr. Bose has argued, that land in two Bengals-West Bengal and Bangladesh in the 1970s-had some of the highest densities of population and some of the lowest yield in production in the world.[4] Demographic changes were influenced not

only by agricultural production systems but also by river diversion and artificial control. Another reason for the decline in population is the change in the course of the Ganges. Earlier the main stream of river Ganga used to flow in the Bhagirathi, the other in the Padma, but later the main stream of the Ganges shifted entirely to the Padma. Two important commercial cities built around the river Bhagirathi were Kaliganj [5] and Fulia [6] which later lost their former glory due to the change in the course of the river Bhagirathi.

In this context, we will learn about the deterioration of public health in the colonial Nadia district. Some Researchers like Aravinda Samanta,[7] C.A Brentley,[8] Ira Klein [9] blamed that colonial modern technology and fragile medical system. The expansion of the railway from Calcutta to Ranaghat led to a rapid increase in some diseases such as malaria. Due to the combination of all these factors, no development was observed in the district in the first half of the 20th century. In the 1940s, the development of the district started due to inflation, improvement of the medical system, and immigration of people coming from outside.

The population growth of any country state or region depends on its birth rate, death rate, and immigration. In the first phase, if we look at the population growth and density of the population in the table of 1931 - 1941, we will see that natural growth was more here. But we will see that population growth during this period was mainly due to immigrants (1941-1951). This reduction in natural growth can be due to various reasons, such as lack of permanent settlement, precarious life, reluctance to marry, unemployment, etc. The population growth rate was significantly higher in the border regions, especially in the partition of Bengal. [10]

In 1921, the same picture was observed in the Nadia district. At this time, the initiative to provide purified water to Krishnagar led to rural folk returning to Krishnagar to settle, while Santipur and Navadwip also became attractive to the people due to improved communications, especially the development that took place with the expansion of railways and the construction of bridges. [11] On the other hand in 1941 - 51 the population of all areas under Krishnagar Sadar Division and Ranaghat Subdivision increased, but Tehatta and Karimpur were exceptions.[12] During 1941-51 Nadia registered a phenomenal growth of urban population of 76.96 percentage against the state's urban growth of only 32.52 percentage.[13]

Inter-census population growth rate-

Years	1951-60	1941-50	1931-40	1921-30
West Bengal	28.4	12.4	20.6	7.4
Nadia	40.3	30.9	15.2	1.4

Source:1961 census

A very important aspect of a population survey is the determination of population density. Population density is defined as the number of people per square kilometer of land in an area. However, population density may vary depending on place, time, and region. A region's economic activities and government policies depend on this population density. If the numerical analysis of the population density is done, it will be seen that the population density of this district exceeded the other districts of West Bengal. Even in proportion to the population density of West Bengal as a whole, Nadia had the highest population density. Let's look at the table no 1mentioned above.

Nadia's density is the second highest for the districts in the presidency division. In 1921, the population density of Nadia per square kilometer was 472 people, in 1951 it increased to 1138 people.[14] Population pressure per square mile was highest in the district towns of Krishnagar, Nabadwip, and Santipur. Which enhanced the process of urbanization of the district. Urbanization is a process in which people congregate in specific areas for the purpose of improving their livelihood and quality of life. The prosperity of Nadia's urban centers is also very important in that respect. ''Commercial towns" were built by the river. For example, Chapra by the Jalangi river, Chakdaha by Hooghly river, Kaliganj by Bhagirathi, Krishnagar by Mathabanga.[15] Country towns" were developed around Chakda, Krishnagar, Ranaghat, Santipur. we will see the different forms of population density change of different towns of the Nadia district between 1911 and 1951. from the table mentioned below -

Density of population in Krishnagar Sadar division and Ranaghat Sub-division (percentage per square mile)

Year	1951	1941	1931	1921
Ranaghat	888	480	421	439
Chakdaha	934	507	439	492
Santipur	1062	734	620	612
Krishnagar	1141	664	547	518
Nabadwip	2273	1355	994	849

Sources: Census 1951

According to the 1971 census report, Nadia was ranked fifth among the districts of West Bengal. The highest population density is observed in Calcutta (3,497). However, metropolitan states are not behind in population density, Howrah (1625), Hooghly (913), 24 Parganas (623), and Nadia (507).[16] In this context, if we take the population density of the five major cities of Nadia district, we will find that the municipalities of Nadia district like Kolkata have grown more in population. The population of the new cities (census towns) built in Nadia after independence is also noticeable Kanchrapara Development Area rural colony, Fulia (Baincha Railway Station), colony state Taherpur (For middle-class Hindu).

The overall sex ratio of a population is the combined effects of sex ratio at birth and sex differentials in mortality. A balanced sex ratio is considered to be 952 females per 1000 males because biologically males are more likely to be born as compared to females, though the survival probability of females is more as compared to males.[17] In the 1921s, the death rate in Nadia was higher than the birth rate, but the situation gradually changed. At present, the ratio of men and women in Nadia district has improved significantly in terms of the state. Below is a list of birth and death ratios of Nadia district.

Fertility and Mortality Rate of Nadia District

Year	Fertility rate	Mortality rate	Female (per 1000 of Male)
1921	34.1	33.0	956
1931	35.6	26.7	951
1941	23.3	23.1	945
1951	22.9	33.0	935
1961	19.5	5.5	948

Source: Various Census Report

Second Phase:

Partition and their aftermath

In the discussion about penetration in West Bengal and Nadia district, the discussion of how the penetration took place deserves relevance. On the partition of India in 1947, out of 39 million people who came from East Bengal, 11 million were Hindus.[18] There was no adherence among the homogenous community of Hindus in East Bengal. Even they were not equally divided. Most of the Hindu settlements can be seen in the southern part of East Bengal such as Khulna, Jessore, Barisal, and Faridpur. Out of these 11 million Hindus, 4 million were belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.[19] India gained independence by breaking up the Indian subcontinent and forming two separate states. Its impact in post-independence India was far-reaching. Research on the

partition from different perspectives is proof of this. As a result of partition, West Bengal witnessed the migration of a large number of Hindus from East Pakistan to West Bengal.

But while 'fear' was not the main factor in the first phase of this arrival, later it became the only factor. If we can review the influx of refugees in different districts of West Bengal, we will see that the infiltration took place mainly in four streams. In the first phase, between 1946-50 AD, about two million Hindus entered West Bengal. Centering on the riots in Noakhali, Tippera, and Khulna, fear spread throughout the Hindu-dominated areas of East Bengal. As a result, Hindus, especially from Barisal, flocked to West Bengal in search of safe haven. Urban 'Bhadralok,[20] Hindu gentry, some businessmen[21,] and some artisans[22] were the most numerous among the Hindus of this phase. In the second phase (1950-58), infiltration was centered around the passport system. In 1952, the Government of India introduced the passport system. During this time many noble Hindu families immigrated to this country with valid visas, but even when the visas expired, they never returned to East Pakistan. 'Consistent intruders were the most likely to adopt this approach'.[23] The third phase of penetration begins with the Hazarabal incident. In 1963 it spread to Hyderabad city as well. In the fourth phase, the greatest penetration occurred during the Liberation War of Bangladesh (1971). However, this trend of penetration continues even today. Border crossing continues today. A section of those crossing the border illegally settled in the border areas.

First, the people coming from the East were regarded as displaced and then eventually as migrants. They were classified as 'Old' (who were displaced from East Bengal to West Bengal from 1946 to 1958) and 'New' (who came to West Bengal from 1964 to 1972)[24]. They are called 'Refugee'. The word 'refugee' in legal parlance means who crossing an international border. In the Bengali language they are called by different names like 'Udbastu (uprooted from home or homeland),' saranarthi' (someone who seeks refuge and protection), 'Bastuhara (one who has lost his homeland), 'chinnomul' (uprooted from homeland). If we look at the census data from 1951 to 1971 and all the related data, we can understand the population structure of homeless people.

Percentage of Refugees in total population of West Bengal

Years	Total population	Refugees from East Pakistan	Percentage of Refugees
1951	26299980	2104241	8%
1961	34926279	3068750	8.78%
1971	44312011	4293000	9.68%

Source: Chinnomul Rajnitir Utsha Sandhane, Shibajiprotim Basu, pp.79

As shown in the above table, the number of refugees has increased step by step, the main reason for which is the permanent migration of large numbers of refugees to West Bengal due to the increasing persecution of minorities in East Pakistan, killings, rapes, and liberation war. However, the pressure of refugees fell on the eight districts of West Bengal the most, six of which were border districts. If the census report of 1951 is carefully reviewed, it will be seen that most of the refugees are concentrated in Calcutta, 24 Parganas and Nadia.[25] Now let's look at the census report in 1961. With the help of the information obtained from this report, the picture of refugee arrival in different towns and villages of West Bengal will be easily presented to us-

Number of Refugees in various Districts of West Bengal -

District	Total population	Rural	Urban
West Bengal	3068750	1507220	1561530
24 Pargana	786661	297164	489697
Kolkata	528205	-	528205
Nadia	502646	381009	121638
Cooch Behar	252753	227628	25125
Jalpaiguri	218341	171617	46724
West Dinajpur	172237	125155	47082
Bardhaman	144704	81841	62863
Hooghly	130951	38663	92288

Source: Chinnomul Rajnitir Utsha Sandhane, Shibajiprotim Basu, pp.80

Now let's find out how the influx of refugees changed the demographics of Nadia district. Jaya Chatterjee, in her famous book "The Spoil of Partition," cites several reasons behind identifying Nadia with immigrants from East Pakistan. But before discussing that we will know about the undivided Nadia district. The violent upheaval centered on Partition, which divided India on religious grounds but wanted both India and Pakistan to adopt secular policies.[26] Even after 1947, one riot after another continued with religion at the fore. Without going into detail on this topic let us know how partition and post-partition refugees from East Pakistan changed the demographics of Nadia. 1931 there were 6009 people who immigrated to Nadia, in 1941 to10,573, in 1951 it increased to 464, 462. The following table will illustrate the magnitude of influx from across the border -

Year	Number of Migration
1947	47808
1948	74786
1949	65619
1950	226402
1951	6638

Sources: Asok Mitra, Census of India,1951: District Census Handbook: Nadia

The undivided Nadia district consisted of five sub-divisions and 25 police stations. The population of the district was 17,59,846 of which 37.8% were Hindus and 61.25% were Muslims.[27] Before the partition of 1947, this district was known to be a Muslim-dominated district. Karimpur and Tehatta, are two major Muslim-dominated areas of Nadia district. these two districts people expected to be included in East Pakistan's Kushtia, but the two districts were annexed to Nadia district through the Ratcliffe Declaration.80 percent of the Muslim population left the district overnight to save their lives. Two police stations of the Sadar subdivision Tehatta and Karimpur -registered a negative growth rate of -2.3% and -13.4% respectively from 1941 to 1951.[28]

District /subdivision /police station	Muslim population 1941	Muslim population 1951	Rate of Growth 1941-51
Nadia	412254	256017	-37.89
Sadar subdivision	292298	194956	-33.30
Krishnagar and Nabadwip	32702	32628	-0.22
Chapra and Krishnaganj	65096	35772	-45.04
Nakasipara and kaliganj	62031	67662	9.07
Tehatta and karimpur	132496	58894	-55.54
Ranaghat subdivision	119956	61061	-49.09

Source: R.A. Dutch, Census of India, 1941, Census 1951, West Bengal District Hand Book: Nadia, A. Mitra, Calcutta, 1953.

Nadia district, which was a predominantly Muslim majority area before 1947, was converted into a predominantly Hindu Majority area in 1951. In 1947 independent Nadia district was formed with two sub-divisions and twelve police

stations. Being a border region, the influx of Refugees in this district was very high. Refugees from East Pakistan flock to the urban areas of Nadia. The population density was highest in areas like Krishnagar, Nabadwip, Santipur etc. Nadia's rural and urban areas prospered by the influx of refugees and their kindness.

Rural and urban population (per sq.mile) and percentages of growth

Year	Rural population	Urban population	Percentage of rural population	Percentage of urban population
1901	473	1815	-	-
1911	475	1824	0.34	0.52
1921	431	1819	-9.20	-2.9
1931	434	1956	+0.66	+7.51
1941	494	2649	+13.83	+35.44
1951	639	4740	+29.39	+78.96
1961	954	7183	+49.23	+51.53
1971	1238	9289	+30.00	+33.00

Source: Nadiyar Janasamikha, Gobinda Bihari Bandopadhyay, pp.108-109

From the writings of Ashok Mitra[29] Hiranmay Banerjee[30] and others, who Inform that in the first phase, the people who migrated to Nadia district were those belonging to the agricultural community. They settled in Chakdah, Haringhata, and Nakashipara areas. And the middle class community, artisans, and businessmen took refuge in Ranaghat, Santipur, Krishnagar, and Nabadwip. Ashok Mitra was surprised to see the radical change in Chakdah police station when he wrote the 1951 census. Uninhabited, sleepy hollow Chakdah, today is one of the most important cities connected to Calcutta. Even the 1961 Census Commissioner was surprised to see the drastic change in Nadia's unindustrialized sub-divisions of Ranaghat, Chakdah, and Krishnagar.

Needless to say, even after 1971, the population growth rate of this district is very high. Illegal infiltrators from Bangladesh are establishing settlements in all states of eastern India. According to Amalendu Dey the 1980s, the population of West Bengal increased dramatically due to encroachment. India's former foreign secretary and Bangladesh expert wrote an article in 'The Hindu' about this infiltration. Where he blames Bangladesh's poverty for the infiltration. He fears that this trend will continue until Bangladesh is economically developed. However, these demographic changes have contributed to the development of the various industries in the Nadia district.

References:

1. Saswata Ghosh and Gorky Chakraborty, *Demographic Trends in Western Bengal*,1881-1951, Vol -2, pp.586, A Comprehensive History of Modern Bengal, 1700-1950, Vol- 2
2. Asok Mitra, *Parting of ways, partition and after in Bengal*, Economic and Political Weekly, 1990, Vol-25, pp.2441-2444
3. Arun Bandopadhyay, *Demography, Man and Nature in Bengal, c. 1770-1930*, pp.287, A Comprehensive History of Modern Bengal,1700-1950, Vol- 1
4. Sugata Bose, *Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal since 1770*, Cambridge University Press, 2003. pp.8
5. Ranjan Chakrabarti, *A Tale of Rivers of Bengal: An Environmental History*, pp.316, A Comprehensive History of Modern Bengal, 1700-1950, Vol- 1
6. Kumudnath Mallik, *Nadia kahinee* , Pustak Bipanee , 1317 (Bengali year)। pp.298
7. Arabinda, Samanta, *Malaria in the Countryside in Colonial Bengal: Some Demographic Observations*, pp.120-121
8. C.A. Bentley, *Malaria and Agriculture in Bengal: How to reduce Malaria in Bengal by Irrigation,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1925. pp.35
9. Ira Klein, *Development and Death: Reinterpreting Malaria, Economic and Ecology of British India*, The Indian Economic and Social History Review, Vol. XXXVIII, no.2 April -June 2001, pp.147-79.
10. Saswata Ghosh and Gorky Chakraborty, *Demographic Trends in Western Bengal*, 1881-1951, Vol -2, pp.590
11. Majumdar, Durgadas. *West Bengal District Gazetteers: Nadia*, Calcutta, 1978. pp.5
12. Ibid. pp74
13. Census 1961, West Bengal District Hand Book: Nadia, B. Roy, Calcutta, 1963. pp.27
14. Ibid, pp.35
15. Census of India, 1921, Vol-V, pp.109
16. Tushar Baran Halder, *Nadia Jilar Asanghatito Khetrer Shilpo O Sramik'* Rabindra press, 2014. pp.50
17. Saswata Ghosh and Gorky Chakraborty, Demographic Trends in Western Bengal,1881-1951, Vol -2, pp.586
18. Joya Chatterjee, *The Spoils of Partition, Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge University Press, 2007. pp.108
19. Ibid, pp.111
20. Chakrabarti, Prafulla K. *The marginal Men: The Refuses and the Left Political Syndrome in West Bengal*, Lumiere Book, Kalyani, 1990. pp.1.
21. Pakrasi, Kanti B. *The Uprooted: A Sociological Study of the, Refugees of West Bengal*, India, Editions Indian Calcutta, 1971, pp. 108.
22. Chakrabarti, *Prafulla K. The marginal Men: The Refuses and the Left Political Syndrome in West Bengal*, Lumiere Book, Kalyani, 1990. pp.1.
23. Anindita Ghoshal, *Refugees, Borders and Identities, Rights and Habitat in East and Northeast India*, Rutledge, 2021, pp86

24. Anindita Ghoshal, *The Altered State of Affairs: Hindu Refugees of India and Muslim Returnees in East Pakistan (1947-1977)*, Indian History Congress, 2015, Vol - 76, pp 650-651
25. Joya Chatterjee, *The Spoils of Partition, Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge University Press, 2007. pp.119
26. Joya Chatterjee*, Secularisation and Partition Emergencies: Deep Diplomacy is South Asia,* Economic and Political Weekly, 2013, Vol -48,
27. R.A. Dutch, Census of India, 1941pp.4
28. Census 1951, West Bengal District Hand Book: Nadia, A. Mitra, Calcutta, 1953. Pp. xviii
29. Ibid, pp. xix
30. Bandopadhyay, Hiranmay. *Udbastu, Shishu Sahitya Shamshad* Private Limited, Calcutta, 1970, pp. 65-69.

Planning and Welfare Schemes for Scheduled Tribes in Northern Odisha : Opportunities and Barriers to Inclusive Development

Bhagyashree Mishra
Research Scholar, Department of History and Archaeology
Fakir Mohan University, Balesore, Odisha

Abstract: Tribal development in India, viewed through a historical lens, reveals a complex journey marked by marginalization, resistance and evolving state policies. During the colonial era, tribal communities were often alienated from their lands and subjected to exploitative systems such as land revenue policies and forest regulations, disrupting their traditional livelihoods. Post-independence, the Indian state acknowledged the need for inclusive development, leading to the formulation of various constitutional safeguards and welfare programs aimed at uplifting Scheduled Tribes. The historical trajectory of tribal development has transitioned from a protectionist approach to one of integration and empowerment. However, challenges such as displacement due to industrialization, inadequate implementation of policies and cultural erosion persist. Despite numerous Five-Year Plans and targeted schemes, tribal populations often remain on the periphery of socio-economic progress. Contemporary perspectives emphasize participatory development, preservation of tribal identity and the need for sustainable, community-driven models. Understanding tribal development from a historical perspective is essential for crafting policies that are not only inclusive but also respectful of tribal heritage and autonomy. This approach ensures that development does not come at the cost of cultural alienation or socio-economic disempowerment.
Key Words: Marginalization, Safeguard, Erosion, Periphery, Disempowerment.

Introduction

The Schedule Tribes Communities in India as well as Odisha are characterized by economic and social marginalization, geographical isolation, and educational backwardness. These Communities collectively known as *Adivasis*, have their own rich history, culture and unique ways of lifestyle. North Odisha is the northern part of the Indian state of Odisha and it is located on the eastern coast of India along the Bay of Bengal. Mayurbhanj, Keonjhar and Balasore are the

major districts in North Odisha. The region is a mix of hills, forests, river valleys and fertile plains. The Simlipal Nationalpark and Simlipal hills are prominent features. Major Tribes of North Odisha are-Santhal, Munda, Ho, Bhuyan, Juang , Bathudi, Lodha Mankirdia, Gond, Kharia, Oraons and Bhumij etc. These tribes have traditionally lived in close coordination with forests and nature, relying on indigenous knowledge systems, community-led practices, and subsistence-based economies. However, the concept and course of "development" for these communities have undergone significant transformation over time, especially under colonial rule and post-independence policy frameworks.

Historically, the tribal communities of Northern Odisha faced marginalization not only from mainstream society but also from state policies that often misunderstood or overlooked their unique ways of life. Colonial economic policies, land alienation, forest laws, and later, development-induced displacement have all left deep imprints on their social, cultural, and economic conditions. Yet, the story of tribal development in this region is not one of victimhood alone, but also of resilience, adaptation, and assertion of rights.

This study seeks to explore the historical trajectory of tribal development in Northern Odisha tracing how tribal societies were shaped by external forces, how they resisted or adapted to change, and how contemporary development policies attempt to address their long-standing struggles. Understanding this historical perspective is essential to appreciate the complexities of tribal identity, rights and development in present day Odisha.

Major Tribes in Odisha:

There are 62 tribal communities residing in Orissa today. They are scattered to all parts of the Orissa. The major tribes of the state are Santhals, Kondhs, Koyas, Gadabas, Oraon, Juangs, and Bhumija. Tribal people of Orissa are known hardworking and lead a very subdued life. Various tribes engage in different occupation, but most are either into agriculture, fishing or hunting. Better settled tribes also work in mills and handicraft industries. Few tribes like Bondo and Gadaba have their own looms and make clothes for their own use. The scheduled areas of Orissa fully cover six districts (Mayurbhanja, Sundargarh, Koraput, Rayagada, Nawarangpur and Malkangiri,) and seven The Strategy of Tribal Development in Odisha 149 district partially (viz. Balasore, Keonjhar, Sambalpur, Kalahandi, Gajapati, Ganjam and Phulbani). More than 50 percent of tribal population of the state is found in undivided Koraput district, Mayurbhanja and in Sundargarh district and 25 percent of tribal population is found in undivided Koraput district alone (i.e. Present Koraput, Rayagada, Nawarangpur

and Malkangiri districts). 3. An Overview of the Scheduled Tribes in Odisha There are 62 communities listed as a Schedule Tribes (STs) in Odisha under the provision of the Indian constitution. More than 80% of them live in designated scheduled area (Behura & Panigrahi). There are thirteen (13) pvtgs (Particularly Vulnerable Tribal Groups) in Odisha, who are characterized by (a) a pre-agriculture level of technology, (b) a stagnant or declining population, (c) extremely low literacy and (d) a subsistence level of economy**. The thirteen primitives are Birhor, Bonda, Chuktia Bhunjia, Didayi, Dongria Khond, Juang, Kharia, Kutia Khond, Lanjia Saora, Lodha, Mankirdia, Paudi Bhuyan and Saora**. As per 2011 census Odisha state is having 22% of its total population belongs to Scheduled Tribes. The tribal population in Odisha is among the poorest, more vulnerable and exploited groups in the states. Most of the tribal communities are confined to the more hilly are remote areas of the state. These areas have been the habitat for some tribes for centuries, whereas the other have been driven out of the more fertile plains by non-tribal in recent times. Historically tribals have had a life style characterized by close dependency on the forest for shifting cultivation, collection of forest produce and hunting.

Odisha is home to 62 tribal communities, spread across the state. The major tribes include the Santhals, Kondhs, Koyas, Gadabas, Oraon, Juangs, Ho, Mankirdias, Bhuyans, Bathudis, and Bhumija. Most tribal people depend on farming, fishing, and hunting for their livelihood. Some tribes, like the Bondo and Gadaba, weave their own clothes using traditions. Others work in small industries and handicraft production. Six districts in Odisha—Mayurbhanja, Sundargarh, Koraput, Rayagada, Nabarangpur, and Malkangiri—are fully designated as Scheduled Areas, while seven others are partially Scheduled. Over half of the tribal population lives in the old Koraput region, Mayurbhanja, and Sundargarh districts, with 25% in Koraput alone. Odisha also has 13 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), including the Bonda, Dongria Khond, Juang, Birhor, Chuktia, Bhunjia, Didayi, Kharia, Kutia, Lanjia Saora, Lodha, Mankirdia, Paudi Bhuyan and Saora, who face challenges like low literacy, poor health, and traditional lifestyles. Overall, 44.21% of Odisha's land is classified as Scheduled Area, and the state has a rich mix of tribal cultures representing different language groups like Dravidian, Austro-Asiatic and Indo-Aryan.

Status of Tribal Population in Odisha:

Total Population of Odisha	Male	Female	Child	Literacy	
				72.87%	
41,974,218	21,212,136	20,762,082	5,273,194	Male	Female
				81.59%	64.01%

Economic Life of North Odisha's Tribes:

Northen Odisha consists of various Tribal communities before British rule. These Communities were - **Santhal, Ho, Munda, Juang, Bhumij, Bhuyan, Bathudi, Mankirdia and Saora**, they lived in relative co-ordination with their environment. Their economy was based on **subsistence agriculture, hunting, gathering, shifting cultivation (podu)** and small-scale barter trade. But Still Most tribes practice rain-fed subsistence agriculture, using traditional tools and techniques. They also collecting **non-timber forest products (ntfps)** like sal leaves, mahua flowers, honey and medicinalplants, tenduleaves plays a important role in their income. Some families also doing animal husbandry livestock such as pigs, goats and poultry for subsistence and sale.

Tribal Development and five year plans

The government had made several developmental programmes for Scheduled Tribes under different five year plans: each five year plan had various development efforts for welfare of tribal people in order to provide additional financial resources through a community development approach. The central and state government have been undertaking various steps for socio-economic promotion of tribal people in india. The five year plans in india have seen a gradual yet significant transformation in their approach to tribal development, evolving from welfare-centric policies to more inclusive and rights-based strategies. In the early plans, particularly the first and second (1951–61), tribal development was primarily approached through the lens of protection and assimilation, with a focus on providing basic services like health, education, and minor infrastructure. However, these interventions often overlooked the unique socio-cultural contexts of tribal communities. By the Fifth Five Year Plan (1974–79), a shift occurred with the introduction of Integrated Tribal Development Projects (ITDPs), which aimed at concentrated development in tribal-dominated areas. Special Central Assistance (SCA) and the Tribal Sub-Plan (TSP) strategy were introduced to ensure earmarked funds and targeted interventions. Subsequent Plans emphasized sustainable livelihoods, skill development, education, and healthcare while trying to reduce exploitation

through legal safeguards. The Tenth and Eleventh Plans highlighted the need for participatory governance, empowering tribal communities through the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996, and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. These policies aimed to restore tribal rights over land and forests and promote self-determination. Recent approaches have focused on holistic development, convergence of welfare schemes, and preservation of tribal identity, marking a shift from top-down governance to community-led planning.

Policies for Tribal Devlopment:

Northern Odisha, with its rich natural resources and dense tribal populations, faces unique developmental challenges. The Odisha government — along with central schemes — has launched region-specific policies to boost economic inclusion, sustainable livelihood, and tribal empowerment.

Population table of Scheduled Tribes of various districts of North Odisha:

Districts	Total Population District	Total Population ST of the district	Male (ST)	Female (ST)	Total Population of the Child	Literacy
Sundargarh	2,093,437	1,062,349	526,856	535,493	263,160	73.34%
Mayurbhanj	2,519,738	1,479,576	730,487	749,089	351,834	63.17%
Balasore	2,320,529	275,678	137,748	137,930	288,672	79.79%
Keounjhar	1,801,733	818,878	405,927	412,951	259,403	68.24%

Odisha Tribal Empowerment And Livelihood Programme(OTELP)

It aims to Uplift particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) like the **Juang** tribe in Keonjhar district and **Hill Kharia** in Mayurbhanj district. It promote horticulture, kitchen gardens and medicinal plant farming. It also recommend women;s self-help groups for micro-enterprise like leaf-plate making, weaving and mushroom cultivation.

Van Dhan Vikas Kendras (VDVK) in Tribal Forest Areas

- It Focus the Districts like : Mayurbhanj, Keonjhar and Sundargarh**.** It's objective is add value to Minor Forest Produce like sal leaves, tendu, mahua flowers, honey and tamarind etc.

Kendu Leaf & Forest Produce-Based Economy

In the districts like Mayurbhanj and Keonjhar where special attention is given to kendu leaves, sal seeds and tamarind are major non-timber forest products.

Tribal communities are engaged as:

- Pluckers.
- Seasonal wage earners.
- Members of cooperative societies that trade leaves with state forest corporations.

Juang Development Agency (JDA) & Micro-Projects

Special attention for Juang PVTG in Keonjhar districts. It focus on programs like: Housing and drinking water projects, Land development and irrigation support.

Skill Development Programs for Tribal Youth

Odisha Skill Development Authority (OSDA) skilled in Odisha Initiative, tribal focused courses at ITI Keonjhar, Mayurbhanj and Rourkela. It creates Industrial jobs for Rourkela steel plant, mining industries in Keonjhar and Sundargarh. It also conduct training program in tailoring, welding, driving and computer applications.

Promotion of Tribal Handicrafts & Handlooms

Special attention on **Sabai Grass Crafts** (Mayurbhanj), **Dokra Metal Art** (Kolkata-Rairangpur belt), **Leaf-plate making** (Keonjhar), and **Tassar Silk Weaving** (Baripada). Market linkages through fairs, exhibitions, and e-commerce partnerships.

Tribal people and Forest Act

Many of the tribal peoples depended upon in Forest. The think Forest and Mountain to be their mother and they will be total depend on the forest to protect their life and livelihood. Due the certain forest act they face many of the challenges in their daily life style

Forest Act of 1865

This act was the first formal forest law in India. It allowed the British government to declare any forest land as government forest and it restricted for local use. This act focused on securing wood for railway tracks. This act was regarded as the beginning of state control over forests.

Forest Act of 1878:

The Indian Forest Act of 1878 was a revised act of Forest Act 1865 that aimed to establish government control over forests. This act categorized the forests like–

Reserved Forests: These were the highest areas with the state having control over it. Villagers were not allowed to use these forests.

Protected Forests: These were forests where the state had the right to utilize resources for revenue generation.

Village Forests: Assigned to specific village communities, granting them certain rights to their use.

Forest Act of 1927:

This Act grants the government powers to make rules for these areas. It restricted certain activities within forests. It regulates the movement of forest products and the levy of duties on them. Aimed at maximizing state income from forest resources.

Health policies for Tribal Development:

National Health Mission:

Reduce maternal and infant mortality rates and control communicable and non-communicable diseases. Implementation of **Mobile Health Units** in remote tribal villages like those in Similipal biosphere, ensuring doorstep health services. Establishment of **ASHA workers** (Accredited Social Health Activists) as grassroots health champions for rural communities. Special programs for malaria control in tribal-dominated areas.

Biju Swasthya Kalyan Yojana (BSKY)

Offers **cashless health coverage** of ₹ 5 lakh per family per annum (₹ 10 lakh for women members) at both public and private empaneled hospitals. Special camps organized in remote areas of Keonjhar and Mayurbhanj for health card distribution

Integrated Child Development Services (ICDS):

Through anganwadi centres in villages, ICDS provides important services for children under 6 years old, as well as for pregnant women and breastfeeding mothers. These services include extra nutrition, vaccinations, regular health check-ups, and referrals to hospitals, especially in remote tribal areas.

Mission Shakti Health:

This program organizes joint health check-ups and awareness campaigns focused on women’s health. It covers topics like menstrual hygiene, cancer screening, and nutrition advice to help improve overall well-being among women.

State Malaria Control Program

- Intensive malaria control efforts in forest and tribal regions, including free distribution of **long-lasting insecticidal nets (LLIN)**

Initiatives for Education:

Mo School Abhiyan

A community-participation program aimed at transforming government schools Alumni, local donors, and institutions contribute funds to enhance school infrastructure, libraries, smart classrooms, and playgrounds.

Odisha Adarsha Vidyalaya (Model Schools)

- Establishing **English-medium, CBSE-affiliated schools** in each block to provide quality education for talented rural children.Special focus on students from SC/ST and marginalized backgrounds.

Eklavya Model Residential Schools (EMRS)

- Fully residential schools funded by the Ministry of Tribal Affairs. Provide free education, boarding, and facilities for tribal students in remote districts like Mayurbhanj and Keonjhar. The Tribal students also getting various scholarships for their higher studies.

Mid-Day Meal Scheme (MDMS)

- Nutrition-focused incentive that boosts student attendance and minimizes classroom hunger. In tribal areas, local food items are incorporated to suit cultural preferences.

National Means-cum-Merit Scholarship (NMMS)

- Financial support to students from economically disadvantaged backgrounds to reduce dropout rates at the secondary school level.

Samagra Shiksha Abhiyan (SSA)

- Holistic school education program integrating primary to senior secondary education. Special emphasis on inclusive education for children with disabilities and girl students.

Initiatives for Women:

Mission Shakti:

More than 7 lakh Women Self-Help Groups (WSHGs) have been created under this major program. It helps women learn about money management, start small businesses, get access to loans, and earn a living. Women receive training in areas like handicrafts, farming, small enterprises, and digital skills. Special centres called *Mission Shakti Bhawans* are being built to support these activities.

Mamata Scheme:

This is a cash support program for pregnant and breastfeeding mothers. It encourages women to go for hospital deliveries and attend regular check-ups before and after childbirth.

Kendu Leaf Scheme for Tribal People:

Kendu leaf, also known as the "green gold of Odisha," is mainly used to make bidis (local cigarettes). For many tribal families, collecting and selling these leaves is an important way to earn money during the summer.

Kendu Leaf as a Source of Tribal Income:

Around 7 to 8 lakh tribal and forest-based families take part in collecting kendu leaves each year. For many, it is their main source of income during the collection season. This work is especially important in districts like Mayurbhanj, Sundargarh, Sambalpur, Bolangir, Kalahandi, and Malkangiri.

Government Support and Schemes: The Odisha government, through its **Forest and Environment Department**, manages the scheme with the aim of ensuring:

- **Fair wages and employment** during the collection season.
- **Bonus payments**: Annual bonuses are distributed to leaf pluckers based on profits.
- **Free insurance coverage** under schemes like the **Kendu Leaf Pluckers and Binders Welfare Fund**.
- **Healthcare benefits**, provision of **umbrellas, slippers, and water bottles** to pluckers.
- Establishment of **leaf godowns** and **mobile procurement centers** in tribal villages.

Challenges for Kendu leaf Scheme

- Delayed payments and irregularities in bonus distribution.
- Exploitation by middlemen despite state-controlled procurement.
- Fluctuating market demand for bidis affecting income stability,climate impact on leaf quality and yield.

Challenges to Tribal Development:

Even though there are many government policies and laws to protect tribal communities, they still face serious problems. One of the biggest issues is **losing their land**. Many tribal families are forced to give up their ancestral land to outsiders, companies, or mining projects—often without proper permission or fair payment.

Laws like the **Forest Rights Act (2006)** and **PESA (1996)** are meant to protect tribal land and forest rights, but these laws are not followed properly. As a result, many tribals continue to lose their land and forests. In places like **Keonjhar, Sundargarh, and Mayurbhanj** in northern Odisha, mining and factory projects have pushed many tribal people out of their homes, destroyed forests, and harmed the environment. Efforts to help those displaced have not worked well.

Tribal people depend a lot on forests for things like **sal leaves, kendu leaves, honey, and herbs**. But government rules, forest cutting, and exploitation by middlemen make it hard for them to earn money from these resources.

Education is another major issue. In remote tribal areas, there are not enough schools. The language used in schools (like Odia or English) is often different from tribal languages, which leads to many students dropping out. Poverty, social discrimination, and a lack of teaching methods that respect tribal culture also make education harder for tribal children.

Health and nutrition are big problems too. Many tribal people suffer from **malnutrition, anaemia, and poor maternal health**. They often don't have good healthcare nearby, and they rely on traditional medicine, which may not always work. Diseases like **malaria and tuberculosis** are common but often go untreated.

These problems are all connected and make it very hard for tribal communities to grow and thrive. Stronger policies and better implementation are needed to bring real and lasting development for them.

Conclusion

Tribal development in North Odisha represents a delicate journey through the ages. The region, blessed with ample natural resources and vibrant cultural diversity, is home to tribes whose lives are deeply entwined with the forests, rivers, hills and land. Yet, these communities continue to grapple with pressing issues such as land alienation, displacement due to mining and industrial projects, limited access to quality healthcare, educational barriers and economic marginalization. Over the years, both the state and central governments have introduced various targeted initiatives — including the Integrated Tribal Development Agency (ITDA), the Odisha Tribal Empowerment and Livelihoods Programme (OTELP), the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act (PESA), and the Forest Rights Act (2006) — all designed to protect tribal rights, strengthen self-governance, and improve livelihoods. However, the real impact of these schemes is often thinned by gaps in grassroots-level implementation, bureaucratic delays, and lack of active community involvement.

Equally critical to this developmental journey is the safeguarding of tribal languages, traditional knowledge systems, and cultural practices, which are at risk of erosion under the pressures of rapid industrialization and homogenized modern lifestyles. Tribal festivals, indigenous art forms like **Dokra craft** and **Saura paintings**, and age-old ecological practices reflect not just heritage but also practical wisdom for sustainable living.

The path forward demands a development approach that goes beyond material growth one that values cultural identity, ecological harmony, and social justice. Empowering tribal communities through skill-based education, ensuring fair access to resources, promoting tribal entrepreneurship, and giving them a voice in local governance are essential for genuine to get the more benefit of various government scheme as well as the solve the challenges.

Reference

Patnaik, N. (2005). *Primitive tribes of Orissa and their development strategies*. New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd.

Behura, N. K. (1983). Structural continuity of tribal culture and Indian civilization: An analysis of the Odishan situation. *Journal of Social Research.*

Behura, N. K. (1978). *Peasant potters of Odisha*. New Delhi: Sterling.

Agarwal, S. (2013). Disadvantageous situation of tribal women and children of Orissa, India: A special reference to their health and nutritional status. *Journal of Community Nutrition and Health, 2*.

Hembrom, S. (2017). Changing tribal livelihood pattern through MGNREGA: A study of Mayurbhanj district of Odisha. *The Researcher's International Research Journal.*

Government of Odisha. (2021). *Annual report of the ST & SC Development, Minorities & Backward Classes Welfare Department*. Bhubaneswar: Government of Odisha. https://stscodisha.gov.in

Ministry of Tribal Affairs. (2020). *Statistical profile of Scheduled Tribes in India*. New Delhi: Government of India. https://tribal.nic.in

Odisha Forest Development Corporation (OFDC). (2020). *Kendu leaf operational report*. Bhubaneswar: OFDC.

Pattnaik, B. K. (2017). Forest-based livelihoods of tribal communities in Odisha: Issues and challenges. *Indian Journal of Social Development, 17*(2), 235–250.

Das, S. K. (2019). Livelihood options and forest policies in tribal Odisha: A case study of kendu leaf. *South Asian Journal of Development Studies, 14*(1), 77–94.

Xaxa, V. (2014). *Report of the High-Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India*. Ministry of Tribal Affairs, Government of India.

Nayak, R. N. (2015). Tribal development and forest rights in Odisha: Implementation and impact. *Journal of Rural Development, 34*(3), 311–328.

Behera, M. C. (2006). *Tribal rights and forests: A study of Scheduled Tribes in Odisha*. New Delhi: Concept Publishing Company.

Mishra, S. (2020). Forest-based livelihoods in tribal Odisha: Role of minor forest produce in rural economy. *Journal of Regional Development and Planning, 9*(1), 65–78.

Padel, F., & Das, S. (2010). *Out of this earth: East India Adivasis and the aluminium cartel*. New Delhi: Orient BlackSwan.

Panda, R. K., & Nayak, A. K. (2018). Role of kendu leaf in sustaining tribal livelihood: A study in Odisha. *Indian Journal of Agricultural Economics, 73*(3), 389–396.

Dash, S. (2017). Education and health status of tribal people in Odisha: A critical study. *International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6*(4), 24–30.

Sarap, K. (2003). Participatory forest management in tribal regions of Odisha: A case study of Nayagarh district. *Economic and Political Weekly, 38*(50), 5307–5315.

Government of India. (2021). *Van Dhan Yojana: Empowering tribal enterprises*. Ministry of Tribal Affairs. https://tribal.nic.in

Odisha Tribal Empowerment and Livelihoods Programme (OTELP). (2019). *Final evaluation report*. Bhubaneswar: Government of Odisha.

Sankaracharya's Advaita Vedanta Philosophy and Brahmanism : A Critical Analysis

Chaitali Saha

Research Scholar, Department of Philosophy

University of Kalyani, Nadia, W.B.

Abstract: Adi Shankaracharya's philosophy is built on the Upanishads and the idea of Advaita, which means "not two", Shankaracharya created a way of thinking called Advaita Vedanta. It is based on the idea that Atman and Brahman are the same thing. He said that the individual soul, Atman, is the same as the highest soul, Brahman. The final goal of life is to reach self-realization and understand this non-dual truth. Adi Shankaracharya thought that the soul of a person and the soul of the highest being are like waves and the ocean. Even though the waves look different from the ocean, they are both made of water[1]. In the same way, Atman and Brahman may look different, but they are really the same thing. Both names mean the same thing that has always been there. The Atman thinks it is different from Brahman because it doesn't know any better. But his Advaita Vedanta theory shows the truth that is not limited to two sides. Adi Shankaracharya used three main points to support the Advaita view. The first argument comes from the idea that awareness is one. It was his opinion that all living things have the same, basic awareness. Brahman is the name for this universal mind. There are many examples in the world of change where the basic truth does not change. One example is ice that changes into water and then gas, but hydrogen and oxygen stay the same. In the same way, each soul looks different, but it is really the highest Brahman. The used the fact that infinite regress is impossible as an argument. He said that each soul could not be fundamentally different from Brahman, because if it were, there would be an endless number of souls. This can't happen. There must be a first concept, or the most important thing in the world, which is Brahman. He said that the only way to understand that Atman and Brahman are the same thing is to know about them. Knowing yourself gets rid of ignorance and connection, which make it hard to see this. This knowledge is strengthened even more by direct practice.

---

[1] Sarker, C. R. (2021). Consciousness in quantum physics and meaning in the Advaita philosophy of Adi Sankaracharya. *Ultimate Reality and Meaning*, *38*(1-2), 73-81.

Keywords: Shankara, Brahman, Advaita, illusion, Tatasthalaksana, Svarupalaksana.

Introduction:

Sri Adi-Shankaracharya was born at Kalati in Kerala in 788 A.D. to Shivaguruand Aryamba. He became an ascetic at a young age and on the banks of river Narmada met his guru, Govinda Bhagavatpada under whom he studied for four years. Govinda Bhagavatpada taught Shankara the profound philosophy of Advaita and directed him to write a philosophical commentary on the Vedanta Sutras, also known as Brahma Sutras, then interpreted in diverse theological ways. Later Shankara went to Varanasi and wrote commentaries on the Brahma Sutras, Upanishads and Bhagavad Gita. Then he travelled throughout India on foot three times from Nepal to Rameshwaram preaching the universal philosophy of Advaita in important centers of learning, places of pilgrimage and in capitals of kings. Sankaracharya's Advaita thought is high, beautiful, and one of a kind. It's a system with strong ideas and tricky reasoning. It's very interesting, motivating, and uplifting. It is the most brave, deep, and subtle way of thought that has ever been put forward. Sankara had a full and perfect way of thinking. Sri Sankara was a great and powerful mind. He was very good at using logic. He was one of the mostdeep thinkers ever. He was the wisest person I have ever met. He was a form of Lord Siva of the gods. Many people in both the East and the West have found comfort, peace, and light in his ideas. Western minds bow down to Sri Sankara's lotus feet. Many people have found peace, hope, joy, wisdom, perfection, freedom, and comfort in his thought, even those who were very sad or suffering. Everyone in the world admires his way of thinking about things. Shankara wanted those who followed him to not only think about his Advaita theory, but also live by it. He sent this message through an event in which he was part.

Adi Shankaracharya stressed that rituals are not important and do not lead to freedom. The point of life is to learn about yourself by telling the difference between what is real and what is not real. When someone realizes they are God, they can look at the world and other people with equal love and awe. In everything, they see the supreme self. His theory of not having two sides gives us a one-sided view of the world. It brings all paradoxes together by showing that self and other, soul and body, mind and matter are really just one thing. It gives religious ideas like the idea of Ishwara or the personal God a logical base.

Advaita Vedanta wants all people and cultures to get along. The most important thing in the Advaita-Vedanta philosophy is to respect nature and see

that everything is one [2]. AdvaitaVedanta is one of the six main schools of Indian thought that says the Vedas are the most important books in the world. The Brahmasutra Bhashya, Bhagwad-Gita, and Upanishads are also very important works in this system. Together, they are called the Prasthantrayi[3]. In Advaita-Vedanta, the Brahman is seen as the only truth.

Brahman is thought to be beyond words. Names, shapes, time, space, and thought can't describe it. Trying to explain it is just trying to bring it down to the level of what people can understand. In Advaita-Vedanta, the self, also called the Atman, and the Brahman are the same thing. Atman and Brahman are the same, like a wave and the ocean. Hence, behind the veil of various names and forms exists one ultimate reality called the Brahman or the Atman. The Rig Veda, states-

'Ekam Sat VipraBahudaVadanti'[4]

.....That ultimate truth is one, known by the wise as many.

The difference between different names and shapes comes from something called Maya, Avidya, or the cosmic illusion. We can tell the difference between a bowl, a glass, and a flower pot even though they are all made of the same material, "mud." Thank you, Maya. In the same way, we think of men, women, animals, trees, rivers, and other things as separate because of cosmic error, but at their core, they are all the nondual Brahaman, because there is nothing outside of Brahman.

The Stanford encyclopedia of philosophy describes environmental ethics as:

> *"A discipline of philosophy that studies the moral relationship between the human and the non-human world"*[5]

It's not that Indians are superstitious or stuck to forms; it's just that they deeply understand that behind all names and forms there is one heavenly force called "Brahma." The Holy Bhagavad Gita has these words from Lord Krishna:

> *"An enlightened one is he who sees me in the wise, in a cow, in a dog, in an elephant, in an ant and in an outcast".*[6]
>
> \- BG 5.18: Chapter 5, Verse 18[6]

---

[2]Bhajanananda, S., & Mission, R. (2010). Four basic principles of Advaita Vedanta. *Prabuddha bharata*, *27*, 9-15.

[3] Rangaswami, S. (Ed.). (2012). *The Roots of Vedānta: Selections from Śaṅkara's Writings*. Penguin Books India.

[4] Tularam, G. A. Vedic literature and Swami Dayananda Saraswati: a revival of the ancient Vedic tradition.

[5]Cimatti, F. (2016). Beyond the human/non-human dichotomy: the philosophical problem of human animality. *Humanimalia*, *7*(2), 35-55.

[6] https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/5/verse/18

Hence, Advaita-Vedanta doesn't consider a human to be particular, instead it sees him as a general part of nature that is suppose to function as per Dharma. Dharma here must not be confused with religion.

The Dimensions of Advaita Vedanta:

Maya (Illusion):

Maya is the complex power of illusion that comes from Brahman. It makes Brahman appear as the material world in two different forms, called *Nirguna Brahman* and *Saguna Brahman.* Shankara said that Nirguna Brahman is not a person. It is only when it is connected to Maya that it becomes a personal God (*Saguna Brahman*) [7]. There is no difference between *Saguna Brahman* and *Nirguna Brahman.* However, Nirguna Brahman is not the opposite of Saguna Brahman, and vice versa. If they were, it would go against everything that Advaita Vedanta says. For the religious worship of followers, the same Nirguna Brahman shows up as Saguna Brahman. From two different points of view, it is the same Truth. The higher Brahman is Nirguna Brahman, which is the Brahman from the transcendental point of view (*Paramarthika).* The lower Brahman is Saguna Brahman, which is the Brahman from the relative point of view (*Vyavaharika*). One of Maya's main jobs is to "hide" Brahman from normal people, and the other is to show the material world as its replacement. *Maya* is also said to be indescribable because the basic truth behind sensory perception is hidden. This is true even though all the information we get from our five senses is Maya. Another reason it is said to be confusing is that it's not totally real or totally fake. Maya lives in Brahman, but Brahman is not affected by the illusion of Maya. This is similar to how the Swan and the Lotus are not affected by their surroundings, which is a picture of Advaita Vedanta. The Upanishads say, "Brahman is the only real thing," but we see this world as real. In what way? Adi Shankara used the idea of Maya to explain this strange thing.

Ishwara (The Supreme Lord):

Adi Shankara described Advainta Vedanta. It says that when a person tries to understand the formless, indescribable Brahman with their mind and while being affected by Maya, what they see is *Ishwar*a. *Ishwara* is what happened when Maya and Brahman came together. In a figure of speech, Adi Shankara says that the Supreme Being (Ishwara) appears when the image of the Cosmic Being is looked at through the mirror of Maya. *Ishwara* is *Saguna Brahman*, which means that Brahman is using Maya as a tool. He can be realised or seen by

---

[7] Radhakrishnan, S. (1914). The Vedanta philosophy and the doctrine of Maya. *The International Journal of Ethics*, *24*(4), 431-451.

people who are spiritually awake [8]. Some might even say that he has a personality. People worship him. He is the source of morals and the person who gives people the results of their *Karma.* However, He is without sin or good deed. Ishwara's beauty is not changed by his relationship with *Maya.* Ishwara always knows that the Brahman material is one and that the world is *Mayic*. The Supreme Lord is only real on the practical level. On the spiritual level, the Cosmic Spirit is His real form. Then the question comes up of why the Supreme Lord made the world. If you think that Ishwara makes the world for any reason, you are insulting his completeness and perfection, which is also against the *Advaita* Vedantic Principles. For instance, thinking that *Ishwara* makes the world to get something would go against His perfection. It wouldn't make sense to think that He creates out of kindness, since there would be nothing to be compassionate about in the beginning (when only Ishwara existed). With this in mind, Adi Shankara could only come to the conclusion that God's creation is just a game.

Brahman (The One without a Second):

Adi Shankara said that Brahman, the Supreme Cosmic Spirit, is the only thing that is real. Everything else, like the world, material things, and people, is false except for Brahman. The spiritual foundation of all being is Brahman, who is known as the One who is everywhere, all-powerful, and all-knowing. "Not this, not this" is another way to describe Brahman. It is also called Adrishya, which means "beyond the reach of the materialistic eyes." It's what the material world is built on, and the material world is just a dream (Maya)[9]. However, Brahman is not what the world is because the world is what Brahman does. People say that Brahman is the source of all information in its purest form. Brahman is not something that can be seen or touched. Self-existence, self-delight, self-knowledge, and self-bliss are some of its qualities. What it is is Svarupa (energy) and Nirikara (formless). It is the spirit of someone who knows. It is the Seer (Drashta), the Above and Beyond (Turiya), and the Silent Witness (Saakshi).

The primary focus of Advaita Vedanta is Brahman. The core ideas of Shankara's Advaita are that the jiva is almost the same as Brahman, the world is a false appearance on Brahman, and Brahman is ultimately genuine. According

---

[8] Keerthi, G. (2017). The Great Life History of Shankarachrya. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies*, *4*(1), 408-16.

[9] Mishra, R. K. (2015). Advaita Vedanta Tatwa and Adi Sankaracharya. *International Journal of Humanities and Social Science*, *4*(2), 40-44.

to Advaita philosophy, the universe is the self-alienation of Brahman, an objectification of the unobjective reality that is eternally refuted. The world is both a substantial change (parinama) of the nescience that is inherent in Brahman and an outward manifestation (vivarta) of Brahman. According to the scripture, Brahman is existence (satya), consciousness (jnana), and boundless (ananta). It is also birthless (ajam), deathless (amaram), and eternal (nityam); it is one without a second (ekamevadvitiyam); and it is indescribable in words and unknown to the mind (avamgmanasagocaram).

According to the Upanishads, Brahman is "ekamevadvitiyam," which translates to "one without a second." Saccidananda's essence is life, consciousness, and happiness. According to Upanisadic sayings such as "satyamjnanamanantam Brahman," Brahman is knowledge, truth, and infinity. It is evident that Brahman is the nature of sat, cit, ananda, and ananta. "Vijnanaanandam Brahman" implies that Brahman is knowledge and happiness, and "anando brahma vyajanat" says that He understood bliss as Brahman. Two different conceptions of Brahman are defined by the Advaita Vedantins: Tatasthalaksana, or accidental, and Svarupalaksana, or fundamental. An object's core definition is its essence. The four fundamental definitions of Brahman are sat, cit, ananda, and ananta. Shankaracharya explains the concepts sat, cit, and so on in his commentary "Taittiriyopanisad."

Since Shankaracharya does not distinguish between existence (sat) and reality, "sat" denotes truth. The Upanishads prescribe two forms of Brahman: a higher one (para) that lacks attributes and activity, change, and modification, and a lower one (apara) that possesses all of the attributes and activities mentioned in some passages. This is how the Advaitin explains away the apparent disparity and contradictions. This lower Brahman is God, who is a combination of the attribute-less reality of Brahman and the indeterminate entity known as maya or avidya. The mind is a byproduct of avidya, while the soul is a combination of the higher Brahman.The world is Brahman's fictitious manifestation. This means that Brahman, the attribute-less reality, appears to be divided into God, the soul, and the world. Maya or avidya is the force that causes the aforementioned apparent diversifications.

Adi Shankara came up with some rational reasons why Brahman is true, even though Brahman is already true. A lot of what the Upanishads and the Brahma Sutras say about Brahman is very similar to what Adi Shankara said. This is proof of Brahman from other people. Everyone has a soul, also called Atman. Both Adi Shankara and his beliefs say that Atman and Brahman are the

same thing. This argument also shows that the Brahman knows everything. It looks like everything is going according to plan and nothing is getting lost. This is not because of an inner force; it is because of Brahman.

Mohsha (Liberation):

Advaitins also think that souls (*Atman*) can reincarnate as plants, animals, or people, depending on their past actions. So they think that pain is caused by Maya and that only knowing about Brahman (called *Jnana*) can get rid of *Maya*. There is no difference at all between the *Jiva* and the Brahman once *Maya* is taken away. Jivan mukti is the name for this kind of happiness that you can experience while you are still alive. You can praise God in any way you want while you are in the pragmatic level. But Adi Shankara thinks that sacrifices, worship, and puja in the *Vedas* can help people reach Jnana, or true knowledge, but they can't get them straight to *Moksha*. One has to deal with the results of what they did in the past. Someone will have to face their mistakes one day, even if they do a lot of good things to hide them. Probably not in this life.

So, The core tenet of the Advaita Vedanta school is that, in actuality, there is no separation between the individual, the entire universe, and God, Brahman, or between consciousness and the universe. According to Advaitin, the universe is a manifestation of Brahman, which is a neuter gender term that literally translates to “growth,” “development,” “swelling,” or the “supreme transcendental and immanent Reality or the one Godhead.” Although Brahman’s characteristics (Saguna) are confirmed in a number of Upanishad and Bhagvad-Gita passages, there is no indication that this is a temporary truth about Brahman. “May I be many, may I grow forth,” exclaims Brahman.In contrast, Shankara asserts that Brahman is Nirguna by citing passages from the Shastra. According to Shankara, Brahman is "that which penetrates all, which nothing exceeds, and which, like the infinite space around us, fills all entirely from within and without, that absolute non-dual Brahman-"that thou art." Brahman the one is a state of being, It is not a ‘He’ a personal being, nor is it a ‘It’, an impersonal notion. The state in which all subject/object distinctions are eliminated is known as Brahman. In the end, the experience of the eternal fullness of being is known by the name Brahman.

Bibliography:

1. Swami Tapasyananda. The Sankara-dig-vijaya of Madhava-Vidyaranya, Ramakrishna Mission, Madras, 1st ed., 1978, 2nd ed., 1983.
2. Karl H Potter (ed.). The Encyclopedia of Indian Philosophies, Princeton University Press, Princeton, 1981.

3. The Hindu, (Friday Review, Faith) 2015 April 20.
4. Blavatsky HP. The Secret Doctrine. 2017.
5. John Grimes. The Vivekacudamani of Sankaracarya Bhagavatpada: An Introduction and Translation; c2004.
6. Sri Adi-Shankaracharya, Brahma-sutra bhasya; adhyavasyamah.
7. Mishra L.P. The Doctrine and Discipline of Avaita Vedanta, 1998.
8. Taittiriya Upanisad.
9. Bhagvadgita.
10. Indian Philosophy vo.2, by Dr. S. Radhakrishnan.
11. Vivekacudamani.
12. The Making of Vedanta, T.G Mainker Pp 124.125.

The China as - a Factor in Indo-Bhutan Relations

Chandan Chatterjee
State Aided College Teacher, Dept. of Sociology
Manbhum Mahavidyalaya, Manbazar, Purulia, WB

Abstract: South Asia Consisting of huge landmass includes Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maldives as well as India itself. Though there are different opinions about South Asian countries. The south asian region is also replete with contradictions, disparities and paradoxes.in the post colonial period after the second world war the region experienced the bloody inter state civil wars. India has accepted the reality of the region and decided sensitively to amend her ways to live with her ways to live with her neighbours, preferably peacefully. India knows very well that without enduring primacy to and support of one's own neighbour, no nation can become a credible power on the global stage. Time and again India's wise leadership has accorded special priority with regard to the country's neighbourhood diplomacy. Unlike India's bilateral relationship with other south asian countries, Bhutan is an all weathered friend of India.India and Bhutan share traditionally a warm and cordial relationship, which is relatively trouble free in comparison with other south asian neighbours. In the heart of the great Himalayas, Bhutan is a tiny land-locked country but in the region Bhutan has great importance because of its strategic location between two of the most powerful asian countries namely China and India. For India, Bhutan as a buffer state acts as a defence shield against China by protecting 'the chicken neck'. Bhutan's strategic location helps India also to protect her north eastern states. Bhutan is also important for its hydropower capacity. India gets huge amount of electricity from Bhutan to feed India's increasing energy appetite. Beside this, there are many other reasons to make Indo Bhutan relationship more propitious and amicable.
Keywords: World war, Regional cooperation, Chicken neck, Geopolitical landscape, South Asian Perspective, Optimistically of friendship, Geographical imperative.

The 24th round of China-Bhutan border talks held in Beijing in August 2016 brought forth several aspects of South Asia's geopolitics into the limelight of focus and intensive discourse. China's increasingly cosy relations with Pakistan, and more recently Nepal, have concerned India for many years. The country now appears to be expanding its presence in the Himalayas through negotiations with another of India's northern neighbours: Bhutan.

There is considerable recent evidence of China's growing presence in South Asia. In August 2015, China signed a series of bilateral treaties with Nepal, after India voiced objections to Nepal's new constitution and temporarily and insensibly blocked the transport of Indian goods and fuel to Nepal. While China and Bhutan have disagreed on the disputed tracts of Doklam plateau in eastern Bhutan and the Jakarlung and Pasamlung valleys in north-western Bhutan, the countries are moving closer to a resolution on their disputed 470 km border (boundary talks have been held annually since 1984). India is paying close attention to China's strategic intentions in the region.

China-Bhutan tensions date back to the Chinese occupation of Tibet in 1951, which was followed by the publication of Chinese maps that claimed considerable territory in central and north-western Bhutan. This resulted in closer ties between India and Bhutan along with an embargo on cross-border trade with China. In 1996, China made a proposal to exchange a large claim over the Pasamlung and Jakarlung valleys in Central Bhutan for a relatively smaller geographical portion of Bhutan's north-western territory in Chumbi Valley. Chumbi Valley borders Tibet and lies in close proximity to the Siliguri Corridor, one of India's most strategic and sensitive territories.

Over the years, India and Bhutan have mutually benefitted from strong neighbourly relations based on energy, trade, investment and cultural exchange. India has played a major role in Bhutan's economic development, assisting to fund the country's very first Five-Year Plan in 1961. Bhutan, in turn, has increasingly helped to meet India's enormous energy demands by selling its surplus hydropower, which is financially and technically supported by India. A crucial element of this partnership is India's effort to prevent China from negotiating a territory exchange deal that would threaten India's national security. Reports of repeated, aggressive Chinese incursions into India's Ladakh region at regular intervals, and China's sustained interest in the Chumbi Valley, have created a great sense of urgency for India to remain involved in Bhutan's border negotiations. Bhutan on the eve of Bhutan's 2012 general election. India's response was considered by many political strategists as a definitive message to Bhutan.

India's relations with Bhutan remain firmly rooted in historic, cultural and, most importantly, shared economic interests spanning over several decades. But today's complicated geopolitical realities mean that it is no longer possible to easily predict the direction of political developments anywhere in the world. China's diplomacy and the growing economic appeal of its One Belt One Road initiative will likely have significant implications on the region's geopolitical landscape.

Until 2007, India exercised significant leverage over Bhutan's foreign policy, according to the India-Bhutan Friendship and Cooperation Treaty that was signed in 1949. When Bhutan transitioned from an absolute monarchy to a constitutional democracy in 2008, the Friendship Treaty was renegotiated to give greater autonomy to Bhutan in its foreign policy and its military purchases. But Indian investments, technical support and the India- Bhutan free trade agreement mean that India continues to play a key role in supporting Bhutan's infrastructure development and economy.

Hydropower in Bhutan, as supported by India, is by far the country's primary source of energy for domestic use and local industrial consumption, and has been a major export and revenue carrier for the last two decades. The sector drives the economy and contributes to almost 25 per cent of GDP and around 40 per cent of total national revenue. The Indian government has agreed to develop 10,000 MW of hydropower in Bhutan for the export of surplus power to India by 2020. It now looks likely that only 3,000 MW will be developed by 2020. Still, the impacts of hydropower for regional development, under an India-Bhutan agreement signed in 2014 concerning the long-term development of hydropower, have been overwhelmingly positive for both countries.

Yet while India holds an important strategic position in China-Bhutan relations, there is no guarantee that this position is permanent. Bhutan's position as a small landlocked country situated between two major Asian giants creates an imperative to maintain peaceful ties with both India and China. Over the years, China has firmly gained ground in Bhutan and raised the very real possibility of developing political ties with its small, but critically vital, neighbour.

In 2012, China and Bhutan indicated for the first time the possibility of establishing full diplomatic ties following a meeting between the then Bhutanese prime minister Jigme Thinley and then Chinese premier Wen Jiabao on the side-lines of the Rio+20 Conference in Brazil - without India's knowledge.

All of the states straddling a vast territory between middle east and China to the North and Mayanmar to the create a complex geo-politicalmatrix in contemporary times called South Asia. Not surprisingly, the complex and dovetailing ties linking up the South Asian subcontinent drive these countries to speak - optimistically - of friendship as a "geographical imperative". That they have not succeeded in acting to realise much of it does not preclude them or condemning them to regional dysfunction and friction forever, but much of the dynamics would depend on how India leads the region cooperatively and what example it sets in promoting more positive relational calculus with its neighbours.

Ideally, India would prefer a peaceful, prosperous neighbourhood responsive to its own needs and wishes. But from the outset of its history as an independent country, India's principal challenges have included the promotion of internal cohesion and the management of its often-troubled relations with its neighbouring countries, the two often being closely linked, for example in relation to Pakistan, Nepal and Sri Lanka.

Overall, as it ambitiously repositions itself on the global stage, India has been seeking to outgrow its neighbourhood both economically and geo-strategically. In conceiving and conducting its South Asia policy, its tactics have varied, but the recent trend has been towards a more conciliatory approach, as India reaches beyond its own immediate neighbourhood to establish itself as a global actor.

India has close historical, religious, economic, ethnic and linguistic relationships with Bhutan. On August 8, 1949 Bhutan and India signed the Treaty of Friendship, calling for peace between the two nations and not interference in each other's internal affairs. However, Bhutan agreed to let India guide its foreign policy and both nations would consult each other closely on foreign and defence affairs. The treaty also established free trade and extradition protocols. Indian also provided Bhutan with developmental assistance and cooperation in infrastructure telecommunication industry energy medicine and animal husbandry. Since joining the United Nation in 1971, Bhutan has increasingly been prone to establish its international status. His Majesty the king of Bhutan, Jigme Singye Wang chuck visited India from 1-4 August 2005. Bilateral cooperation in several sectors, including hydropower, health, education, human resource development, information technology, and infrastructure was further strengthened during the year.

The year 2015-16 saw sustained progress in all areas of co-operation, including, hydropower, transport, communication, health, education and culture. The momentum of the bilateral ties was carried forward by high level visits and interactions. The Prime Minister of Bhutan Tshering Tobgay met the Indian prime minister on the side-lines of the UN sustainable development summit in 2015 in New York. Prime Minister Tobgay visited India in 2015 to attend the 2nd India Ideas Conclave 2015 in Goa. Notably, the government of India also extended assistance package of 4500 crore towards the 11th five-year plan of Bhutan (2013-18).

The 24th round of China-Bhutan border talks held in Beijing in August 2016 brought several aspects of South Asia's geopolitics into focus. China's increasingly cosy relations with Pakistan and more recently Nepal, has added to India's accumulating concern for many years. The country now appears to be

expanding its presence in the Himalayas through negotiations with another of India's neighbours: Bhutan.

There is considerable recent evidence of China's growing presence in South Asia. In August 2015, China signed a series of bilateral treaties with Nepal, after India voiced objections to Nepal's new constitution and temporarily blocked the transport of Indian goods and fuel to Nepal. While China and Bhutan have disagreed on the disputed tracts of Doklam plateau in eastern Bhutan and the Jakarlung and Pasamlung valleys in north western Bhutan, the countries are moving closer to a resolution on their disputed 470 km border (boundary talks have been held annually since 1984). As apprehensive, India is turning vigilant to China's strategic game plan in the region.

China-Bhutan tensions date back to the Chinese occupation of Tibet in 1951, which was followed by the publication of Chinese maps that claimed considerable chunk of territory in central and north western Bhutan. This resulted in closer ties between India and Bhutan along with an embargo on cross-border trade with China. In 1996, China made a proposal to exchange a large claim over the Pasamlung and Jakarlung valleys in Central Bhutan for a relatively smaller geographical portion of Bhutan's north western territory in Chumbi Valley. Chumbi Valley borders Tibet and lies in close proximity to the Siliguri Corridor, one of India's most strategic and sensitive territories.

Over the years, India and Bhutan have mutually benefitted from strong neighbourly relations based on energy, trade, investment and cultural exchange. India has played a major role in Bhutan's economic development, assisting to fund the country's very first Five-Year Plan in 1961. Bhutan, in turn, has increasingly helped India to meet enormous energy demands by selling its excess hydropower, which is financially and technically supported by India. A crucial element of this partnership is India's effort to prevent China from negotiating a territory exchange deal that would threaten India's national security. Reports of repeated, aggressive Chinese incursions into India's Ladakh region at regular intervals, and China's sustained interest in the Chumbi Valley, have created a great sense of urgency for India to remain involved in Bhutan's border negotiations.

Until 2007, India exercised significant leverage over Bhutan's foreign policy, according to the India-Bhutan Friendship and Cooperation Treaty that was signed in 1949. When Bhutan transitioned from an absolute monarchy to a constitutional democracy in 2008, the Friendship Treaty was renegotiated to give greater autonomy to Bhutan in its foreign policy and its military purchases. But Indian investments, technical support and the India- Bhutan free trade agreement

mean that India continues to play a key role in supporting Bhutan's infrastructure development and economy.

Hydropower in Bhutan, as supported by India, is by far the country's primary source of energy for domestic use and local industrial consumption, and has been a major export and revenue carrier for the last two decades. The sector drives the economy and contributes to almost 25 per cent of GDP and around 40 per cent of total national revenue. The Indian government has agreed to develop 10,000 MW of hydropower in Bhutan for the export of surplus power to India by 2020. It now looks likely that only 3,000 MW will be developed by 2020. Still, the impacts of hydropower for regional development, under an India-Bhutan agreement signed in 2014 concerning the long-term development of hydropower, have been overwhelmingly positive for both countries.

Yet, while India holds an important strategic position in China-Bhutan relations, there is no guarantee that this position is permanent or stationary. Bhutan's position as a small landlocked country situated between two major Asian giants creates a solid imperative to maintain peaceful ties with both India and China. Nevertheless, over the years, China has firmly gained ground in Bhutan and raised the very real possibility of developing political ties with this small, but critically vital, neighbour.

In 2012, China and Bhutan indicated for the first time the possibility of establishing full diplomatic ties following a meeting between the then Bhutanese prime minister Jigme Thinley and then Chinese premier Wen Jiabao on the side-lines of the Rio+20 Conference in Brazil - without India's knowledge. This development was taken very seriously by the Indian government, resulting in the withdrawal of India's petroleum subsidies to Bhutan on the eve of Bhutan's 2012 general election. India's response was considered by many political strategists as a definitive message to Bhutan.

India's relations with Bhutan remain firmly rooted in historic, cultural and, most importantly, shared economic interests spanning several decades. But today's complicated geopolitical realities mean that it is no longer possible to easily predict the direction of political developments anywhere in the world. China's diplomacy and the growing economic appeal of its One Belt One Road initiative will likely have significant implications on the regional geopolitical matrix.

Recently in 2018 the Minister of Power issued new guidelines for import and export of electricity and power trading with neighbourhood countries. Earlier also India had some guidelines but those guidelines were very restrictive. Under pressure from the neighbourhood countries to mend those guidelines, the Government of India reformulated fresh guidelines in 2018 with liberal tenor.

Besides, the perception of increasing Chinese investment in different sectors to make room for hegemony in Indian subcontinent added to the ominous signal which India wanted to counteract.

Bhutan's development dilemma emanates from two considerations. One is its overdependence on export of hydro-electricity, hence diversification of its export is urgently required particularly because rivers' torrential flows could be disturbed in future due to probable climatic disruptions. That's apart, Bhutan, however boastful of its achievement as a producer of huge clean energy, could not avoid the instability inherent in existing market reality. On the other hand, since many of Bhutan's hydro-power projects are jointly implemented ventures it creates an obligation that their benefits should go to India in equal measure. This, in turn, creates a ground of notional compliance by India or mutual agreement on such terms before Bhutan could go for unilateral commercial trading which again shows how Bhutan's economy is deeply integrated with that of India and how the latter could exercise indirect terms to Bhutan's approach to open doors to other regional and extra-regional powers. So, there is a possibility or areas of latent frictions as Bhutan protested against the 2016 guidelines and later the 2018 guidelines which replaced earlier guidelines to facilitate and promote cross-border trade of electricity.

Over the last 60 years, Indian diplomacy has enabled to forge deeper political and economic understanding with Bhutan India and Bhutan share close and friendly relations underscored by mutual trust and confidence. The China as a Factor in Indo-Bhutan Relations 129 years 2013-18 witnessed sustained progress in bilateral cooperation in all areas of importance ranging from hydro-power, transport, communications, infrastructure, health, education and culture, IT industry and agriculture. But India may not continue to enjoy the leverage it always had with Bhutan. China is another important dimension in India-Bhutan relations. In recent years, China has tried to establish its influence in Bhutan. It continues to stake claims to important areas such as Chumbi valley and Doklam. Of late, the Bhutanese government is also willing to have a deeper engagement with China in areas of tourism, education, culture, agriculture etc. Nevertheless, it might be too early to conclude that China can hurt India's stake in Bhutan. The DNT Party won the election of 2018. It is far more pragmatic in approach and seeks to go for rapid development of Bhutan without being crony to either Indian or the Chinese side. Finally, there is yet another perspective that Bhutan is important to India geo-politically, but not economically. Economic integration with Bhutan is not a top priority for India as Bhutanese economy relies more on climatic vagaries. This perception is not fully sound which is why India should continue to nurture good relations with Bhutan. It depends on political will on

the part of both sides of government not only to unleash a new web of government-to- government interactions but also to enthuse and energise interactions at the level of private agencies to go for more ambitious and multifaceted mutual engagements in newer fields of emerging importance like environment, satellite communication and data analytics.

References:

1. Choudhury K. T (1997) "Indian Immigration in Bhutan," Encyclopaedia of SAARC Nations," Volume 6; Verinder Grover, Published by Deep and Deep Publications, F-159, Rajouri Gander, New Delhi- 110027, p 473-474.
2. Singh Pavneet (2018) "International Relations for civil services Examinations" published by McGraw Hill Education, 444/1, Sri Ekambara Naicker Industrial Estate, Alapakkam, Chennai 600116, Tamil Nadu, India, P- D12.
3. The Hindu, 29 September 2015.
4. Udisha Saklani, (2016) "The China factor in India-Bhutan relation" Article.

The Rise and Growth of Goyendah in Colonial Bengal

Faijun Aktar
Assistant Professor, Dept. of History
Sundarban Mahavidyalaya

Abstract: Intelligence gatherers are always an integral part of a state system. It can be traced back to ancient times. This trend was sustained in the medieval period. After the establishment of the East India Company, they tried to systematize their system. The British administration introduced many policies. From the very beginning, they understood that Knowledge is power. So, they tried to gather information as they could. The company era was very different in tone and temper from the past. The British administration tried to reorganise the police structure to strengthen their empire. The British administration incorporated the informers within the police structure to strengthen their machinery system.
Key Words: Informer, ancient era, medieval era, modern era, Daroga, police, Crime, thugee problem, approver system.

Introduction: There are several references to surveillance, spying, and information collection in the Indian historical tradition since ancient times, where the intelligence service was an integral part of the state administrative framework. From the time of Artha Sastra, one finds reference in the numerous Hindu texts about the usages of the ambassadors in foreign countries and spies and informers within the homeland assigned with the task of information gathering about any concern for the state.[1] It can be well assumed that for a sub-continent like India, where the extent of its geographical landmass as well as the complexities inherent in the social fabric, information was a much necessary tool from the rulers' point of view, for better governance or for the consolidation of their rule. It is also to be mentioned that the social, cultural, religious, as well as linguistic heterogeneity of Indian society puts a premium on accurate intelligence.[2] This tradition went on during the rule of the Sultanate as well as of the Mughal rule, where specialized officers, assigned for the job of maximum information like barid, munihiyan and others who continued to be one of the strong pillars of the Sultanate and Mughal administration. However, the process of disintegration of the Mughal Empire at the turn of the eighteenth century was reflected in "a failure of knowledge, of the flow of information and of the central

ruling elite's canny understanding of local circumstances".[3] With a better-designed policy towards thriving for the goal, coupled with political and economic acumen as well as military strength, the English East India Company (the Company henceforth) finally overtook the other European contenders, and could successfully establish them as the ruling authority of the country.

Now, after grabbing the power, the Company as the ruler was supposed to know this huge geographical area with its varied contours, changing climate, production type, multi-layered societal formations, different cultural patterns, and diverse religious practices. The Company had no other choice but to gather as much information as possible to address all these and establish their rule on a firm footing. As it is rightly observed by one of the modern-day historians that the "Company's government believed, right from the beginning, that it had very limited access to vital information about the country it was to rule".[4] They created various educational institutions (such as the Asiatic Society) and other organizations to survey India's natural resources (like the Geological Survey of India and the Botanical Society). The leaders of the Company assumed control with a preconceived sense of superiority over the Indian populace, and they consistently asserted their perceptions of this society across all areas, whether executive, legislative, or judicial. However, with the turn of the nineteenth century, a new element, more intense than the previous time, challenged the Company's authority. With the rise in criminal activities in early nineteenth century Calcutta, the seat of power of the English East India Company, the need was felt in the highest echelon of the administration of the Company, to reorganize the police structure, with an addition of informers (Goinda; derived from the Persian Word 'guftan' meaning to inform, tell, or speak) attached to it, to serve the purpose of anticipating crime, and thereby eliminating it beforehand. The primary purpose of the Company's initiatives in this regard was first to gather, and then to systemize, as much information about the country and its people as possible. It readily admitted that information was power, and that explains the emergence of the civil intelligence outfits of the colonial state under the jurisdiction of the police.

Darogah and Goyendah: Two 'New' Entrants

It was in 1793 that Lord Cornwallis decided to relieve the traditional zamindars of their police duties, what they have been performing for quite long time. The Company then went ahead with its well-thought-out plan, considering the expanse of the country, of dividing the districts into thanas (units of police jurisdiction) of twenty to thirty square miles, each placed under a new officer called daroga.[5] It has been rightly observed that the daroga immediately became a new instrument of control for the Company's government, or as the peasants

looked at them, as the local representatives of the "aura and authority of the Company Bahadur".[6] Backed by the Company's authority, the daroga-zamindar tie-up, soon became a terror for the rural life of Bengal. Though the daroga system was formally abolished in other parts of India in 1812, it continued to function in Bengal, only to be placed after 1817 under a more regulatory regime closely supervised by the District Magistrates.

It appears from a minute dated 24 November, 1810, that under the encouragement of head money offered by the regulation of 1810, the profession of goyenda first began, and then rapidly spread over the country.[7] Following the creation of thanas in 1793, every thana was reported to have its set of goyendahs plying for occupation, with the avowed countenance and support of the darogah, who shared with them the head money. Informers attached to the police stations gathered information not just about crimes and criminals but also about any kind of combination considered potentially dangerous. Some of the early tracts written by serving or retired Company officials like Alexander Fraser Tytler quite clearly indicate the steady growth of goyendah (informers) as a distinct profession. Tytler found two types of goyendahs operating in Bengal: occasional or temporary in nature and professional or more permanent in nature. The former took it for occasional inducements and was, therefore, of no great importance. It was the professional type that he found the most subtle. Tytler believed that these professional informers quite effortlessly formed a nexus with the officers of the police stations and shared the profits.[8] It is to be mentioned in this context that the information gathered through such sources was not always accurate, and therefore, the Company officials were still looking for an adequate and final solution to their worries or apprehensions. Initially outside the ambit of the police functioning, there was another method of Initially outside the ambit of the police functioning, there was another method of information collection, a practice common among the contemporary Indian ruling class, and the Company also tried it, though without much success, for its benefit. This was the interception of letters through postal agencies. The General Post Office was already set up in Bombay (1794), it was because of the dominant prevalence of the private posts that such situations arose where the Company had assigned a post-master for sending letters, without knowing that the same man was also entrusted with the same kind of responsibility by the Company's Indian enemy. At times, the situation proved to be beneficial for the Company, and sometimes it backfired.[9] But what can be said about this porous kind of methodology for collecting information is that it signifies that the Company was yet to feel content, so far as the question of establishing a strong administrative machinery was concerned.

Canvas of Crime

Along with the extension of the traditional crime of gang dacoity from the rivers and villages of Bengal to the modern metropolis, new types of crimes were emerging in Calcutta with the turn of the nineteenth century. A report prepared by the justices of peace (appointed for the municipal administration of Calcutta) on January 31, 1800, listed the city's criminals who were found hanging around the liquor shops in the following categories: (i) gang robbers; (ii) river dacoits; (iii) cutpurses or pickpockets; (iv) petty thieves; (v) cattle thieves;(vi) counterfeiters; (vii) cheats and swindlers; and (viii) receivers of stolen goods.[10] These new trends of criminality in the horizon of Calcutta were developing in the context of a 'rupture in socio-economic relations in Bengal'. A brief overview of a particular crime, i.e., dacoity, in rural Bengal, might be useful to understand the growing concern for the colonial authority to deal effectively with it. Since 1792, it is known that the Company government had relied on the employment of spies and informers with men over them called girdwars whose duty was to arrest those denounced by the spies.[11] In 1801, a large gang of 600 dacoits attacked and plundered the house in a town in Birbhum and thus created a 'law and order' problem for the magistrate of the district. On this occasion, spies were sent to fetch information regarding the whereabouts of the dacoits.[12] One of the chief weapons used by Mr. Blacquiere, the Magistrate of Nadia, in the process of eliminating of this crime was the employment of spies, to get finally accepted by the Company government. In the words of Blacquire himself, "The detection, conviction, and bringing to condign punishment by hanging many offenders at the period produced a great amelioration, and the crime of dacoity was unknown in the district of Nuddea and Hooghly for some years afterwards".[13] A detailed direction was given by Nizamat Adalat regarding the operation of the spies. It read as follows:

"The established duty of goyendahs is to discover the haunts of the dacoits, to watch their movements, to mix with them occasionally, with the view of obtaining accurate intelligence respecting their operations and designs for their employer, to communicate to him the result of their observation and enquiries, and finally, to point out to goyendahs, who are usually regular police officers, the persons of the individual whom the Magistrate, in the discharge of his public functions, may order to be apprehended".[14]

The Company also tried to use the criminals, when caught, to act as their informers. In 1801, Shakra, a dacoit handed himself over to the police in Dinajpore, and he provided information against the rest of the gang with which he had worked once, including a Sirdar and fourteen other people. The group was arrested and afterwards pledged to proceed to the next step, based on the

information given by Shakra. The Magistrate of Dinajpore recommended Shakra as 'a proper object of mercy' under the provisions provided by Section 111, Regulation 6 of 1796.[15] Nemai Chung, a well-known dacoit of Deogram, Hooghly turned into an informer against his gang and provided necessary information to the administration and based on his information one of the members of the gang was hanged to death.[16] In another instance, in 1850, Tinu Ghosh turned into an informer for the Nadia police. On 26 September 1851, the gang in which Tinu worked operated a dacoity in one of the well-known persons of the area, Ramnarain Pathak's house. After this dacoity, Tinu served as an informer to the police in Nadia and based on his information, his gang members were arrested. For rendering this service, Tinu was rewarded by getting recruited as Choukider of Belpukur village and became an official informer subsequently.[17]

Alluring into Ambit

This practice of gathering information through appointing dacoits as a chaukidar became common in nineteenth-century rural Bengal. The English East India Government thought this was the best way to deal with the criminal activities by collecting information from one of the gang members. As J.R. Ward, commissioner of the Dacoity Commission, said that they were looking for a new source to obtain evidence which would lead to better results, and the only way of obtaining such information was by admitting one of the ex-members of the gang as witness against his fellow members. This practice was finally acknowledged when the Thugee and Dacoity Department was established in 1835 under William Henry Sleeman to deal with the rising disturbances created by the thugees (thugs). The thugees were said to have operated across the northern section of the Indian sub-continent as gangs of highway robbers, tricking and later strangulating their victims. The department under Sleeman adopted a two-fold strategy to eliminate this problem permanently. On the one hand, it developed an extensive network of 'paid informers' spread over a wide area for collecting necessary information regarding the movement and potential plans of the gangs in advance. On the other hand, Sleeman introduced the 'approver' system whereby the convicted thugees were offered suspension of sentences on condition that they disclosed identities and plans of other members of the gang.[18] This was in tune with the practice that the Company police had been practicing in the countryside since the initial years of the nineteenth century. The 'approver' had to confess about the gang member, based on which the gang will be arrested. Sleemen made a blueprint or a plan to destroy the group of thugs.

In tune with his plan, in the eastern part of the country, Sleeman employed Bengali middle-class people who wanted to join the police as

Goyendahs. The educated middle-class people were recruited as goyendahs and depending on their skill and commitment to the job, they were sometimes promoted to the post of darogah. According to their theory, while "the upcountry" constables were chosen for brawn, the short-statured Bengalis were preferred for brain".[19] "The Bengalee alone," said the annual police report of Calcutta of 1855, "who is unfitted [sic.] by physical disqualification for a constable, makes in this country a perfect detective".[20] William Bentinck, the Governor General of India stressed upon the subject of recruiting the Bengali in the post of Goyendahs. The local people were recruited as Goyendahs because they were accustomed to the local environment. To eliminate the thugee problem, the act of XXX of 1836 was passed in 14th November.

There is of no doubt, as the statistics proved, that the Sleeman model became effective in crushing the thugees and thereby, assured the Company of an efficient machinery, where informers played a vital role, to deal with the criminal activities within their territory. However, with the passage of time, within two decades, the need for a more specialized infrastructure was felt, as the political consciousness of the Indians was getting shaped up by the denials and consequent grievances, aroused mainly because of the changing attitudes of the British rulers. Therefore, the British authority needed to deal with these newly emergent political forces. afresh, apart from the criminal activities that they had been dealing with since the turn of the nineteenth century.

End Note:

1. Wendy Doniger and Brian K. Smith (eds., transl.), The Laws of Manu, London, 1991, p.151, pp. 225-6.
2. C.A. Bayly, *'Knowing the Country: Empire and Information in India'* in Modern Asian Studies, Vol. 27, No. 1, Special Issue, February, 1993, p.9
3. Ibid. p.10
4. Basudeb Chattopadhyay, *'State Intelligence Network and Surveillance in Colonial India'* in *Webs of History: Information, Communication and Technology from Early to Post-Colonial India* (eds.) Amiya Kumar Bagchi, Dipankar Sinha and Barnita Bagchi, New Delhi, 2005, p. 197.
5. Sekhar Bandopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India*, New Delhi, 2006, p. 102.
6. Basudeb Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal*, 1770-1860, Calcutta, 2000, p.109.
7. W.R. Gourlay, *A Contribution Towards a History of Police in Bengal*, Calcutta, 1916, p.44, cited in Basudeb Chattopadhyay, *'State Intelligence Network and Surveillance in Colonial India'*, Op.cit., p. 206.
8. Alexander Fraser Tytler, *Considerations on the Present Political State of India*, London, 1916, pp.65-70, cited in Basudeb Chattopadhyay, Ibid. p. 206.

9. C.A. Bayly, Op.cit, pp. 30-34
10. Sumanta Banerjee, "'City of Dreadful Night': Crime and Punishment in Colonial Calcutta" in *Economic and Political Weekly,* Vol. 38, No. 21(May 24-30), pp.2045-55.
11. Ranjan Chakrabarti, *Crime and Punishment: Order and Disorder in Early Colonial Bengal 1800-1860*, Kolkata, 2014, p. 83
12. Ibid.
13. Iftikhar-ul-Awwal, 'Anti-Dacoity Drive in Mid-Nineteenth Century Bengal' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities*), Vol. 35, No. 1, June, 1990, p. 90.
14. Ranjan Chakrabarti, Op. cit. p.83
15. Ibid. p. 84
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Basudeb Chattopadhyay, *'State Intelligence Network and Surveillance in Colonial India'*, Op.cit, p. 204.
19. Sumanta Banerjee, *The Wicked City: Crime and Punishment in Colonial Calcutta*, New Delhi, 2009, p.467.
20. Ibid. p. 468.

Study of Modern Sanskrit Literature

Haripada Mahapatra
Associate Professor, Dept. of Sanskrit
Sankrail Anil Biswas Smriti Mahavidyalaya
Sankrail, Jhargram

Abstract: The oldest book in the world is the Rigveda. Sanskrit literature originated from this Rigveda. Upanishads, Puranas, Ramayana, Mahabharata, Abhijnanasakuntalam, etc., the flow of Sanskrit literature continues to flow today. Ages have changed, thoughts have changed, Sanskrit literature has also changed with it. Sanskrit literature is not limited to mythology but has come closer to reality. Numerous modern Sanskrit literatures have been written beyond the known table. Modern Sanskrit literature has got short stories, novels etc. along with poetry and drama. In modern Sanskrit literature, reality has prevailed more than imagination.
Keywords: Literature, modern, reality, Sanskrit.

Introduction;

Most of the people say 'Sanskrit' means only Vedic worship mantra, 'Sanskrit literature' means only ‘Ramayanam’, ‘Mahabharatam’, ‘Puranam’, ‘Upanishad’ and Sanskrit story means ‘Panchatantram’, ‘Hitopadesh’, ‘Betalpanchabingsati’ etc. For many learned scholars, modern Sanskrit literature seems to be an unimaginable impossibility. This idea has traditionally taken place in people's minds for ages. But the real truth is that the Sanskrit literature that we think of as ‘Ramayanam’, ‘Mahabharatam’, ‘Puranam’, ‘Panchatantram’ etc. are actually Sanskrit literature of ancient times. Sanskrit literature is well-established in the modern age as well, surpassing the long medieval literary period as well as other provincial literature in keeping with the times. Needless to say, Sanskrit literature of the modern age is much more unique and rich than that of the ancient and medieval times.

Where the main subsistence of ancient and medieval more Sanskrit literature was ‘Ramayanam’, ‘Mahabharatam’, ‘Puranam’. Such as - Kalidasa's ‘Abhijnanasakuntalam’, ‘Vikramorvashiyam’, ‘Meghdootam’; Vasa’s ‘Abhisheknatakam’, ‘Pratimanatakam’, ‘Uruvangam’, ‘Karnavaram’; Bhattanarayana's ‘Benisangharam’ etc. In modern Sanskrit literature, real human life has taken place in the pen of modern Sanskrit writers. Such as - Chintaharan Chakraborty's ‘Sushila’, Radhaballav Tripathi's ‘Somaprabham’, Rajendra Mishra's ‘Abhishtamupayanam’, Tarapada Bhattacharya's ‘Shaibali’ etc.

In the ancient fictional literature like ‘Panchatantram’, ‘Hitopadeshah’ etc. where human words have been placed in the mouths of animals and birds for the entertainment of children, for the purpose of teaching through entertainment. In the writings of modern Sanskrit storytellers the human heart has spoken. In Tarapada Bhattacharya's story ‘Shaibali’, the unspoken words of his soul have reached the hearts of the readers more than what Shaibali has said. Proverbs told in ancient fiction have been transformed into social messages in modern fiction. Modern Sanskrit literature seems to be much more aware.

Literature is the mirror of society. Best examples of this are found in modern Sanskrit literature. Professor of Jadavpur University Dr. Rita Chattopadhyay in her book ‘Adhunik Sanskrit Sahitya’ called modern Sanskrit literature as 'Mirror of Time'. Instead of mythological, fictional and historical stories, the social sufferings of recent times have taken place in the thoughts of modern Sanskrit writers. Unemployment, terrorism, politics, corruption of public leaders, communalism, oppression of women, degradation of humanity, environmental pollution, ethnic problems, etc. have become the subject of modern Sanskrit literature. Tarapada Bhattacharya's story ‘Athavejalkatha’ depicts the image of adulterous omnipotence at different levels of society. Chintaharan Chakraborty's 'Sushila', Rajendra Mishra's ‘Abhishtamupayanam’ and Tarapada Bhattacharya's ‘Shaibali’ tell the story of women's suffering in modern society.

The story of corruption in recruitment in the world of education has been narrated in Haridatta Sharma's ‘Sakshatkariyam’ story. Veenapani Patni's two stories ‘Sankhanadah’ and ‘Batayanam’ tell the story of the self establishment of a woman who was not respected in a patriarchal society.

Modern Sanskrit literature has undergone radical changes not only in storytelling but also in words, language and style of writing. Modern Sanskrit literature has got a simple, fluent language by abandoning the long, complex, compound words of ancient and medieval times. Modern Sanskrit writers have enriched the Sanskrit vocabulary by introducing words like Bengali Tadbhav, Desi, Arabic, French, English. From Marathi “Jhakli Muth Sabba Lakhachi” to Sanskrit “BaddhaMushtihLakshadhikamulya” or from Bengali “Dekhlei Ga Jwale Yaaye” to Sanskrit “DarshanmatrenGatradahmutpadayati” etc. Sanskrit translation of the most popular proverbs in the provincial language has not only made Sanskrit literature more attractive to the readers but has also given a new identity to Sanskrit literature in the court of the world.

References:

1. Chattopadhyay Rita. Adhunik Sanskrit Sahitya. Reprint, Progressive Publication, Kolkata, 2019. AD, ISBN-978- 81-8064-208-1.
2. Das Devkumar. Sanskrit SahityerItihas. Edition 11, Sadesh, Kolkata, 1419. (Bangabda), ISBN-81-8282-061- 0.

A Comprehensive Study of the Sericulture Industry in Murshidabad : Historical Evolution, Present Trends and Future Prospects

Md. Bulbul Saikh
Research Scholar, The Centre for Studies in Social Science
Calcutta

Abstract: Sericulture is the cultivation of silkworms to produce silk. It involves the rearing of silkworms, primarily Bombyx mori, on mulberry leaves, allowing them to spin cocoons, and then processing these cocoons to extract silk fibers. This practice has been around for thousands of years, especially in countries like China and India, which are major producers of silk. Murshidabad, located in the state of West Bengal, India, has a long-standing legacy in sericulture, which is central to its agrarian economy. The district has historically been known for its high-quality silk production, specifically in mulberry and Tassar silk. This paper explores the evolution of the sericulture and silk industry in Murshidabad, with a focus on its history, economic contributions, challenges, and the potential for sustainable growth. By analyzing historical records, current industry practices, and government interventions, this research aims to offer a comprehensive understanding of the sector's dynamics and suggest pathways for its future development.
Keywords: Sericulture, Silk Industry, Murshidabad, Economic Development, Sustainability, Historical Evolution.

Introduction:

Murshidabad is a historically significant district in the Indian state of West Bengal. It was once the capital of Bengal, Bihar, and Odisha during the Mughal era, under Nawab Murshid Quli Khan, after whom the district is named. The district played a crucial role in India's history, particularly during the Battle of Plassey (1757), which marked the beginning of British rule in India.

The geographical periphery of the district is bound within 23°43’ 5’’N to 24° 52’N latitude and 87°49’E to 88° 44’E longitude. It borders Malda district to the north, Jharkhand's Sahebganj district and to the north-west, Birbhum to the west, Bardhaman to the south-west and Nadia district due south.The international border with Bangladesh's Rajshahi division is on the east. This district is situated on the banks of the Bhagirathi River, which is a distributary of the Ganges. This district has been divided into 5 Sub-Divisions, 8 Municipalities

and 26 Community Development (CD) Blocks. According to the 2011 census this district has a population of 7,103,807. This gives it a ranking of 9th in India (out of a total of 640). The district has a population density of 1,334 inhabitants per square kilometre. Murshidabad district was once a major center of trade, commerce, and industry, particularly under the Nawabs of Bengal. It has been recognized for centuries as a prominent center of silk production.

Sericulture is the practice of rearing silkworms for the production of silk. Sericulture in Murshidabad traces its roots to the 18th century, flourishing under the patronage of the Nawabs of Bengal. Apart from the Silk and sericulture Murshidabad also well known for its others traditional industries like, brass and bell metal, ivory carving, clay pottery and terracotta, lac etc. All these rich tradition of industries and handicrafts that provide livelihoods to a significant portion of its population.

Due to the locational opportunities, the art and artists of Murshidabad managed to maintain a standard of their own. Murshidabad artists enjoyed extensive trade routes from Shashanka's time. Cheap labour, abundance of raw materials, above all extensive trade routes and port facilities created a favorable environment for Murshidabad industry. The emergence of Cossimbazar and Dhulian as ports and the consequent influx of local and foreign merchants before the shift of the capital at the beginning of the eighteenth century, along with waterborne connections with northern India, introduced the industry of the region to the world. Today this sericulture industry in Murshidabad is declining in nature due to several interconnected factors. Academics discussion about the sericulture industry of Murshidabad is crucial to protecting this glorious industry.

Glorious History of the Sericulture and Silk Industries of Murshidabad:

The tradition of sericulture in Murshidabad dates back to the 18th century during the rule of the Nawabs of Bengal. It was during this period that Murshidabad emerged as a major center for silk production, especially due to the favorable geographical conditions of the region. The combination of humid weather and fertile land enabled the region to cultivate mulberry trees, which are essential for silkworm rearing. Under British colonial rule, Murshidabad's silk industry saw both prosperity and challenges. The British East India Company played a significant role in promoting the export of Murshidabad silk to European markets, although local production was later impacted by colonial policies that favored other industries.

Details of the silk industry in Murshidabad are available in the District Gazetteer report, 2003 which is maintain by Government of West Bengal. According to this report, the history of Murshidabad Sericulture and silk industry is too many ancient. This industry existed here long before the Nawabi period of

the eighteenth century. Before the arrival of the Nawabs in Murshidabad in the first decade of the eighteenth century, the English East India Company sent a group of observers from Surat in the second decade of the seventeenth century to Patna to investigate market conditions in the lower Gangetic valley. In their report in 1621, they reported obtaining large quantities of silk in Murshidabad. In 1658 AD, they invested 50,000 rupees and set up silk looms in Cossimbazar. In 1681 AD, i.e. 23 years after the establishment of Kuthi, the English East Out of a total investment of 2,30,000 pounds in the silk industry in Bengal, India Company invested 1,40,000 pounds in Cossimbazar, Murshidabad.

Later, the industrial revolution in England required raw silk for the cloth mills in Manchester. From the mid-eighteenth century, raw silk was in high demand in England. After the Civilization in 1765, the East India Company focused more on raw silk production than silk production in Murshidabad. As a result sericulture production increased in Murshidabad. Since then they have set up silk mills in different areas of Murshidabad. For example, in 1773, the East India Company established a silk-making filature in the Jangipur region of Murshidabad. As described by Lord Valencia in 1802, it was the largest silk center of the East India Company. There were 600 silk mills and 3000 workers.

Details of the silk industry in Murshidabad are also available in the statistical report of May 1876. This report shows that, Murshidabad district then had a total of 45 European filchers, 77 native filchers. Famous author Nitya Gopal Mukerji also describing the sericulture of Bengal in his book *A Monograph on the Silk Fabrics of Bengal, 1907*. He was using a data from the Indian census of 1891, he pointed out the amount of mulberry cultivation and the number of sericulture farmers of Murshidabad. Which I have shown in the table below.

Table 1: Area under mulberry cultivation and number of cocoon producers, 1891

Name of Districts	**Area under Mulberry cultivation (Acres)**	**Number of Mulberry and Silkworm producers**
Birbhum	2000	8249
Bankura	200	978
Mednipure	18500	3566
Hooghly	200	83
Murshidabad	62900	31698

Rajshahi	800	8793
Malda	50000	38433
Total-	134600	91433

Source:Indian Census, 1891 from Nitya Gopal Mukerji's book.

The above table shows that out of the total mulberry cultivation of Bengal in 1891, the amount of mulberry cultivation in Murshidabad was 62,900 acres which is 45.38 per cent of the total production. By this number, Murshidabad was the first place in the whole of Bengal in the production of mulberry cultivation and second place in the production of silkworm or sericulture.

Present Scenario of the Sericulture Industry of Murshidabad:

Rearing of silkworms to produce silk thread is called sericulture. And the production of silk thread and silk fabric from the silk cocoon produced after rearing silkworms is called silk industry. Murshidabad has both sericulture and silk thread and textile manufacturing. However, the amount of sericulture in Murshidabad is more than silk. Sericulture in Murshidabad is mainly carried on as a cottage industry. As a result this while the men of the house work with the industry on the one hand, the women of the house are also engaged with the industry. Despite the various challenges, the silk industry continued to be an important aspect of the economy of Murshidabad. Sericulture remains one of the most vital sources of income for the rural population of Murshidabad. The silk industry supports a wide range of employment, from silkworm rearing to weaving, dyeing, and handloom operations. Sericulture offers employment to thousands of farmers, weavers, and artisans, especially in rural areas where alternative sources of income may be limited.

Sericulture in Murshidabad is mainly done in three steps. First steps start through mulberry leaves cultivation. It is cultivated for sericulture in the same way as other agricultural crops are cultivated on land. Mulberry leaves are the main food of silkworms. This cultivation is usually done by the men of the house. Then the first step of sericulture is completed as they cut the mulberry leaves from the field regularly twice a day and bring them home. The second step of sericulture began through rearing silkworms in their homes.

This second step in sericulture can be described by a comment made by Abdul Qadir during my interview. He is a male sericulture farmer in Khargram region of Murshidabad. Where he said that, These silkworms or beetles have to be nurtured with great care and diligence. These insects should be fed by cutting mulberry leaves three times a day. They have to take a lot of care. He forgets to

eat himself but does not forget to take care of silkworms. After 40 to 50 days of working in this way, the cocoon producing silk thread is obtained. The third step of sericulture is related to the production of silk yarn from their cocoons. To complete this step farmers also do hard work in their homes with their children and other family members. However, many farmers have been selling silk yarn outside their homes to some big factories and industrialists in Murshidabad since last few years instead of producing silk yarn from cocoons themselves. Where silk thread is produced with the help of advanced technology

The concentration of this glorious industry in Murshidabad is gradually decreasing. At present this cultivation in Murshidabad is limited to certain areas of the district. These areas are Khargram, Nabagram, Hariharpara, Jalangi, Raninagar-I and II, Domkal, Berhampur, Beldanga-I and II, Raghunathganj-I and II, Lalgola, Bhagwangola- II etc. It needs to be mentioned here that not everyone living in the area does this. Certain families here have kept this practice alive for generation. I have highlighted about the block wise present status of sericulture of Murshidabad in the table below.

Table 2: Block Wise Sericulture Statistics of Murshidabad District, 2019

Name of the blocks	**Quantity of mulberry farming (sericulture) (acres)**	**Number of the villages**
Khargram	3495.09	60
Nabagram	2297.22	63
Jalangi	339.88	05
Beldanga- I	178.10	15
Raninagar- I	94.75	05
Domkal	55.08	09
Beldanga- II	51.50	02
Berhampur	49.50	05
Lalgola	48.81	08
Raninagar- II	37.00	05
Murshidabad- Jiaganj	33.12	12
Bhagwangola- II	25.97	05
Sagardighi	22.00	09
Hariharpara	100.32	06

Source: Deputy Director of Sericulture, Murshidabad, 2019

The above information obtained from shows that still 209 villages in 14 blocks of Murshidabad are involved in sericulture activities. However, it should be remembered that due to various reasons, the concentration of this industry in Murshidabad has decreased a lot compared to earlier. Although the official data mentions 209 villages, how many people in these villages are currently involved in this work is also an important question.

Challenges Faced by the Sericulture Industry in Murshidabad:

The sericulture industry in Murshidabad not only contributes significantly to the local economy but also holds cultural importance due to its intricate handloom weaving traditions. However, despite its long-standing legacy, the industry faces numerous challenges. Few of these challenges are discussed very briefly below.

(i) The productivity of mulberry cultivation and silkworm rearing is heavily dependent on favorable climatic conditions. Unpredictable weather patterns, such as excessive rainfall or droughts, can adversely affect silk production. Furthermore, the region's dependence on natural resources for silk production makes it vulnerable to climate change.

(ii) Despite efforts to modernize, many local farmers and weavers continue to rely on traditional practices Depends on outdated silk reeling & weaving methods, which are less efficient. There is a need for greater integration of modern technology, such as mechanized reeling and automated weaving, to increase productivity and reduce labor costs.

(iii) Silkworm diseases like Pebrine, Grasserie, and Flacherie often destroy silkworm crops, reducing silk output. Farmers struggle to access high-quality disease-resistant silkworm seeds.

(iv) The price of mulberry leaves and other inputs has increased, making sericulture less profitable. Farmers and weavers face difficulties getting loans, subsidies, and financial aid for silk production.

(v) Cheap silk from China has flooded the Indian market, reducing demand for Murshidabad silk. Not only China, Murshidabad faces competition from other states in India also, such as Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh, which have more developed infrastructure for sericulture. These states offer better facilities for silkworm rearing, and their silk production systems are more modernized.

In addition to the reasons mentioned above the rise of artificial silk and polyester fabricshas also affected traditional silk demand of Murshidabad. Power looms and automated weaving technologies in other states produce silk at a lower cost, making Murshidabad's handwoven silk less competitive. All these reasons leads to declining interest among younger generations. They are moving to other professions like agriculture, construction, or urban jobs due to low

earnings from silk weaving. If this continues, one day this glorious traditional industry will disappear from Murshidabad. Preservation is extremely important to keep the industry alive here.

Future Prospects and Recommendations:

Sericulture remains one of the most vital sources of income for the rural population of Murshidabad. The silk industry supports a wide range of employment, from silkworm rearing to weaving, dyeing, and handloom operations. To address the challenges and promote the sericulture industry, the government has implemented several initiatives like, training and capacity building, subsidies and financial assistance, marketing and promotion etc.

The West Bengal Sericulture Development Department has established training centers to educate farmers and weavers on improved techniques for mulberry cultivation, silkworm rearing, and silk processing. The government provides subsidies for the purchase of equipment, the construction of sericulture infrastructure, and the development of new technologies to help farmers improve productivity. The government supports the marketing of Murshidabad silk products through exhibitions, fairs, and trade shows, helping local artisans reach broader markets. But this is not sufficient to overcome all the challenges. In addition, some other steps can be taken such as:

(i) The introduction of modern technologies in rearing, harvesting, and weaving will improve productivity and product quality.

(ii) Adopting sustainable farming practices, such as organic mulberry cultivation, will not only improve environmental conditions but also help the region's silk industry tap into the growing demand for eco-friendly products.

(iii) Enhanced marketing strategies, including online platforms, will help local farmers and weavers reach global markets, thereby increasing the demand for Murshidabad silk.

(iv) Continued government support in the form of subsidies, training programs, and infrastructure development is essential for maintaining the growth of the sericulture sector in the region.

(v) Promoting disease-resistant silkworm varieties and scientific sericulture method, encouraging direct market access for weavers to eliminate middlemen exploitation etc. can this industry be revived.

Conclusion:

Murshidabad’s sericulture industry, with its rich historical legacy and cultural significance, continues to be a key player in the silk production industry. Despite facing numerous challenges, the industry holds significant potential for growth and development. Through technological advancements, government support,

and a focus on sustainable practices, Murshidabad's sericulture industry can continue to thrive and contribute to the region's economic and cultural heritage.

References:

1. Goswami, Anindita et al. (2019). A Study on Historical Analysis of Murshidabad Silk Industry at Nawab's Reign (1717-1757), International Journal of Social Science, New Delhi, pp. 29-34. DOI:10.30954/2249-6637.01.2019.5
2. Hossain, Zakir et al. (2017). Silkworm disease incidence trends during the years 1992–2011 in the Murshidabad district of West Bengal, India, International Journal of Tropical Insect Science, Volume 37, Issue 4, pp. 259 – 270.
3. Mukerji, Nitya Gopal, (1907). A monograph on the silk fabrics of Bengal, The Bengal secretariat press, Calcutta, pp. 6.
4. O'Malley, L. S. S. (1907). Bengal District Gazetteers: Murshidabad, Bengal Secretariat Book Depot, Writers' Buildings, Calcutta, pp. 124-149.
5. Roy, Chandan and Mukherjee, Sanchari (2015). An Analytical Study on Determinants of Income Generation in Rural Sericulture Sector of West Bengal, Indian Journal of Economics and Development, Vol 3 (2), pp. 172-175
6. Roy, Chandan, (2018). Murshidabad Silk Industry in West Bengal: A Study of Its Glorious Past & Present Crisis, Indian Journal of Social Research 59(2), pp. 1-7.
7. Singh, A. & Verma, R. (2018). Economic Contributions of Sericulture in Eastern India, Journal of Agrarian Studies, 12(3), pp. 45-62.
8. Taufique, Mohammad and Hoque, Md Areful (2021). Current Scenario of Sericulture Production in India: A Spatio Temporal Analysis, International Research Journal of Education and Technology, Volume: 02 Issue: 04, pp. 18-20.

Websites:

http://www.seriwbgov.org/gen_mandate1.aspx Accessed on 12thOctobar 2024.

http://csb.gov.in/wp-content/uploads/2019/02/Seri-States-Profiles-2019.pdf, Accessed on 20th July, 2024.

https://www.westbengalhandloom.org/development_sericulture_and_silk_industry Accessed on 17th January, 2025.

Abul Kashem Fazlul Haq : A Versatile Genius in Pre-Independence India

Neksad Khan
Assistant Professor, Dept. of History
Bolpur College

Abstract: Fazlul Haq, a multi-faceted talent, was involved in various activities including the awakening of Bengali nationalist consciousness, expansion of education among the common peoples and the abolition of the zamindari system. The research paper begins by providing comprehensive over view of Haq's early life, education and entry into politics, tracing the formative experiences and influences that shaped his commitment to the cause of Bengali nationalism.It also examines his efforts to foster unity among the diverse linguistic and religious community. Furthermore, the paper evaluates Haq's tenure as the Prime Minister of undivided Bengal from 1937 to 1943, during when He implemented progressive and inclusive policies aimed at addressing the socio-economic disparities within the region. Haq's prominent leadership is characterized by his strong advocacy for the rights and aspirations of the peoples of Bengal, his dedicated efforts to promote social and legal justice.

Keywords: Communal Harmony, Leadership, Education, Socio-Economic, Politics.

Discussion: Abul Kashem Fazlul Haq was an unforgettable brilliant political figure in undivided Bengal in pre independent India. Not only politics, but his contribution in the fields of education, society, and economy was considerable. His eloquence, great foresight and political wisdom raised him to the highest pinnacle of politics. He worked for the common people with sincerity throughout his life. His intellectual and political acumen along with his leadership skills made him one of the most significant figures of his time.He was steadfast in his ideals and was uncompromising in the establishment of truth and justice. His leadership and dedication to public welfare earned him the title Sher-e-Bangla (Tiger of Bengal).

Fazlul Haq was born on October 26, 1873 in his maternal uncle's house in the village of Saturia under the Rajapur Thana in the district Jhalakathi, then under the grater Barisal. Fazlul Haq grew up in the socio-economic environment of Barisal during a period of about nine years from 1881-89; then journey to

Calcutta for higher studies. Most of the teachers then were English and the medium of instruction was English. Acharya Profulla Chandra Roy was the only Bengali teacher who was a professor of chemistry. He created a surprise by passing with honors in three subjects' mathematic, physics and chemistry with credit from Presidency College. He completed post-graduation in mathematics in 1895 with the interest of Sir Asutosh Mukherjee. He obtained his Bachelor in Law from Ripon College in 1897and significantly he was the second Muslim in the Indian subcontinent to obtain a Law degree.[1] He enrolled in Calcutta High Court as an apprentice of Sir Asutosh Mukherjee. Seeing Fazlul Haq's talent in law, Asutosh Mukherjee commented that he will be established not only as a jurist, but also as a country servant. Later this prophecy of his was to be proved to be true. After his father's death in 1901, he returns to Barisal to manage the family estate and started here a law practice. In 1906, he left the legal profession and joined the Government service. In 1906, He was appointed as a Deputy Magistrate. Later on, he was transferred to Jamalpur where he had to face a communal riot which he very effectively and tactfully handled. Thereafter, he was transferred to Madaripur where he was offered the post of Assistant Registrar of Rural Co-operative Societies in the new province of Eastern Bengal and Assam.[2] But 1911, he left the post of Deputy Magistrate and returned to Calcutta due to friction with the British Government.

All India Muslim League was established in 1906 with the efforts of Nawab Salimulla of Dhaka to safeguard the political rights and interests of the Muslims, to preach loyalty to the British. Fazlul Haq, who was closed to Nawab, played an important role in the establishment of the league. He was the member of draft constitution committee of the league and served as one of the joint secretaries. Thus, it can be said without any doubt that Fazlul Haq became one of the founder members of the All-India Muslim League[2.] After the cancellation of the partition of Bengal in 1911, the Bengal Legislative Council was elected in Dhaka. He contested as an independent when no Muslim dared to field a candidate in this predominantly Hindu majority constituency.[3] He won the election by defeating his nearest rival Roy Bahadur Kumar MahendraMitra with the support of Aswani Kumar Dutta, So he did not have to face much problem to proceed in that critical communal environment.[4] The success in these elections was a turning point in his life and thereafter Fazlul Haq never looked back and marked his footprints in the politics of Bengal. After the death of Nawab in 1914, the importance of Fazlul Haq increase in the politics of Bengal. He took charges as the president of Bengal of Muslim League. Fazlul Haq served as the

elected president of the All-India Muslim League from 1916 to 1921. He was one of those, who were instrumental in formulating the Luck Now pactof 1916 between the Indian National Congress and the Muslim League. In 1917, Fazlul Haq became the Joint Secretary of the Indian National Congress and served this organisation as its general secretary in 1918-1919. The imperialistic and autocratic British Government pass a notorious law called the Indian Press Act to prevent the voice of Indian Newspaper. Fazlul Haq opposed the Act and placed a significant speech in the Thirty-two session of Indian National Congress. He was the only person to concurrently hold the president of the League and the general secretary's position in the Congress. In 1918, Fazlul Haq presided over the Delhi Session of the All-India Muslim League. However he was in favor of the unity of both the Hindus and Muslims communities for the greater good of the country. He believed if there are harmony between two communities, the freedom struggle of the country will be more united.

Although a key figure in the Muslim League Fazlul Haq always advocated for secular India and believed in maintaining Hindu-Muslim harmony and unity.[5] He believed that Hindus are not the enemies of Muslims. Lack of education and others social bigotry has taken a toll on both communities. With the spread of education, people's minds will expand and tolerant attitude will be awakened. He believed that in order strengthen the unity among Hindu-Muslim, the backward Muslim caste should be brought forward and social justice should be established among them.During the Khilafat Movement Fazlul Haq led the pro-British faction within the Bengal Provincial Muslim League. He was a supporter of the Boycott of foreign goods, but strongly opposed the Boycott of educational institutions. In the conference held in Dhaka on December 1920, he delivered his long speech about the boycott of foreign goods and Boycott of Government schools. He had said our main discussion today is whether we should withdraw our boys and girls from educational institution; it has been said that we have no more room for discussion on the matter…… The policy of boycotting educational institution will be against our interest. Our purpose will be fulfilled, on the one hand and it will be causing irreparable damage to our national interest on the other. In order to boycott educational institution at present, we have to take two-pronged approach. Firstly, by denying the help from the Govt. Aided institution in order to endanger their existence and secondly by withdrawing millions of children despite having no national educational institutions of their pen and blocking their access to education.[6] Fazlul Haq also differed with the Congress leadership during the non-

cooperation movement. Fazlul Haq favoured working within the constitutional framework rather than boycotting legislatures and educational institutes. He later resigned from the Congress.

In the field of education, his positive thinking was the identity of his humanitarian approach. He showed his outstanding skill and wisdom in the field of education. Haq recognized the importance of education for societal development. He advocated for the establishment of school and educations that could provide quality education to the masses. His efforts were directed towards making education accessible to all sections of society. He believed that education is the backbone of the nation. In 1912, he formed the central Muslim Education Association in Calcutta. The aim of this association was to bring backward Muslim in the premises of education; Haq encouraged the participation of Muslims students by providing scholarship and financial grants. He realized that in order to bring this backward community to the educational institutions, it was necessary to create interest in them through the teaching of Arabic and Persian. So, he arranged to teach Arabic and Persian language in Government institutions.[7] Even he stresses the issue of teacher recruitment apart from religious education, some reserved of seats were provided for engineering and medical education for Muslim students. In this regard, he made an overall effort to bring the society forward in various ways. With this initiative, the attendance rate of the Muslim students in the educational institution started to increase to some extent. Fazlul Haq is one of the person who have contributed significantly in the establishment of Dhaka University in 1921 and maintained its academic reputation. Due to his efforts, two hostels namely Bekar and Carmichael were established in Calcutta.

On 1st January, 1924 Fazlul Haq become the education minister of undivided Bengal. Till 1943, he was minister of education several times. And when he became the Prime Minister of Bengal in 1937, he kept the ministry of education under his responsibility. He had significant contribution in Education Reform and Education Legislation. His efforts were aimed at bridging the gap between traditional systems of education and modern, which He believed would contribute to the development of a progressive society. At that time the secondary education of entire Bengal was conducted under Calcutta University. As a result, even though higher education was well managed, the lower-level education system was relatively neglected. So, he said to form a separate education Board. On august 20, 1940 he introduced the secondary education bill. He also played a significant role in improving Muslim women’s education. Lady

Brabourne, Chakhar and Islamia colleges are established during the tenure of His education Minister ship. He wanted Muslim women to be educated and was usually referred to as the 'Renaissance man' by the Muslim intelligentsia.[8]

Fazlul Haq's political journey was marked by his commitment to the welfare of both community of Bengal, as well as his advocacy for the rights of peasants and marginalized peoples. During his official duties, he visited the villages of Bengal and observed the real condition of the agricultural workers, witness the brutal oppression of the landlords and moneylenders. In the light of that experience, he introduced the debt arbitration Board to improve the condition of the poor downtrodden farming community in later life. His Krishak Praja Party promoted agriculture reform and economic development in Bengal. Fazlul Haq himself said 'Amar rajneeti dal-bhaterrajneeti, Tai langol jar jomin tar, gham jar dam tar.' His tenure saw the enactment of the Bengal Agriculture Debtor's Act in 1938, the moneylender's Act in 1938 and Bengal tenancy Act in 1938. Debt Settlement Boards were also created in all districts. At this time, 60 thousand loan arbitration votes were formed under the instruction of Fazlul Haque. Landlords across the country strongly opposed this act, but Fazlul Haq indomitably disrupted all the impatiens and barriers in his own efforts.[9] From 1937 to 1943, he did many public welfare works during his two-term prime minister ship in Bengal. The role, he played in protecting the interests of the peasantry is unforgettable. Haq played a crucial role in negotiations for autonomy and independence for British India. In 1940, Fazlul Haq had one of his most notable political achievements when he presented the Lahore Resolution, which laid the foundation for the creation of Pakistan. He was subsequently repenting for it. Amalendu De says in this context that in thought and action, Fazlul Haque was a true and large hearted Bengalee. Although he had moved the Pakistan Resolution in Lahore in 1940, he soon realized that it was unreal and was in fact directed against the interests of India and Bengal.[10]

Along with Desh Bandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhas Chandra Bose, Fazlul Haq also was the true leader of the undivided Bengal. Undoubtedly, Haq's organized peasant movement paved the way for Hindu-Muslim harmony in the communal environment of Bengal. Fazlul Haq reorganized the Krishak Praja party on the eve of elections under the Government of India Act, 1935. His party declared that its main aim would be to promote harmony between the Hindus and Muslim in India. The Krishak Praja party did well in the elections, but no party got a single majority. Although, he was forced to join Muslim League under the pressure of the situation. The lack of foresight of the Congress

leader on the one hand and the intrigues of some Bengal Muslim businessmen based in Calcutta pushed Him towards the Muslim League. It is true that the history of Bengal or India would have taken a different turn if the Congress had agreed to form the Cabinet on that day at Haq's call. He was widely accepted by both communities Hindu and Muslim. He ran the Government in 1941 along with Sarat Basu, Shyama prasad Mukherjee. The League's primary goal was to strengthen Muslim unity by appealing to Muslims' religious feelings. Even though there was openly expressed religious solidarity, Haq's religious appeal enabled for a regional particularity to triumph. Thus, he was able to oppose Jinnah and create political coalitions with people of different religious backgrounds without having to use secular nationalist rhetoric.[11] As the Haq-Mookerjee coalition fell apart; ethnic politics became more divisive in Bengal. He fought for the people of Bengal all his life. Kalipada Biswas has properly evaluated in his book 'Jukta Banglar Shesh Adhyay' about Fazlul Haq that He was the last Bengali representative of his era.[12] His involvement in the All-India Muslim League, the Krishak Praja Partyand his position as the Prime Minister of undivided Bengal, established him as a significant role in the fight for Bengali identity and self-governance. Haq's ideas and leadership remain a source of inspiration and relevance for individuals interested in comprehending the intricacies of Bengali nationalism.

References:

1. Rajmohan Gandhi, Eight Lives, New York, 1986, p. 189. 2
2. Sirajuddin Ahmed, Sher-e-Bangla, A.K. Fazlul Haq (in Bengali), Dhaka, 1997, p. 36.
3. Amalendu De, Pakistan Prastab O Fazlul Haq (in Bengali), Calcutta, 1989, p.1; see also, A.S.M. Abdur Rab, A.K. Fazlul Haq (Life and Achievements), Barisal, 1966, p. 17.
4. B.D. Habibullah, Shere Bangla (in Bengali), Barisal, 1374 (BS), p. 22.
5. J.H. Broomfield, Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal, California, 1968, pp. 114-15.
6. Bhabesh Roy 'Sher-e-Bangla Fajlul Haque' Swapna Nath Pub., second Edition 2004, p.38
7. Sirajul Islam, Fazlul Haq Speaks In Council, Dhaka: Bangladesh Itihas Samiti, 19761913-1916, p-48-54
8. Kamaluddin Hussain, 'Itihas Purush Shere Bangla,' in Shahjahan (ed.), Shere Bangla Juge Juge, 53-5
9. Jahanara Begum, 'The Bengal Legislature of 1937 And Its Characteristics.' Proceedings of the Indian History Congress 36 (1975) 485-8;

10. Amalendu Dey, ‘Islam in Modern India’, Maya Prakashan, Calcutta, 1982, p-146-147
11. Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims: The Politics of the United Province' Muslims, 1860-1923, London, 1974, p.121.
12. Kalipada Biswas, ‘Jukta Bangalar Shesh Adhaya’. Orient Book Company, Calcutta, 1966, Page-27.

Good Governance and Indian Democracy : Problems and Prospectus

Nepal Chandra Sarkar
Asst. Prof., Dept. of Political Science
Berhampore Girls' College

Abstract: This article is related to democracy and good governance in Indian context. It examines the nexus among the 'Democracy and Governance' using a contextual analysis of the Indian experience; but within a broader framework of South Asian democratization hurdles. It argues that whereas democratization, defined as the process of transition to a stable/consolidated democracy, could be a harbinger of development, with good governance as the link in the chain; much of it would however depend on its time-spell, depth and the context within which it is pursued. It is argued that the present state of democratization in India.. In the circumstance, we consider social mobilization in all its ramifications as a highly usefuland pivotal option.
Key Word: Governance, Mobilization, Democratization.

Introduction:

A state is a political institution that has sovereign jurisdiction within specific territorial borders and exercises authority through a set of permanent institutions including bureaucracy parliament judiciary and so on. The government is one of the key institutions of state and society. It is liable for ensuring equity throw appropriate policies and programs, regulating the activities of private sector as well. In this context the study of good governance has become very important in the study of political science.

Origien of the Concept of Governance and Good Governance:

The concept of “Good Governance” is a new term.It has joined prominence around the world in recent times specially in the sphere of public administration. In order to understand the concept of good governance we must be clear about the concept of "Governance". The concept of "Governance" is not new. It is as old as human civilization. Generally "Governance" means the process of decision making and the process by which decisions are implemented. Mention that the term governance can be used in several contexts such as corporate governance, smart governance, e-governance, local governance etc.

Governance becomes good when the decisions and actions of the government are based on people's centric. Thus good governance is concerned

with high quality in governance. In recent times the concept of good governance first emerged in the mid-1980s as governability with the emphasis on adherence to the rule of law following the collapse of the sovietunion and the end of cold war. In the 1992 report entitled "Governance and Development" the World Bank set out its definition of good governance. It defined good governance as the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development.

Subsequently in the 1998s world Bank's annual report Governance in Asia ; from crisis to opportunity, presented a more cogent concept of good governance. The report elaborates four components of good governance accountability, transparency, predictability and participation.

Differences Between Governance and Good Governance:

Basically governance implies the proper formulation and implementation of any kind of policies by government agencies within well defined legal framework. It also emphasizes on people getting the necessary information, for fostering openness in the system and ensuring accountability on the part of politicians and bureaucrats. Governance depends upon three pillars of the constitution, namely the executive branch, legislative branch and judiciary. The legislature formulates the laws, the executive implements the laws while the judiciary interprets the laws.

On other hand good governance implies enlightened citizenship as well as accountable and constitutional government. Good governance tries to improving the quality of life of citizens and enhancing the effectiveness and efficiency of administration. Good governance is related to the development of basic infrastructures like roads, bridges, transport etc. Creating new employment opportunities in the government and private sectors is considered as good governance. Basically good governance provides citizen centric services.It ensures accountability and transparecy in the governmental activities.

Features of Good Governance:

Good governance has 8 Major characteristics in modern times. Having understood the nature of good governance we shall discuss about the said features. Which are as follows :

1. People's Participation:

Peoples participation is considered to be the core element of good governance. Governments need to ensure the adequate freedom to the citizens to participate in the decision making process. Participation includes men and women vulnareble section of society, backward classes, minorities etc. Through participation people will able to influence the decisions and actions of those who are governing them. In Indian context for more peoples participation the 73rd and 74th constitutional

amendment have provided for Gram Sabha in everey panchayat and ward committee in every municipality respectively.

2. Accountability:

Accountability is an essential part of good governance. Not only governmental institutions but also the private sector must be accountable to the public and to the institutional stakeholders. In recent times we find instances of accountability of the government activities. During elections the electorates if they are not satisfied with the performance of elected representatives in their constituencies what them out of power. All these indicates the significance given to accountability in the governmental process.

3. Rule of Law:

Government requires a well drafted and fair legal framework impartially. This should be supported by appropriate law enforcement authority which ensure rule of law. In a democratic society rule of law protects the human rights. In this context government will follow rule of law to perform any kind of activities.

4. Transparency:

Transparency is another valuable feature of good governance. Administration in traditional sense functioned on the principle of secrecy. Now the scenario has been changed in terms of good governance. Transparency means that is decision taken and their enforcement are done as per rules and regulations. It also means information is freely available and accessible to all the citizens.

5. Equity:

Since the governance aims at seeking the participation of people in various development activities they need to promote equity. Good governance assures an equitable society. In a democratic society people should have opportunities to improve their maintain their well being.

6. Responsiveness:

The traditional governance mechanisms failed to bring all the stakeholders in their periphery. But recently, the emphasize is more on institutions being responsive to the needs of all those who are likely to be affected by their decisions.

7. Effectiveness and efficiency:

Good governance is characterized by effectiveness and efficient service delivery. The concept of efficiency in good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of the environment.

8. Consensus oriented:

Good governance must have arbitrary role of the different interest in society to reach a broad consensus in society. Consensus oriented decision making ensures

that even if everyone does not achieve what they want to the fullest, a common minimum can be achieved by everyone.

Good Governance in ancient India:

The idea of Good Governance is as old as Indian civilization. The concept of good governance can be found in our ancient Indian writings. First we start to trace root of good governnce in our oldest scriptures of Rig-Veda. The Rig Veda States – "Atmano mokshartham jagat hitayacha" i.e. the dual purposes of our life are emancipation of the should and welfare of the world. Thus, the public good should be the welfare of the society ; or in other words, the private good or self-promotion should be subservient to the greatest good of all.

Manusmriti holds a position of pre-eminence in the Hindu literature. It is the oldest and well-known Smriti. Manusmriti (7.3) says that without a proper ruler, the anarchy will result in citizens living in fear and thus kinship was instituted for the protection of the subjects.

Now we come to the holy Ramayana. The Ramayana very succinctly talks about Ram-Rajya or ideal governance and offers essentials of the crucial art of leadership, for instance the second chapter, the Ayodhya Kanda. It is a real treatise on the issues related to good governance. Lord Ram advise his younger brother Bharat, that how to manage the kingdom. It will appear to be a great lesson on effective management practices The critical factor in good governance is the quality of ministers. Lord Rama advises his brother Bharat on how to take effective decisions.

Another important scripture of good governance in ancient India is Mahabharat. Mahabharat deals with the rulers responsibilty which bound by dharma. Popularly called "Rajadharma" which precisely meant for ensuring good governance to the people. Even though monarchy prevailed, there was no place for any theory of the divine rights of the kings or of arbitrary rule. Raj Dharma was the code of conduct or the rule of law that was superior to the will be of the ruler and governed all his actions. This description of Good Governance found in ancient Indian scriptures, can be the Jataka tales, Shanti Parva-Anushasanparva of Mahabharat, Shukarcharyas's Nitisar, Panini's Ashtadhyayi, Aitreya Brahmana, Valmiki's Ramayana.

Shanti parva of Mahabharat has devoted considerable space to Raj Dharma which aims to establish Good governance in the society. It stressed that, it is duty of the king to seek and promote the welfare of its subjects. The kind must be compassionate to the people of all section of society and concentrate on the welfare of the people. The first, Rajadharmanushasana Parva is most important because it is totally devoted to the art of governance. This Parva deals

with the duties of four varnas, the history of sovereignty, the superiority of truth to false-hood and the duties of the king.

Kautilya´s Arthashastra is another crucial scripture of good governance. Arthashastra while highlighting the principal of good governance declares, “In the happiness of his people lies king’s happiness, in their welfare his welfare, whatever pleases himself he shall not consider as good, but whatsoever please his people he shall consider as good.”

So in Indian scriptures Good Governance is called Raj Dharma, i.e., righteous duty of the king. It means those who are involved in governance must adhere to righteousness and do justice to the public. It has inseparable link to social welfare and inclusive development. Absence of good governance has been identified as the root cause of many of the deficiencies in society.

Major initiatives of Good Governance in India:

After independence, several steps we were taken by the government of India for promotion of welfare state and catering to the needs of the citizens. Planning was resorted to as an instrument of development to achieve the socio- economic objectives. India's governance structure and mechanism had been designed and reformed from time to time to meet the over all welfare goals and objectives. Recently major initiatives have been taken up in India for empowering common man and effective functioning of governance which include are as follows :

Citizen's Charter:

Maximum people of India are unaware of the various types of services, procedures, mechanism of lodging complaints and grievances if they are not satisfied with the services. To facilitate this the government has introduced the concept of citizen's charter. Citizen charters provides information to the citizens on various aspects.

Right to Information Act:

Right to information act marks a significant shift in Indian democracy. The central government has enacted The right to information act in 2005. Several state governments such as Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh have also passed the Act. This act gives greater access of the citizen to the information which in turn improves the responsiveness of the government to community needs. Through this act citizen can approach any ministry, department or any government organisation for getting the required information except certain types of information which are related to national defence or security.

E-governance:

E-governance is the application of ICT for delivering government services, exchange of information, communication transactions, integration of various stand alone systems. E-governance increase citizen's participation in decision

making process and make government more accountable, transparent and efficient. Today electricity, water, phone and all kinds of bills can be paid over the internet. All are dependent on internet and when citizens depends on government internet services all that come is e-governance. So in essence, e-governance has a direct impact on it citizens who derive benefits through direct transactions with the service offered by the government.

Police Reforms:

Police reforms is the result of good governance in India. Modernising police forces and implementing the model police act of 2015. Through this act FIR lodging mechanism has been changed including introducing filing e FIR for minor offences. To prevent any kind of offence launched a common nationwide emergency number.

NITI Aayog:

After independence Central Government of India was set up a planning commission. But centralised planning commission was abolished in 2015 replacing it with that new think tank called the National Institution for Transforming India namely NITI Aayog. Mention that when during 1990s World Bank raised the issue of governance, this immediately, became an issue of concern in India. The document of the Ninth Five Year Plan (1997-2002) released in April 1999 included a Chapter on "Implementation, delivery Mechanism and institutional development." In this chapter a review had been done on implementation of fiveyear plans in India with a view to identify weak spots in the formulation and implementation of plan programmes to find solution to the weaknesses. The issue of decentralization in development planning, accountability of the implementing agencies and monitoring and evaluation of programmes were raised.

the Eleventh Five years plan (2007-2012) highlighted the following featurres of Good Governance in India.

- As a democratic country, a central feature of good governance is the Constitutionally protected right to elect government at various levels in a fair manner, with effective participation by all sections of the population.
- basic requirement for the legitimacy of the government and its responsibility to the electorate.
- The government at all levels must be accountable and transparent. Closely related to accountability is the need to eliminate corruption, which is widely seen as a major deficiency in governance. Transparency is also critical, both to ensure accountability, and also to enable genuine participation.

- The government must be effective and efficient in delivering social and economic public services which are its primary responsibilities.
- Governments at lower levels can only function efficiently if they are empowered to do so. This is particularly relevant for the Panchayati Raj Institutions (PRIs) which currently suffer from inadequate devolution of funds as well as functionaries to carry out the functions constitutionally assigned to them.
- Finally, the entire system must function in a manner which is seen to be fair and inclusive. Disadvantaged groups, especially the SCs, STs, minorities and others, must feel they have an equal stake and should perceive and adequate flow of benefits to ensure the legitimacy of the State.

The twelfth five year plan (2012-2017) defines good governance as an essential element of any well-functioning society. It ensures effective use of resources and deliverance of services to citizens and also provides social legitimacy to the system.

Challenges of Good Governance in India:

Good governance as we have discussed plays an important role in the current administrative scenario. In a developing country like India the concept of good governance is facing some problems and challenges. There are a number of factors responsible for the failure to achieve the desired ends. These factors are as follows :

Corruption:

Corruption has virtually spread in almost all aspects of public life. Corruption is relatively inherent. According to Transparency International report India is the 85 least corrupt nation out of 180 countries. A major form of corruption is direct theft of government funds from development programmes such as irrigation and roads, from social and anti-proverty programmes, from publicly funded loans to the poor, and the diversion of price-controlled goods, that are in short supply, for sales at higher market rates. These involve both bureaucratic and political corruption and overlap with cultivating electoral constituencies. This form of corruption, that is, direct embezzlement of government funds and materials, takes place down to the village-level.

Criminalization of politics:

The nexus of crime and politics is so strong in India that the common citizens of the country have no stand to say or exert their rights. In order to prevent such misuses on May, 2, 2002, the Supreme Court of India has given a historic judgement following the public interest litigation (PIL) led by an NGO that, every candidate contesting an election to Parliament, State Legislatures or

Municipal Corporations has to give true declarations of candidate's educational qualifications, criminal charges and financial records. But regretting that according to the Association of Democratic Reforms 43 percentage of members of parliaments of lok Sabha in 2019 are facing criminal charges. It is 26% increase as compared to 2014.

Growing incidence of violence:

Growing incidence of violence considered as hindrance of social integrity among the citizens in India. Restoring to illegal force and violence are considered to be a law and order problem. But when one looks at it from the point of view of the principles of good governance it becomes clear that peace and order is the first step to development. Strikes, riots, terror attacks are considered as harmful elements of the society.

Deffered Justice:

A citizen has the right to avail timely justice but in India there are several factors because of that a common man does not get timely justice. It is considered as challenge of good governance.

Possible Solutions:

The effective functioning of governance is the prime concern of every citizen of the country. While there is no magic pill to cure said hindrances and corruption also. In this regard it is necessary to reform the existing laws which can be considered as possible solutions for the successfull of good governance in India.

1. For the smooth functioning of good governance in India there is a need to develop good practices and producers of parliamentary functioning and make parliament a dynamic institution.
2. In Indian context it is necessary to develop a responsive civil service machinery that is professional, efficient, impartial and caters to peoples needs.
3. To get the effective result of good governance educating the citizens about their constitutional rights and duties. This can be ensured by making them partners in all governmental activities.
4. Government should be given importance on economic development of the country. Besides these good governance has to pay attention to several serious issues in political economic and civil spheres.
5. To ensure good governance in India it is necessary to stop nexus between political executive and criminals.
6. The laws which protect politicians and bureaucrats from prosecution for misuse of power should be abolished. An individual citizen should be able to initiate legal action to prosecute officials for misuse of power, something

that exists in several democracies. The Right to Information (RTI) Act is an important step.

7. The role of the media and NGOs in exposing misuse of power is vital and they must be legally protected as well as enabled when carrying out investigative journalism or exposing the misuse of power.

Reference:

1. Surendra, Munshi, Good Governance, Democratic Societies and Globalization, Sage Publications, New Delhi 2000, p. 15
2. Subhash C.Kashyap, Concept of Good Governance and Kautilya's Arthashastra, in G Hood Governance ; Stimuli and Strategies, (ed) Rajiv Sharma, Ramesh K. Arora, Aalekh Publishers, Jaipur, 2010.p.31
3. Arthashastra, Book 1, Chapter XIX, p.39
4. Planning Commission, Government of India, Tenth Five year Plan (2002-2007) Vol-1.p 177
5. Planning Commission, Government of India, Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Faster, More Inclusive and sustainable Growth, Vol. -1, 2013, p. 286.

Ethical Recognition of Motherhood : Revisiting Feminist Ethics in the light of Buddhist Philosophy

Ria Mondal
Research Scholar, Dept. of Philosophy
University of Gour Banga, Malda

Abstract: This paper entitled as 'Ethical Recognition of Motherhood : Revisiting Feminist Ethics in the light of Buddhist Philosophy' aims to show the necessity of the concept of 'otherness' that also emphasizes the concept of 'motherhood' recollecting the values of Buddhist tradition. Feminist ethics and Buddhist ethics both tradition encourages the practice of mothering. Buddhist theory of eight fold path, concept of Nirvāṇa, pragmatic aspects of Brahmavihārā all are directly associated with the model of 'self-other' construction. A mother's compassion to her children is genuine in all aspects of its relationship. Cultivation of this mothering in the respect of feminist philosophy is new. Though the classic Buddhist texts are not directly focused on the concept of mothering. But all ancient texts have their own philosophical exploration. Depending on that exploration or analysis, this paper seeks to formulate a comprehensive feminist ethics of care that is intrinsic in the nature of Buddhist ethics.

Proponents of feminist care ethics, including Carol Gilligan and Nel Noddings stress that, traditional moral theories, principles, practices and policies are deficient to the degree they lack, ignore, trivialize or demean values and virtues culturally associated with women. Gilligan offers her work as a critique of the Freudian notion that men are morally well-developed, women are not. In Buddhist philosophy every person irrespective of gender has the equal rights. Feminist philosophy is traditionally regarded as political and a gender-biased understanding of oppression. We can resolve this gap in the light of Buddhism and also find out the core problems of feminist ethics. Highlighting motherhood could be the best position to show compassion to the vulnerable being of the society. In this way, re-evaluation of feminist philosophy will be possible that reconnects ethical notion of feminism with Buddhism.

Keywords: Mothering and Motherhood, Buddhist Ethics, Feminist Ethics.

Introduction:

A new metaphysical world is hidden in the philosophy of enlightenment that is also considered as the bedrock of Buddhist philosophy. Philosophical analysis of all Indian schools starts with metaphysical contents. Though for Buddhist philosophy, the tenets of metaphysics are not directly related with their interpretations, but the Buddhist texts, sūttas, nikāyas and some other sources vehemently support the great saying Ātmanamviddhi. In spite of the relations between all Indian philosophical theories it should be remembered that the vedāntic views are more closure to the concept of Ātman than the Buddhists approach to the concept of Buddhahood. The objective to attain Buddhahood is not associated with the emancipation of soul or the realisation of the soul. Developing Buddhahood is realistic in nature as it paves the way to know the root of all misery of death and decay. The means and ends of Buddhist philosophy are not the same with Upaniṣads. The path of enlightenment, Buddhahood, concept of nāmarūpa, the Noble Eight-fold path emphasizes the affirmative response of building consciousness. The Ātman is its naturalistic sense is specified with the "five khandhas together or anyone of them" (Dasgupta, A History of Indian Phiosophy , 2018). We can also explain the importance of 'soul' as the creation of 'self-hood' of an individual. In the Saṃyutta Nikāya we find that the Buddha says, "O Bhikkus it is called rūpam because it manifests (rūpayati); how does it manifest? It manifests as cold, and as heat, as hunger and as thirst, it manifests as the touch of gnats, mosquitoes, wind, the sun and the snake; it manifests, therefore it is called rūpā (Saṃyukta Nikāya, III.86.).

From the passage above it is very clear that the concept of rūpa is also explained as the identification of the sense-data and its appearance in the physical world. Individual beings are eager to know the world through their perception that reveals their individuality. This construction of individuality is not self motivated. The relationship between 'self' and 'other' is also necessary. Here 'I' is not defined as 'I am'. Upholding Saṃyutta Nikāya it is referred, "When one says 'I', what he does is that he refers either to all the khandhas combined or anyone of them and deludes himself that was 'I'. Just as one could not say that the fragrance of the lotus belonged to petals, the colour or the pollen, so one could not say that the rūpa was 'I' or that the vedanā was 'I' or any of other khandhas was 'I'. There is nowhere to be found in the khandhas 'I am (Saṃyukta Nikāya, III.130.)'."

Our nature is intertwined with the desires (taṇhā jatā), and the only one way of loosening these desires, is the practice of right discipline (sīla), concentration (samādhi) and wisdom (paññā) (Dasgupta, A History Of Indian

Philoslophy, 2018). With practising sīla one can attain 'sainthood', viz., the sotāpannabhāva and the sakadāgāmibhāva. These two stages are fundamental to redeem the inner power for practising wisdom at the time of incompatibilities with the values. This is the right way to cultivate morality. The moral cultivation of Buddhist ethics is established with its own epistemic and metaphysical verse that simultaneously supports feministic ethical approach of practising morality constructing the idea of 'Mothering' or 'Motherhood'. Buddhist ethic of compassion and feminist ethic of care have similar philosophical ideas in the margin of moral cultivation. Though feminist concept of mothering or motherhood is not directly related with the spiritual practice of Buddhism. But "in the tantric system of Buddhism as practical in Tibet, ideas of mothering are central to spiritual practice, and in order to progress in meditation one must gain a direct, intuitive understanding of the practices of mothering on both personal and universal levels" (Curtin, Jan.1994). This process of meditation encourages the model of creating motherhood or the cultural practice of mothering that is found in the literature, Great Exposition of the Stages of the Path written by Tsong Kha Pa. In the following sections this study will be focused on the fundamental concepts of feminist ethics relating motherhood with its critical appraisal. Then some possible arguments will be stated to support the hypothesis that the cultural concept of mothering should be emerged in every corner of our society.

Epistemological Importance of Motherhood

Motherhood and mothering both are natural construction that highlights feminine culture in our society. It advances the notion of empathy to conceive a world view of equality. Some feminist researchers propose that the nature of motherhood was historically, socially, politically, and philosophically constructed. Though some feminists are the opponent of the concept of motherhood as they reject the notion of a fixed category of "woman", "postmodern and poststructuralist approaches also reject that "mother" is a fixed category" (Neyer & Bernardi). For them, mothering is an equal identity like other acquiring identities of women. Following Rich's distinction, O'Reilly divides motherhood studies into three categories, motherhood as institution, motherhood as experience and motherhood as identity or subjectivity. It is quite evident that, "scholars concerned with the ideology or institution investigate policies, laws, ideologies, and images of patriarchal motherhood; researchers interested in experience examine the work women do as mothers. The third category, identity or subjectivity, looks at how female's sense of self is shaped by the institution of motherhood and the experiencing of mothering. A fourth category, agency, discuss the extent to which mothering can be a site of

empowerment and political activism" (Jiao). This categorisation support mothering or motherhood as a social and cultural practice that should be engaged in any profession. Judith Butler expounds motherhood as performative that defines the cultural existence of mothers and their activity of mothering. Historian Ellen Ross also illustrates that viewing mothers as performative subjects means "learning about the details of their daily material work; about the quality of their feelings for their children; about changes mothering brings in relations with jobs, men, friends and lovers; about the public activities and political positions stimulated by women's experiences as caretakers of children.....Without full recognition of the phenomenology of mothering the ability of feminist scholarship to comprehend the scope of women's lives today is much diminished" (Ross, winter 1995). Women's agency is formed with the qualities of 'care' for children. Mothering is not the activity of raising one's self-consciousness. It plays a determinative role to shift their position from domestic to the society. If someone feel suspicious about the biological determination of the body-consciousness as only the biological responsible mother, then the arguments could be shown to explain motherhood as "culturally gendered performativity" (Oh, Winter 2009). Motherhood acknowledges both performativity and biology.

The passages above graphically describe the concept of 'care' is not only established with the cultivating the mothering culture but it has immense capacity to build a theory, a theory of 'kindness' or 'compassion' that seeks another definition in Buddhist culture. Valuing others constitutes a method of meditative practice through which one can form seven stages that refer "seven-point-cause-effect method" (Powers & Curtin, Mothering: Moral Cultivation in Buddhist and Feminist Ethics, 1994). These seven stages are characterised as, 1. Understanding that all sentient beings have been one's mother; 2. Do not forget their kindness; 3. Reframe a state where one can repay their kindness; 4. 'Love' refers mutual happiness of all beings; 5. 'Compassion' that states everyone's emancipation from suffering and wishing to find the causes of suffering; 6. Constitute an attitude for taking the vow to bring peace through the establishment of Buddhahood; 7. 'The mind of enlightenment' that refers resolving to attain enlightenment for the sake of all sentient beings (Hopkins, 1993) (Sopa & Hopkins, 1989). Through this practice the mediator realizes the past actions whatever one did as a murderer or torturer and also try to reduce their aggressive attitude. In addition, one also realizes that "every other being has been her own mother and that just as her own mother was almost unimaginably kind, so every other being has been just as kind and has given birth, cared for and nurtured her, loved her selflessly and without qualification and has forgone

her own happiness for that of her children" (Powers & Curtin, Mothering: Moral Cultivation in Buddhist and Feminist Ethics, 1994).

The analysis of Tsong Kha Pa's approach pinpoints all the problems related interpersonal, interracial, intersexual and international relationships. The relevance of this method also verifies the concept of Brahamavihāra, the fourfold meditation of mettā, karunā, muditā and upekkhā. This category specifies the four kind of habit of human nature which uses as cultural benefit. Those qualities are 'universal friendship', 'universal pity', 'happiness in the prosperity of all' and 'indifference to any kind of activity relating with preference of oneself, friend, enemy or a third party' (Dasgupta, A History of Indian Philosophy, 2018). Tsong Kha Pa's model provides a mutual friendship, togetherness and also marks the way to envision others as loving and lovable.

Developing Motherhood as Care

It has already mentioned before that feminist moral theory and the practice of mothering are interrelated. Feminists explore many ways to define women's moral experience moving away from traditional theories toward contexualist accounts based on friendship, trust and caring. Proponents of feminist care ethics, including Carol Gilligan and Nel Noddings stress that traditional moral theories, principles, practices and policies are deficient to the degree they lack, ignore, trivialize, or demean values and virtues culturally associated with women. Gilligan offers her work as a critique of the Freudian notion that whereas men are morally well-developed, women are not. Freud attributed women'ssupposed moral inferiority to girls' psychosexual development. According to Gilligan, Freud is simply one of many traditional thinkers who have viewed women as morally inferior to men. She singles out educational psychologist Lawrence Kohlberg for extended criticism. Kohlberg claimed that moral development is a six-stage process. Stage one is the "punishment and obedience orientation". To avoid the pain of punishment and/or to receive the pleasure of a reward, children do as they are told. Stage two is "the instrumental relativist orientation". Based on the notion of reciprocity- scratch my back and I will scratch yours- children meet others' needs only if others meet their needs. Stage three is the "good boy-nice girl" orientation. Adolescents adhere to prevailing norms to secure others' approval and love. Stage four is the "Law and order orientation". Adolescents develop a sense of duty, defer to authority figures, and maintain the social order to secure others' admiration and respect. Stage five is the "social-contract legalistic orientation". Adults adopt a utilitarian moral point of view according to which individuals may do as they please, provided they do not harm other people. Stage six is the "the universal ethical principal orientation". Adults adopt a Kantian moral perspective that transcends

all conventional moralities. Adults are no longer ruled by self-interest, the opinion of others, or the fear of punishment, but by self-imposed universal principles (Kohlberg, 1971). Although Gilligan concedes that Kohlberg's moral ladder appeals to many people schooled in traditional ethics, she points out that wide acceptance of a moral development theory is not necessarily the measure of its truth. She asks whether Kohlberg's six stages of moral development are indeed universal, invariant and hierarchical. Gilligan believes that Kohlberg's methodology is male-biased.

Women's moral personhood dignifies contextual decision making and presence of diverse interests. Their procedure of thinking supports relational and contextual attitude not as autonomous. Here the ethics of care based on women's moral personhood tries to devalue the objective, impartial, abstract domain of "truths". Feminist philosophy in its ethical domain seeks the way to expose the biases of "unbiased" philosophy so that it can create a comprehensive theory to resolve the matters for debate. Thus illustrating a new dimension some feminist philosophers declares mothering as a transformative idea throughout in our society. There are three demanding issue relating with mothering – preservation, growth and social acceptability. Defining Sara Ruddick's argument that mothering is inherently a social practice that makes our world more engaging where children can be preserved nurtured and trained (Ruddick). This direction has already been cultivated in Buddhism, especially in traditional Buddhism. Through this practice, one can increase social awareness that discards the traditional distinction between personal cultivation and social action. This kind of orientation contributes the same stage in the field of feminist philosophy with a special reference on uplifting the interplay between the concept of personal cultivation and social action. The Buddhist meditative practice presents an alternative existence of being based on ethic of care that refuses to objectify other. To realizeone in relation to other beings help to train the mind and body to value the others. Moral cultivation of Buddhist ethical virtue supports the concept of 'care' as a virtue that develops feminine spirituality, feminine qualities and feminine values for personal and social development.

Conclusion:

The goal of this paper is to revisit feminist ethical standpoints through the Buddhist path-breaking ethical notions. Also, this paper seeks the way to analyze the concept of 'motherhood' in different perspective that adds value to the activity of mothering as moral cultivation. Sara Ruddick's discussion of mothering and meditative practice outlined by Tsong Kha Pa provide the enormous thought provoking paradigms that brings a transformation of human

beings for their self-development and enlarges their self-efficacy to build an engaging society at large.

Notes & References

1. (2018). In S. Dasgupta, *A History Of Indian Philoslophy.* New Delhi: Rupa Pubicatilons India Pvt.
2. Curtin, J. P. (Jan.1994). Mothering: Moral Cultivation in Buddhist Ethics. *Philosophy East West , 44*, 1.
3. Dasgupta, S. (2018). *A History of Indian Philosophy* (Vol. 1). New Delhi: Rupa Pubication Pvt.Ltd.
4. Dasgupta, S. (2018). *A History of Indian Phiosophy* . New Delhi: Rupa Publication pvt.Ltd.
5. Hopkins, J. (1993). *Compassion in Tibetan Buddhism.* London.
6. Jiao, M. Mothering and Motherhood: Experience, Ideoogy and Agency. *Comparative Literature Studies , 56*, 542.
7. Kohlberg, L. (1971). "From Is to Ought: How to Commit the Naturaistic Fallacy and Get Away with It in the Study of Mora Development". In *Cognitive Development and Epistemology.*
8. Lam rim Chen mo. (n.d.). 559.3.
9. Neyer, G., & Bernardi, L. Feminist Perspectives on Motherhood and Reproduction. *Historical Social Research , 36*, 167.
10. Oh, I. (Winter 2009). The performativity of Motherhood: Embodying Theory and Political Agency. *The Society of Christian Ethics , 29*, 14.
11. Powers, J., & Curtin, D. (1994). Mothering: Moral Cultivation in Buddhist and Feminist Ethics. *Phiosophy East West , 44*, 1.
12. Powers, J., & Curtin, D. (1994). Mothering: Moral Cultivation in Buddhist and Feminist Ethics. *Philosophy East West , 44*, 3.
13. Ross, E. (winter 1995). "New Thoughts on 'the Oldest Vacation', Mothers and Motherhood in Recent Feminist Schoarship". 398-399.
14. Ruddick, S. Maternal Thinking.
15. *Saṃyukta Nikāya, III.130.*
16. *Saṃyukta Nikāya, III.86.*
17. Sopa, L., & Hopkins, J. (1989). Cutting Through Appearances. 81-94.

Holi a Dalit Festival : An Untold Story of Protest

Shatrughan Kahar
Assistant Professor, Dept. of History
Debra Thana S. K. S. Mahavidyalaya (Autonomous)

Abstract: Social festivals in India have historically served as more than just religious observances or celebrations of joy; they have functioned as subtle yet powerful forms of protest against the socio-economic, political, and cultural status quo. From the Mughal period to British colonial rule, these festivals provided a platform for expressing resistance and uniting people across social divides. Figures such as Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lokmanya Bal Gangadhar Tilak recognized the potential of festivals like Ganesh Chaturthi to foster national unity and resist colonial oppression. Similarly, the transformation of Durga Puja and the evolution of Holi from caste-based celebrations to inclusive festivals reflect the changing dynamics of social resistance and cultural democratization in India. This paper explores how these social festivals not only shaped the national consciousness but also acted as agents of change, challenging caste discrimination, colonial rule, and elite dominance, ultimately paving the way for a more inclusive and unified society.
Keywords: Holi, Festival, Social, Dalit, Protest.

Introduction:

In India, social festivals are not merely a way of observing religious customs or celebrating joy; they often carry a subtle voice of protest against the established socio-economic, political, and cultural order. Numerous instances of this can be traced back to the Mughal period. It is believed that to safeguard Hindu culture during Mughal rule, Chhatrapati Shivaji Maharaj, a remarkable leader of the Hindu hierarchy, initiated the celebration of Ganesh Chaturthi in Pune with the approval of Mata Jijabai. Over time, the festival was embraced by the Peshwas and gradually evolved into a widespread tradition.[1]

During British rule, most Hindu festivals faced certain restrictions, albeit limited. The British government sought to downplay the First War of Independence in 1857 by labelling it as merely a 'Gadar' or military revolt. However, beneath this narrative lay a deep-seated fear that Hindu society might once again unite and rise against colonial rule.

Lokmanya Bal Gangadhar Tilak keenly understood the power of festivals in fostering unity. He viewed them not just as religious observances but as potent tools for awakening national consciousness and mobilizing society. While the British administration imposed strict restrictions on political and communal gatherings, religious festivals remained relatively free from such controls. Recognizing this as an opportunity, Tilak transformed Ganesh Utsav into a platform for both religious devotion and the cultivation of social and national awareness.

He urged people to celebrate Ganesh Chaturthi in every household, leading to its widespread acceptance. Community Ganesh Mandals began organizing programs infused with nationalist sentiments, grounded in religious and scriptural themes. These gatherings facilitated increased social interactions under the guise of festivities, fostering a spirit of unity and cooperation. Over time, this collective engagement nurtured the idea of freedom from British rule, gradually inspiring organized efforts to expel the colonial regime from the country.[2]

In 1905, fearing the growing nationalist spirit in Bengal, the British government attempted to divide and weaken it through the partition of Bengal. However, this move ignited a powerful anti-partition movement that swept across the region. In response, Rabindranath Tagore chose the festival of Raksha Bandhan as a means to unite Bengalis—Hindus and Muslims alike—against this divisive policy.[3]

Just as many such festivals have played a role in strengthening Indian nationalism against foreign rule, several social festivals have also emerged as expressions of protest against caste discrimination, social and economic inequality, and untouchability. A significant example from Bengal's socio-economic history is the transformation of Durga Puja from a zamindar-controlled event to the community-led "Barowari Pujo," symbolizing the assertion of common people's rights over religious and cultural spaces.

In the 18th century, zamindars restricted commoners from participating in their household Durga Pujas, reinforcing class-based exclusion. A turning point came in Guptipara, Hooghly, where twelve men, denied entry to a zamindar’s puja, decided to organize their own community worship—thus marking the birth of Barowari Pujo. Over time, this movement gained momentum, challenging the monopoly of the elite over religious festivities.

By 1910, the Bhawanipur Sanatan Dharmatsahini Sabha in Kolkata further advanced this cause, promoting inclusivity and breaking the zamindar-

bari dominance. The spirit of community participation continued to grow, leading to the establishment of major Barowari Pujas across Kolkata.

Today, Barowari Pujo stands as a widespread tradition, symbolizing the victory of collective community participation over elite exclusivity. The shift from zamindar-centric worship to a people's festival reflects the broader democratization of cultural and religious spaces in Bengal. However, over time, these festivals have gradually transcended caste and socio-economic barriers, evolving into universally recognized social celebrations. One such example is Holi, which, despite its historical and religious origins, has become a festival that fosters unity and inclusivity across different sections of society.[4]

In this context, Vishwakarma Puja deserves particular mention. The male deity Vishwakarma is traditionally revered as the god of machinery. Interestingly, jute factories in Bengal did not initially include Vishwakarma idols in their worship practices. However, from the mid-20th century onwards, Vishwakarma Puja began to be celebrated with considerable pomp and ceremony across factories of all sizes. Workers, regardless of whether they were Bengali or non-Bengali, embraced the festival as their own.

This puja drew from dual cultural roots: the Bhadra Sankranti and Arandhan rituals of rural Bengal, and the Hatiyar Puja of rural North India, in which agricultural tools and machinery were venerated. Eventually, Vishwakarma Puja became a fixture in all jute mills of Bengal. Each department within a factory organized its own separate puja, a practice that reflected and perhaps reinforced internal divisions among the workers. Typically, the responsibility for organizing the event rested with the line leaders, whose authority was often intertwined with the festival itself. Despite these divisions, the puja also served to momentarily bridge the deep divide between factory owners and the working class. On this occasion, all workers—irrespective of religion—were expected to contribute a fixed amount for the organization of the celebration. The departments were lavishly decorated with flowers and other festive materials. Over time, workers came to see Vishwakarma Puja as a cultural expression rooted in their own lived experiences. It emerged as an alternative to elite-dominated festivals like Durga Puja and the more formal observances of International Labour Day on May 1st. Through Vishwakarma Puja, workers asserted their class identity and cultural autonomy.

As historian Dipesh Chakrabarty observes, "The Vishwakarma Puja festival may be contextualised in the broader concept of autonomous working-class culture, the culture not based on economic determinism propounded by the

Marxists, but a human consideration, created in workers' own psyche based on multifarious pulls and pushes."[5]

In this context, Professor Nirban Basu's observation is also worth noting. According to him, "Religiosity, festivity, and the assertion of class identity converge through the experience of migration—living far from one's native village—by embracing local deities with devotion, worshipping them, and organizing public rituals with great pomp and ceremony."[6]

Main Discussion

Holi, one of the major Hindu festivals known as the Festival of Colours, celebrates the divine love of Radha and Krishna and the triumph of good over evil, symbolized by Vishnu's incarnation as Narasimha defeating the demon Hiranyakashipu. It marks the arrival of spring, the end of winter, and the hope for a good harvest. Celebrated widely across the Indian subcontinent and by the diaspora globally, Holi begins on the full moon day of Phalguna (mid-March) and lasts for a night and a day. Across North India, it is known by different names and associated with varied traditions: in Bengal and Odisha, it is celebrated as Doljatra, commemorating the birth of Mahaprabhu Chaitanyadev; in other regions, it highlights the devotion of Prahlad to Lord Narayana. The playful love of Radha and Krishna remains central, while stories of Kama and Rati are also invoked. Holi begins on the full moon day of Phalguna (mid-March) and lasts for a night and a day. In Bhojpuri-speaking areas, it is called Phagua,[7] but among Bengal's working-class communities, the name Holi is more common.

Although today Holi is celebrated with immense enthusiasm across all communities—regardless of caste, religion, or language—it was once primarily a festival of the Dalits. Originally free from Brahminical control, Holi was considered a celebration of the lower castes, existing outside the mainstream of Hindu religious practices. As a Bhojpuri folk saying goes:

"Bāhmaṇa kēr akchhābandhana, chatarīa kē dasaharā.
Baisa kē dē'ōẏālī, ā nīchana kē hōli."[8]

In other words, Rakhi Purnima is celebrated by Brahmins, Vijayadashami by Kshatriyas, Diwali by Vaishyas, and the Holi festival by the lower castes. While today, in many parts of North India, sisters or *didis* tie Rakhi on the hands of their brothers, this custom was once exclusively performed by Brahmins, who were part of the upper class of society. Vijayadashami commemorates the day when Lord Rama killed Ravana and triumphed in battle, making it a day of special respect for Kshatriyas. Diwali, primarily a festival

dedicated to the worship of Lakshmi, is particularly significant for the Vaishyas, who are mostly engaged in business and commerce. On the other hand, the Holi festival has historically been associated with the Dalits.

Historically, Holi's significance as a Dalit festival is also reflected in its cultural practices. For example, in regions like Bihar, Uttar Pradesh, and Bengal, the celebration of Holi was tied to local traditions that were distinctly separate from upper-caste customs. Unlike Diwali or Dasahara, festivals that were primarily celebrated by upper-caste communities,[9] Holi was primarily a festival of the oppressed, a direct challenge to the notion that religious practices were the domain of the higher castes alone.

There are several reasons why Holi can be considered a festival of the Dalits. First, similar to *Chhat Puja*, Brahmins have no significant role in this festival. In the Chatkal-dominated regions of Bihar, Uttar Pradesh, and Bengal, Holi is celebrated the day after Dol Yatra, reflecting a distinct local tradition.

Secondly, a popular myth associated with Holi revolves around Lord Krishna's complexion. According to legend, Krishna's skin turned dark after he was poisoned by the milk of Putana during infancy. As he grew older and fell in love with Radha, he became anxious that his dark complexion might lead to rejection. Noticing his distress, his mother suggested that he ask Radha to colour his face with a shade of her choosing. Krishna followed her advice, and from that moment, their love flourished. While Brahminical Hindu norms often reject romantic relationships between unmarried/married young men and women, Holi provides a socially accepted space where such love—otherwise deemed illicit—is expressed freely under the playful cover of colors.

This story highlights two significant aspects: first, the celebrated love between Radha and Krishna, and second, the underlying caste discrimination woven into the festival's history. Krishna's dark skin symbolizes a marginalized section of society, a notion that persists today. For instance, a Dalit or tribal person with fair skin is often told, "You don't look like a tribal person,"[10] exposing the enduring caste bias. Historically, Holi has been especially popular among darker-skinned, non-Aryan communities, who were often deemed untouchables due to their complexion. Through this festival, these communities assert their demand for equality and social recognition.

The mythological narrative of Krishna's complexion—his dark skin marking him as an outsider—mirrors the lived experiences of Dalits, who have long been stigmatized for their appearance. While the love story of Krishna and Radha symbolizes unity beyond boundaries, it also subtly challenges caste

prejudices that have shaped Indian society. Krishna's dark complexion, representing the marginalized, stands as a powerful defiance against casteist ideologies deeply ingrained in the social fabric.

Thirdly, Holi is unique among Hindu festivals in that it does not involve traditional puja rituals. While ancestors may be remembered, there are no strict customs or religious observances, reinforcing its non-Aryan origins. Historically associated with the lower castes, Holi exemplifies the transformative role of social festivals. Unlike most Hindu celebrations, which have been dominated by Brahmins, the priestly class, Holi found its roots in communities traditionally marginalized by caste distinctions. This departure from mainstream religious practices underscores the festival's role as a celebration of defiance.

Dalit communities, in particular, embraced Holi as a means of asserting their demand for social inclusion and equality. Despite facing exclusion due to their caste status and skin colour, they used the festival as a space to challenge hierarchical norms. Holi's absence of rigid Brahminical rituals further highlights its subversive nature. Unlike other festivals where caste-based restrictions dictate participation, Holi is celebrated with a spirit of inclusivity, breaking down social barriers.[11] For Dalits, who were often excluded from religious ceremonies, Holi became an opportunity to celebrate openly and, in doing so, resist caste-based oppression. More than just a festival of colours and revelry, Holi carries an underlying assertion of social justice and recognition.

Fourthly, Holi is a festival of enjoyment and indulgence. People prepare various foods in every household, such as luchi, poya-pitha, kheer, and even non-vegetarian dishes. Alongside these, bhang, domestic and foreign liquor, and other intoxicants are commonly consumed.[12] The caste system, which traditionally separates the pure from the impure, naturally excludes this celebration from the mainstream Hindu practices.

Fifthly, Holi sees significant participation from the Muslim community as well, underscoring the festival's inclusive, multi-dimensional character. This broad participation further reflects Holi's role as a celebration that transcends religious and social boundaries.

Although Holi is traditionally recognized as an ancient Hindu festival, historical evidence shows that after the arrival of Muslims in India during the Middle Ages, Sultans and Mughal emperors celebrated the festival without hesitation, even during the Sultanate and Mughal periods.[13] There is no record of any protests from upper-caste Hindus against Muslim participation in this festival. Perhaps the upper-caste Hindus did not find it problematic, as Holi,

originally a festival associated with the Dalits, was seen as separate from their cultural sphere, and thus no objection was raised. Though now widely seen as a Hindu festival, Holi has historically witnessed Hindu-Muslim tensions and riots, particularly from the mid-British period onward.

Another key aspect of Holi's protest narrative lies in its inclusivity. Over time, despite its association with the Dalits, Holi became a festival embraced by a broad spectrum of society, including Muslims. This shift in Holi's cultural meaning reflects its growing role as a symbol of unity across religious and social divides. The celebration of Holi, free from caste-based exclusion, gradually became a broader expression of resistance not only against the oppression of Dalits but also against the entire social system that perpetuated inequality.

Over time, however, Holi has evolved into something very different. What was once a festival born out of resistance to caste-based discrimination has transformed into a celebration of love and unity. Today, it is celebrated by people of all backgrounds—irrespective of caste, religion, colour, or language—making it a universal festival of joy and togetherness. In contemporary times, Holi's transition from a marginalized celebration to a widely accepted festival of unity and joy reflects the social changes in India. What was once a festival rooted in the resistance against caste discrimination has evolved into a celebration of love, camaraderie, and collective joy. However, it remains, at its core, a festival that continues to carry the memory of protest—a reminder of the Dalit struggle for equality, recognition, and social justice.

Conclusion:

The story of Holi as a Dalit festival is a testament to how social festivals in India have historically functioned as more than just cultural observances; they have been platforms for protest, resistance, and social change. By reclaiming Holi as their own, Dalits not only found a means of celebration but also an avenue to challenge the caste system and demand their rightful place in society. While the festival has since transcended its caste-based origins, its history remains an untold story of protest against discrimination, inequality, and social exclusion.

References:

1. https://panchjanya.com/2024/09/10/353750/bharat/a-celebration-of-social-xpression/, accessed on 28/03/2025.
2. Sumit Sarkar, 1983, Modern India 1885-1947, Delhi, Macmillan, P-99-100.
3. Op.cit, P-111-12.

4. Banerjee Debanjana, September 13, 2022, Barowari Pujo, Kolkata, The Statesman, Link- https://www.thestatesman.com/durga-puja/barowari-pujo-1503110807.html, Accessed on- 28/03/2025
5. Nirban Basu, 'Religious festival and working-class culture', op.cit., also in, Dipesh Chakraborty, Rethinking Working Class History, Bengal 1890-1940, O.U.P, Delhi, 1989, Pp- 81-90.
6. Ibid.
7. भुनेश्वरभास्कर, 2016, भोजपुरीलोक-संस्कृतिऔरपरंपरा, दिल्ली, प्रकाशनविभाग, सूचनाएवंविस्तारमंत्रालय, भारतसरकार,पृष्ठ -89-94
8. डा .शशिशेखरतिवारी, 2012, भोजपूरीलोकोक्तियां, पटना, बिहारराष्ट्रभाषापरिषद, पृष्ठ164।
9. Op.cit, पृष्ठ164।

10. মুর্মু মেরুনা, ঠিক সাঁওতালদের মতো, তারিখ -৩০জুন, ২০১৯, আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরসম্পাদকীয়।
https://www.anandabazar.com/editorial/the-discrimination-in-rbu-was-unnecessarily-politicised-1.1011150?fbclid=IwY2xjawJW_r1leHRuA2FlbQIxMQABHW6PAIgrE36Wy02EzSC9yyMXq9P5dqpzo2PunKox8F3gYXe9wvjIQ9zAwA_aem_GplpxAVqtgWVaYkjv2bWpA, Accessed on- 01/07/2019
11. डॉ .कृष्णदेवउपाध्याय, 1989, भोजपुरीलोक-संस्कृति, प्रयाग, हिन्दीसाहित्यसम्मेलनप्रेस, पृष्ठ- 328
12. Op.cit, पृष्ठ- 329
13. https://scroll.in/article/800900/in-mughal-india-holi-was-celebrated-with-the-same-pomp-as-eid, Accessed on- 20/01/2025.

Swami Vivekananda and his Educational Thoughts Include Social Values and the Present-Day Society

Sk. Mohammad Hasan
State Aided College Teacher, Dept. of History
Patrasayer Mahavidyalaya, Patrasayer, Bankura, West Bengal

Abstract: Every society has social ideals, customs, ideologies, traditions, and culture. All people in society must live in harmony with these. The continuity of idealistic social life continues from generation to generation through the conventional education system of the society, which is important for personality development. But with the radical change in the modern technology-based education system, idealistic social ideas are currently facing a great crisis, which has become a major obstacle in personality development. In the current education system, instead of character building, emphasis is being placed on traditional education, which is creating a selfish, aggressive, competitive attitude among the society and the people, and with the decline of social values, the ability of the people to differentiate between what is right and what is wrong has gradually become weak. Therefore, Swamiji spoke about the introduction of such an education system that will not only help the society to become self-reliant, but will also help in the formation of idealistic character along with the full development of the inherent divinity through the development of the spiritual consciousness of the people. He has tried to show that the education system should be such that Western science and Indian religion are harmonized. He has tried to show that the education system should be such that Western science and Indian religion are harmonized. An education system based on science without religion will lead the society towards destruction and the ideals of the society will be destroyed as well as the moral values will disappear. Swamiji also gave special importance to women's education for the ideals and moral values of the youth. Therefore, the subject of this article is Swamiji's purpose of introducing a socially ideal education system and its relevance to the present youth.

Keywords: Education, Values, Divinity, Character Building, Personality Development, Social Ideal.

Discussion: Humans are social beings. From within society, the entire life of humans revolves around society. Every society has certain social ideals, customs, ideas, traditions, and culture, with which individuals, as humans, must adapt, which is called socialization. In this context, Gillin and Gillin say, "By the term 'Socialization' we mean the process by which individual develops into a functioning member of the group according to its standards, conforming to its modes, observing its traditions and adjusting himself to the social situations."[1]

Socialization is a very important issue for both human and social life. Socialization is a process that continues uninterruptedly in human and social life. Socialization is a type of social education, through which an individual learns the norms, rules and regulations of society and develops into a competent member of society. It is through the conventional education system of the society that the ideals, customs, culture and continuity of life of the society are continued from generation to generation, which is very important for the development of personality. Education plays the most effective role in familiarizing the individual with the civilization and culture prevalent in life and the social life has the potential to be smooth, harmonious, peaceful and progressive. Therefore, education should be such that it plays a supportive role in the development of the personality of the individual.

Currently, society and the entire world are surrounded by the modern machine-driven technology of science, which is of immense importance in human life and social change. Thanks to modern technology, the infrastructure in the field of education has undergone radical changes. At the same time, it has been possible to improve the quality of education. Based on which, the progress of society is gradually increasing and there is no room for disagreement on this point, which has created a competitive mentality in the whole world. But the question is, even though modern technology has made it possible to improve the infrastructure and quality of education in the field of education, has it helped in the proper development of personality? Because if we evaluate the current society, we will see that more importance is given to traditional education in the education system instead of character building. Just as selfish, aggressive, and competitive attitudes have been created among society and people, so too has an attitude of mutual intolerance been created, and with the decline of social values, people's ability to differentiate between right and wrong is becoming increasingly weak. Incidentally, in his speech on the birth centenary of Swamiji, the then President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, said, Today we are facing a great crisis. Many believe that we are standing on the brink of

destruction. The values of society are distorted, the moral standards of life are degraded. We are affected by totalitarian pessimism and universal madness, we are confused by despair, we are degraded by defeat. But this distrust of the human soul is a despicable betrayal of human dignity. If we have to remember any of Swamiji's words, it is a call to trust in our spiritual greatness. Infinite spiritual potential lies within man. The human soul is supreme, man is unique, wonderful, we only have to hope. Vivekananda has given us refuge in pain, hope in sorrow, courage in despair.[2]

Swamiji believed in the importance of introducing an educational system that would reveal the perfection that is already present in every human being. Therefore, he believed that Vedanta should be spread among all classes of people. Spiritual progress is possible only when the truth of the true theory of Vedanta and faith in that truth is awakened in the minds of people. And through that true knowledge, the veil of the human heart can be removed and the infinite power that is present can be revealed. Therefore, such an education system should be introduced for every person, regardless of caste and religion, through which the development of a true personality is possible along with spiritual progress in every person and at the same time social values are also awakened. In view of the above, Swami Vivekananda is one of the few great people who spoke about the introduction of an ideal education system based on the socio-economic context of 19th century India. He was in favor of introducing a modern education system by combining Western scientific consciousness with Indian spiritual consciousness. Because he knew that if, in the context of India, religion is excluded, spiritual consciousness is kept at a distance and the education system is introduced only based on Western scientific consciousness, its success will not extend far. According to him, science-based education makes people rational and self-reliant. And religion-based education provides values and moral education through the development of people's spiritual consciousness. But today, although science-based machine-driven modern education has made individuals fit for the times, it has abolished values and morals and has bound the individual in the chains of slavery and has created obstacles in the development of the individual's full personality. Only through real education can this chain of slavery be broken in the life of every individual and the development of a full personality be possible. In this context, the importance of Swamiji's educational thought is as relevant as it is far-reaching.

Incidentally, Swami Abedananda says, in Sanskrit we find three words, Daya, Dharma and Dan. Which are included in moral qualities. By denying these

moral qualities, loving only oneself is called selfishness. This self-centered love is narrow. Therefore, it is the name of bondage and darkness. By practicing moral qualities, love and friendship are created among people. Which removes the narrow darkness of the mind and opens the door to confidence, makes one's personality hopeful, fresh and strong. Just as the sun shines indiscriminately on all people, guilty and innocent; so too should every human being love and benefit all beings, irrespective of race, color and religion; and only then will the spiritual consciousness be opened in the perfection of moral life, and social values will also be awakened.[3] But the question is, what are values? How can values be awakened? How did Swami Vivekananda answer this question?

In the Indian perspective, values generally refer to moral values or spiritual values. These values play a particularly effective role in the social progress of any society. Therefore, it is said that 'Moral values of a society are the backbone of that society'.[4] Of course, apart from moral values, there are different types of values, such as political values, social values, economic values, religious values, etc. But the basis of any value is spiritual values.

Value is defined in Western philosophy as 'Value'. This is not the same as Eastern philosophy. Some Western thinkers believe that humans cannot explain values genetically. Biologist Richard Dawkins says in his book 'The Selfish Gene' that humans, like other animals, are special machines made up of genes. Genetically, it can be seen that humans are selfish. Sometimes we pretend to be selfless for the sake of our own interests. As a result, people do not get any idea of values from their genes. At the root of this thinking is the strong influence of materialism. An attempt has been made to confine people within a small sense of self. But in the spiritual consciousness of India, the welfare of all living beings or altruism is repeatedly found. Values form a bridge between materialism and spirituality. These values awaken the understanding of the inner being of man. Man is freed from small self-interest and is inspired by compassion, love, and empathy. And moral consciousness arises in man.

But one of the main reasons for the decline of moral values in today's society is the unprecedented development of secular science-based information technology. Just because people in the West are educated in science-based education does not mean that they lack values or morality. Rather, the practical values and morality of Western people are much higher than ours, and their social responsibility is also greater. In this context, while talking about how much modern science has taught human society, Russian philosopher Prince Kropot Nik said, Modern science has achieved two objectives. One has given a

man a valuable lesson of humility and selflessness. Man has learned from science how small and helpless man is compared to the vastness of the universe. In this way, the boundaries of his limited ego have been broken, and he has understood that a particular center of the vast universe is the object of exclusive attraction of the Creator God. Science has taught man that leaving God aside, his individual existence is very insignificant. The existence of the small 'I' without 'you', i.e. God, is completely meaningless. On the other hand, by opening up self-consciousness, science has taught man to utilize the infinite power of the universe. So that he can become infinitely powerful on the path of progress. In the West, the outward manifestation of religion has been reflected in actions much more than it has been reflected externally. That is, there are moral values in behavior, there is morality; but there is no spiritual basis behind morality and values, there is no faith in spirituality. To make morality worthwhile, to give stability to values, a conscious spiritual consciousness is needed behind it. According to Vivekananda, only religion can awaken spiritual consciousness. Therefore, while praising the Western civilization based on modern science, he said to them, "If Western civilization is not built on a spiritual foundation, it will be completely destroyed within the next fifty years. ... If Europe, the playground of material power, does not change the basis of its wealth and build it on spirituality, it will be destroyed within fifty years."[5] How true and practical this statement of Swamiji is can be understood by looking at the countries in the West today.

Just as Swamiji had warned the West, which relied on science, he also warned of the evil influence of science gradually spreading in Eastern life. He told the people of India, "If you abandon religion and rush towards the materialistic and all-encompassing civilization of the Western nations, then the three generations will perish without leaving. If you abandon religion, the very backbone of the Hindu nation will be broken, the foundation on which the vast national edifice was built will be broken, and therefore the result will be complete destruction."[6] So Swamiji's statement about the East and the West was that even if there is unprecedented development in information technology and only science is given importance without giving importance to religion, real progress in society is not possible. Progress in society is possible only if there is proper development of personality, and in that case spiritual values play a particularly effective role. Therefore Swamiji said that if religion is excluded, all spirituality will disappear from the world, all moral values will disappear, all sweet sympathy towards religion will disappear, all ideals will be destroyed..."[7]

According to Swamiji, religion is the center of gravity of spirituality. Just as spiritual realization is not possible without religion, so is true awakening of values. Incidentally, in his birth centenary speech, Will Durant said that Swami Vivekananda was telling his countrymen, "We want the religion that makes man... . Abandon the debilitating mysticisms, be brave for the next fifty years... . Leave all other meaningless gods from our minds. The only God who is awake. He is our nation, His hands are everywhere, His feet are everywhere, His ears are everywhere; He is omnipresent.... The worship of those around us is the first need.... These are our Gods, these are all men and other animals; and the first gods we have to worship are the people of our country."[8]

The first word of Swamiji's educational thought is "to develop man" and through him to develop society beautifully. But the present education system cannot develop real man, because a distrustful negative attitude is being expressed towards the education system, that education is more terrible than death. Therefore, Swamiji's aim was to introduce such an education system that can skillfully reveal honest ideals and thoughts in people, through which real humanity, real character and life can be formed. We have to awaken the divinity that is hidden within us due to our wrong thinking and wrong living. We have to develop the Vedic essence. In this context, Swamiji reminded us that "Each soul is potentially divine".[9] From the beginning, divinity is present in everyone, to awaken it, he has repeatedly awakened it with the Agni Mantra, addressing it as 'Amritasya Putra'. Since birth, infinite power, infinite potential, divine consciousness have been latent within you. Move towards self-liberation through its emergence.

He believed that liberation could never come through education based on modern science alone. Real liberation, including social progress and the elimination of inequality, can come only through the combination of science and religion, if spiritual values are developed. But the true understanding of spiritual values is possible only if the personality is properly developed, and for the development of personality, education is needed, real education. Real education will help in removing the darkness of the mind and developing the inner perfection of the individual, and the Brahman that is in the heart of man will be revealed. Therefore, Swami Vivekananda believed that in order to guide the society in the right direction, people from every level of society should be educated in real education. Through which the good intellect and will of the people are properly developed and guided in an honest manner. Real education is the education that destroys the animality inherent in the heart of the people and

helps in the manifestation of divinity. He wanted every person from every level of society to live in this world with his head held high while maintaining his individuality. The well-being of human life and society is possible only if the personality is properly developed. In that case, social values play a particularly effective role. Modern technology will not be properly applied for the well-being of human life unless every person at every level of society can be educated with proper education.

According to Swamiji, the "main goal" of education is to build character and make people. But the way a competitive mentality has been created in modern education, the goal of education, which is to build character and make people, is being thwarted and the real progress of society is also being hindered. Because the two main flaws of modern education are lack of respect and lack of morality. However, without respect, it is not possible to gain real knowledge, and without morality, it is not possible to make 'human' through education. Therefore, Swamiji said that for the progress of society, students and society should be given such education that the divinity inherent in them is revealed, and if that is possible, then it is possible to build humanity, morality, honesty and strong character in people. For this purpose, Swamiji, while describing education, says, "Education is the manifestation of the divinity that exists within man from the beginning."[10] But how can divinity be revealed through education? According to Swamiji, at the end of every action, the formations remain and they accumulate in the mind. In this way, as the formations accumulate, they combine and become habits. Human nature depends on those habits. If our present nature is only due to habits, then we can remove those habits whenever we want. But for that, it is necessary to be honest physically, verbally and mentally. Because the things we do, say and think leave an impression on our minds, the formations are the sum of them. Our character is the sum of those habitual formations. The formations of bad habits that have accumulated in our minds have to be controlled by good habits. As a result of continuous effort in this way, bad habits will be eliminated and good habits will be consolidated and a good character will be formed. And gradually the path will be opened for the full development of the divinity that is already present in man. Although many people think that this is not possible, because as humans we cannot elevate ourselves to the ultimate state of divinity. Others think that it is possible, because we are originally created in the image of the Supreme Soul, we are sparks of the same fire. Divinity is the true nature of man.

In the message of modernity in education, Swamiji inspired the youth to awaken the divinity that lies dormant in the society, which is the true nature of all beings, through the knowledge of Shiva through life service. He inspired them with divine consciousness, established the common man in the highest status, in 'divinity' - for this perfection to be established, he told the entire world, "Arise, Awake and Stop not yet the goal is reached".[11] But this effort can be successful if it is possible to eliminate negative thoughts and educate everyone, regardless of race or religion, through positive education. In other words, if the youth can be educated through real education, then only the divinity that has always existed within man will be fully developed and the values of society will be re-established.

Swami Vivekananda emphasized on the spread of education among all sections of society, emphasizing on character and moral education. Swamiji explained his ideal and goal of life very briefly to sister Nivedita, saying, "The message of the divinity within man should be preached and the method of developing that divinity should be determined". He observed that if man cannot be self-reliant in every aspect of his personal life, then all the wealth of the world will not be sufficient help for a village in India. But if you look at the pages of history, you will see that some people have used education in their own way for their own interests for ages. And the common people have fallen behind with time. Vivekananda understood this flawed inequality of society in his heart. That is why he said, 'The true nation, those who live in huts, have forgotten their personality and humanity, their lost sense of individuality will have to be restored.' They must be educated. He believed that if some people have to be given more and some less, then the weak should be given more benefits than the strong. Only then will it be possible to eliminate the discrimination among people in society and establish equality. Education is the only way that can eliminate the discrimination among people in society and establish unity. Therefore, according to Swamiji, the progress of any nation or society is not possible without real education.[12]

According to Swamiji, for the overall development of society, the spread of women's education is necessary throughout the country. In this context, he said, "The development of women and the awakening of the masses - both of these are necessary first and foremost, and only then can there be real welfare in the country and the entire world." He understood that the cause of the distorted values of society is the deterioration of women's education, which has been going on since ancient times. According to him, if the mother is not educated,

how will the child be educated, become the ideal of the society. Mothers are the first teachers or gurus of every child. The nature of a mother has a special influence on a child, which he has explained with examples from his own life, how much he owes his knowledge to his mother. Regarding the spread of women's education, his idea is that nothing can be achieved without the spread of education among girls. Not only that, his definition of an Indian woman was - to be absolutely pure in nature, devoted to her husband, and like Sita in all respects, so he said - "There is no other character in any mythological story that has permeated the life of an entire nation like the ideal of Sita. ... In India, whatever is honest, pure and holy, Sita is the name of that."[13] Vivekananda believed that when an ideal woman with pure character becomes the mother of a child, her pure character will be reflected in her child. Real education is needed for the development of pure character. Therefore, he said that mythology, history, housework, art, rules of housekeeping and principles that help in forming ideal character should be taught with the help of current science. If the mother is educated and ethical, then only through her hands will the future youth be created, social welfare and moral values will be established.

In the competition of modernity, society is changing on its own path, and will continue to do so. But currently, amidst various social, political, and economic ups and downs, the social evaluation of society is being hindered for various reasons. There are many prohibitions regardless of caste and religion, and their refinement is far from being possible, rather there is no possibility of refinement. Is the gradual loss of values the reason for the social situation to be like this? In fact, values are the sense of humanity, which exists among all people in all countries, perhaps its number is decreasing. But we believe that there is a continuous structure for managing the social system, social order exists, so it can be said that values have not been completely lost yet. Humanity exists among a few people in society, which shows the way for society to move forward in the right way. And this is where the words and writings of Swami Vivekananda are particularly needed. Along with education, there is a need for continuous practice of Swamiji's words and writings for the purpose of character building. Which will help in building the future youth. That is why Swamiji called upon the youth to revive the country. Because the youth are the first to raise questions about every injustice or prejudice in the society. They are the ones who jump into the question of solutions. That youth community is still as vibrant as ever, we just need to shine a little light in their minds. That knowledge

will be about national affairs, social affairs, education affairs and religious affairs.

References:

1. Cultural Sociology, Gillin & Gillin, Macmillan, New York, 1948, p. 112.
2. Sardhoshotojanmojayantismaroksonkha, vol. II, Sawasshotonirvikpothik, ed. by Sri Sushanta Dutta, p. 89.
3. Swami Pragyanand, Avedanonda Dorshon, p. 161.
4. The changing system of values and present society, Suparna Ghosh, p. 60.
5. Swami Vivekananda Bani O Rachana, Vol. VII, p. 195.
6. Swami Vivekananda Bani O Rachana, Vol. IX, p. 401.
7. Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986. Vol. IV, P-318
8. Sardhoshotojanmojayantismaroksonkha, op. cit., p. 88.
9. Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986. Vol.1, p. 124.
10. Swami Vivekananda Bani O Rachana, Vol. V, p. 325.
11. Complete work of Swami Vivekananda, Advata Ashram, Calcutta, 1986, Vol. III, p. 430.
12. Sardhoshotojanmojayantismaroksonkha, op. cit., p. 331.
13. Swami Vivekananda Bani O Rachana, Vol. I, p. 423.

The Surveillance Scheme : British Intelligence and the Suppression of Revolutionary Movements in India (1900-1920s)

Shampa Khatun
Research Associate, ICSSR Major project
New Delhi

Abstract: This paper explores the evolution of surveillance and espionage systems in India, tracing their roots from ancient times to the British colonial era and Special emphasis is placed on the British colonial period, particularly the early 20th century, when revolutionary movements in Bengal prompted the British to formalize and expand their surveillance mechanisms. The Calcutta Surveillance Scheme is examined as a key initiative to curb anti-colonial activities through systematic intelligence gathering, infiltration, and repression. The paper analyzes key developments such as the establishment of District Intelligence Branches, and the introduction of repressive laws like the Rowlatt Act. Through statistical data and official reports, it evaluates the effectiveness of British surveillance in reducing revolutionary activities between 1924 and 1926. Ultimately, the paper concludes that while British surveillance succeeded in short-term suppression of dissent, it failed to halt the larger nationalist movement that eventually led to India's independence in 1947.
Keywords: crime, intelligence gathering, surveillance scheme, nationalist revolutionary activity, measures.

Discussion: Surveillance systems in India have existed since ancient times. The reference of espionage system goes back to ancient times from numerous historical texts such as the Rigveda, Ramayana and Mahabharata. The Mauryan Empire, which ruled India over 2,000 years ago, had a very advanced spy system that helped them keep an eye on their enemies and stay one step ahead.[1]As India moved into medieval times, the Delhi Sultanate and the Mughal Empire also used espionage and surveillance to maintain their power. The Mughals, in particular, had a well-organized intelligence network that included spies and informers.[2] They used this network to gather information about their enemies, monitor the loyalty of their officials, and even control the spread of information. Zia-ud-din Barani writes that the system of spies made the king aware of each

and everything about his nobles — what happened, where and what was talked about — everything was reported the next day to the king. The result was that nobles and government officials had no courage to speak a word against him.[3] When India was ruled by the Britisher, they also used surveillance and espionage to keep control over the country. The British conquest of India was accompanied by large-scale violence. The British administration tried to control the situation and introduces various surveillance measures for monitoring and strengthening the Empire., surveillance was "watching over probable evil-doers so as to prevent them from committing crime".[4] In particular, it was exercised over suspected habitual criminals – a criminal classification that included released convicts and non-convicted but suspicious characters.[5] The Police Act of 1861 gave local district superintendents the power to develop their own policing practices, which could include surveillance. The British also introduced the Telegraph Act of 1885, which allowed the government to take control of licensed telegraphs and intercept messages.[6] This marked the beginning of modern communication surveillance in India, giving the authorities the power to monitor and control the flow of information.From ancient spies to modern intelligence agencies, India's history of surveillance and espionage is a rich and complex one that continues to shape the country's security and politics today. The British conquest of India was accompanied by large-scale violence. The British administration tried to control the situation and introduces various surveillance measures for monitoring and strengthening the Empire.

The Calcutta Surveillance Scheme was a significant initiative undertaken by the British colonial authorities to prevent the growing revolutionary movements in Bengal during the early 20th century. The rise of nationalist movements during this period posed a direct threat to British colonial rule. Calcutta, which had been the capital of British India until 1911, was the epicenter of revolutionary activities. Various underground nationalist groups, driven by the desire for India's independence, engaged in acts of violence, bombings, and protests aimed at challenging British rule. As these revolutionary groups gained momentum, the British authorities initiated a advanced surveillance network to control and neutralize these threats. The surveillance schemes implemented by the colonial government would ultimately become a key aspect of British strategy in maintaining control over Bengal, and more broadly, India.

Early Developments and the Introduction of the Surveillance Scheme

In the early years of the 20th century, Bengal was increasingly seen as the center of revolutionary nationalist activities. The rise of groups like the Anushilan Samiti and Jugantar, dedicated to Indian independence through violence and threaten, became a major concern for the British authorities. The government had already set up surveillance mechanisms in smaller districts like Jessore and the 24-Parganas to control the spread of revolutionary activities. The effectiveness of these smaller operations prompted the British to extend surveillance to the larger urban areas, particularly to Calcutta. F.A. Halliday, the Police Commissioner of Calcutta, in a letter to Mr. Stevenson in 1911, outlined the detailed plans for expanding surveillance operations in the city. He noted that the surveillance system had already been successfully implemented in other districts of Bengal and that Calcutta would be the next area of focus. The decision to extend surveillance to Calcutta was made in light of increasing unrest and nationalist activities in the city. Halliday's letter revealed that by mid-1911, numerous individuals had already come under suspicion, many of whom were involved in the political movements. In response to the rising threat, Halliday recommended appointing an Assistant Superintendent of Police to help with the administration and management of these operations.[7]

Expansion of the Surveillance Scheme

In September 1911, the British colonial administration in Calcutta formalized a comprehensive surveillance operation to monitor and suppress revolutionary activities. This initiative was led by Inspector Rai Bahadur Gupta, who headed the newly established Calcutta Special Branch. The surveillance team comprised four sub-inspectors, 58 head constables, and 48 constables, all under the supervision of a Deputy Superintendent of Police. Officers were equipped with bicycles to enhance mobility and efficiency in monitoring suspects across the city. Detailed diaries and reports were maintained to track patterns in revolutionary movements, ensuring authorities were always informed of the evolving situation. The scheme marked an early form of urban intelligence gathering, optimizing manpower to maintain a watchful eye on revolutionary groups in Calcutta.[8]

A significant turning point in British surveillance efforts occurred on December 23, 1912, when a bomb was thrown at Lord Hardinge, the Viceroy of India, during a procession in Delhi. The attack was part of the Delhi-Lahore Conspiracy orchestrated by Rash Behari Bose and other revolutionaries. Although Lord Hardinge was injured, the bombing revealed serious gaps in

British intelligence, as authorities had no prior knowledge of the group behind the attack. In response, the British government intensified its surveillance operations in Bengal, especially in Calcutta. A special investigative team, led by David Petrie and assisted by Scotland Yard's Sir Edward Henry, was formed to uncover the offenders. Through meticulous investigation, the team identified the perpetrators, and several conspirators were arrested. However, Rash Behari Bose managed to escape, highlighting the need for more effective intelligence techniques. The aftermath of the Delhi bombing prompted the British to strengthen their intelligence network, leading to the establishment of District Intelligence Branches (DIBs) across India. These branches were tasked with monitoring grassroots movements and gathering intelligence on nationalist groups at the district level. Additionally, the Rowlatt Act of 1915 was enacted, granting the police powers to arrest individuals suspected of nationalist activities without trial. These measures marked a significant escalation in British efforts to control and suppress the growing nationalist movement in India.[9]

The Rowlatt Act marked an intensification of British repression in India, particularly in Bengal, where revolutionary movements had been gaining ground. The Rowlatt Act also marked a pivotal moment in the expansion of intelligence operations. Surveillance techniques evolved as the British authorities sought to infiltrate revolutionary groups and break them from within. Intelligence officers used a variety of methods, including covert agents, undercover operations, and even sowing discord within revolutionary groups to weaken their unity. British intelligence had learned from its failures during the Delhi bombing, and by 1917, it had refined its approach, focusing not just on surveillance but also on disrupting and dismantling revolutionary networks. Additionally, the growing political unrest in India during this period saw a rise in the formation of new revolutionary groups, which further pushed the British authorities to enhance their surveillance techniques. As national movements gained traction, especially in Bengal, the intelligence community found itself stretched thin. Increased personnel and resources were allocated to the surveillance apparatus to deal with the rise in activities across the country.[10]

By the 1920s, the revolutionary movement in India had evolved. The Government Report of 1924 proved that the British Officers did not control the Political situation after 1924. Therefore, they employed more officers to tackle the situation. The problem described in the report is as follows:

> "It has been proved by notes written since 1919 and has been admitted by the introduction of the Ordinance that the

> revolutionary movement was reorganised during the periods of non-co-operation, swaraj and satyagraha activities, and has gained a firm hold throughout the province. Action taken so far has merely loosened its hold. Hitherto, the use of Regulation III has only acted as a temporary check and it had proposed to follow up the Ordinance by a Bill, with a view to render action taken more effective and more permanent. It will now be necessary to study the information at our disposal more closely, in order to break the hold, which the movement has gained, to trace the details of the organisation, to mark down other members to deal with, and to prepare their case. There is every prospect of efforts made to sustain the organisation, and it is likely that more information will be forthcoming. It is inevitable that further investigation will increased the volume of work, and it is not possible for one special Superintendent to cope with to cope with it; to direct enquiries, to draft reports, to examine cases, to write histories, to deal with questions arising from searches, internment, interviews, etc., in addition to the ordinary office work. Experience shows that there is sufficient routine work to occupy one Superintendent. Investigation will occupy another and sufficient routine work to occupy one Superintendent. Investigation will occupy another and write history sheets etc., the third. For the past three months, all officers have been working long over time and at high pressure."[11]

Furthermore, they also thought about How they could come out of this situation and agreed to continue their force. They had mentioned it in their report as -

> "The most important point we have to deal with, I think, is to secure the uninterrupted flow of our offensive against the revolutionary groups. This means chiefly collection and use of accurate information about those groups with a view to breaking them up and, as necessity arises, to further action under the Ordinance."[12]

In the early 20th century, British authorities in Calcutta devised a strategic approach to gather intelligence on revolutionary activities. This approach was divided into three key stages:

> “First, they focused on managing existing informants and recruiting new ones to expand their network of intelligence

sources. Second, they conducted interviews with individuals who had previously been under surveillance, aiming to persuade them to abandon violent methods and instead collaborate with the authorities to counteract revolutionary movements. Lastly, the information collected from both informants and interviews was thoroughly investigated to assess its reliability and to uncover any hidden networks or plans. This systematic process was integral to the British intelligence operations in Calcutta, reflecting their efforts to maintain control over the growing nationalist sentiments in the region."[13] In response to the growing political violence, the British Government employed staff in the District Intelligence Branch from the 1st of January 1925 to control the contemporary situation. The Government Report of 1926 shows that the actual cases decreased from 79544 in 1924 to 75716 in the year under review. As regards cases reported to the Police, a decrease occurred in twenty districts, the most noticeable being Burdwan with 1257 cases, followed by Howrah with 985, Bakarganj with 689, Dinajpore with 568, and Hooghly with 491.[14]

The following table shows the extent to which figures vary from year to year for the same district and also how they differ in districts of equal size and importance.[15]

District	**Number received for investigation. 1924-1925**	
Malda	4	30
Murshidabad	34	7
Hooghly	9	39
Faridpur	53	92
Khulna	50	35
Burdwan	44	38
Padna	45	43
Decca	59	69
Midnapore	8	34

Tippera	17	35
Mymensingh	91	147
Bakerganj	236	196
24-Parganas	171	146

In addition to the cases mentioned above in which the Police were required to draw up first information report, four-hundred eighty-five complaints were referred to the Police for enquiry on specific points. This is a decrease of 60 cases as compared with the figures for 1924, but referring such cases to the police needs to be further discouraged. The Non-Cooperation Movement and the Salt March of 1920-1930 brought about a fundamental shift from relatively small-scale violent acts to mass movements calling for complete independence from British rule. The British response, predictably, was to further intensify their surveillance operations. With nationalist leaders like Subhas Chandra Bose and Chittaranjan Das rising to prominence, the British government began to deploy more intelligence officers to monitor nationalist activities. District Intelligence Branches expanded, with local officers tasked with watching key leaders and groups. The personnel strength of the intelligence network also increased significantly, as more officers were needed to track the movement of nationalist groups in both rural and urban areas. The presence of British intelligence officers in districts like Dacca, Mymensingh, and Bakarganj reflected the widespread nature of surveillance operations. Surveillance officers were tasked with monitoring public gatherings, collecting information from informers, and employing covert tactics to infiltrate revolutionary cells. The British authorities were well aware that the nationalist movement had become a major threat, and they were determined to suppress it using every tool available.

The Decline of Revolutionary Activities and the Impact of Surveillance

By the mid-1920s, the British authorities noted a significant decline in revolutionary activities, particularly in Bengal. The number of reported revolutionary incidents dropped considerably between 1924 and 1926. In 1924, the authorities recorded 79,544 cases of revolutionary activity, but by 1926, that number had decreased to 75,716. This decline was attributed to the success of the surveillance network, which had managed to neutralize or disperse many revolutionary groups through arrests, surveillance, and strategic disruption. The effectiveness of surveillance operations was also evident in the success of several high-profile investigations and arrests. One of the most notable cases was the arrest of Sachindra Nath Sanyal, a prominent revolutionary leader, for his role in

circulating seditious leaflets. The British intelligence network succeeded in tracing the origin of the leaflets and apprehending Sanyal, a testament to the effectiveness of the surveillance system. In another instance, the authorities uncovered a bomb-making factory in Baranagar, 24-Parganas in 1924. The operation led to the arrest of nine individuals, and it was a key victory for British intelligence. The trial that followed saw the first use of a special tribunal under the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1925, marking an escalation in the legal measures used by the British to suppress revolutionary activities.[16]

Conclusion:

The Calcutta Surveillance Scheme was a backbone of British colonial strategy to control and suppress revolutionary movements in Bengal. The implementation of surveillance systems, the expansion of intelligence operations, and the introduction of authoritarian laws such as the Rowlatt Act all played critical roles in maintaining British dominance over India during a time of political unrest. Despite the apparent success of the surveillance schemes in suppress revolutionary activities, they also exposed the lengths to which the British authorities were willing to go to retain control over their colony. While these efforts were effective in the short term, they ultimately failed to prevent the growth of the nationalist movement, which eventually culminated in India's independence in 1947.

References:

1. Kautilya. (1992). Arthashastra. Translated by L.N. Rangarajan. Penguin Books.
2. Habib, Mohammad and Nizami, Khalid Ahmad (ed), Comprehensive Histroy of India Vol. V, The Delhi Sultant, 1970
3. Queshi, I.H, The Administration of Sultanate of Delhi, 1942, Delhi
4. J.A. Scott, Lectures on Practical Police Work, 24. MssEur F161/181-189
5. A.E. Stanley, District Superintendent of Saran to the Offg. Under-Secretary to the Government of Bengal, Judicial, Political and Appointment Department, 28 December 1890
6. Telegraph Act. (1885). Act No. 13 of 1885.
7. Home (pol.) Con. Department, File No. 263, B. Proceeding No.50, 1911, West Bengal State Archive
8. Ibid. Proceeding No.53
9. Ibid. Proceeding No.65
10. Police Political department, fille no. p. 3A/9 1-2, year 2011, West Bengal State Archives
11. Home (pol.) Con. Department, The Government Report of 1924, proceeding No. 35

12. Ibid.
13. Ibid, Proceeding No. 55
14. Home (pol.) Con. Department, Government Report of 1926, Proceeding No. 25, September 1926
15. Home (pol.) Con. Department, Government Report of 1926, Proceeding No. 26
16. Ibid, P.32.

Gender Stereotypes and Its Impact on Indian Society

Tanima Chatterjee
Assistant Professor, Department of Philosophy
Krishnagar Government College

Abstract: The word 'sex' refers to the biological attribute of an individual which is determined at the time of birth. On the other hand, the word 'gender' means socially constructed roles, behaviours, expressions and identity of different individuals. Gender Stereotype is bias about the physical appearance, behaviour, personality, occupations etc. of different genders, especially of men and women. In a developing country like India different gender stereotypes affect individual. There is a societal myth that each man or woman has to express some gender-based behaviour, for example, women have to rear children, cook, clean home and men have to take responsibility of earning money. Men who engage themselves in household work are often teased by society, as these works are thought as feminine. There are many other stereotypes regarding personality, use of language, etc. in society; which not only affect individual but also construct the mental make-up of future generation.
Keywords: Stereotype, gender, stress, behaviour, women.

Discussion: I have collected information required for my paper on the basis of face-to-face interaction survey. Women of different age group and different economic background were asked questions and their personal experience helped me to gather information.

'Sex' and 'gender' are two different words having two different meanings. According to Oxford English Dictionary, Sex is the classification of humans and many other living things into the two main categories of male and female based on their reproductive functions. So, Sex identity is natural. But, in case of human being, another identity is artificially constructed by society regarding the roles, behaviour, expression etc.of an individual. This is called gender identity. According to Oxford English Dictionary, stereotype means an image or idea of a particular type of person or thing that has become fixed through being widely held. Gender stereotype is bias about physical appearance, behaviour, personality, use of language, occupation, choice of dress etc. of different gender.

In the primitive society human beings had to fight with one another to earn their livelihood. They had to collect their food by means of hunting. All these needs physical strength. Chromosomes and hormones are some biological factors which are responsible for physical and mental difference between men and women. Men, being physically stronger than women in general, used to take the responsibility of collecting food. For giving birth and rearing children women had to be confined in home for long time. They used to take the responsibility of household work. With the passage of time human being became civilized, but as a result of the habit of a long period of time they developed a mental make-up which made them to believe that outside activity is suitable for men and in-house activity is for women. This gave men a chance to earn money and become self-dependent. From this point of view women were considered as inferior to men. In a developing country like India, gender stereotype affects the life of individual in different ways.

Indian society expects that each man and woman will express some gender-based behaviour. For example, women are expected to look after children and take care of elderly people, prepare food for family, wash clothes, clean home etc. Even when women pursue professional career, it is expected that they will take the responsibility of these household work also. This attitude makes women overburdened. On the other hand, men are usually not expected to do household works. 'In-house work is only for women'- this concept has been imprinted in the mind of society. When same type of activity is done by men outside home as chef or at laundry, which is useful to income money, is welcomed by society. On the other hand, men who engage themselves in household work in their home are often teased and stopped to do such activity by others, even by their wives. Some men may have special interest in cooking or they may want to help their wives or children to relieve them from becoming overburdened. But, stereotypes and societal myth about particular work related with masculinity and femininity sometimes stop them to perform such work. Again, some people believe that men will take the responsibility of financial aspects as these require intelligence. It is commonly thought that women are less intelligent than men and they are suitable for mechanical work only. Children of Indian families notice these gender-specific roles in their family and develop a mental make-up that this is natural and they consider interchange of such roles as unnatural.

The effect of gender stereotype is reflected in workplace also. Women are often thought of as gentle, sensitive, illogical and care giving. On the other hand,

men are thought as strong, forceful, aggressive, competent, competitive and independent. For this, women, sometimes, are not given leadership related roles. According to a report by professional networking platform LinkedIn and New Delhi- based public policy consulting firm The Quantum Hub, the percentage of women in senior leadership roles was 18.7% in 2023, but it has become 18.3% in 2024. This stereotype often affects the self-esteem of women. They may start to believe themselves less talented, less suited for challenging assignments and less worthy to supervise than their male counterpart. Both men and women have this gender bias, more or less in their mind, which limit and obstruct women's career advance. This may also affect the mental health of women. Again, women are viewed as meek, weaker sex by society and it may result in sexual harassment in workplace. In sports field also women are considered less competent than men. There is a common societal myth that 'sports field is mostly for men'. The performances of male sportsperson are celebrated more than that of women. Commercial investment in Women's sports is very poor in comparison to men's sports. There is a huge pay gap between male and female sportsperson in most of the sports. Sports equipment is mostly made up keeping male structure in mind, which is very much problematic for women.

Choice of dress of individual is also affected by genderstereotype. Women wearing western dress are often criticized as ultra-modern, specially in rural areas. It is also thought by society that such women want to attract men by their attire. Actually, some women feel that western dress is more comfortable to carry on outside activity. The concept of wearing western dresses related with one's wish of exposing oneself is often deemed unacceptable. Sports women are often criticized as they have to wear short dresses, which do not match with traditional dress of patriarchal society.

There are some gender stereotypes regarding beauty in Indian Society. Women are expected to be beautiful, which is measured by slim figure and fair complexion. Women with dark skin colour, fatty figure and short hair are often considered as less feminine. In the world of modelling these women are considered as less fitted. On the other hand, intelligence of men is given more importance. Women are affected by body-shaming and trolls also in social media.

The choice of dress-colour is also affected by gender stereotype in our country. It was ages ego when it was thought that some specific colours are related with masculinity and some with femininity. Still now it is deep-rooted in the mindset of some people that pink colour is for girls and blue, black, white or

grey colour is for boys. It is thought that pink colour is associated with qualities like nurturing and caring, which only girls should have. On the other hand, colours like blue, black etc. are thought to be associated with quality like aggression, which only boys should have. This is the result of long-term conditioning from our society. Actually, boys also need to have caring quality and girls also should develop aggression in demanding situation. So, there is no colour which is naturally related with specific gender. Parents, while buying dress for their children sometimes show this biasness. As a result, from very childhood a child may develop 'other feeling' towards its siblings or friends. So, it is better to choose gender-neutral colour that enhances ones looks, for both children and adults. Fashion is actually a matter of individual choice which should not be limited within the sphere of any specific gender. It is also a gender stereotype that ornaments are only for men. But, if we look back towards history, we find that in the ages of Vedas and Upanishads men used jewellery as a part of their traditional attire. Men have a history of wearing earrings, necklace, bracelets etc. as a symbol of wealth, community status or religious devotion. But using ornaments by men is mostly thought as feminine. In present days some actors like Ranveer Singh are using androgenous dress like skirts, ornaments which break gender stereotypes. Androgenous dress are those which are not meant for any specific gender. In some traditional Indian dress also, we find androgenous characteristics. For example, skirt and dhoti or lungi are to some extent similar. In Maharashtra, women wear saree in such a manner that has a similarity with dhoti. But gender stereotype is so deep-rooted in human mind that men wearing so-called dress like women or expressing emotions are often more marked and criticized, as society thinks it as degradation or becoming something inferior. This societal mentality is also expressed through the behaviour towards children. Most of the parents buy dolls, toy kitchen-kit for their daughters and toy guns, vehicles, bat-balls for their sons. In some cases, girls are given guns, vehicles, bat-balls, but boys are never given dolls or kitchen-kits. Boys who express emotion by crying often asked 'why are you crying like a girl?' In this way, from the very childhood people develop gender biasness and concept of specific gender roles in their minds.

By means of language gender stereotypes are reinforced in society. Pronouns such as 'Sir' is often used to refer to both men and women. It is true even within the Parliament of India. According to a report by 'The Hindu' in June 2022, references to inherently masculine pronouns are made over 150 times in the Rules of procedure in Rajya Sabha. Words like 'mankind', 'man-made',

'chairman', 'businessman', 'fireman' are some common words used in society which express gender bias embedded in it. The Supreme Court of India recently has released a guideline which can help judges to identify languages that promote incorrect ideas about women.

Media plays an important role in perpetuating gender stereotypes. In movies men are shown as strong, aggressive, decision maker in family and protector of women. On the other hand, women are represented as weak, dependent on men. In most of the advertisements, women are shown in their traditional role of serving food or caring children. All these strengthen the gender specific roles in viewer's mind. But media has also the potentiality to challenge gender biasness. In recent years, in films and television serials women are being represented as officers, detectives, sportsperson, taking responsibility of parents. In some advertisement men are also being shown as working in kitchen or taking care of children. This can be effective to change the mindset of common people as mass media can reach a huge number of people at the same time.

There can be arguments that according to Article 15 of Indian constitution, any discrimination on the basis of gender is forbidden. Now women are getting opportunity of education, scope of expressing opinion. They have equal right of choosing any profession, they are holding post of ministers. So, there is no discrimination or bias on the basis of gender. But this conclusion cannot be so easily drawn, because this view is only one- sided. A huge number of women do not get this opportunity. For this, participation of women in salaried job is significantly less than men. There are different Government scholarships for girls to enhance their scope of education. But, educated and sometimes self- dependent women also face gender biasness in different sphere of their life. Pinki (name changed) was a 19 years old college student. She told me that she was not allowed to come at college without cleaning her elder brother's room. Her brother had no such task. For this, she often could not reach college in time. Sunita (name changed) was an 18 years old girl from lower income group family. Her parents sent her to my neighbour's house for household work. She told me that her mother tells her that she can eat food only when there is sufficient food for her brother. In most of the times she does not get sufficient food. Sonali (name changed) was a 25 years old married woman who worked in a private sector. Her in-laws told her that she has to wear saree every time and she can go for her job only after completing cooking and other household works in the morning. She was so overburdened that she was

compelled to resign her job. There are millions of such women who are affected by gender stereotype in different spheres of life.

Conclusion: Any gender stereotype hinders the natural flow of life of an individual. The root of this biasness lies in the concept of inequality. Pointing one gender as inequal to other gender on the basis of some false interpretation leads to biasness towards that gender. Total change in the societal mindset is necessary to break this attitude. Implementation of gender- equality in the curriculum at the early school level is very much important in this regard. NCERT has already recommended that schools must ensure that teachers pay equal attention to boys and girls;they should select books and other activities without gender bias. Sensitization program for parents is also recommended. If students learn gender equality from the very beginning of their life, they will be able to give any individual proper respect that he or she deserves and help others to eradicate misconception from their mind. Stereotypes are deep-rooted in human mind from centuries ago. So, we cannot expect that it will be eradicated in a few years. But, now-a-days some people are coming out of it and performing gender neutral roles. We can expect minimization of gender stereotype in future. This is the only light of hope in 21st century.

Bibliography:

· Supreme Court of India, Handbook on Combating Gender Stereotypes, August 16, 2023, Page 7, 9, 13.

· Nadal, Kevin ed,The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender, Page 4,5

· www.thehindu.com,Indian ads furthergender stereotypes,shows study, April 22,2021,03:12 am IST ,New Delhi

· www.hindustantimes.com,breaking gender stereotypes should begin at playschool level,says NCERT,NewDelhi,By press trust of India,Oct17,2019, 12:19PM IST

· www.feminismindia.com, Gendering Colours and Style: Fashion's Journey In Shattering Gender Norms,by Lucky Kumar, Jun15,2023.

· www.outlookindia.com,'Yes Sir': How Use of Male – Centered Language In Parliament Reinforces Gender Stereotype,Anisha Reddy, updated on 30August 2023,1.35 am.

· https://m.economictimes.com,Percentage of Women in Senior Leadership Roles:Report, May 30,2024.

A Heritage Police and His Struggle for Protecting Tangible Heritages of Temple Village of India

Samima Nasrin
Research Scholar, Dept. of History
Presidency University

Abstract: Maluti, a small village of Jharkhand State, India is now considered the Temple Village of India. The village contains more than 70 temples of late medieval period. The temples did not meet its doomsday for a sole soldier, Gopaldas Mukherjee, a dweller of the said village. He literally knocked to door to door of the government offices so that government should take care of it.
Keywords: Maluti, Temples, Letter, Bihar.

Main Discussion:

Maluti, the Temple Village of India or 'Bishnupur of Jharkhand' is crowned with more than 70 temples of late medieval period. Most of the temples are chala type of temple. More than 30 temples are decorated with terracotta plaques. The rumor glorified that originally the total number of the said temples were 108. Although we could not believe in the existence of temple of such magical number, but certainly a few temples of the Baj Basanto Dynasty were dilapidated by the time. However, Gopaldas Mukherjee, a native descendent of the said dynasty acted as heritage police and longed for government initiative for taking care of the protected monuments. He was a soldier in his youth. Then he served as a teacher of his own mystic village, Maluti.

Gopaldas Mukherjee first approached to the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle on 28th May, 1979 requesting to earmark Maluti as a place of archaeological site and a place of tourist's interest and sent a write up on Maluti.[1] Prior to that, the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle visited the village in March, 1979 and promised to Gopaldas Mukherjee for sending the photographs of temples but Gopaldas Mukherjee did not get them then.[2] He also wrote to the Commissioner, Bhagalpur Division on 20th March, 1979 to extend his kind help regarding this.[3] But the Commissioner replied on 25th March, 1979 that he had already persuaded the ASI regarding the same.[4] On the 10th July, 1979, A. K. Sinha, the Registering Officer informed to Gopaldas Mukherjee that the Director, ASI, Mid-Eastern Circle would visit the village and for this he requested to Gopaldas Mukherjee and Nanda Dulal (a dweller of

Maluti) for staying at the village on that day and to arrange a rest room in the Middle School.[5] Later on the villagers spontaneously sent a no objection for Government of Bihar for taking over the temples of Maluti for protection to the Registering Officer, Bhagalpur Museum on 1st November, 1979.[6]

In the consequent year, A.K. Sinha, the Registering Officer, Bhagalpur informed Gopaldas Mukherjee on 15th June, 1980 that he would visit the village on 23rd June, 1980 along with R.S.Vist, the Director, ASI, Mid-Eastern Circle and a meeting would be held at Middle School at 4p.m with people with archaeological interest.[7] Before they advent to the village, Gopaldas Mukherjee informed to the Superintending Archaeologist , *"....these antiquities (remains) have drawn attention both of the scholars like Dr. David Maccutchon and Sri Amiya Kumar Basu and the government officials like Commissioner of Bhagalpur Division, Director, Museum and Archaeology, Bihar, Registering Officer, Bhagalpur Museum and others."*[8] But A.K. Sinha disappointed Gopaldas Mukherjee on 26th June, 1980 as he had to postpone the program as Rabindra Singh Vist, the Director could not join with him.[9] However, Bihar Government, Education (Archaeology & Museum) Department issued a notice no. Pura 814, Dated 30th July, 1980 and declared the temples of Maluti as 'protected' monuments.[10] For this, Gopaldas Mukherjee along with the villagers approached to the Director, ASI, and Mid-Eastern Circle for conserving the temples.[11] But it had a lengthy process to proceed the work. After eight months of the publication of the notification by Education (Archaeology & Museum Department), the joint secretary of the respective department asked the Deputy Commissioner, Santal Pargana, to notify it to its administrative department.[12] Gopaldas Mukherjee and the villagers appealed to the Joint Secretary, Government of Bihar, Education (Archaeology & Museum) for starting renovation work.[13] Gopaldas Mukherjee also send a synopsis regarding this to the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle, ASI, as the receiver had enquired the village along with party whether they should take the village under protection on 27th April, 1981.[14] He got a very positive response from H.K.Narain, the Superintending Archeologist, Mid-Eastern Circle on 20th June, 1981.[15] He informed that the Director General, ASI had approved the proposal of protection of the group of temples and urgently asked to furnish following documents- i) Ownership of the temples whether the monument was being looked after by any Government or by private body. ii) If the monument belonged to a private party, whether the owner was willing to enter an agreement and if so, under which condition.[16] So, on 29th June, 1981, Gopaldas Mukherjee sent a list containing the description of the

temples and the names of the respective owners and also enclosed a no objection from the villagers for the Government taking over temples existing at Maluti for protection and maintenance. In the letter, Gopaldas Mukherjee said, "The monuments were under the care of the individual owners previously. However, w.e. from 11.3.79 one Sri Nanda Dulal Banerjee of Maluti is looking after the monuments by verbal order of Sri A.K.Sinha, Registering Officer, Bhagalpur. The order was made in presence of Sri A.K.Rai and Sri D.P.Singh, both from Mid-Eastern Circle, Archaeological Survey of India."[17] The dwellers of Maluti also informed that there was no encumbrance and reported, "The monuments belong to private parties. They are willing to enter into agreement unconditionally for protection and maintenance of the temples."[18]

The State Government was also active. The Deputy Secretary, Government of Bihar, Education (Archaeology & Museum) asked the Deputy Commissioner, Santal Pargana to notify the above said notification to respective administrative departments, specially Anchaladhikari, Shikaripara.[19] Gopaldas Mukherjee also knocked the door of the same department in September, 1981.[20]

Maluti came to the limelight when H.K.Narain, the Superintending Archaeologist of Mid-Eastern Circle, ASI, published his article title, *'Maluti, the abode of Gods and Goddesses'* in the *'Indian Nation'* on 15th November, 1981. Gopaldas Mukherjee was very much thankful to him as his native village was unveiling towards the world. He informed him that he had published *'Devbhumi Maluti'* in Bengali and its 7500 copies had been sold out. He also expressed his desire to help H.K.Narain or any scholar who wished to work in this line for Ph.D[21] There was a big leap when H.K.Narain assured Gopaldas Mukherjee, "*The surveyor of this office will soon visit Maluti to collect the protection data and preparation of site plan. Early action is being taken by this office to protect the temple.*"[22] At that time, a group of high officials of Bihar visited the village and promised for all round development.[23]

Sri Ajoy Chakravarti, the surveyor from Mid-Eastern Circle came to Maluti on 11th February, 1982 and left the village on 26th February, 1982.[24] Gopaldas Mukherjee grabbed the opportunity for securing job to the villagers. So, he requested to the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle to hire from the localities when the department would be required for fresh staff.[25] On his demand, H. K. Narain replied after two months, "*Shri A.C. Chakraborty, Surveyor has already been directed to complete the work of site plan immediately. As soon as these works are completed, necessary step will be taken to protect the temples under survey.*"[26]

Gopaldas Mukherjee again contacted with the superintending archaeologist in January, 1983 after October, 1982 when S.N.Nandi visited Maluti to prepare a site plan of Maluti. He requested to inform him whether there was any objection regarding declaring the temples protected as he assumed that the plan submitted by their surveyor had approved in that time interval.[27] He again contacted with him in March, 1983 as there was no progress report since the said surveyor of the Mid-Eastern circle, ASI completed his survey on 7th October, 1982.[28]

The Officer-in-Charge, District General Branch, Dumka asked the Anchaladhikari, Shikaripara to collect written no objection permission from the villagers through Gopaldas Mukherjee in April, 1983.[29] So, Gopaldas Mukherjee and the villagers again sent the no objection to the Anchaladhikari, Shikaripara.[30] Gopaldas Mukherjee personally requested to the Anchaladhikari, Shikaripara to proceed further administrative work as well as to appoint local people for protecting from stealing the terracotta plaques.[31] Later on the Anchaladhikari, Shikaripara tried to fulfill his demand for appointing two guards from the localities.[32]

Gopaldas Mukhopadhyaya again contacted with H.K.Narain as there was no practical progress on paper work.[33]At that time he became so impatience that he contacted with the Director General, ASI and informed that H.K.Narain had visited Maluti on 27th April, 1981 and the Mid-eastern circle of ASI collected datas and had worked out site plan in two phases, during February and October 1982. Then he pleaded to Debala Mitra, the contemporary Director General, ASI for approving the site plan and the proposals connected to Maluti.[34]

On 22nd June, 1983, the Deputy Commissioner, Santal Pargana demanded the notification declaring protected the temples of Maluti from the Secretary of the Commissioner, Education (Archaeology & Museum) department.[35] At the same time H.K.Narain was replaced by K.P. Gupta. So, Gopaldas Mukherjee had to persuade the new Superintending Archeologist to proceed the work by reporting in detail the previous work.[36] Though he informed to the Joint Secretary, Education (Archaeology & Museum) that the official formalities had over.[37] He again requested to K.P.Gupta to arrange for necessary orders to set about the conservation work.[38] In this year, two terracotta plaques had been stolen in the occasion of Kali puja when a large number of outsiders crowded in the village.[39] However, on the 5th December, 1983, Government of Bihar, Education (Archeology & Museum) notified through gazetteer that those monuments were be treated as protected henceforward.[40]

So, it was a long tireless process when there was no smartphones or internet connections. But, Gopaldas Mukherjee's struggle was not ended here. He then fought to make Maluti as a place of tourist interest so that the youth did not leave the village. He was also successful in this field. The devotees are now rushed to the 'Tarapeeth of Jharkhand'. Even the foreigner people are enchanted with the aura of this little village.

References:

1. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject : Request to earmark Maluti as an archaeological site and a place of tourists' interest, received by the Superintending Archaeologist, ASI, Mid-Eastern Circle, 28th May, 1979, personal collection, Maluti
2. Ibid.
3. Letter by A.Pathak, Commissioner, Bhagalpur Division, Subject :Village Maluti- a place of tourist's interest, received by Gopaldas Mukherjee, 25th March, 1979, personal collection, Maluti
4. Ibid.
5. Letter by Ajay Kumar, Sinha, Registering Officer, Bhagalpur, received by Gopaldas Mukherjee, 10th July, 1979, personal collection, Maluti
6. Letter by the Villagers, Maluti, Subject: No Objection for Government of Bihar Taking Over the Temples of Maluti for Protection, received by the Registering Officer, Bhagalpur Museum, 1st November, 1979, personal collection, Maluti
7. Letter by Ajay Kumar, Sinha, Registering Officer, Bhagalpur, received by Gopaldas Mukherjee, 15th June, 1980, personal collection, Maluti
8. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject: Request for initiate protection of Monuments existing at Village Maluti, received by the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle, 16th June, 1980, personal collection, Maluti
9. Letter by Ajay Kumar, Sinha, Subject *: agami mahemeinmaluti ki jatra ki sammandhmein*, received by Gopaldas, Mukherjee, 26th June, 1980, personal collection, Maluti
10. Notification no. pura. b2-1020/80 814, dated 30th July, 1980, Government of Bihar, Education (Archaeology & Museum) Department.
11. Letter by the Villagers, Maluti, Subject *: Maluti meinabasthitprachinmandironki*…..,received by the Director, Mid-Eastern Circle, 22nd December, 1980, personal collection, Maluti
12. Letter by the Joint Secretary, Education (Archaeology & Museum), Government of Bihar. Subject*: Saontal Pargana jilla ki prachinsmarakebongaboshesho ko*

surakshitghoshitkarne ki sandarbhmein, received by the Deputy Commissioner, Santal Pargana,13th March, 1981, personal collection, Maluti.

13. Letter by Gopaldas, Mukherjee and the Villagers, Subject :*Saontal Pargana jilla ki prachinsmarakebongaboshesho ko surakshitghoshitkarne ki sandarbhmein,* received by the Joint Secretary, Government of Bihar, Education (Archaeology & Museum), 3rd April,1981, personal collection, Maluti
14. Letter by Gopaldas, Mukherjee, received by the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle, ASI, 29th April, 1981, personal collection, Maluti
15. Letter by H.K.Narain, received by Gopaldas, Mukherjee, 20th June, 1981, personal collection, Maluti
16. Ibid.
17. Letter by Gopaldas, Mukherjee, received by the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle, ASI, 29th June, 1981, personal collection, Maluti
18. Letter by the villagers of Maluti, Subject: No objection for the Government taking over temples existing at Maluti for protection and maintenance.
19. Letter by Chandranath, Mathur, Subject :*Maluti gram (Shikaripara) keprachinmandiron ko surakshitghoshitkarne ki sandarbhmein,* received by the Deputy Commissioner, Santal Pargana, 11th July, 1981, personal collection, Maluti
20. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject :*Maluti gramkoparjatankendra banana kesammandhmein*, received by the Deputy Commissioner, Santal Pargana, 2nd September, 1981, personal collection, Maluti
21. Letter by Gopaldas, Mukherjee, received by H.K.Narain, 2nd November, 1981, personal collection, Maluti
22. Letter by H.K.Narain, received by Gopaldas, Mukherjee, 17th November, 1981, personal collection, Maluti
23. Letter by Gopaldas, Mukherjee, received by H.K.Narain, 24th November, 1981, personal collection, Maluti
24. Interview taken by Samima Nasrin, from Gopaldas Mukherjee, 2nd February, 2020, Maluti
25. Letter by Gopaldas, Mukherjee, received by the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle, ASI, 3rd March, 1982, personal collection, Maluti
26. Letter by H.K.Narain, received by Gopaldas Mukherjee, 13th May, 1982, personal collection, Maluti
27. Letter by Gopaldas, Mukherjee, received by H.K.Narain, January, 1983, personal collection, Maluti

28. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject: Protection of group of temples at Maluti (S.P), received by the Superintending Archaeologist, Mid-Eastern Circle, ASI, 11th March, 1983, personal collection, Maluti
29. Letter by the Officer-in-Charge, District General Branch, Dumka, Subject :*Maluti gram meinabasthitprachinmandiron ko surokshitghoshitkarne ki sammandhmein,* received by the Anchaladhikari, Shikaripara, 11th April, 1983, personal collection, Maluti
30. Letter by Gopaldas, Mukherjee and the villagers, Subject :*Maluti gram meinabosthitprachinmandiron ko surokshitghoshitkarne ki sammandhmein,* received by the Anchaladhikari,Shikaripara,18th April, 1983, personal collection, Maluti
31. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject : *Maluti gram meinabosthitprachinmandiron ko surokshitghoshitkarne ki sammandhmein,* received by the Anchaladhikari, Shikaripara, 18th April, 1983, personal collection, Maluti
32. Letter by the Anchaladhikari, Shikaripara, Subject : *Maluti gram meinabosthitprachinmandiron ko surokshitghoshitkarne ki sammandhmein,* received by the Officer –in-charge, 20th April, 1983, personal collection, Maluti
33. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject: Protection of group of temples at Maluti, received by H.K.Narain, 2nd May, 1983, personal collection, Maluti
34. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject : Protection of group of temples at Maluti, under Shikaripara Block, Dist. SP, Bihar, received by the Director General of Archaeology, ASI, 5th May, 1983, personal collection, Maluti
35. Letter by the Deputy Commissioner, Santal Pargana, Subject : *Santal Pargana jillakeprachinsmarak/puratattwa sthal/ aboshes ko surakshitghoshitkarne ki sammandhmein,*received by the Secretary of the Commissioner, Education (Archaeology & Museum), 22nd June, 1983, personal collection, Maluti
36. Letter by Gopaldas. Mukherjee, Subject : Protection of ancient monuments at Maluti (Santhal Pargana), received by K.P.Gupta, 26th July, 1983, personal collection, Maluti
37. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject : Protection of ancient monuments at Maluti, Anchal Shikaripara, S.P, received by the Joint Secretary, Education (Archeology & Museum) Department, Government of Bihar, 5th September, 1983, personal collection, Maluti
38. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject : Protection of ancient monuments at Maluti (Santhal Pargana, received by the Superintending Archaeologist, Mid-eastern circle, 7th October, 1983, personal collection, Maluti

39. Letter by Gopaldas, Mukherjee, Subject : Protection of ancient monuments at Maluti, Anchal Shikaripara, Dist. Dumka (SP), received by the Joint Secretary, Education (Archaeology & Museum), Government of Bihar, 17th November, 1983, personal collection, Maluti

40. Bihar gazette, Education (Archaeology & Museum) Department, issued on 5th December, 1983, Patna.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

DOI : 10.5281/zenodo.16036760

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn : 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in